প্রতিষ্ঠাতা—স্বামী অভেদানন্দ

দশ বর্ষ—নবম সংখ্যা
ক মূল্য—চারি টাকা

কার্ত্তিক, ১৩৬২
প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন—বড়বাজার ১৮০৫

# শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত

## পুনর্জন্মবাদ

**REINCARNATION**—পুস্তকের বঙ্গানুবাদ।

পূর্ব্বজন্ম, পরজন্ম, পরলোক, মৃত্যুর পরে বিভিন্ন প্রকৃতির মনুষ্যের বিভিন্ন প্রকার গতি ও অবস্থা—সিদ্ধযোগীর অনুভূতি ও দার্শনিক মনীষার আলোকে ব্যাখ্যাত। বহুচিত্র সম্বলিত।

মূল্য—দুই টাকা

## শিক্ষা সমাজ ও ধর্ম্ম

এই গ্রন্থে আছে :—

শিক্ষার আদর্শ কিরূপ হওয়া উচিত,

শিক্ষার পদ্ধতি কিরূপ হইলে ব্যক্তি ও সমাজের উন্নতি হয়

সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি-সাধনের জন্য ইহার নিয়ম ও প্রথা কি প্রকার হওয়া উচিত

প্রকৃত ধর্ম্ম কি এবং ইহার প্রকৃতি কিরূপ—আধুনিক যুগের উপযোগী ধর্ম্মের ভিত্তি কিসের উপর স্থাপিত হইতে পারে—

প্রকৃত ধর্ম্ম ও আধুনিক বিজ্ঞানের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য কোথায়

মূল্য—আড়াই টাকা

## যোগশিক্ষা

How to be a Yogi-র বাঙলা অনুবাদ

যোগের তত্ত্ব ও সাধন-পদ্ধতি সম্বন্ধে এরূপ সহজ সরল ও প্রাণস্পর্শী ব্যাখ্যান অন্যত্র পাওয়া দুর্লভ।

একাধারে দার্শনিক মনীষা ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির সুষমাপূর্ণ সমাবেশ

যোগ কি, হঠযোগ, রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, প্রাণায়াম-সাধ আদর্শ যোগী যীশুখৃষ্ট প্রভৃতি শিক্ষাপ্রদ ও সারগর্ভ আলোচনায় সমৃদ্ধ।

মূল্য—দুই টাকা

P30404

## আত্মবিকাশ

Spiritual Unfoidment নামক পুস্তকের বঙ্গানুবাদ

এই পুস্তকে—'আত্মসংযম', 'ধারণা ও ধ্যান' এবং 'সমাধি'—এই তিনটি ও ধ্যান-সাধনার সমস্ত তথ্য ও পদ্ধতি আশ্চর্য্যভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

ঈশ্বরে চিত্ত-সমাধানের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদের অবশ্য পাঠ্য গ্রন্থ।

মূল্য—এক টাকা

প্রাপ্তিস্থান :—

**প্রাপ্তিস্থান—শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা**

সম্পাদক—স্বামী সদাত্মানন্দ ও স্বামী বেদানন্দ

১১বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের পক্ষে ব্রহ্মচারী বসন্তকুমার কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং ১৪১, বিবেকানন্দ রোড কলিকাতা-৬, ভারতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনিবারণচন্দ্র সিংহ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

# বিশ্ববাণী—কার্ত্তিক, ১৩৬২

## সূচীপত্র


| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | যোগেশ্বর-সাধনা ( প্রবন্ধ ) | স্বামী অভেদানন্দ | ৪৩১ |
| ২। | মায়াবাদ ও আচার্য্য গৌড়পাদ ( প্রবন্ধ ) | ব্রহ্মচারী [illegible] | ৪৪২ |
| ৩। | জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা ( প্রবন্ধ ) | ডাঃ [illegible] | ৪৪৪ |
| ৪। | শ্রীলক্ষ্মী-রহস্য ( প্রবন্ধ ) | শ্রীরাসমোহন চক্রবর্ত্তী | ৪৫১ |

## হাওড়া মোটর কোম্পানী লিঃ

( স্থাপিত—১৯১৮ )

মোটর গাড়ীর যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

নিখুঁত ভাবে ইঞ্জিন মেরামতি কার্য্য আমাদের বৈশিষ্ট্য

হেড অফিস—পি ৬, মিশন রো এক্সটেনসন, কলিকাতা—১

ফোন—২৩-১৮০৪ ( পাঁচ লাইন )

শাখা—বম্বে, দিল্লী, পাটনা, ধানবাদ, কটক ও গৌহাটি

বস্ত্র শিল্পে মোহিনীর অবদান অতুলনীয়

## মোহিনী মিলস্ লিমিটেড

— ১নং মিল — — ২নং মিল —

কুষ্টিয়া ( পাকিস্তান ) ● বেলঘোরিয়া ( ভারত )

এই মিলে প্রস্তুত ধুতি শাড়ী লংক্লথ প্রভৃতি ভারত ও পাকিস্তানে সমভাবে সমাদৃত

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ ঃ

## চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোম্পানী

রেজিষ্টার্ড অফিস :—২২নং ক্যানিং ষ্ট, কলিকাতা।

ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক, এম. এ, এম. ডি, বি. এল, আবিষ্কৃত

পেটেণ্ট

## ইক্-মিক্ কুকার

ইহাতে এক ঘণ্টায় ভাতের বিভিন্ন আমিষ ও নিরামিষ পাক অতি সহজে একঘণ্টায় সুন্দররূপে রন্ধন করা যায়। যে কোন জ্বালানী দ্রব্যের দ্বারা বিনা তত্ত্বাবধানে অতি অল্প খরচে রান্না চলে। মূল্য-তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

ম্যানেজার—ইক্-মিক্ কুকার, ২১১।১এ, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

## সূচীপত্র


| | | | |
|---|---|---|---|
| ৫। | তিব্বত ভারত সংস্কৃতি-সম্বন্ধ | শ্রীপ্রফুল্লকুমার কর | ৪৫৫ |
| ৬। | আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের প্রতি (কবিতা) ... | অনাদিনাথ বসু | ৪৫৯ |
| | মন ও মানুষ | স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ | ৪৬০ |
| ৮। | সংশয় ( কবিতা ), | অধ্যাপক শ্রীসুবোধরঞ্জন রায় | ৪৬২ |
| ৯। | শ্রীশ্রীশ্যামা রহস্য | স্বামী দুর্গানন্দ | ৪৬৩ |
| ১০। | কেদার-বদরী হতে ( কবিতা ) | শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য | ৪৬৭ |
| ১১। | মহা-জাগতিক রশ্মি | আল-কামাল আবদুলওহাব | ৪৬৮ |
| ১২। | শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজীর স্মৃতিপূজা | শ্রীঅমৃতলাল চক্রবর্ত্তী | ৪৭০ |
| ১৩। | গ্রন্থ-সমালোচনা | | ৪৭৪ |
| ১৪। | সঙ্ঘবার্ত্তা | | ৪৭৬ |


## 'বিশ্ববাণী'-র নিয়মাবলী

১। 'বিশ্ববাণী'-র বর্ষ আরম্ভ হয় প্রতি ফাল্গুন মাসে। বৎসরের যে কোন সময়ে আপনি গ্রাহক হইতে পারেন। তবে প্রথম সংখ্যা হইতেই লইতে হইবে।

২। 'বিশ্ববাণী'-র বার্ষিক মূল্য সডাক চারি টাকা, ষাণ্মাসিক দুই টাকা, প্রতি সংখ্যা আট আনা। মূল্য অগ্রিম পাঠাইতে হইবে।

৩। কোন গ্রাহকের ঠিকানা অল্পদিনের জন্য পরিবর্ত্তিত হইলে তিনি স্থানীয় ডাকঘরে নির্দ্দেশ দিবেন : বেশীদিনের জন্য হইলে পূর্ববর্ত্তী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে, নতুবা পূর্ব্বের ঠিকানায় পত্রিকা প্রেরিত হইবে।

৪। 'বিশ্ববাণী'-র গ্রাহক মূল্য মনিঅর্ডার যোগে পাঠাইলে কুপনে নাম ও ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। কোনও মাসের সংখ্যা না পাইলে গ্রাহকগণ তাহার পরের মাসে সাত তারিখের মধ্যে আমাদিগকে তাহা জানাইবেন।

৫। 'বিশ্ববাণী'র জন্য প্রবন্ধাদি পাঠাইবার কালে রচয়িতার নাম ঠিকানা যেন তাহাতে বেশ স্পষ্টাক্ষরে সন্নিবেশিত থাকে। 'বিশ্ববাণী'তে প্রকাশযোগ্য প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হয়। প্রবন্ধাদি হারাইয়া যাইলে বা কোন প্রকারে নষ্ট হইলে আমরা দায়ী থাকি না।

প্রবন্ধ স্বল্পায়তনে, ফুলস্কেপ চার পাতার মধ্যে, রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়: দীর্ঘাকার প্রবন্ধ ছাপা অসম্ভব।

৬। প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাক-টিকিট পাঠানো চাই। ছয়মাস পরে অমনোনীত প্রবন্ধাদি নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। কোনও লেখা প্রকাশিত করা সম্পূর্ণরূপে সম্পাদকদের অভিমত সাপেক্ষ। ইহার জন্য সম্পাদকেরা কোনও কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নহেন।

৭। কাহাকেও কোন বিষয় জানিতে হইলে ( গ্রাহক হইলে, গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া ) সর্ব্বদা **রিপ্লাই কার্ডে** অথবা ডাক-টিকিট সমেত এবং পূর্ণ ঠিকানার সহিত দিতে হইবে। অন্যথায় উত্তর দেওয়া হয় না।

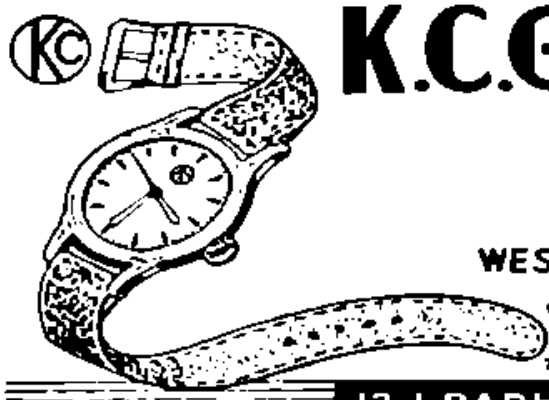

# K.C.GANGULY
## & CO.

*Dealers in:-*

WEST END • FAVRE-LEUBA
& ANGLO SWISS

★ REPAIRING OUR SPECIALITY

12-1 RADHA BAZAR ST. CAL-1



স্বামী ওঁকারেশ্বরানন্দ প্রণীত

## ১। প্রেমানন্দ জীবন-চরিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইস চ্যান্সেলর ভারতবরেণ্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের এই জীবন চরিতখানি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আধ্যাত্মিক শাখায় গ্রন্থরাজির মধ্যে বিশেষ সম্মানীয় স্থান অধিকার করিবে। হৃদয়স্পর্শকারী সুন্দর ও প্রাঞ্জলভাবে বর্ণিত।" প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠায় ৪খানি সুন্দর ছবি সহ, সুলভ সংস্করণ মূল্য ৩.০ বাঁধাই ৪৲ টাকা।

## ২। প্রেমানন্দ ১ম ভাগ ২য় সংস্করণ ও ২য় ভাগ

সাধক ও ভক্তদিগকে প্রদত্ত অমূল্য উপদেশ সংগ্রহ।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ভূতপূর্ব ভাইস প্রেসিডেন্ট পূজ্যপাদাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী অচলানন্দজী মহারাজ লিখিয়াছেন—"পড়িয়া প্রাণে বড় আনন্দানুভব করিলাম"।

উদ্বোধন—"উপদেশ অংশ পড়িয়া সংগ্রাহককে কৃতজ্ঞতা না জানাইয়া থাকা যায় না।" সকল পত্রিকায়—উচ্চ প্রশংসিত। সুন্দর আর্ট পেপারে চারিখানি ছবি রহিয়াছে। মূল্য যথাক্রমে ২।০ ও ২৸০

প্রাপ্তিস্থান :— **শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ**,—১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬।

পোঃ অঃ কুণ্ডা, দেওঘর, এস. পি., বিহার এই ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট লইলে ডাক মাশুল লাগিবে না।



# ডি. রতন এণ্ড কোং

ফটোগ্রাফার্স

ফটো

২২-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিঃ ৬

ফোন: ৩৪- ৩৭১১

সপ্তদশ বর্ষ | কার্ত্তিক—১৩৬২ | নবম সংখ্যা

# যোগের সাধনা

স্বামী অভেদানন্দ

ধর্ম্মের তত্ত্ব সম্বন্ধে ব্যাখ্যান-প্রদান এবং সেই তত্ত্বকে উপলব্ধি করিবার জন্য যথাযথ সাধন-পদ্ধতি প্রদর্শন করা বেদ উপনিষদ বেদান্ত গীতা প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রের প্রধান বিশেষত্ব। স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবর্ষে ঋষিতুল্য সিদ্ধযোগিগণ ও সুবিখ্যাত ধর্ম্মাচার্য্যেরা এসম্বন্ধে অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। এইসব শাস্ত্রের মধ্যে যে শ্রেণীর শাস্ত্রে বিধিবিহিত পদ্ধতিতে সাধনার দ্বারা ধর্ম্মের তত্ত্বকে উপলব্ধি করিতে এবং ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার সম্বন্ধকে সাক্ষাৎভাবে জানিবার জন্য বিশেষভাবে শিক্ষা ও উপদেশ দেওয়া হইয়াছে—সেই শাস্ত্রকে 'যোগশাস্ত্র' বলে।

যোগের সাধনা-সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকারের পদ্ধতি ও অনুষ্ঠানের ব্যাপারে ভারতবর্ষে প্রাচীন কাল হইতে বিভিন্ন প্রকার শাস্ত্রগ্রন্থ রচিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে মহর্ষি পতঞ্জলির প্রণীত যোগদর্শন (যাহার অপর নাম—'পাতঞ্জল দর্শন') অন্যতম। সাধারণতঃ পাতঞ্জল দর্শনকে সাংখ্য বেদান্ত ন্যায় বৈশেষিক পূর্ব্বমীমাংসা প্রভৃতি ভারতের ছয়টি দর্শনশাস্ত্রের অন্যতম বলিয়াই লোকে জানে। কিন্তু বেদান্ত বা ব্রহ্মসূত্র এবং পাতঞ্জল দর্শন বা যোগসূত্র শুধু দার্শনিক মতবাদের পুস্তকমাত্রই নয়। এই দুই শাস্ত্র কাজে-কর্ম্মে ধর্ম্মগত ব্যাপারে রীতিমত সাধনার ভিত্তির উপরে স্থাপিত। সেজন্য বেদান্ত অথবা পাতঞ্জল যোগসূত্রের সূত্রগুলি অধ্যয়ন, সেগুলির ব্যাখ্যা শ্রবণ এবং সেগুলির ভাবরাশির সম্বন্ধে বিচার-আলোচনা ও বাদানুবাদ করিলেই শুধু চলিবে না। বিচারনিষ্ঠা বা মননশীলতার ক্ষেত্র হইতে আরও উচ্চতর স্তরে উঠিয়া প্রত্যক্ষ অনুভূতির রাজ্যে সাধনার শক্তিবলে প্রবেশ করিতে না পারিলে যোগশাস্ত্রের সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ কিছুতেই সম্ভব হইবে না। যোগশাস্ত্রের জ্ঞানলাভ সর্ব্বতোভাবে ঐকান্তিক সাধনালব্ধ আধ্যাত্মিক অনুভূতির উপরে নির্ভর করে। পূর্ব্বেই আমি আপনাদের বলিয়াছি যে, যোগশাস্ত্রের সম্বন্ধে ভারতবর্ষে অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ আছে। এখানে কিন্তু যোগসম্বন্ধে সেইসব শাস্ত্রের বিষয়ে আমি আলোচনা করিব না। আমি শুধু

এখানে আপনাদিগকে পাতঞ্জল যোগদর্শন সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিতে চেষ্টা করিব।

যোগশাস্ত্রের মতবাদ ও সাধনাসম্বন্ধে আলোচনা করার পূর্ব্বে আমি একটি বিষয়ের অবতারণার দ্বারা আপনাদের কাছে একটি কথা বলিতে চাই। কারণ, ইউরোপ ও আমেরিকার বাসকারী অধিকাংশ ব্যক্তিদের মধ্যে ভারতবর্ষ ও হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক অসঙ্গত ও অদ্ভুত ভ্রান্ত ধারণা চলিয়া আসিতেছে। পাশ্চাত্য দেশের অধিকাংশ লোকেরা ভারতীয় যোগশাস্ত্র ও ভারতীয় যোগীদের সম্বন্ধে অনেক আজগুবী ও কিম্ভূতকিমাকার ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। সেই সমস্ত ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণা যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহাদের অজ্ঞতার জন্যই সৃষ্টি হইয়াছে। আমি আপনাদের সুস্পষ্ট ভাবেই জানাইতেছি যে, ভোজবাজী ইন্দ্রজাল ভাইনীবিদ্যা ভূতুড়ে কাণ্ড ভূত-প্রেতের-সহিত-আলাপ অথবা ঝাড়ফুঁক হাতদেখা বশীকরণ সম্মোহন-বিদ্যা প্রভৃতি ব্যাপারের সহিত যোগশাস্ত্র ও যোগসাধনার কোনই সম্বন্ধ নাই। কোনও যুক্তিহীন মত ও ভ্রান্ত বিশ্বাস অথবা কুসংস্কারের স্থান যোগসাধনের মধ্যে আদৌ নাই। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলসত্তা পরমাত্মার সহিত মানব-আত্মার আধ্যাত্মিক ভাবে চিরন্তন মিলন সম্পন্ন করাই যোগশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট সাধনের উদ্দেশ্য। যুক্তিবাদ অন্বেষণশীলতা ও সত্যান্বেষণই যোগশাস্ত্রের বিশেষত্ব।

যোগশাস্ত্রের নির্দ্দিষ্ট অনুশাসনকে সাধন করিবার জন্য যোগশিক্ষার্থী ব্যক্তির কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায়গত মতবাদ বিশ্বাসবিধি নিয়ম প্রথা প্রভৃতি মানিবার আবশ্যক হয় না। কিন্তু যে সমস্ত চিরন্তন নিয়মনীতি বহির্জগৎ ও আন্তর্জগৎ এবং আধ্যাত্মিক জীবনকে চালিত ও নিয়ন্ত্রিত করিতেছে—সেই সমস্ত শাশ্বত নিয়মকে আয়ত্ত ও উপলব্ধি করাই যোগশিক্ষার্থীদের পক্ষে সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান প্রয়োজন। উদ্দেশ্যের প্রতি আন্তরিকতা ও স্থায়ী আগ্রহই যোগশিক্ষার্থী-দের সর্ব্বাগ্রে অর্জ্জন করিতে হইবে। সুতরাং যাহারা ঠিকভাবে যোগসাধনা অভ্যাস করিতে চায়, তাহাদিগকে সর্ব্বাগ্রে সাধনার ব্যাপারে ঐকান্তিক আগ্রহপূর্ণ জিজ্ঞাসু এবং প্রবল অধ্যবসায়সম্পন্ন হইতে হইবে।

অবশ্য শুধু খেয়াল বা কৌতূহলের বশে কোন কোন ব্যক্তিকে যোগসাধনায় রত হইতে দেখা যায়। যোগসাধনের জন্য যে প্রবল আগ্রহ ধৈর্য্য ও বিপুল অধ্যবসায়ের প্রয়োজন—সেই আগ্রহ ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় ইহাদের মধ্যে নাই বলিলেই হয়। তাঁহারা যোগসাধনের সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গীন ফল তাহারা না পাইলেও এব্যাপারে তাহারা কিছু পরিমাণেও সুফল লাভ করিতে পারে। ঐকান্তিক চিত্তে যাহারা যোগসাধনা করিয়া থাকে, তাহারা অবশেষে নিজের আত্মার-সত্তা ও প্রকৃত স্বরূপকে উপলব্ধি করে এবং আধ্যাত্মিক নিয়ম-সকলের প্রকৃতিকে জানিতে সক্ষম হয়।

আমাদের আত্মার-সত্তার স্বভাব কিরূপ এখন আমরা তাহা জানিতে পারিতেছি না। আমরা আমাদিগকে নিজেদের যাবতীয় কর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া মনে করিতেছি, কিন্তু নিজ হইতে কোন কিছু করিবার শক্তি প্রকৃতপক্ষে আমাদের মধ্যে নাই। আমাদের নিজস্বরূপের সম্বন্ধে আমাদের কোনই জ্ঞান হয় নাই। সাধারণতঃ আমাদের বিশ্বাস ও ধারণা —আমরা জন্মমৃত্যুশীল জীব, এই নশ্বর দেহই আমাদের একমাত্র অস্তিত্ব এবং দেহের জন্ম ও মৃত্যুর সহিত আমাদেরও উৎপত্তি ও নাশ হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এইরূপ বিশ্বাস করা মহাভ্রম। কারণ এই রক্তমাংসময় নশ্বর দেহ এবং আমাদের প্রকৃত সত্তা কখনই এক বস্তু নয়। প্রকৃতপক্ষে আমরা এই দেহের অতীত জন্মমৃত্যুহীন নিত্য আত্মা। আমাদের অস্তিত্ব অনাদি কাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত—অথচ ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এই সত্য-তত্ত্বকে আমরা জানিনা। স্বরূপতঃ আমরা কি—তাহা আমরা অবগত নহি। সুতরাং এমন ঘোর অজ্ঞানের অবস্থায় আমরা কেমন করিয়া ঈশ্বরকে জানিতে পারিব? নিজের স্বরূপতত্ত্ব সম্বন্ধে না জানিয়া কেহই ঈশ্বরকে জানিতে পারেনা। যোগসাধনার দ্বারা নিজের স্বরূপতত্ত্বকে জানিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

সহায়তা পাওয়া যায়। যোগের সাধনায় রত হইয়া প্রথমে আমরা নিজেদের স্বরূপ জানিতে পারিলে, তবে তাহার পরে আমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্ব ও ঈশ্বর-তত্ত্বকে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব। যোগসাধনার পথে বাহিরে ও ভিতরে অনেক বাধা ও বিঘ্ন আছে। কিন্তু শ্রদ্ধাবান উৎসাহী ও সতর্কসচেষ্ট সাধকেরা সেইসব বাধা অতিক্রম করিতে পারেন।

যোগসাধনের পথে অনেক বাধা ও অন্তরায় আছে। তাহাদের মধ্যে এইগুলি প্রধান। (১) শরীরের জড়তা, (২) মনের অবসাদ, (৩) প্রবল ইচ্ছাশক্তির অভাব, (৪) সাধনায় উৎসাহহীনতা এবং (৫) আলস্য অন্যতম। পাতঞ্জল দর্শনে বা যোগশাস্ত্রে যোগসাধনের বিঘ্ন ও অন্তরায়গুলির সম্বন্ধে এরূপ বলা হইয়াছে :—ব্যাধি (দেহের রোগ), মনের জড়তা, সন্দেহ, সাধনায় অনিচ্ছা ও উৎসাহশূন্যতা, বিষয়লালসা, মিথ্যা অনুভূতি এবং সাধনায় অবনতি যোগসাধনের প্রবল অন্তরায়—[ পাতঞ্জল যোগদর্শন, ( সমাধিপাদ ), ১।৩০ )[১] । ] দুর্বল ও অসুস্থদেহে যোগসাধন করা যায় না। মনের মধ্যে আগ্রহ আকুলতা ও ইচ্ছা না থাকাও যোগসাধনের অন্যতম অন্তরায়। তাহা ছাড়া সাধনার গন্তব্যস্থলে যাওয়ার সম্বন্ধে সন্দেহ হতাশা প্রভৃতিও সাধনার স্রোতকে রুদ্ধ করে।

অনেকেই আপাততঃ খুব উৎসাহ লইয়া যোগ-সাধনে প্রথমে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। কিছুকাল পরে দেখা যায়—তাহাদের মধ্যে সাধনার আগেকার মতন তেমন উৎসাহ আর নাই। "সাংসারিক বিষয়-সম্পদের লালসা, ভোগে আসক্তি মানুষকে যোগ-সাধনায় অভিনিবিষ্ট হইতে দেয় না" (গীতা ২।৪৪)। তাহার পরে যোগসাধনের আর এক বিঘ্ন—মিথ্যা-জ্ঞান, অর্থাৎ—যাহা অসত্য ও অনিত্য তাহাতে সত্য ও নিত্য বলিয়া বিশ্বাসী হওয়া। নশ্বর দেহকে নিজের আত্মা বলিয়া মনে করাই মিথ্যাজ্ঞানের অন্যতম প্রমাণ। অজ্ঞানতার বশে আমরা এখন নিজেদের মোহান্ধ করিয়া রাখিয়াছি। নশ্বর ও ক্ষয়শীল এই দেহকে আত্মা বলিয়া মনে করার অপেক্ষা আত্মবিস্মৃতি ও মোহের আর কি অধিকতর হীনতর অবস্থা মানুষের হইতে পারে? সাধনার বিষয়ে চিত্ত একাগ্র না হওয়া যোগের আর একটি বিঘ্ন। সাধনার প্রথম অবস্থায় আমরা মনকে একাগ্র করিতে চেষ্টা করি। কিছুকালের চেষ্টায় আশানুরূপ ফল দেখিতে না পাইলে আমরা নিরুৎসাহ হইয়া সাধনার জন্য সমস্ত চেষ্টা হইতে বিরত হইয়া পড়ি।

সাধনার চরম অভীষ্টলাভের জন্য যে প্রবল চেষ্টা ও আন্তরিক অধ্যবসায় তাহা অধিকাংশ ব্যক্তিরই নাই। সাধনায় সামান্য উন্নতি লাভ করিয়া সেই অবস্থাকে তাহারা স্থায়ীভাবে নিজের আয়ত্তে রাখিতে পারে না। সাংসারিক ভোগবাসনার বশে তাহারা সেই উচ্চতর অবস্থা হইতে অবনত হইয়া পড়ে। সত্যই সাংসারিক ভোগবিলাসের আকর্ষণ এমনই প্রবল ও বিভ্রান্তিকারী।

এই সমস্ত বিঘ্ন ছাড়াও যোগসাধনের আরও কতকগুলি অন্তরায় আছে। যেমন (১) দুঃখ শোক ও উদ্বেগের জন্য মনের চাঞ্চল্য ও অস্থিরতা। (২) শরীর ও মনের অস্থিরতা ও অসমতা। অনেকের দেহ ও মনের গঠন এমন অসংযত যে, তাহারা মাত্র পাঁচ মিনিট সময়ও কোথাও স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। মনের এই প্রকার অবস্থা যেমন অবাঞ্ছিত তেমনি শোচনীয়। অনেক ব্যক্তির স্নায়ু অত্যন্ত দুর্বল। দুর্বল স্নায়ুযুক্ত দেহ যোগসাধনের দারুণ অন্তরায়। নিশ্বাস-প্রশ্বাস অনিয়মিত ভাবে প্রবাহিত হওয়াও যোগসাধনের পক্ষে ক্ষতিকর। ঠিকভাবে ও নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিগতভাবে নিশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিতে পারে এমন লোকের সংখ্যা খুবই অল্প। অনেকেই এই সমস্ত দোষ ও অসুস্থতার প্রতিকারের জন্য চেষ্টা

১। ব্যাধিস্ত্যান সংশয় প্রমাদালস্যাবিরতি-ভ্রান্তিদর্শনালব্ধভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তেঽন্তরায়াঃ।—১।৩০
দুঃখদৌর্মনস্যাঙ্গমেজয়ত্ব-শ্বাসপ্রশ্বাসা বিক্ষেপসহভুবঃ।—১।৩১

করে না। সেজন্য তাহারা চিত্তের স্থিরতা ও স্নায়ুর সমতা কখনই লাভ করিতে পারে না।

দেহ ও মনের এই সমস্ত জড়তা অস্থিরতা অসমতা ও বিকৃতি ( unbalanced state ) যোগসাধনের পক্ষে দারুণ বিঘ্ন। আত্মীয়স্বজন পাড়াপ্রতিবেশী ও বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে অনেকেই তাহাদের পরিচিত ব্যক্তিদের ধর্মসাধনায় বিশ্বাস ও অনুরাগকে উপহাস ও বিদ্রূপ করিয়া থাকে। বাড়ীর লোকেরাও নিজের পরিবারে কাহাকে ধর্মবিষয়ে অনুরক্ত ও পূজা জপ করিতে দেখিলে বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হয়। তাহা ছাড়া আরও অনেকে ধর্মসাধনা করিতে দেয় না। এই রকম বিরুদ্ধ পরিবেশে ও বিরোধী লোকদের মধ্যে থাকিয়া ধর্মসাধনা করা অত্যন্ত কঠিন। তাহাতে উপাসকের মনে অনেক সময় দুঃখ ক্ষোভ ও বিষাদ আসিয়া থাকে।

যোগসাধনায় সাফল্য লাভ করিতে হইলে সর্ব্ব-প্রথমে যোগাভ্যাসী ব্যক্তিকে সাধনার ব্যাপারে একান্ত ভাবে অনুরক্ত ও প্রবলভাবে সচেষ্ট হইতে হইবে। আন্তরিক ইচ্ছা ও ঐকান্তিক অনুরাগ এবং প্রাণপণ চেষ্টা না থাকিলে শুধু যোগসাধনা কেন, কোনও মহৎকার্য্যে সাফল্য লাভ করা যায় না। উদ্দেশ্যের প্রতি একনিষ্ঠ ও একমন হওয়া ধর্মসাধকদের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজন। সাধনায় বীতিমত ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের সহিত বরাবর একভাবে লাগিয়া থাকিতে হইবে। অস্থির চিত্ত হুজুকপ্রিয় ও ভাবপ্রবণ ব্যক্তিরা সাধনায় দীর্ঘকাল একভাবে লাগিয়া থাকিতে পারে না। এই রকম প্রকৃতির লোকের যোগ-সাধনা শুধু কথার কথা মাত্র। হঠাৎ এবং অল্প সময়ের মধ্যে যাহারা সাধনায় উন্নতি করিতে চায় তাহাদের এই পথে কোনই অগ্রগতি হয় না। শ্রদ্ধাবান দৃঢ়সঙ্কল্প পবিত্র সংযত ও একাগ্র চিত্ত ব্যক্তিরাই বহু বৎসর একনিষ্ঠ সাধনার দ্বারা যোগসাধনায় সিদ্ধ হইতে পারেন।

অনেক ব্যক্তির এই প্রকার ভ্রান্তধারণা আছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া, ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা টাকা রোজগার করার অপেক্ষা যোগসাধনা অনেক সহজ ব্যাপার। তাহারা মনে করে কিছুকাল তীর্থভ্রমণ পূজা ব্রতনিয়ম জপ ইত্যাদি করিলেই ধর্ম্মের ব্যাপারে সাফল্য লাভ করা যায়। সুতরাং তাহাদের মতে—'যে বয়সে শরীর সবল সুস্থ ও কর্ম্মক্ষম থাকে জীবনের সেই সময়টা শুধু লেখাপড়া-শেখা টাকা-রোজগার ভোগসুখ প্রভৃতি কার্য্য করাতেই ব্যয় করা উচিত। যখন শরীরে ব্যাধি আসিবে এবং কোনও কঠিন শ্রমসাধ্য কাজ-কর্ম্ম আর করা যাইবে না, তখন সেই বয়সে ভগবানের চিন্তায় ও ধর্ম্মের সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।' এই সমস্ত লোকেদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা হওয়ার কারণ খুবই সুস্পষ্ট। ধর্ম্ম-সাধনা যে কত কঠিন ও কত অধ্যবসায়সাপেক্ষ তাহার গুরুত্ব ইহারা মোটেই জানেনা। ধর্ম্মসাধনার গুরুত্ব যে কতখানি তাহা জানে না বলিয়া ইহারা ধর্ম্মসম্বন্ধে এইরূপ অজ্ঞতাপূর্ণ বিশ্বাস পোষণ করিয়া থাকে। চিত্রকলা, সঙ্গীত, ইতিহাস বিজ্ঞান ও স্থূল ইন্দ্রিয়-বিষয় লইয়া আরও অসংখ্য লৌকিক বিদ্যার যে কোনও একটিতে পারিতা ও ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে হইলে মানুষকে বাল্যকাল হইতে যৌবনের শেষ পর্য্যন্ত অতিশয় অধ্যবসায়ী হইতে হয়। আর সকল বিদ্যার অপেক্ষা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা বা অধ্যাত্মবিদ্যা—তাহা কি বৃদ্ধবয়সে জীর্ণদেহে মাত্র কয়েক মাসের সাধারণ চেষ্টাতেই আয়ত্ত হইয়া যাইবে? এইরূপ প্রকৃতির লোকেরা শুধু নিজেদেরই প্রতারণা করে। বৃদ্ধ বয়সে যখন স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়ে, আর রোগব্যাধির যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত হইতে হয়, তখন কেমন করিয়া যোগসাধন করা সম্ভব? ইহা শুধু শিশুসুলভ অজ্ঞতা মাত্র।

যোগসাধনের মধ্যে যে-সব অত্যাবশ্যক নিয়ম আছে, তাহাদের মধ্যে ইন্দ্রিয়সংযম ও মনসংযম প্রধান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অতএব যোগসাধনার্থীকে প্রথমেই ইন্দ্রিয় ও মনকে সংযম করিতে হইবে। যে সমস্ত বিষয় দেখিলে চিন্তা করিলে অথবা যাহাতে রত থাকিলে মন বহির্মুখী অস্থির চঞ্চল ও অবনত হয়—যোগশিক্ষার্থীদের তাহা হইতে সম্পূর্ণভাবে

নিরত হইয়া অন্যত্র থাকিতে হইবে। ঈশ্বরের ধ্যানে মনকে একাগ্র করিবার পথে যে সমস্ত বস্তু অথবা চিন্তা ও কল্পনা বাধা বিঘ্ন আনিয়া দেয়—সেই সমস্ত বিষয়ের চিন্তা ও কল্পনায় মনকে কিছুতেই যাইতে দেওয়া উচিত নয়। মনকে সর্বদা সুচিন্তা ও সদসদ্‌বিচারের দ্বারা কুৎসিত ও অপবিত্র বিষয় হইতে ফিরাইয়া আনিয়া ঈশ্বরের চিন্তায় নিমগ্ন করাই যোগশিক্ষার্থীদের পক্ষে একান্তভাবে উচিত। যে সমস্ত পবিত্র বিষয়ে মনকে নিযুক্ত রাখিলে মনে ঈশ্বরের উদ্দীপনা হয়, যাহাতে মন ঈশ্বরের চিন্তায় সম্পূর্ণ একাগ্র ও অভিনিবিষ্ট হইতে পারে, সেই সমস্ত পবিত্র বিষয়ে সবসময়েই যোগশিক্ষার্থীদের চিন্তা করা উচিত।

ভোগবিলাসে আসক্ত এবং বিষয়সুখে ইন্দ্রিয়সুখে অভিলাষী ব্যক্তিদের মন সর্বদা চঞ্চল বহির্মুখী ও অস্থির। তাহারা জাগতিক সুখ ও বিষয়ভোগের দিকে সর্বদা উন্মুখ ও ধাবিত। এই শ্রেণীর লোকেরা কখনও ঈশ্বরের চিন্তা ও ধ্যানে মনকে নিবিষ্ট করিতে চায় না। ঈশ্বরের প্রতি তাহাদের আদৌ একটুকু বিশ্বাস বা আগ্রহ নাই। ধর্মসাধনার প্রতি তাহাদের মন কখনই যাইতে চায় না। মানবজীবনে তাহারা ধর্মসাধনার কোনই প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে পারে না। সাংসারিক বিষয়েই ইহারা উৎসাহী; ভোগবিলাসের কথা বলিতে ও শুনিতেই ইহারা ভালবাসে। ভগবানের কথা ধর্মের কথা ইহাদের মোটেই প্রিয় ও সুখকর নয়। যেখানে ধর্ম ও ভগবানের প্রসঙ্গ হয় এই সকল বদ্ধ সংসারী ও ভোগাসক্ত ব্যক্তিরা এক মুহূর্তও স্থির হইয়া বসিতে থাকিতে পারে না। ভগবানের প্রসঙ্গ কিংবা ধর্মের কথা শুনিলে এই সমস্ত ভোগলালসাপরায়ণ ব্যক্তিরা অত্যন্ত যন্ত্রণা ও অস্বস্তি অনুভব করে।

যতক্ষণ মানুষ নিজের মন এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্পূর্ণরূপে সংযত করিতে ও আপনার আয়ত্তে আনিতে না পারিবে—ততক্ষণ কিছুতেই তাঁহার পক্ষে যোগসাধনের প্রথম স্তরে উন্নত হওয়া সম্ভব হইবে না। অতএব যে-কোনও প্রকারে যোগশিক্ষার্থীকে আত্মসংযমে সম্পূর্ণ দক্ষ ও মুক্তকাম হইতে হইবে। মনকে এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে আপনার বশে আনিতে পারিলেই ঈশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন হইতে কোন অসুবিধা হয় না। অতএব আমরা আত্মসংযম অথবা আত্মপ্রভুত্বের অবস্থায় কেমন করিয়া আসিতে পারি—সে সম্বন্ধে আমাদিগকে সর্বদা মনোযোগী ও সচেষ্ট থাকিতে হইবে। আত্মসংযম পবিত্রতা সৎচিন্তা বিবেক বৈরাগ্য প্রভৃতি গুণগুলি যোগসাধনের পক্ষে অপরিহার্য। এই সমস্ত গুণগুলি না থাকিলে যোগসাধনা নিষ্ফল প্রয়াসে পরিণত হয়।

পাতঞ্জলদর্শন বা যোগশাস্ত্রে যোগসাধনাকে আটটি উত্তরোত্তর স্তরে বিভক্ত করা হইয়াছে। সেই আটটি স্তরের নাম:—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। যাঁহারা সিদ্ধযোগী স্বামী বিবেকানন্দের রচিত "রাজযোগ" নামক বইখানি খুব গভীর মনোযোগের সহিত পড়িয়াছেন—তাঁহারা নিশ্চয়ই যোগসাধনের এই ক্রমিক আটটি স্তরের সম্বন্ধে নিশ্চয়ই অবগত আছেন। 'রাজযোগ' পুস্তকে বিভিন্ন অধ্যায়ে স্বামী বিবেকানন্দ যোগসাধনার বিভিন্ন দিক লইয়া অতি নিপুণ ও প্রাণস্পর্শী ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া ঐ পুস্তকের শেষের দিকে পাতঞ্জল যোগদর্শনের সমস্ত অধ্যায়ের অন্তর্গত সূত্রগুলি তিনি নিজের প্রত্যক্ষ অনুভূতির ও মনীষার আলোকে অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা আজ এখানে এই আলোচনা-সভায় আছেন—তাঁহাদের মধ্যে হয়ত কেহ কেহ নিশ্চয়ই মনে রাখিতে পারেন—স্বামী বিবেকানন্দের "রাজযোগ" গ্রন্থের অধ্যায়গুলির অবলম্বনে আমি কয়েক মাস ধরিয়া ধারাবাহিকভাবে ব্যাখ্যামূলক কয়েকটি বক্তৃতা দিয়াছি। এক্ষণে আমি আপনাদিগের নিকটে ঐ যোগসাধনের সম্বন্ধে সংক্ষেপে বিভিন্ন স্তরগুলি বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

যোগসাধনের প্রথম স্তর হইল—যম। 'যম' শব্দটির অর্থে দমন করা বিনীভূত করা অথবা আয়ত্তে

আনা বুঝাইয়া থাকে। এখানে 'যম' শব্দে মন ও ইন্দ্রিয়কে দমন বা আয়ত্ত করা বুঝাইতেছে। পাতঞ্জল দর্শনে 'যম' শব্দের এইরূপ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। যথা—অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (অচৌর্য্য) ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ (কাহারও দান গ্রহণ না করা)—এই গুণগুলির সমষ্টিকে যোগশাস্ত্রে যম বলে। দ্বিতীয় স্তরের নাম নিয়ম। বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচ (শুচিতা), তপস্যা, স্বাধ্যায় (বেদাদিশাস্ত্রপাঠ, মন্ত্রজপ, স্তবপাঠ প্রভৃতি) এবং ঈশ্বরের উপাসনা—এইগুলিকে নিয়ম বলে। ইহার পরবর্ত্তী স্তর—আসন। শরীরের যে অবস্থায় অধিকক্ষণ স্বচ্ছন্দে ও স্থিরভাবে বসিয়া ঈশ্বরের চিন্তায় মনকে নিযুক্ত রাখা যায় তাহাকে আসন বলে—(স্থিরসুখমাসনম্, ২।৪৬)। আসনের পর প্রাণায়াম। প্রাণায়াম শব্দে সাধারণতঃ শ্বাস-প্রশ্বাসকে নিয়মিত করা বলা হইয়া থাকে। কিন্তু প্রাণায়াম শব্দের প্রকৃত অর্থ—প্রাণশক্তিকে নিজের আয়ত্তে আনা—প্রাণশক্তিকে জয় করাই প্রাণায়াম। প্রত্যাহার বলিতে ইন্দ্রিয়-বিষয় হইতে মনকে ফিরাইয়া আনিয়া ঈশ্বরে নিয়োজিত করার চেষ্টাকে বুঝাইয়া থাকে। ঈশ্বর অথবা ধ্যানের কোনও পবিত্র বিষয়ে মনকে অনেকক্ষণ ধরিয়া রাখার নাম ধারণা। যে সময়ে ঈশ্বর অথবা ধ্যানের অন্য কোন বিষয়ে মনের সমস্ত চিন্তা একভাবে প্রবাহিত হইয়া যায়—তাহাকে ধ্যান বলে। ধ্যানের সময়ে মনে আর কোনও চিন্তা থাকে না। তখন শুধুই অনেকক্ষণ ধরিয়া একভাবে ঈশ্বরের চিন্তা প্রবাহিত হইতে থাকে। এই সময়ে দেহ হইতে মন সম্পূর্ণ-রূপে উঠিয়া গিয়া ধ্যেয় বস্তুর সহিত একাকার হইয়া যায়। সুতরাং এসময়ে যোগশিক্ষার্থী নিজের চারি-পাশের সমস্ত বস্তুর অস্তিত্ব এমনকি নিজের দেহের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া যান। মন তখন ইন্দ্রিয়রাজ্য হইতে মুক্ত হইয়া অতীন্দ্রিয় ভূমিতে বিরাজ করিতে থাকে। ধ্যানের পরে সমাধি। 'সমাধি' শব্দের অর্থে—যখন ধ্যানে ধ্যেয় বস্তুর বাহ্য আকৃতি কিম্বা ইন্দ্রিয়ের অগম্য পরিত্যক্ত হইয়া শুধু তাৎপর্য্যমাত্রই বিরাজিত থাকে, পাতঞ্জল দর্শনের মতে সেই অবস্থাকে "সমাধি" বলে।

যোগসাধনায় প্রথম প্রবর্ত্তিত ব্যক্তিদের সাধনার প্রথম অবস্থায় ধ্যানকালে মনে অনেক বিকৃত ভাব ও সংস্কার উঠিতে থাকে। তাহার জন্য ঈশ্বরকে চিন্তা করিতে অত্যন্ত অসুবিধা হয়। ইহার কারণ—মনের অবচেতন স্তরে (subconscious plane) পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মের অনেক হীন চিন্তা ও সংস্কার প্রচ্ছন্ন-ভাবে সঞ্চিত হইয়া থাকে। সাধনায় প্রথম প্রবর্ত্তিত ব্যক্তির ধ্যানকালে মনের অবচেতন স্তর হইতে মনের উপরের স্তরে সেই সমস্ত সংস্কার দেখা দিয়া মনকে চঞ্চল ও অস্থির করিতে থাকে। এসম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলে মনের এই অবস্থার সম্বন্ধে সহজে বুঝিতে পারা যাইবে। সমস্ত মনটিকে আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপে একটি হ্রদের সহিত তুলনা করিতেছি। আপাততঃ দেখিতে পাওয়া যায়—হ্রদের উপরেকার স্তরটি বেশ স্থির ও শান্ত। কিন্তু কখন কখন নিম্নস্তর হইতে স্রোত উত্থিত হইয়া অনেকগুলি বুদ্বুদ বা জলবিম্ব উঠিয়া হ্রদের উপরেকার স্তরকে আলোড়িত করিতে থাকে। তাহার পর ঐ স্রোত প্রবল হইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ উঠিয়া হ্রদের জলরাশিকে বিক্ষুব্ধ ও চঞ্চল করে। ক্রমে বড় বড় তরঙ্গ উঠিয়া হ্রদ আরও চঞ্চল হইয়া

অহিংসাসত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ
—পাতঞ্জল দর্শন, ২।৩০

শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বর-প্রণিধানানি নিয়মাঃ।
—পাতঞ্জল দর্শন, ২।৩২

স্থিরসুখমাসনম্।
—পাতঞ্জল দর্শন, ২।৪৬

তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ
—পাতঞ্জল দর্শন, ২।৪৯

দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা।
—পাতঞ্জল দর্শন, ৩।১

তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্।
—পাতঞ্জল দর্শন, ৩।২

তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ।
—পাতঞ্জল দর্শন, ৩।৩

উঠে। পূর্ব্ব-পূর্ব্বজন্মের কৃত অনেক অসৎ কর্ম্মের ফলে অধিকাংশ লোকের মনে বহু হীন সংস্কার মনের অবচেতন স্তরে প্রচ্ছন্নভাবে জমিয়া থাকে। বিবিধ হীন বাসনারূপী বায়ুর সংস্পর্শে চিত্ত-হ্রদের উপরে এইভাবে বুদ্বুদ ও তরঙ্গরাশি উঠিয়া থাকে। মনের এই সমস্ত চাঞ্চল্য দূর করিতে চাহিলে সেজন্য সমস্ত হীন বাসনা ও কামনাকে সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করিতে হইবে। ভোগবাসনার সম্পূর্ণ বিরতি এবং সর্ব্বদা সৎ ও পবিত্র বিষয়ে চিন্তার অভ্যাস করিতে করিতে অবশেষে মনের এই চঞ্চলতা ক্রমশঃই দূর হইয়া যায়। অবশেষে মন স্থির ও শান্ত হয়। তখন ঈশ্বর অথবা ধ্যানের অন্য কোন পবিত্র বিষয়-বস্তুর চিন্তায় মনের মধ্যে আর কোনও ব্যাঘাত আসিবে না।

যে মন সর্ব্বদাই চঞ্চল ও বহির্ম্মুখী—তাহাকে ধ্যানের বিষয়ে একাগ্র করিবার উপায় কি? যোগশাস্ত্রে মহাত্মা পতঞ্জলি দর্শনে ( ১।১২ ) বলিয়াছেন, "অভ্যাস ও বৈরাগ্যের সহায়ে মনকে ক্রমেই শান্ত ও একাগ্র করা যায়।" ভগবদ্গীতাতেও (ষষ্ঠ অধ্যায়ে ৩৪-৩৫ শ্লোকে ) দেখিতে পাওয়া যায়—অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে কাতর হইয়া জানাইতেছেন, "হে শ্রীকৃষ্ণ মন অতিশয় চঞ্চল দুর্দ্দমনীয় ও বলবান। প্রবলবেগে প্রবাহিত বায়ুকে আয়ত্তে আনার মতন এই চঞ্চল মনকে নিজের আয়ত্তে আনা আমি অতিশয় কঠিন ও দুঃসাধ্য ব্যাপার বলিয়া মনে করি।" অর্জ্জুনের এই কথায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন, "হে মহাবীর অর্জ্জুন! সত্যই মন অতিশয় দুর্নিবার। মনকে নিজের আয়ত্তে আনা যে অত্যন্ত কঠিন তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু রীতিমত অভ্যাসের দ্বারা এবং বৈরাগ্যের সহায়তায় এই মনকে অবশেষে নিজের বশে আনিতে পারা যায়।"

এক্ষণে আমাদিগকে বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে—'অভ্যাস' এবং 'বৈরাগ্য' এই দুইটি শব্দের যথার্থ অর্থ কি? 'অভ্যাস' বলিতে বুঝিতে হইবে মনকে সর্ব্বদা ঈশ্বর অথবা ধ্যানের বিষয়ে নিযুক্ত করিবার জন্য নানাভাবে আন্তরিক চেষ্টা করা। সর্ব্বদাই মনকে অসৎ অপবিত্র বিষয় হইতে ফিরাইয়া আনিতে হইবে—আর ঈশ্বরের কোনও নামের পুনঃপুনঃ উচ্চারণ অথবা ঈশ্বরের তত্ত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রের কোনও উক্তিকে বিচার ও চিন্তা করিতে হইবে। এইরূপ ক্রমাগত চেষ্টার ফলে অবশেষে মনের গতি ঈশ্বরের অভিমুখে যায়, তখন মন ক্রমে ক্রমে শান্ত ও সমাহিত হয়। ক্রমাগত পবিত্র বিষয়ের চিন্তার ফলে মনে সৎসংস্কার দৃঢ় হইতে থাকে। তখন আর মন এখনকার মতন এত অস্থির ও চঞ্চল থাকে না। তাহার পরে আমাদিগকে 'বৈরাগ্য' শব্দটিকে বিশেষভাবে প্রণিধান করিয়া তাহার আন্তরিক অর্থটি জানিতে হইবে। 'বৈরাগ্য' শব্দটির সাধারণতঃ লোকে যে অর্থ করে, প্রকৃতপক্ষে উহার অর্থ তাহা আদৌ নয়। অধিকাংশ লোকের ধারণা—'বৈরাগ্য' অর্থে সমস্ত কর্ত্তব্য-কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া বনে জঙ্গলে চলিয়া গিয়া নির্জ্জনে অলস ও কর্ম্মহীন জীবনযাপন এবং সকাল সন্ধ্যায় প্রতিদিন কিছুক্ষণ ধরিয়া ভগবানের নাম-গান প্রার্থনা কীর্ত্তন ও জপ করা। কিন্তু যোগসাধনা কখনই কর্ম্মবিমুখতা নয়। যাবতীয় মহৎ ও পবিত্র কর্ম্মকে নিপুণভাবে সম্পন্ন করাই যোগ। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ সেজন্য বলিয়াছেন, "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্"। অনভিজ্ঞ জনসমাজে প্রচলিত বৈরাগ্য শব্দের এইরূপ অর্থ সম্পূর্ণ ভুল।

ভারতবর্ষের প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত যোগসাধনার সিদ্ধ অনেক ঋষি ও মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন। 'বৈরাগ্য' শব্দের অর্থে তাঁহারা বলিয়াছেন—"যাবতীয় হীন কুৎসিত ও মলিন চিন্তা কল্পনা ইচ্ছা ও কার্য্য হইতে সম্পূর্ণ বিরতি এবং সত্যস্বরূপ পবিত্রতাস্বরূপ ঈশ্বরে একান্ত ও অবিচ্ছিন্ন অনুরক্তি।" উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবর্ষে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নামে একজন অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল। ধর্ম্মের সকল প্রকার সাধনার পথে তিনি সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধিলাভের দ্বারা ধর্ম্মসাধনার ইতিহাসে নূতন একটি যুগের সূচনা করিয়া

দিয়াছেন। এযুগে রামকৃষ্ণদেবের মতন এমন মহান ধর্মগুরু পৃথিবীতে আর কোনও দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না। সর্ববিধ যোগসাধনার আদর্শ তাঁহার জীবনে আশ্চর্যভাবে রূপায়িত হইয়াছে। 'বৈরাগ্য' সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "ঈশ্বরে অনুরাগ আর বিষয়সম্পর্কে ও অনিত্য ব্যাপারে বিরাগ ও বিতৃষ্ণাই বৈরাগ্য।" মনকে সমস্ত নীচতা ক্ষুদ্রতা সঙ্কীর্ণতা ও কুটিলতা হইতে মুক্ত করা এবং সুমহান পবিত্র ও উদার আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়াকেই বৈরাগ্য বলে।

যোগশাস্ত্রের যে বিভাগে মন-সংযমের দ্বারা ধ্যান ধারণা অভ্যাস করিবার নির্দেশ দেওয়া আছে—তাহাকে 'রাজযোগ' বলে। 'রাজযোগ' অর্থে সকল যোগের রাজা বা শ্রেষ্ঠ যোগকেই বুঝাইয়া থাকে। কারণ রাজযোগ সাধনের দ্বারাই মানুষ সর্বতোভাবে দেহ ও মনের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব লাভ করে এবং পরচেতনার স্তরে ( super-conscious plane ) উন্নীত হইয়া সমাধি লাভের দ্বারা পরমাত্মার সহিত সম্পূর্ণভাবে মিলিত ও চিরযুক্ত হয়। কিন্তু রাজযোগ-সাধনের পূর্বে নিজের দেহকে বিশেষতঃ শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি ও স্নায়ুমণ্ডলীকে ( nervous system ) সুনিয়ন্ত্রিত ও সমতাসম্পন্ন করা সাধকের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। যোগশাস্ত্রে এই বিষয়ে একটি বিভাগ আছে—তাহাতে বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতি অভ্যাসের দ্বারা শরীরকে সুস্থ সবল সুদৃঢ় ও সমতাসম্পন্ন করিতে শিক্ষা দেয়। এই বিভাগের যোগপদ্ধতিকে 'হঠযোগ' বলা হয়। রাজযোগের অভ্যাসকারী সাধকেরা কিংবা রাজযোগে সিদ্ধ মহাত্মারা এই যোগসাধনার পূর্বেই হঠযোগের নিয়মিত অভ্যাসের দ্বারা ইহাতে সুদক্ষ ও সফল হইয়াছিলেন।

যোগসাধনায় ঠিকভাবে শিক্ষালাভ করিতে এবং নিয়মিতভাবে যোগসাধনা করিতে হইলে প্রথমেই প্রয়োজন—একজন সিদ্ধ মহাযোগীর প্রদত্ত শিক্ষা উপদেশ ও তাঁহার অভিপ্রায়ে সান্নিধ্যে বাস করা। যোগসাধনায় শিক্ষা একমাত্র তিনিই দিতে পারেন—যিনি বিধিমত সাধনার দ্বারা যোগসিদ্ধ হইয়াছেন। সিদ্ধমহাযোগী ভিন্ন অপর কাহারও নিকটে যোগশিক্ষা করা উচিত নয়। কোনও সিদ্ধযোগীর নিকট দীক্ষালাভ করিয়া তাঁহার সহিত সবসময়ে বাস করিয়া তাঁহার নির্দেশমত সাধনা করাই যোগশিক্ষার্থীর পক্ষে সর্বতোভাবে উচিত ও যুক্তিযুক্ত। এই প্রকারে যোগ-সাধনা অভ্যাস করা একান্ত কল্যাণকর ও উন্নতিকর। এমন অনেক ব্যক্তি আছেন—যোগশাস্ত্রের কোন কোন বই পড়িয়া কোন সিদ্ধগুরুর সংস্পর্শে না আসিয়া নিজে নিজেই তাঁহারা যোগসাধনা করিতে থাকেন। আবার কেহ কেহ কোনও অজ্ঞ গুরুর নির্দেশে যোগ-সাধনা করিতে যায়। এই দুই শ্রেণীর লোকেদের পরিণাম অত্যন্ত দুঃখপূর্ণ ও শোচনীয় হয়। যোগ-শাস্ত্রের কতকগুলি বই পড়িয়া নিজে নিজে যোগের অভ্যাস করাতে, কিংবা অনভিজ্ঞ ও অসিদ্ধ কোনও গুরুর কথায় যোগসাধনা করিতে গিয়া অনেক ব্যক্তিই হাপানী স্নায়ুদুর্বলতা অনিদ্রা পিত্তপীড়া প্রভৃতি কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। অনেকের মাথার গোলমাল হওয়ায় তাহারা শেষে একেবারে পাগল হইয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া এখানে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি—সকল ব্যক্তিই যোগসাধনার অধিকারী নয়।

অনেক হাজার লোকের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই ঠিকভাবে যোগসাধনের অধিকারী হয়। যোগসাধনায় যাহারা যথার্থ অধিকারী, তাহাদের শরীর ও মনের গঠন এবং রুচিপ্রবৃত্তি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যাহারা যথার্থ বিবেক-বৈরাগ্যবান মুমুক্ষু এবং শুদ্ধচিত্ত তাহারাই যোগসাধনের একমাত্র অধিকারী। তাহাদের আকৃতি প্রকৃতি বাক্য ও আচার আচরণে অসাধারণত্বের একটা দৃঢ় ছাপ দেখিতে পাওয়া যায়। যোগ-সাধনার উপযুক্ত অধিকারীদের দেহ-মন সম্পূর্ণরূপে সবল সুদৃঢ় ও সুসমঞ্জসপূর্ণ (well balanced)। আহার বাক্য ও নিদ্রায় সম্পূর্ণ সংযত না হইলে যোগসাধনায় কোনই ফল হয় না। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে

(১৬-১৭ শ্লোকে) বলা হইয়াছে—"যাহারা অতিমাত্রায় আহার করে, অনেক ঘণ্টা ধরিয়া ঘুমায়—অথবা অতিমাত্রায় জাগরণশীল ও উপবাসকারী তাহাদের দ্বারা যোগসাধনা হয় না। যাহারা আহার নিদ্রা ও ব্যায়ামে সংযত ও পরিমিত তাহারাই যোগী হইতে পারে।" যোগীর প্রকৃতি লইয়া যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—তাহারা স্বভাবতঃই আহার বাক্য ও নিদ্রায় সম্পূর্ণ সংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত।

আর একটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। প্রাণায়াম অভ্যাস যাহার তাহার পক্ষে করা উচিত নয়। প্রাণায়াম অভ্যাসের জন্য কয়েকটি নিয়ম প্রতিপালন করা একান্ত পক্ষেই প্রয়োজন। প্রথমতঃ—ব্রহ্মচর্য্যপালন; দ্বিতীয়তঃ—যোগসিদ্ধ গুরুর নিকটে থাকিয়া তাঁহার নির্দ্দেশে সাধনা করা—তৃতীয়তঃ যেখানে উন্মুক্ত স্থান, নির্ম্মল ও অবাধ বায়ু, যেখানে আবহাওয়া সর্ব্বদা স্বাস্থ্যকর—এমন স্থানেই যোগশিক্ষার্থীর বসবাস ও প্রাণায়াম অভ্যাস করা উচিত। এখনকার এই সমস্ত সহরের মধ্যে অসংখ্য বাড়ী এবং তাহার আশেপাশে অনেক কলকারখানা আছে। লক্ষ লক্ষ লোক এইসব সহরে ও তাহার চারিপাশের স্থানগুলিতে এমন সব বাড়ীতে বাস করে যে, সেখানে আলোক বাতাস ও রৌদ্রের চলাচল নাই। এইরূপ দূষিতবায়ু ও জনাকীর্ণ সহরের বাড়ীর মধ্যে এখনও স্বাস্থ্যকর নির্ম্মল বায়ু প্রবাহিত হইতে পারে না। সুতরাং সহরের ঘনবসতিপূর্ণ এইরকম অস্বাস্থ্যকর ঘরবাড়ীতে থাকিয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করা কোন-মতেই নিরাপদ নয়। এইরূপ ধূলা-ধূমপূর্ণ ও অন্ধকার ঘরবাড়ীতে বাস ও প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে বুক ও ফুসফুসের অনেক মারাত্মক রোগ হইতে পারে।

এক্ষণে অনেকের মনে প্রশ্ন উঠিতে পারে—"যদি প্রাণায়াম করিবার সুযোগ ও অধিকার অধিকাংশ ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তির না থাকে, তাহা হইলে কি তাহারা ধ্যান-ধারণা অভ্যাস করিতে পারিবে না?" তাঁহাদিগকে আমি বলিতেছি—আপনাদের এসম্বন্ধে নিরাশ হইবার কোনও কারণ নাই। কায়ন-ধ্যান ধারণায় মনকে একাগ্র করিবার জন্য প্রাণায়াম-অভ্যাসই একমাত্র উপায় নয়। আর তাহা ছাড়া পাতঞ্জল দর্শন ছাড়াও যোগ-সাধনের আরও অনেক শাস্ত্র প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষের ঋষি যোগী ও সিদ্ধমহাত্মারা রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে গীতা অন্যতম। গীতায় "অভ্যাস যোগের" কথা বর্ণিত আছে। যদি আন্তরিকভাবে সৎ ও পবিত্র বিষয়ের চিন্তায় কোনও মানুষ রত হইবার চেষ্টা করে, যদি দিবারাত্র ঈশ্বরের স্মরণ-মনন ও চিন্তায় মানুষ নিযুক্ত থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অন্ততঃ তিনচার বৎসর পরে তাহার মন একাগ্র হইতে থাকিবে। যাঁহারা প্রাণায়াম-অভ্যাস করিবার অধিকারী নহেন, তাঁহারা যদি প্রত্যহ নিয়মিতভাবে ভগবানের কাছে ভক্তিমুক্তি ও শান্তিলাভের জন্য আকুলপ্রাণে আন্তরিক প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কয়েক বৎসর বাদে তাঁহাদের মন ধ্যানে স্থির হইতে আরম্ভ করিবে। রামকৃষ্ণদেব প্রায়ই বলিতেন, "ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা এলে মন আপনা থেকেই স্থির ও একাগ্র হয়ে যায়। সৎচিন্তা ও ঈশ্বরে অনুরাগ যতই বেশী হবে, মন ঈশ্বরের ধ্যানে ততই একাগ্র হবে।"

যোগশাস্ত্রে ধ্যানের বিষয় সম্বন্ধে খুব উদার মত দেওয়া আছে। ইহা কোনও যুক্তিহীন বিষয়ে অন্ধবিশ্বাস করিতে বলে না। যোগশাস্ত্রের মতে যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রভৃতি পদ্ধতিগুলি যথাযথভাবে অভ্যাস করিলেই যোগের সাধনায় সাফল্য লাভ করিতে পারা যায়। যোগশিক্ষার্থী ব্যক্তিকে ঈশ্বরে যে বিশ্বাস করিতেই হইবে এমন কোনও অপরিহার্য্য নিয়ম ও নির্দ্দেশ সেখানে নাই। এসম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা"—(পাতঞ্জল দর্শন,—সমাধিপাদ—১।২৩)। অর্থাৎ, ঈশ্বরে বিশ্বাস ও তাঁহাতে মন সমাধান করা যোগ-সাধনের অন্যতম পথ ঈশ্বরচিন্তা পাতঞ্জল দর্শনে স্বীকার করিলেও—তাহাকেই একমাত্র পথ বলা হয় নাই। যোগ পন্থাবলম্বী সাধকেরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস

করেন না। অথচ মহাযান হীনযান প্রভৃতি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মধ্য হইতে অনেক সিদ্ধযোগীর অভ্যুদয় হইয়াছে।

এখানে আমি একটি কথা বলা একান্ত প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। আমার বিশ্বাস আপনারা সেই কথাকে একান্ত অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে করিবেন না। আমি আপনাদিগকে এখানে জানাইয়া দিতেছি—আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও মুক্তি পাতঞ্জল যোগদর্শন এবং বেদান্ত দর্শনের উভয়েরই লক্ষ্য। তথাপি ধর্মসাধনার পদ্ধতিগত ব্যাপারে এবং ঈশ্বরধারণা ও সমাধির অবস্থা সম্বন্ধে এই দুই দর্শনশাস্ত্রের অভিমতের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ও বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। 'ঈশ্বর' এবং 'সমাধি' এই উভয় শব্দ পাতঞ্জল দর্শনে ও বেদান্তের মধ্যে ব্যবহৃত হইলেও, উহাদের আভ্যন্তরিক অর্থ ও ভাব সম্বন্ধে এই দুই দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে প্রবল মতভেদ আছে। পাতঞ্জল দর্শনের 'ঈশ্বর' এবং বেদান্তের 'ঈশ্বর', ধারণাগত দিক দিয়া একই তত্ত্ব নয়। পাতঞ্জলের বর্ণিত 'সমাধি' এবং বেদান্তের বর্ণিত 'সমাধি' সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।[৭]

ধ্যানে চিত্তকে একাগ্র করিবার জন্য যোগশাস্ত্রে ঈশ্বর অথবা দেবদেবীর নামযুক্ত কোনও মন্ত্রকে জপ করিবার বিধান দেওয়া আছে। কিন্তু নিজের খেয়াল-খুসি-মতন কোনও একটা মন্ত্র লইয়া জপ করিতে থাকিলে তাহাতে কোনও ফল হইবে না। কোনও সিদ্ধযোগীকে গুরুরূপে বরণ করিয়া তাঁহার দেওয়া কোনও বিশিষ্ট একটি মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া তাহা নিয়মিত পদ্ধতি অনুসারে জপ ও তাহার চিন্তা করাই যোগশাস্ত্রের অন্যতম নির্দেশ। পাতঞ্জলযোগ-সূত্রের মতে—প্রণব অর্থাৎ ওঁ-ই ঈশ্বরের সর্বভাব-প্রকাশক একমাত্র নাম। (তস্য বাচকঃ প্রণবঃ, ১।২৭)। বেদ উপনিষদ বেদান্ত গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রেও এই ওম্-কারকে ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ নাম বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। সিদ্ধগুরু দেওয়া মন্ত্রের মধ্যে একটি আশ্চর্য শক্তি নিহিত থাকে। আন্তরিক শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত ঐ মন্ত্র প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় প্রত্যেকবার অন্ততঃ দুই তিনঘণ্টা জপ করিলে যথাসময়ে তাহার সুফল নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে। জপ করিবার সময়ে শুধু মন্ত্রের আবৃত্তি করিয়া গেলেই হইবে না। ঐ মন্ত্রের মধ্যে যে আভ্যন্তরিক তত্ত্ব এবং উহার প্রতিপাদ্য দেবদেবীর মূর্তিকে সেইসঙ্গে চিন্তা করা একান্ত দরকার। এই কথাই সুস্পষ্টভাবে সাধনশিক্ষার্থীদের প্রত্যেক শাস্ত্র ও সিদ্ধগুরু বারবার বলিয়া দিয়াছেন।[৮]

সাধকদের মানসিক প্রকৃতির ভিন্নতা ও উপাসনাগত ভাবের বৈচিত্র্যের জন্য ধ্যানের বিভিন্ন বিষয়ের কথা যোগশাস্ত্রে বলা হইয়াছে। সাকার অথবা নিরাকার যে কোনও আধ্যাত্মিক ভাবের অবলম্বনে ধ্যান করিবার বিধান বিভিন্ন যোগশাস্ত্রে আছে। এক এক শ্রেণীর সাধকদের ধ্যানের বিষয় এক এক রকম। কেহ অদ্বৈত নির্গুণভাবের, কেহ নিরাকার সগুণ ব্রহ্মের, কেহ কোনও দেবদেবীর, কিম্বা কোনও মন্ত্র বা প্রতীক অবলম্বনে ধ্যানের অভ্যাস করিয়া থাকেন।

৭। পাতঞ্জল দর্শনে প্রণব ঈশ্বরের সংজ্ঞা (definition):—

ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।

—পাতঞ্জল দর্শন, ১।২৪

বেদান্তের এবং উপনিষদ প্রভৃতি আরও অন্যান্য শাস্ত্রে ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা ইহা অপেক্ষা অনেক উচ্চতর ও বিশালতর। ইহা বেদান্ত উপনিষদ গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রের অধীত পাঠকমাত্রেই জানেন। এখানে ঈশ্বরসম্বন্ধে উপনিষদের একটি মন্ত্র দেওয়া হইতেছে:—

স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণম্
স্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূ র্যাথাতথ্যতোঽর্থান্
ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।

—ঈশোপনিষদ, ৮

তদুপরতর্ধ ভাবয়ন্

—পাতঞ্জল দর্শন, ১।২৮

যথাভিমত ধ্যানাদ্বা।

—পাতঞ্জল দর্শন, ১।৩৯

যতদিন না ধ্যানের গভীরতায় অনুভূতি হইতে থাকিবে ততদিন কিছুতেই যোগসাধনের সাফল্য সম্বন্ধে কোনই আভাস পাওয়া যাইবে না। ধ্যানের অভ্যাস ও আবেশ যত গভীর হইবে আধ্যাত্মিক অনুভূতির গভীরতা ততই আরও বেশী হইবে। অন্তর সম্পূর্ণ শুদ্ধ হইলে সেই স্বচ্ছ ও বিশুদ্ধ অন্তরে ঈশ্বরের দিব্যস্বরূপ প্রতিবিম্বিত হয়। অন্তরের সম্পূর্ণ শুদ্ধতায় মন ও ইন্দ্রিয়ের দাবী, বুদ্ধিবিচারের ও যুক্তিশীলতার ভূমিকে অতিক্রম করিয়া অতীন্দ্রিয় ভূমিতে পরচেতনার স্তরে উঠিয়া ( Superconscious plane ) সাধক আত্মস্বরূপে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার করেন। এইজন্য যীশুখৃষ্ট বলিয়াছেন, "পবিত্র-হৃদয় ব্যক্তিরা ধন্য, কেননা তাহারা নিশ্চয়ই ঈশ্বরের দর্শন লাভ করিবে" ( 'Blessed are the pure in heart. For, they shall see God )।'

যে অবস্থায় সাধক ঈশ্বরের সহিত স্বরূপগত-ভাবে নিজের একাত্মতা উপলব্ধি করেন—তাহাকে 'সমাধি' বলে। পাতঞ্জল দর্শনে ( ১ম অধ্যায় ৪র্থ সূত্র ) বলা হইয়াছে—"ইহাই যোগসাধনের চরম ফল, এই অবস্থাতেই সাধক নিজ দিব্যস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন।" বেদান্তে 'সমাধি' শব্দে জীবাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপগত সমত্ব উপলব্ধির অবস্থাকে বুঝাইয়া থাকে। এই অবস্থা লাভ হইলে সাধক সর্ব্ববিধ মোহ মলিনতা অশান্তি অপবিত্রতা ও অজ্ঞানতা হইতে চিরমুক্ত হইয়া যান। তিনি তখন অশেষ শান্তি অপার আনন্দ ও অসীম জ্ঞানে সম্যকভাবে প্রতিষ্ঠিত হন। যোগসাধনায় সিদ্ধ সাধক উপলব্ধি করেন—তিনি এই রক্তমাংস-অস্থির দ্বারা গঠিত নশ্বর দেহ নন। তিনি জন্মহীন মৃত্যুহীন শোকদুঃখতাপ-বিমুক্ত চিরআনন্দময় ও জ্যোতিস্বরূপ আত্মা। যোগসাধনায় সিদ্ধ হইলে যোগীর অন্তরের চক্ষু খুলিয়া যায়, তিনি দিব্যদৃষ্টি অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেন। গীতায় বলা হইয়াছে—"সিদ্ধযোগী সমদর্শী ও মুক্তাত্মা। সিদ্ধযোগী দেখেন, যিনি তাঁহার মধ্যে, তিনিই সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রাণী ও সকল পদার্থের মধ্যে বিরাজিত। সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র অন্তরে ও বাহিরে সেই এক অনাদি অনন্ত অপরিণামী আত্মাকে সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত দেখিয়া তিনি আর কাহারও প্রতি দ্বেষ হিংসা করিতে পারেন না। সকল নরনারী ও সকল জীবকেই তিনি সমান স্নেহ ও সমান প্রেমে ভালবাসেন। সকলের মধ্যে নিজেকে এবং নিজের মধ্যে সকল জীবকে দেখিয়া তিনি নিখিল বিশ্বচরাচরের সহিত একাত্মতা উপলব্ধি করেন।" তখন তিনি জনসমাজে পবিত্রতা দিব্যজ্ঞান বিশ্বপ্রেম ও ঈশ্বরপ্রাপ্তির জীবন্ত দৃষ্টান্তরূপে বিরাজ করেন। তাঁহার সমস্ত চিন্তা ও কর্ম্মই ব্রহ্মময় হইয়া যায়। আর এই ব্রাহ্মীস্থিতি ও একত্ব অনুভূতিতেই মানবজীবন ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হয়।*

* পূজনীয় স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটিতে প্রদত্ত *Practice of Yoga* নামক ইংরাজী বক্তৃতার অনুবাদ।

---

ভারতে সবাই নেতা হ'তে চায়, হুকুম তামিল করবার কেউ নেই। সকলেরই উচিত—হুকুম চালাবার আগে হুকুম তামিল করতে শেখা। আমাদের ঈর্ষ্যার অন্ত নেই। আর যতই আমরা হীনশক্তি, ততই আমরা ঈর্ষ্যাপরায়ণ। যতদিন না এই ঈর্ষ্যা দ্বেষ যায় ও নেতার আজ্ঞাবহতা হিন্দুরা শিক্ষা করে, ততদিন একটা সমবেতচেষ্টা হওয়াই পারে না।

—স্বামী বিবেকানন্দ

# মায়াবাদ ও আচার্য্য গৌড়পাদ

ব্রহ্মচারী সদানন্দ

শ্রুতি প্রতিপাদিত অদ্বৈত-তত্ত্ব আচার্য্য শঙ্করের গ্রন্থাবলীতে যতটা সুস্পষ্ট আকার গ্রহণ করিয়াছে, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী আর কোনও আচার্য্যের গ্রন্থে এমন বিস্তৃতভাবে উহা আলোচিত হয় নাই। আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার গ্রন্থরাজিতে জগতের অনির্ব্বচনীয়তা প্রমাণ করিয়া, জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপগত একত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। শ্রুতিরও তাৎপর্য্য জীব ও ব্রহ্মের একত্ব প্রমাণ করা। অদ্বৈতভাবেই শ্রুতির মধ্যে সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক অনুভূতি বিরাজিত। এই অদ্বৈতবাদই শ্রুতি ও তাহার পরিপূরক সমস্ত আর্ষশাস্ত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপাদ্য বিষয়। আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার অতুলনীয় অনুভূতি ও অদ্ভুত মনীষার আলোকে অকাট্য যুক্তির দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন।

নির্ব্বিশেষ অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা করাই আচার্য্য শঙ্করের জীবনের ও রচনাবলীর বিশেষত্ব। তিনি শ্রুতিবর্ণিত অদ্বৈত-তত্ত্বকে ব্যাখ্যান করিয়াছেন—এবং সুস্পষ্টভাবে নিজেকে 'ব্রহ্মবাদী' বলিয়াই পরিচয় দিয়াছেন ("বয়ন্তু ব্রহ্মবাদিনঃ।") কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, শাস্ত্রজ্ঞ অনেক সুধী ব্যক্তিই তাঁহাকে 'মায়াবাদী' বলিয়া অভিহিত করেন। তাঁহাদের মতে 'আচার্য্য শঙ্করের ব্যাখ্যাত ও প্রতিপন্ন দার্শনিক মত মায়াবাদ'। আচার্য্য শঙ্কর যে সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মবাদী ইহা তাঁহারা মনে করিতে পারেন না।

এই প্রকারে আচার্য্য শঙ্করের মতবাদ আলোচনায় ঐ-সমস্ত আপত্তিকারীদের দ্বারা কতকগুলি অতীব প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচিত হয় না। সেই বিষয়গুলি প্রধানতঃ এখানে আমরা উত্থাপন করিতেছি :—

(১) শ্রুতি-প্রতিপাদিত অদ্বৈতবাদ—যাহা আচার্য্য শঙ্কর দেখাইয়াছেন—উহাকে 'মায়াবাদ' আখ্যায় ভূষিত করা অন্যায়। কারণ, শ্রুতি সকল স্থলেই বলিয়াছে, এবং আচার্য্য শঙ্করও দেখাইয়াছেন যে, অখণ্ড চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। এইজন্য আচার্য্য শঙ্করের ভাষায় অদ্বৈতবাদকে 'ব্রহ্মবাদ' বলা যায়।* কিন্তু 'মায়াবাদ' অর্থে মায়াই অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয় কোন বস্তুকে জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ বুঝাইয়া থাকে। (২) শ্রুতি যেখানে জগতের নাম ও রূপের কথা বলিয়াছে, সেখানে উহাকে 'অনির্ব্বচনীয়' ও 'মিথ্যা' বলিয়াছে। এইজন্যই জগতের নাম ও রূপের অংশে অদ্বৈতবাদিগণ 'মায়াবাদ' শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন—ইহা আমরা বাচস্পতি মিশ্রের প্রণীত 'ভামতী' টীকায় পাইয়াছি। কিন্তু 'মায়াবাদ' ও 'অনির্ব্বচনীয়বাদ' নাম ও রূপের অংশ স্বীকার করিলেও, তাঁহারা শ্রুতির তাৎপর্য্য ঐরূপ অনির্ব্বচনীয় বস্তুতে স্বীকার করেন না। (৩) আচার্য্য শঙ্করের পূর্ব্বেও তাঁহার পরম গুরুদেব আচার্য্য গৌড়পাদ জগতের অনির্ব্বচনীয়তা স্বীকার করিয়া প্রগাঢ় যুক্তির সাহায্যে উহা স্থাপন করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা দেখিব যে, আচার্য্য শঙ্কর তাহার পূর্ব্ববর্ত্তিগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই অদ্বৈতবাদের বিস্তার করিয়াছেন এবং আচার্য্য গৌড়পাদ জগতের অনির্ব্বচনীয়তা সম্বন্ধে কী বলিয়াছেন।

শ্রুতির উপদেশ আছে : "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং।" এই উপদেশে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিকারী পদার্থসকল কেবল বাক্য-ব্যবহারের ফল। উহাদের কোনও বাস্তব সত্তা নাই। যদি উহাদের একটিপৃথক সত্তা থাকিত তাহা হইলে জ্ঞানের দ্বারা ঐ সত্তা-সত্তার নিবৃত্তি হইত না। কারণ, জ্ঞান অজ্ঞানকে নাশ করে, সত্তাকে নাশ করে না। অথচ

শ্রুতিতে আছে যে জ্ঞানী (তত্ত্বসাক্ষাৎকারজনিত অপরোক্ষ জ্ঞানের অধিকারী) মিথ্যা নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হন। এইস্থলে অর্থাপত্তি প্রমাণের দ্বারা নাম ও রূপের মিথ্যাত্ব নিশ্চিত হয়। আচার্য্য গৌড়পাদও তাঁহার 'মাণ্ডুক্য-কারিকায়' বলিয়াছেন, "প্রলয় যদি বিদ্বেত নিবর্ত্তেত ন সংশয়ঃ। মায়ামাত্র-মিদং দ্বৈতমদ্বৈতং পরমার্থতঃ।" এই কারিকায় তিনি স্পষ্টই বলিলেন, 'দ্বৈত জগৎ মায়ামাত্র', অর্থাৎ—বাস্তব সত্তাশূন্য। যদি অস্তিত্ব থাকিত তাহা হইলে সংশয় কখনও নষ্ট হয় না এবং সংশয় নষ্ট না হইলে অদ্বৈত-জ্ঞানও হইবে না। এই 'মায়া' শব্দে কেহ যেন বৌদ্ধদের 'শূন্য'-কে না বুঝেন। কারণ বৌদ্ধদের শূন্যের কোনও অধিষ্ঠান নাই। কিন্তু আচার্য্য গৌড়পাদ আত্মাকে 'মায়ার অধিষ্ঠান' বলিয়াছেন। এই আত্মা সৎস্বরূপ। তাঁহার কথাতে ক্রমশঃ ইহা পাওয়া যাইবে। দ্বৈত-জগৎকে 'শূন্য' বলা হইয়াছে—জ্ঞানীর পারমার্থিক দৃষ্টিকে গ্রহণ করিয়া। কারণ, যাহার অদ্বৈত-জ্ঞান হয় নাই, সেই ব্যক্তি জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত জগতের সত্যতা স্বীকার করিবেই। ইহাকেই বলে, 'জগতের ব্যবহারিক সত্তা'। এই ব্যবহারিক সত্তার বিষয় শ্রুতিই স্বয়ং বলিয়াছে, 'যদা দ্বৈতমিব ভবতি তদ্ ইতর ইতরং পশ্যতি।' শ্রুতির এই উপদেশেই বুঝা যায় যে, দ্বৈতের মতন হইলেই ভেদ দেখা যায়। এই দ্বৈত যে কল্পিত ব্যাপার তাহা 'ইব' শব্দের দ্বারাই বুঝা যায়। পুনরায় তত্ত্বজ্ঞানীর অবস্থার কথা বলা হইয়াছে, "যদা সর্ব্বাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ।"

একত্ব-জ্ঞান হইলেই দ্বৈতজ্ঞান নষ্ট হয়। সুতরাং তখন হইতে আর ভেদ-ব্যবহার থাকে না। ব্যাসদেব তাঁহার রচিত বেদান্তদর্শনে "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্" সূত্রে জগতের ব্যবহারিক সত্তা এবং "তদনন্যত্বম্" সূত্রে পারমার্থিক দৃষ্টিতে জগতের অভাব (অনস্তিত্ব) স্বীকার করিয়াছেন। আচার্য্য গৌড়পাদও তাঁহাদের পথার অনুসরণ করিয়া বলিয়াছেন, "বিকল্পো বিনিবর্ত্তেত কথিতো যদি কেনচিৎ। উপদেশাদয়ং বাদোজাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে।" যেমন রজ্জুতে ভ্রমবশতঃ কেহ সর্পের কল্পনা করিলে সেই ভ্রম ততক্ষণই থাকে, যতক্ষণ না রজ্জুর প্রকৃত স্বরূপের জ্ঞান না হয়, তেমনি এই জগৎও যদি কাহারও দ্বারা কল্পিত হয়, তাহা হইলে যে পর্য্যন্ত না ঐ ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় সে পর্য্যন্ত জগতেরও অস্তিত্ব থাকে। এই জগৎকে আচার্য্য গৌড়পাদ 'ঈশ্বরের কল্পিত' বলিয়াছেন। অতএব এই কারিকায় আচার্য্য জগতের ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করিয়াছেন। আচার্য্য স্বয়ং অন্যস্থলে বলিয়াছেন—'যতক্ষণ ভাবনা ততক্ষণ জগৎ'। এই সকল যুক্তিতে দেখা যায় যে, আচার্য্য গৌড়পাদ জগতের অনির্ব্বচনীয়তা স্বীকার করিতেন এবং তাঁহার 'মায়া' বৌদ্ধদের 'শূন্য' নয়। এই মায়াময় জগৎ যে মিথ্যা—তাহা তিনি যুক্তির দ্বারা সমগ্র 'বৈতথ্য' নামক প্রকরণে বলিয়াছেন। এস্থলে একটি কারিকা উদ্ধৃত হইতেছে: "আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তত্তথা বিতথৈঃ সদৃশঃ সন্তোঽবিতথা ইব লক্ষিতা।" অর্থাৎ—'যাহা আদিতে নাই, অন্তেও থাকে না, অতএব তাহা মধ্যেও থাকে না। এইরূপ বস্তু মিথ্যা হইলেও অজ্ঞানী উহাকে সত্য বলিয়া মনে করে।'

উপরোক্ত সমস্ত যুক্তির সাহায্যে বুঝিতে পারা গেল যে, আচার্য্য শঙ্কর 'মায়া' সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, উহা আচার্য্য গৌড়পাদেরই উক্তির প্রতিধ্বনি মাত্র। যাহা পারমার্থিক ভাবে সৎ (চিরন্তন) নয়, অথচ আকাশ-কুসুমের মতন অলীকও নয়, কেননা (উহা) দেখা যায়, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান হইলেই ঐ কল্পিত বস্তু নষ্ট হয়, এইরূপ স্বভাবযুক্ত বস্তুকেই 'অনির্ব্বচনীয়' বা 'মায়া' বলে। ইহা ভাব-বস্তু। ইহাই আচার্য্য শঙ্কর প্রতিপাদিত

মায়ীর স্বরূপ। আচার্য্য গৌড়পাদের কথাতেও তাহাই পাওয়া গেল।

কেহ যেন না ভাবেন যে, আচার্য্য গৌড়পাদই মায়াবাদের প্রথম প্রবর্ত্তক ও প্রচারক। আচার্য্য গৌড়পাদের জীবনকালের পূর্ব্বেও অনির্ব্বচনীয়-বাদের অস্তিত্ব ছিল। আচার্য্য গৌড়পাদের নিজের কথাতেই তাহার সমর্থন প্রমাণ পাওয়া যায়।

(১) কল্পয়ত্যাত্মনাত্মানমাত্মদেহং মায়য়া।
স এব বুধ্যতে ভেদানিতি বেদান্তনিশ্চয়ঃ ৪।১২

(২) স্বপ্নমায়ে যথা দৃষ্টে গন্ধর্ব্ব-নগরং যথা।
তথা বিশ্বমিদং দৃষ্টং বেদান্তেষু বিচক্ষণৈঃ ৪২ ৩১

উপরোক্ত কারিকা দুইটি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, জগতের কাল্পনিক সত্তা আচার্য্য গৌড়পাদের পূর্ব্বেও স্বীকৃত হইত। আচার্য্য শঙ্কর এইরূপ বহু পুরাতন মতের বিস্তার মাত্র করিয়াছেন।

---

# জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা

**ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত**

বর্ত্তমান স্বাধীন ভারতের নাগরিকেরা দেশকে নূতনভাবে সঞ্জীবিত করিবার জন্য নানাভাবে চেষ্টিত হইতেছেন এবং জাতীয় উন্নয়নের জন্য নানাবিধ পন্থা অবলম্বন করিতেছেন। জাতীয় উন্নতির এইসব ব্যবস্থার মধ্যে নূতন ভিত্তিতে শিক্ষাপ্রণালী স্থাপন করার প্রচেষ্টা চলিতেছে। এইজন্য 'বনিয়াদী শিক্ষা' ( Basic education ) প্রণালীর প্রচার হইতেছে।

কিন্তু আসল ব্যাপার তলাইয়া দেখিলে দৃষ্ট হইবে যে, বস্তুতঃ আমরা পুরাতনের উপরে মলম্ লেপন করিতেছি। আমাদের বর্ত্তমানের শাসক-শ্রেণী দেশের পরাধীনতার কালে যে কল্পিত-আদর্শ ( utopia ) ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপ হইতে সংগ্রহ করিয়া জাতীয়তার কামা ও উন্নতির পন্থা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা আজ শাসন-যন্ত্র করায়ত্ত করিবার পরে প্রাকৃত কার্য্যে তাঁহারা লাগাইবার চেষ্টায় আছেন। কিন্তু এই "উটোপিয়ান" ( utopian ) আদর্শ সকল বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে পরিত্যাজ্য হইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশে ভাবপ্রবণতার স্থান এখন আর লোকসমাজ পরিচালিত হয় না। সেখানে সমস্ত কর্ম্মই বিজ্ঞানের উপরে ভিত্তি স্থাপিত করা হয়।

কিন্তু স্বাধীন ভারতে, দ্রুতগতিতে অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য শ্রমশিল্প ( Industry ) ও কৃষিকর্ম্মের সহায়তার জন্য River-valley project-গুলিতে মাত্র কেবল বৈজ্ঞানিক উপায় গৃহীত হইতেছে। কিন্তু অন্যান্য জাতীয় কর্ম্মের ক্ষেত্রে প্রাচীন কালের ন্যায় 'উটোপিয়া' (utopia) পুনরায় আনার প্রচেষ্টা হইতেছে। এই বিষয়ে ইতিহাস যেন পুরাতনের পুনরাবৃত্তি করিতেছে। বাল্মীকি রামায়ণোক্ত 'রামরাজত্ব', যাহা আসলে পৌরহিত্য-তন্ত্রের রাজত্ব, বর্ত্তমান ভারতে জাতীয় উন্নতি-সাধনের ব্যাপারে যাবতীয় কর্ম্মে তাহারই সাধনা চলিতেছে। ইহার দ্বারা ভারতকে বীর্য্যশালী সত্তেজ জাতিরূপে উন্নত করার পরিবর্ত্তে "গান্ধী-রাজনীতি"-র দ্বারা "রামরাজত্ব" আনয়নের জন্য শাসনকর্ত্তারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। এইস্থলে রাজনীতিক ও অন্যান্য বিষয়ের কথা উল্লেখ না করিয়া, জাতীয় জীবনের যে সর্ব্বপ্রথম ভিত্তি 'শিক্ষা'—সেই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক।

স্বাধীন দেশের বিদ্যালয়গুলি একটি কীর্তিমান "নেশন" ( Nation ) সংগঠনের প্রধান ভিত্তি। যদি সুযোগ্য ও তেজস্বী নাগরিক উদ্ভূত না হয়, তাহা হইলে শক্তিমান জাতি কি প্রকারে সংগঠিত হইবে? তীক্ষ্ণ-মস্তিষ্ক এবং দৃঢ়-হৃদয় লইয়াই একটি মানবের বৈশিষ্ট্য প্রকট হয়। মানব-সমষ্টি লইয়াই জাতি হয় এবং সেই জাতিই স্বাধীন রাষ্ট্রের অন্তর্গত 'নেশন'-রূপে বিবর্তিত হয়। ইহাই হইল রাজনীতিক তথ্য। এক্ষণে শিক্ষা বিষয়ে আমাদের নেশন-এর জাতীয় কর্তব্যের কথায় আসা যাউক।

বর্তমানে ভারতবর্ষ পৃথিবীর স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের অন্যতম। ক্রন্দনের ও হা-হুতাশের যুগ এখন চলিয়া গিয়াছে। "কর্মযোগে জাগি পুরুষের মত" স্বাধীনতালাভের ব্রত আমরা উদ্‌যাপিত করিয়াছি। এক্ষণে জাতীয় রাষ্ট্র সংগঠনের কর্মে আমাদের আত্ম-নিয়োজিত করিতে হইবে। স্বাধীন এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র স্থাপন করিলেই পর্যাপ্ত কর্ম করা হয় না। বরং রাষ্ট্রীয় উন্নতির জন্য নূতন কর্মযোগে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

জাতির ভবিষ্যতের আশাস্থল হইতেছে—বালক-বালিকারা এবং তরুণ-তরুণীরা। যে শিক্ষা তাহারা জীবনের প্রথম কালে পাইবে, তাহার দ্বারা পরিচালিত হইয়া তাহারা নিজ নিজ জীবন-পথে অগ্রসর হইবে। এইজন্যই প্রাথমিক জীবনে বৈজ্ঞানিক সংস্কারের দ্বারা নিজেদের সংস্কৃত করিয়া জীবনযাত্রা আরম্ভ করা দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের কর্তব্য।

এক্ষণে প্রশ্ন—কি প্রকারে ইহা সম্ভব হইতে পারে? এই আদর্শকে বাস্তবে সম্ভব করিয়া তোলিবার আধার হইতেছে—বিদ্যালয়। এতদিন অর্থাৎ দেশের পরাধীনতার কালে বিদেশী গভর্নমেণ্টের শাসনকার্য চালাইবার জন্য যেটুকু বিদ্যা প্রয়োজন, শুধু সেইটুকুই আমরা পাইয়াছি। অধ্যাপক রামন ( C. V. Raman ) বারবার দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, "ইংরেজ আমাদের বিজ্ঞান শিখায় নাই।" সাধারণ শিক্ষাক্ষেত্রেও তদ্রূপ। সাধারণ শিক্ষাপদ্ধতিও পুরাতন প্রণালী হইতে বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। একেই বিদেশীর ভাষার মাধ্যমে আমাদের জ্ঞানার্জন করিতে হয়, তাহার পর পাঠ্যপুস্তকগুলিও এমনভাবে রচিত হইয়াছে যে, তাহাদের উপরও সমালোচনা করা চলে। বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধের বা সংবাদের বদলে আমাদের বিদ্যালয়-গুলিতে অসার গল্পের পুস্তকই পড়ানো হয়। ভারতবর্ষের জাতীয় ইতিহাসের প্রাচীন যুগের অধ্যায় আমাদের নিকটে অজ্ঞাত থাকে। এমন অবস্থায় তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি ও জাতীয়তাবোধ দেশের ছেলেমেয়েদের মনে কেমন করিয়া অঙ্কুরিত হইবে?

অন্যান্য সকল দেশেই পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্বের ( Experimental Psychology ) উপর শিক্ষাতত্ত্বের ( Pedagogy ) ভিত্তি স্থাপিত। কিন্তু তাহা এদেশে বিশেষভাবে প্রয়োগ করা হয় না। যখন একটি ছাত্র শিক্ষার অন্তর্গত কোনও একটি বিষয়ে পশ্চাৎপদ হইতেছে, তখন তাহা তাহার অমনোযোগিতাপ্রসূত কিম্বা তাহার মস্তিষ্কের দৌর্বল্য বা কোন মনস্তাত্ত্বিক কারণবশতঃ ঘটিতেছে, তাহা শিক্ষকের অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। ছাত্রকে কেবল বেত মারিলে কিম্বা তিরস্কার করিলেই ছাত্রের মেধা স্ফুরণ হয় না। বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রয়োগের দ্বারাই তাহা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। একমাত্র সোভিয়েট রাশিয়ার বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বালক বালিকাদের শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যে ছাত্রের অঙ্কে (গণিতে) মন বসে না, বরং চিত্রাঙ্কনের দিকে মনের গতি, তাহাকে ভবিষ্যতের আইনস্টাইনরূপে বিবর্তিত করার চেষ্টা বৃথা। অবশ্য প্রাথমিক শিক্ষা সকলের পক্ষেই প্রযোজ্য।

বিজ্ঞানের উপর শিক্ষা-প্রণালীর ভিত্তি স্থাপন যেমন প্রাথমিক কর্তব্য, তেমনিই পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের কর্ম দ্বিতীয় কর্তব্য। বাল্যকাল হইতে

দেশের ছেলেমেয়েদের বৈজ্ঞানিকভাবে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য তদনুযায়ী তথ্যপূর্ণ পাঠ্যপুস্তক-সকলের রচনা করা উচিত ও প্রয়োজন। বিশেষতঃ ভারতে তাহা আশু প্রয়োজন। এদেশে অলৌকিক অনৈসর্গিক কাহিনী ও গল্পসমূহ জনসমক্ষে ধর্ম্মের নামে খ্যাতি লাভ করিয়া থাকে। ইহার ফলে, দেশের সকল বয়সের লোকেদেরই মস্তিষ্ক বিকল হয়। মস্তিষ্কের এই বৈকল্যের জন্য পুনঃপুনঃ বিদেশীদের নিকট হইতে ভারতীয়দের লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছে। ইহা বৈজ্ঞানিকেরাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অজ্ঞতাই ভারতের পতনের মূল। ইতিহাস পড়িয়া দেখিয়া ইহা সুস্পষ্ট বলিয়া প্রমাণিত হয়। অলৌকিক উপায়ে ভারত কখনও বিদেশীদের কবল হইতে রক্ষা পায় নাই। অলৌকিক গালগল্পের দ্বারা ভারত পুনরায় নিজের স্বাধীনতা অর্জ্জন করে নাই। আত্মত্যাগ ও স্বার্থত্যাগের দ্বারাই তাহা সম্ভব হইয়াছে। এই সত্য দেশের ছেলেমেয়েদের এখন বোধগম্য করাইতে হইবে। আমাদের তৃতীয় কর্ত্তব্য হইতেছে—বাল্যকাল হইতে জাতীয় শিক্ষার দ্বারা একজাতীয়তাপ্রাণ ( Nationality ) মন গঠিত করিতে হইবে। প্রাচীন কাল হইতে পণ্ডিতেরা জানিতেন—ভারত নানা ভাষাভাষী এবং নানা মূলজাতীয় ( Race ) লোকের দ্বারা অধ্যুষিত। কিন্তু আধ্যকৃষ্টির দ্বারা সকল লোককে ভারতে একমন একপ্রাণ করার চেষ্টা হইয়াছে। একরাষ্ট্রাধীন একমন ও এক স্বার্থ হইতেছে এক জাতীয়তার ভিত্তি।

আজ রাজনীতিক ক্ষেত্রে ভারত এক জাতীয়তা প্রাপ্ত নেশন ( Nation )। কিন্তু পূর্ব্বকালের কর্ম্মের অপূর্ণতার জন্য এবং পুনঃপুনঃ বৈদেশিক আক্রমণের জন্য ভারতবর্ষ—ইরাণ চীন জাপানের ন্যায় সুদৃঢ় এক জাতীয়তাপ্রাপ্ত জাতিতে বিবর্ত্তিত হইতে পারে নাই। ইরাণের লোকেরা যে কোনও মূলজাতীয় সমুদ্ভূত হউক না কেন, সে ইরাণী—সে সেখ সাদী, ওমার খৈয়াম ও হাফেজের কাব্যপ্রতিভার গর্ব্ব করে। চীনের লোকেরা যে ধর্ম্মেরই অন্তর্গত হউক না কেন, তাহারা নিজেদের হান-এর বংশধর বলিয়া গর্ব্ব করে। চীনা মুসলমানও হান-এর বংশধর বলিয়া নিজের পরিচয় দেয়। জাপানে সব ধর্ম্মের লোকই জাপানী এবং তাহারা সকলেই এক ভাষা ও এক আইনের অনুবর্ত্তী। সে জাই নাইশনের লোক।

আমাদের দেশেও এখন সেই সময় উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বে ভারতে সকলেই নিজেকে 'মনুর সন্তান' বলিতেন। কিন্তু ভারতে বৈদেশিক আক্রমণে সেই একতা ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। বিদেশীদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া একদল লোক নিজেদের 'বেন-ই-আদম' বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন। কিন্তু আজ ভারতবাসীরা সকলেই বিদেশী প্রদত্ত 'ইণ্ডিয়ান' ( Indian ) নামে নিজেদের পরিচয় দিয়া থাকেন। এক্ষণে স্বাধীনতা-লাভের পরে আমাদের কনষ্টিট্যুসনে ( Constitution ) দেশের নামকরণ হইয়াছে—India, that is Bharat'। ইহার অর্থ—'আমরা ভারতীয়—আমরা ভারতের সন্তান'। বর্ত্তমানে আমাদের প্রাদেশিকতা বর্জ্জন করিয়া 'ভারতীয়তা' অর্জ্জন করিতে হইবে।

বৈদেশিক বিজয়ের ফলেই ভারতবর্ষের একতা ছিন্ন হয়। বিভিন্ন স্থানে ছোট বড় অনেকগুলি পৃথক পৃথক রাষ্ট্র স্থাপিত হইয়াছিল। বিভিন্ন ভাষাযুক্ত স্থানে পৃথক পৃথক ক্ষুদ্র রাষ্ট্র সমূহ ( so many minor principalities ) বিবর্ত্তিত হইয়াছিল। বিভিন্ন ভাষাযুক্ত স্থানের জন্য জাতীয়তার বা Spirit of nationalism-এর অনুপস্থিতি ও অসম্ভাবনা হইয়াছে। আর মুনিয়াণী স্বার্থি তাহার ইন্ধন প্রদান করিতেছে। কিন্তু আমরা ভুলিয়া যাই—একই সমাজে, একই মন্ত্রে, একই অনুষ্ঠান দ্বারা আমরা অর্থাৎ হিন্দু মুসলমান বা খৃষ্টান সকলেই উপাসনা করি। পুনরায়, প্রাদেশিক বিবাহে প্রাচীন কালে আপত্তি ছিল না, কিন্তু মধ্যযুগে রাষ্ট্রের বিচ্ছিন্নতার জন্য তাহা বন্ধ হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে, ঐসব প্রথা আবার চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। এক্ষণে অসবর্ণ বিবাহও আবার চলিতেছে।

উপস্থিত হলে আইনতঃও তাহা স্বীকৃত হইতেছে। আমাদের ইহা ভুলিলে চলিবে না যে, আমাদের সামাজিক আচার ও ধর্ম্মপদ্ধতি—এক-ভারতীয়তার সুদৃঢ় ভিত্তি বহু পূর্ব্বেই রচিয়াছে। যখন একজন ব্রাহ্মণ—তিনি যে প্রদেশেরই লোক হউন না কেন—অন্য প্রদেশের ব্রাহ্মণের সহিত একই বেদ ও এক গোত্রের মিল দৃষ্টি করেন, তখন তিনি অন্য প্রদেশের ব্রাহ্মণকে স্বসংগীয় বলিয়াই গণ্য করেন। শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে 'দেশাচার' 'কুলাচার' বিদূরিত হইতেছে এবং হইবে।

সুতরাং এই সমস্ত উপস্থিত ক্ষেত্রে এমন শিক্ষা দেশের বালক-বালিকাদের প্রদান করা প্রয়োজন, যাহাতে তাহাদের বৈদেশিক প্রভাবিত মনোভাব বিদূরিত হয়। সকলেই যেন নিজেদের এক-ভারতীয় জাতি, ভারতের সন্তান বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারে।

আমাদের **চতুর্থ কর্ত্তব্য**—হইতেছে জাতীয় ভাষা। ভাষার বিভিন্নতা ধর্ম্মের বিভিন্নতা অপেক্ষা আরও বেশী মারাত্মক। সকল দেশেই এক জাতীয়তা গঠনের ইহা প্রধান অন্তরায়। বিদেশে অবস্থানকালে ইহা আমরা বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলাম। বিদেশীরা আমাদের বলিতেন, "তোমরা স্বাধীনতা চাও, কিন্তু তোমাদের মধ্যে পরস্পরের ভাষার মিল নাই। সুতরাং তোমরা একটা মেশন কি করিয়া হইবে?" এইজন্য ভারতপক্ষে বিদেশীদের সম্মুখে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের লোকেদের সহিত আমরা সেখানে হিন্দী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতাম। এইসব কারণবশতঃ ভারতবর্ষে একটা *Lingua Franca* অর্থাৎ সার্ব্বজনীন দেশীয় ভাষার প্রচলন হওয়া বিশেষভাবে প্রয়োজন বলিয়া তীব্রভাবে অনুভব করি। এক্ষণে আমাদের জাতীয় গভর্ণমেণ্টের কনষ্টিট্যুশান (Constitution) এই অভাব পূর্ণ করিয়াছে। সংখ্যাধিক্যবশতঃ 'হিন্দী' ভাষা—রাষ্ট্রভাষা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু এইস্থলে বিশেষ গলদ আছে। 'হিন্দী' হচ্ছে একটি বিশিষ্ট স্থানের ভাষা বলিয়া আমরা যেন না বুঝি। 'হিন্দ' অর্থাৎ হিন্দুস্থানের ভাষা হিন্দী। ইহাই প্রাচীনকালে পারসীকেরা ইহার নামকরণ করিয়া ছিলেন। যাঁহারা 'হিন্দুর ভাষা হিন্দী' বলিয়া ইহার উৎপত্তির কারণ মনে করেন—তাঁহারা ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের সহিত পরিচিত নহেন। পুনরায়, আমাদের কনষ্টিট্যুশান বলিতেছে—এই হিন্দীভাষার সর্ব্বপ্রদেশের ভাষা হইতে পুষ্টিসাধন করিতে হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই তত্ত্ব আজ রাজনীতিক আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়াছে।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে যখন দিল্লীর কথা ভাষার সহিত ফার্সী ভাষা মিশ্রিত হইয়া উর্দ্দু অর্থাৎ বাজারের একটা মিশ্রিত ভাষার উদ্ভব হয়, এবং মুসলমান লেখকেরা এই কথা ভাষাতে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন কথা ভাষার একটা নূতন রূপ সাধিত হয়। বিদেশীরা এই নূতন ভাষাকে 'হিন্দুস্থানী' বলিয়া অভিহিত করিতেন—এবং দিল্লীর উর্দ্দু মুয়াল্লার এই ভাষা চলিত বলিয়া ইহার 'উর্দু' নামকরণ হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত মুসলমান কবিরা ইহাকে 'হিন্দী' ভাষা বলিতেন। কিন্তু ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীর প্রভাবে পরে হিন্দীর নূতন নাম হইল 'উর্দু'। কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের উপর 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী'-র হুকুম হইল: "বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণের উপরে স্থাপিত কর। উত্তর-ভারতের হিন্দুদের জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণের উপরে স্থাপিত করিয়া দেবনাগরী অক্ষরে 'হিন্দী' সাহিত্য লিখ, আর ঐ ভাষাই ফার্সী অক্ষরে আরবী ব্যাকরণের উপরে স্থাপিত করিয়া 'উর্দু' সাহিত্য লিখ। ইহার ফলে আমরা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের কিছুতকিমাকার বাঙলার উদ্ভব দেখি, লালু ভাইএর 'প্রেমসাগর' আর মীর আম্মনের 'বাগ ও বাহার' লিখিত হইতে দেখি। কিন্তু কালের প্রভাবে এইসব পুস্তকে ব্যবহৃত শৈলী আর উক্ত সব ভাষার সাহিত্যে চলে না। উনবিংশ শতাব্দীর

শেষকাল পর্যন্ত 'হিন্দু' (হিন্দী) ও 'উর্দু' বলিয়া কোন পৃথক ভাষা ছিল না। সাধারণে একই ভাষার কথা কহিত এবং এখনও কহিয়া থাকে। সাধারণতঃ ইহাকে 'হিন্দুস্থানী' বলা হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে রাজা শিবপ্রসাদ হিন্দী ভাষায় স্কুল পাঠ্য পুস্তকসমূহ লেখেন। কিন্তু সমালোচকেরা বলেন, "উহা দেবনাগরী অক্ষরে উর্দুভাষারই পুস্তক হইয়াছে।" অন্যদিকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের ইনশাউল্লার 'রাণী কেতকীকী কহানী" নামক পুস্তকে আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, ইহা উর্দুভাষার পুস্তক নহে, উহা খাঁটি দেশজ ভাষাতে লিখিত, অতএব হিন্দী!

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল হইতে রাজনীতিক কারণ লইয়া ভারতীয় মুসলমানেরা স্বীয় মাতৃভাষা হইতে দেশজ শব্দসমূহ দূরীকৃত করিয়া তাহার স্থানে ফার্সী এবং পরে আরবী শব্দ বসাইয়া দিয়া এক পরগাছা উর্দুসাহিত্য সৃষ্টি করেন। অতঃপর তাহারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপে হিন্দুলেখকেরা স্বীয় মাতৃভাষা হইতে বিদেশী শব্দসমূহ দূর করিয়া দিয়া সংস্কৃতমূলক শব্দসমূহ প্রবেশ করাইয়া বর্তমানের হিন্দী ভাষার সৃষ্টি করিয়াছেন। বর্তমান সময়ে হিন্দী রাষ্ট্র ভাষারূপে গৃহীত হওয়াতে তাঁহারা ইহাকে আরও সংস্কৃতবহুল করিয়া তুলিতেছেন। ফলে, ইহা আমাদের সংস্কৃতবহুল বিদ্যাসাগরী বাঙ্গলার সহিত 'হাম' 'তুম' শব্দ জুড়িয়া দেওয়ার ন্যায় হইতেছে।

কিন্তু হিন্দী ভাষা বাঙলা বা অপর প্রাদেশিক ভাষা হইতে ফার্সী বা বিদেশজাত শব্দসমূহের বিতাড়ন একেবারেই অসম্ভব। মধ্যযুগের জৈমিনি ও কুমারিলভট্ট সংস্কৃত ভাষাতে 'ম্লেচ্ছ' শব্দসমূহের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এই তথ্য ভাষার ক্রমবিকাশের ব্যাপার; রাজনীতিক ইচ্ছাকৃত ব্যাপার ইহাতে চলে না।

হিন্দী আজ এমন একটা ভাষা—যাহা এখনও সম্পূর্ণভাবে বিবর্তিত হয় নাই—তাহাকে অল্প সময়ের মধ্যে প্রচলিত শিক্ষার মাধ্যম ( medium ) করিয়া—তাহাকে ইংরাজীর পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় চাকরীর পরীক্ষা-স্থলে এবং তরুণ-বয়স্ক ছাত্রদের পরীক্ষার স্থলে ব্যবহার করিবার অনুজ্ঞা দিলে, পরীক্ষার্থীদের প্রতি বিশেষ অবিচার করা হইবে। স্কুলের শিক্ষাক্ষেত্রের ইহাই সমস্যা। উহাতে রাজনীতি-ক্ষেত্রে একটা উপদল গঠন করিয়া রাজনীতিক কার্য হাসিল করা হইতে পারে বটে, কিন্তু ভাষাতত্ত্ব, ফোটেতত্ত্ব ( Phonetics ) ও মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে তাহা অচল।

অন্যদিকে দেখি, মিশ্রিত হিন্দুস্থানী বেশ প্রসার লাভ করিতেছে। বিদেশে ক্রমশঃই তাহার পরিচিতি ও প্রসার বাড়িতেছে। সুপ্রতিষ্ঠিত বাঙলা, মারাঠী, তামিল প্রভৃতি ভাষাকে উড়াইয়া দিয়া, সেইসব দেশে কৃত্রিম হিন্দী চালাইবার চেষ্টা করিলে বিড়ম্বনাই সৃষ্টি করা হইবে। ভারতের একজাতীয়তা অর্জন তাহাতে ব্যাহত হইবে। রাজনীতিক সংখ্যাধিক্যের দাবীর জোরে যাহা করিতে যাইলে বিপদই সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন দেশের ইতিহাসই ইহার সাক্ষ্য প্রদান করে। কিন্তু "দেহ শুনে না গান জাগেনা প্রাণ, বিফলে গীত অবসান হয়।" এই সংখ্যাধিক্যের যথেচ্ছাচারিতার ভয়ে দেশের একটি বৃহৎ অংশ দেশ বিভক্ত করিয়া ভিন্ন রাষ্ট্র সংস্থাপন করিয়াছেন। ইহা দেখিয়াও আমাদের দেশের নেতাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয় না।

আজ প্রাদেশিকতার ফলে বাঙলা ভাষাকে বিভিন্ন রাষ্ট্রে অপমানিত, লাঞ্ছিত এমনকি প্রহৃত হইতে হইতেছে। বাঙলা দ্বিখণ্ড হইয়াছে, আবার তাহাকে আরও ক্ষুদ্র করিবার কথা শুনা যায়। এমনকি বাঙলাকে একেবারেই ভারতীয় ভূগোলের পৃষ্ঠা হইতে মুছাইয়া দিবার কথা শ্রবণ করা যায়। কথায় বলে, "অবস্থা ভেদে ব্যাঙেও হাতীকে লাথি মারে"। এখন বাঙলার হইয়াছে সেই অবস্থা। অপেক্ষা কিং ভবিষ্যতি!

এই ক্ষেত্রে অবান্তর হইলেও একটা কথা আমাদের দেশের জনসাধারণকে এখানে শুনাইতে চাই। আজ ভারতের প্রদেশে প্রদেশে সর্বত্র যাহা

ঘটিয়া উঠিতেছে। বহুপূর্বে অর্থাৎ রুষ বোলসেভিক বিপ্লবের ( ১৯১৭ ) বহু অগ্রে রুষের ভবিষ্যৎ কর্ণধার ( Dictator ) বর্ত্তমান ষ্টালিন তাঁহার *Minority Problems* নামক পুস্তকে তাঁহার ভবিষ্যৎ-বাণী করিয়া ছিলেন। ঐ পুস্তকে ষ্টালিন বলিয়াছিলেন, আমরা আজ ইউক্রাইনকে একটি 'নেশন' বলিয়া জানি, কিন্তু স্বাধীনতা পাইলে তথায় একশত নেশন গড়া হইবে। ইহার কারণ, নানা ভাষা, নানা ধর্ম ও নানা প্রাদেশিক স্বার্থের-টুকু সুবিধা গ্রহণ করিয়া সেখানে নানা বণিয়াণী স্বার্থের বলের উদ্ভব হইবে। তাহারা নিজেদের স্বার্থের আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার জন্য নানা প্রকারের পার্থক্যের অনুহাৎ তুলিবে।" ফলে হইয়াছেও তাহাই। পাল ও সেন যুগের বাঙ্গলার একাংশ কামরূপ আজ "বঙ্গাল খেদা" করিতেছে। বাঙ্গলার একাংশ মিথিলা ও মগধ বাঙ্গলাকে ভূগোল হইতে বিলুপ্ত করিবার কথা বলে, কলিঙ্গ বাঙ্গলার একাংশ দাবী করে। এইসব প্রদেশের নবোত্থিত বুর্জোয়া শ্রেণীরই দাবী হইতেছে "বঙ্গাল খেদা"। আর রাষ্ট্র ভাষা প্রচলনের নামে হিন্দীভাষা ভারতীয় অংশের বুর্জোয়া শ্রেণীর দাবী হইতেছে, অচিরে সমগ্র ভারতকে হিন্দী-করণ করা। কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁহারা প্রাক্তন ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের চাকা ঘুরাইয়া দিতে চাহেন। তাঁহারা অতীতের ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনকে অস্বীকার করিতে চান।

এইসব কথা এইস্থলে বলা হইল—যেহেতু আমাদের বালক এবং তরুণদের শিক্ষা এতদ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইবে। পুনশ্চ ইহা বলি, রুষ বিপ্লবের পরে, সোভিয়েট রুষেও এই প্রকারের সমস্যার উদয় হয়। পূর্বে, রুষের জার-গভর্ণমেণ্ট মস্কোর ভাষাকে বিশাল রুষ সাম্রাজ্যের 'রাষ্ট্র ভাষা' বলিয়া তরবারির জোরে চালাইতেন, আর সর্ব প্রজাদের বলপূর্বক রুষীকরণ করানো হইত। ইহার ফলে সংখ্যালঘুরা অসন্তুষ্ট হইয়া বিপ্লব আন্দোলন বৃদ্ধি করিত। সেজন্য বোলসেভিক বিপ্লবের পরে সংখ্যালঘুদের দ্বারা বিভিন্ন ঘাঁটিতে পৃথক রাষ্ট্র গঠিত হয়। দেশের মধ্যে অন্তর্বিদ্রোহ চলিতে থাকে। এই সময়ে কথা উঠে, বোলসেভিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্র-ভাষা কি হইবে? পরম-মস্তিষ্ক বৈপ্লবিকেরা দাবী করিলেন, যেহেতু তাঁহারা আন্তর্জাতিক মতাবলম্বী, অতএব কোন ভাষার মাহাত্ম্য তাঁহাদের নাই, মস্কোর বৃহৎ রাষ্ট্র ভাষাই রাষ্ট্র ভাষা থাকুক। কিন্তু বৃহৎ রুষ বংশীয় লেনিন বলিলেন, "এতদ্বারা প্রাদেশিকতা আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে; সংখ্যালঘু জাতিরা তাহাদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষালাভ করুক। তাহারা নিজেদের কৃষ্টির উপর দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীবৃদ্ধি লাভ করুক।" সমস্ত বৃহৎ রুষের ভাষা সর্বত্র পড়ান হইতেছে। কিন্তু মধ্য এসিয়ার জাতিসমূহ নিজেদের মাতৃভাষাতেই বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষালাভ করে। ইহার ফল বিগত যুদ্ধে দৃষ্ট হইয়াছিল। বৃহৎ রুষীয় হইতে কাশাক, তাতার প্রভৃতি জাতিরা একপ্রাণ হইয়া জার্মাণ আক্রমণ রোধ করিয়াছিল।

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, এই দেশের নেতারা বিংশ শতাব্দীতে বাস করেন। কিন্তু তাঁহাদের চিন্তাধারা ঊনবিংশ শতাব্দীর। এইজন্যই সংখ্যালঘুদের প্রতি নানা অত্যাচারের কথা প্রতিনিয়ত শ্রবণ করা যায়। তাঁহারা একজাতীয়তারূপ অনুষ্ঠানটিকে ঊনবিংশ শতাব্দীর পুরাতন অর্থে বুঝেন। বর্ত্তমান কালে, 'একজাতীয়তা সম্বলিত নেশন' অর্থে এক মতের এক ধর্মের বা এক ভাষার লোকসমষ্টিকে বুঝায় না।

এইজন্যই বলি আমাদের শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রদান করিতে হইবে। আর যতদিন তথাকথিত হিন্দী বা ছাত্রের মাতৃভাষা উন্নত অবস্থায় বিবর্তিত হয় যাহাতে ইহা উচ্চকোটি বিজ্ঞানের বাহন হইতে পারে, ততদিন বাধ্য হইয়া ইংরেজীর মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে হইবে।

এই বিষয়ে প্রকৃত নজীর ইউরোপে আছে। ইউরোপের দেশসমূহ আকারে ক্ষুদ্র। সেই সেই দেশে ভাষা-ভাষীর সংখ্যাও লঘু। কাজেই উচ্চ

শিক্ষার জন্য তাহাদের অন্ততঃ দুইটি উন্নত দেশজ ভাষা শিক্ষা করিতে হয়। বিজ্ঞানভবনে অধ্যাপকের বক্তৃতা দেশজ ভাষায় চলে বটে, কিন্তু reference book হিসাবে বৈজ্ঞানিক পাঠ্যপুস্তকসমূহকে হয় ফরাসী না হয় জার্মান ভাষায় পড়িতে হয়। সুইজারল্যাণ্ড আমাদের পক্ষে প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। সেখানে বিভিন্ন মূল জাতি ও ভাষা বিদ্যমান। পুনশ্চ, প্রত্যেক কান্টনে উপভাষাসমূহ কথা হয়। এইজন্য প্রাথমিক শিক্ষা ছাত্র ছাত্রীদের মাতৃভাষাতেই দেওয়া হয়, আর উচ্চ শিক্ষা ফরাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে ফরাসী ভাষায়, এবং জার্মান অধ্যুষিত অঞ্চলে জার্মান ভাষার মাধ্যমে দেওয়া হয়।

আমাদের দেশেও শিক্ষাব্যাপারে সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে চিরজীবনের জন্য মাতৃভাষাতেই রাখিতে হইবে এবং ইংরেজীর পরিবর্তে যতদিন কোন দেশজ ভাষাতে উচ্চ কোটির বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক পাঠ্যপুস্তকসকল রচিত না হয়, ততদিন বাধ্য হইয়া ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন রাখিতে হইবে। অন্তপক্ষে, উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক পুস্তকের মর্ম অবগত হইবার জন্য অন্ততঃ আর একটা উচ্চশ্রেণীর ইউরোপীয় ভাষার শিক্ষার প্রয়োজন। ইউরোপ আমেরিকাতে এরূপ ব্যবস্থাই আছে।

আমাদের পঞ্চম কর্তব্য হইতেছে—জাতীয় রাষ্ট্রে "জাতীয় শিক্ষা" উদ্ভব করা। ইংরেজী আমলে "জাতীয় শিক্ষা" অর্থে আমাদের ধারণা ছিল, গাছের তলায় দেশজ ভাষাতে ইংরেজী পুস্তকসমূহের অনুবাদ পাঠ, কারণ বিশ্ববিদ্যালয় "মেলাযখানা"। তথায় goose step education-ই প্রদান করা হয়। কিন্তু 'জাতীয় শিক্ষা' অন্য অর্থে স্বাধীন দেশসমূহে ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেক স্বাধীন রাষ্ট্রের একটা আদর্শ আছে। যে শিক্ষার দ্বারা দেশবাসীকে সেই আদর্শানুযায়ী গঠিত করা যায় তাহাই হইতেছে—জাতীয় শিক্ষা। অবশ্য ইহা রাষ্ট্র দ্বারা পরিচালিত হয়। বিগত যুদ্ধের পূর্বে জগতে আটটি রাষ্ট্রে জাতীয় শিক্ষা প্রচলিত ছিল। এক্ষণে ধর্ম নিরপেক্ষ সার্বভৌম-তন্ত্রীয় ভারত রাষ্ট্রে আমাদের শিক্ষার আদর্শ কি হইবে তাহাই বিবেচ্য। চরখা ও অহিংসা-মন্ত্রে অভিষিক্ত করিয়া তথাকথিত Basic Education-এর ভিত্তি স্থাপন করিয়া জাতীয় রাষ্ট্রের শিক্ষার আদর্শের বিবর্তন বর্তমান শাসকশ্রেণী করিতেছেন; কিন্তু ইহার বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তির বিষয়ে সন্দেহ উত্থিত হইতেছে। অবশ্য রাষ্ট্রের বিবর্তনের সহিত আদর্শের বিবর্তনের রূপ শাকাপাকি-রূপে নির্দ্ধারিত হইবে। উপস্থিত ইহাই পর্য্যাপ্ত যে, ধর্ম ও সম্প্রদায় নিরপেক্ষ ভারতপ্রেমে অনুপ্রাণিত নাগরিক বিনির্মিত করাই আমাদের শিক্ষার পঞ্চম কর্তব্য হইবে।

আমাদের ষষ্ঠ কর্তব্য হইতেছে, মানসিক চর্চ্চার সহিত বাধ্যতামূলক শারীরিক ব্যায়াম চর্চ্চার প্রবর্তন করা। উভয় চর্চ্চাই প্রত্যেক উন্নত দেশে এক্ষণে আছে, একটির অভাবে অপরটির ক্ষতি হয়। প্রাচীন গ্রীকেরা ইহার মূল্য বুঝিতেন। আমেরিকার অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক পাঠ্যের সহিত দুই বৎসর শারীরিক ব্যায়াম চর্চ্চা বাধ্যতামূলক হইয়া আছে। অন্যথা সেখানে ছাত্রেরা ডিগ্রোমা প্রাপ্ত হয় না। পুনরায়, কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বৎসর সামরিক কুচকাওয়াজ বাধ্যতামূলক করা আছে। আজকাল সর্ববিদ্যালয়ে সামরিক বিদ্যা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। উন্নতজাতির সকল ব্যবস্থাই স্বতন্ত্র। অন্যদিকে, ভারতে, বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গে তাহার অভাব লক্ষিত হইতেছে। স্কুলে parade যথাবৎই প্রচলিত আছে কিন্তু অলস ছাত্রেরা তাহা এড়াইয়া চলে। এক্ষণে স্কুলগুলিতে শারীরিক ব্যায়াম বাধ্যতামূলক নয় এবং ছাত্রেরা তাহাতে নারাজ। বর্তমান কালে, স্কুলে parade ব্যবস্থা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু অনেকস্থলে তাহা উদ্দেশ্য ফাঁকির মধ্যে পড়ে।

এইরূপ স্বাধীন রাষ্ট্রে জাতীয় শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য শারীরিক ব্যায়াম, parade

প্রকৃতি বাধ্যতামূলক এবং অবশ্য-করণীয় কর্ত্তব্যের মধ্যে ধার্য্য করা আশু প্রয়োজন।

জাতীয়শিক্ষা প্রচেষ্টার অষ্টম কর্ত্তব্য হইতেছে—নীতিশিক্ষা প্রদান করা। 'নীতি' অর্থে সাধারণে আমরা সাম্প্রদায়িক বাহ্যাড়ম্বর বুঝি। কিন্তু নৈতিক বলে বলীয়ান না হইলে কোন জাতিই মহৎ হইতে পারে না। নীতি অর্থে কোন ধর্ম্মের বাহ্যিক ক্রিয়া-কলাপ নয়ও ইহা সম্পূর্ণরূপে মনস্তাত্ত্বিক সম্পদ। যে আদর্শের তেজে প্রাচীন রোমে দেশপ্রেমে উরুদ্ধ মিউকুয়াসকলা অগ্নিতে হস্ত প্রদান করিয়া বৈদেশিক আক্রমণকারীকে ভীত করিয়াছিল,—যে তেজে অনুপ্রাণিত হইয়া এক সময়ে শিখ তরুণের দল আত্মবলিদান করিয়াছিল—যে তেজ দ্বারা পরিচালিত হইয়া সে দিনও বাঙ্গলার তরুণ ও তরুণীরা দেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মদান করিয়াছিল—সেই নৈতিক তেজ যে জাতির মধ্যে অটুট থাকে সে জাতি অমর হয়। যে তেজে মানবের চরিত্র অটুট থাকে এবং প্রলোভনে মন অটল থাকে তাহাই নীতি। এইজন্য সেই নৈতিক চরিত্র-গঠনের চেষ্টা বাল্যকাল হইতে বালকদের করিতে হইবে। শিক্ষকদের নিজেদের দেশপ্রেমের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ছাত্রদের অল্পবয়স হইতে তাহাদের জাতির ভবিষ্যতের উচ্চাদর্শের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে শিক্ষা দিতে হইবে।

অদ্য ভারত পরিবর্ত্তনশীল নহে। ইতিহাসের গতির চাকা উল্টাইয়া গিয়াছে। উপনিষদের কথা—"যথাযথা আবর্ত্ততে তথাতথা পদ্যতিঃ মানবাঃ" অর্থাৎ যেমন যেমন পরিবর্ত্তন হয়, মানবও তদনুযায়ী পরিবর্ত্তিত হয়, এই তথ্য সত্য। আজ ধর্ম্মের নামে মধ্যযুগীয় ক্রন্দনের ও হতাশার রোল উঠানো হাস্যকর ব্যাপার। আজ সাম্রাজ্যবাদের তরফদারী করিয়া ইতিহাস ও বিজ্ঞানকে বিকৃত করিয়া লোকচক্ষু গোচর করা সন্দেহজনক ব্যাপার। আজ, আমার বাণী প্রচার করিতে হইবে, আজ সাহসের বাণী ছাত্রদের শুনাইতে হইবে। ইহাই হইতেছে জাতীয় শিক্ষার একটী অঙ্গ। আশাকরি আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলি আর "গোলামখানা" না হইয়া ভবিষ্যতের গৌরবপূর্ণ ভারতসন্তান প্রকট করিবার আলয় যেন হয়। জয় হিন্দ।

---

P30404

# শ্রীলক্ষ্মী-রহস্য

শ্রীরাসমোহন চক্রবর্ত্তী, পুরাণরত্ন, বিদ্যাবিনোদ

সৌন্দর্য্য, সৌভাগ্য ও সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে শ্রী বা লক্ষ্মী অতি প্রাচীনকাল হইতে পূজিতা হইয়া আসিতেছেন। প্রাচীন ভারতীয় শিল্প ও ভাস্কর্য্যে লক্ষ্মীদেবীর নানাবিধ মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়; তন্মধ্যে "গজলক্ষ্মী" মূর্ত্তি সর্ব্বাধিক প্রচলিত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। কৌশাম্বীতে আবিষ্কৃত খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতকের একটি মুদ্রাতে "গজলক্ষ্মী" মূর্ত্তি উৎকীর্ণ দৃষ্ট হয়। উহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, লক্ষ্মীদেবী মধ্যস্থলে দণ্ডায়মানা, আর তাঁহার দুই পার্শ্ব হইতে দুইটী হস্তী শুণ্ড-ধৃত কুম্ভদ্বারা তাঁহাকে স্নান করাইতেছে। অযোধ্যা এবং উজ্জয়িনীতেও খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয়, দ্বিতীয় এবং প্রথম শতাব্দীর অনুরূপ মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মূর্ত্তির প্রচলন এতটা প্রসার লাভ করিয়া ছিল যে, প্রাচীন ভারতের বৈদেশিক রাজন্যবৃন্দের মুদ্রাতেও এই ধরণের লক্ষ্মী-মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। গুপ্তযুগের সীল, মুদ্রা ও সিলালিপিতে লক্ষ্মী দেবীর মূর্ত্তি ও নাম প্রায়শঃ দৃষ্ট হয়। ইহাতে

প্রতীত হয় যে, লক্ষ্মীদেবীর উপাসনা গুপ্তযুগে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল। বৌদ্ধ ভাস্কর্য্যেও লক্ষ্মীদেবীর বিশেষ স্থান ছিল। সাঁচীর পূর্ব্ব তোরণদ্বারে ( স্তূপ নং ২ ), উদয়গিরির গুহা-মন্দিরে এবং বারহুতের রেলিঙে লক্ষ্মীমূর্ত্তি উৎকীর্ণ রহিয়াছে।

শ্রী-দেবীর প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়, ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের খিলাংশে পঞ্চদশ ঋক্ সমন্বিত "শ্রী-সূক্তে"। প্রাচীন পাঞ্চরাত্র বৈষ্ণব শাস্ত্রে এবং প্রাচীন পুরাণসমূহের নানা স্থানে শ্রীসূক্তের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। শ্রীসূক্তে শ্রী বা লক্ষ্মী দেবী পদ্মবর্ণা, পদ্মে স্থিতা, পদ্মমালিনী এবং স্বয়ং পদ্মিনী নামে অভিহিতা। যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা সাধকেরা তাঁহার নিকট হিরণ্য, গো-অশ্বাদি পশু, আয়োপা, ধন-ধান্য, সৌন্দর্য্য, কীর্ত্তি ও ঋদ্ধি প্রার্থনা করিয়া থাকেন। সমগ্র শ্রীসূক্তের উপর বিস্তারণা এবং পৃথ্বীধরাচার্য্য কৃত ভাষ্য আছে। শ্রীসূক্তের কয়েকটি মন্ত্র আলোচনা পূর্ব্বক শ্রী বা লক্ষ্মী দেবীর বৈদিক স্বরূপ উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিব।

'হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং সুবর্ণরজতস্রজাম্।
চন্দ্রাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো ম আবহ।'

—( শ্রীসূক্ত, ১ )

অর্থাৎ—হে অগ্নে! যিনি কাঞ্চনবর্ণা, হরিদ্রাভা (অথবা হরিণী রূপধারিণী), যিনি স্বর্ণ ও রৌপ্যমাল্য-ধারিণী, চন্দ্রবৎ প্রকাশমানা, স্বর্ণবিগ্রহা, সেই লক্ষ্মীদেবীকে আমার নিমিত্ত আবাহন কর।

পুরাণে উক্ত হইয়াছে, "শ্রীর্ভূতা হরিণীরূপম্ অরণ্যে সংচচার হ"। শ্রী বা লক্ষ্মী দেবী হরিণীরূপ ধারণ করিয়া অরণ্যে বিচরণ করিয়াছিলেন।

'লক্ষ্মী' শব্দের নিরুক্তি সম্বন্ধে যজুর্ব্বেদের ভাষ্যকার মহীধর বলেন,—'যদ্বা লক্ষ্যতে দৃশ্যতে ইতিঃ সা লক্ষ্মীঃ সৌন্দর্য্যম্ ইত্যর্থঃ।' যাঁহার প্রভাবে অপরের লক্ষণীয় হওয়া যায়, তিনিই লক্ষ্মী। লক্ষ্মী সৌন্দর্য্যস্বরূপা।

শ্রীসূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রে সৌভাগ্য ও সম্পদ্-প্রদায়িনী লক্ষ্মীদেবীকে আবাহন করা হইয়াছে,—

'তাং ম আবহ জাতবেদো লক্ষ্মীমনপগামিনীম্।
যস্যাং হিরণ্যং বিন্দেয়ং গামশ্বং পুরুষানহম্ ॥২'

অর্থাৎ—যিনি বিদ্যমান থাকিলে আমি সুবর্ণ, গো, অশ্ব ও পুত্র-পৌত্রাদি লাভ করিব, হে জাতবেদঃ ( অগ্নে )! তুমি আমার জন্য সেই লক্ষ্মীকে আবাহন কর, যিনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আর অন্যত্র চলিয়া যাইবেন না।

কঠোর সংগ্রাম করিয়া জীবনে সিদ্ধি ও সৌভাগ্য অর্জ্জন করিতে হয়, তাই শ্রী-দেবী যুদ্ধদেবতা দেবসেনারূপিণী।

'অশ্বপূর্ব্বাং রথমধ্যাং হস্তিনাদপ্রবোধিনীম্।
শ্রিয়ং দেবীমুপহ্বয়ে শ্রীর্মা দেবী জুষতাম্ ॥'[৩]

অর্থাৎ অশ্বসকল যাঁহার পূর্ব্বগামী, রথসমূহ যাঁহার মধ্য-ভাগে, যিনি হস্তীর বৃংহণ ধ্বনিতে সকলকে প্রবোধিত করিয়া থাকেন, সেই [সেনারূপিণী] শ্রীদেবীকে আহ্বান করিতেছি, শ্রীদেবী আমাকে প্রাপ্ত হউন।

'কাং সোস্মিতাং হিরণ্যপ্রাকারামার্দ্রাং জ্বলন্তীং
তৃপ্তাং তর্পয়ন্তীম্।
পদ্মে স্থিতাং পদ্মবর্ণাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্।'[৪]

অর্থাৎ—যিনি সুবিজ্ঞেয়স্বরূপা ( কাং ), সুবিমল মৃদুহাস্যযুক্তা, সুবর্ণবৎ প্রভাই আকৃতিসম্পন্না, যিনি দয়ার্দ্রহৃদয়া, স্বীয় তেজে জাজ্বল্যমানা, যিনি নিত্যতৃপ্তা এবং সাধকগণকে সদা তৃপ্তিদায়িনী, যিনি কমলাসনে অধিষ্ঠিতা এবং পদ্মবর্ণা সেই শ্রীদেবীকে এই স্থানে আমি আবাহন করিতেছি।

ভাস্করায় বিস্তারণ্য "কাং" পদের অর্থ করিয়াছেন,—

'বাঙ্মনসোরগোচরাং সুনিরূপস্বরূপাম্ ইত্যর্থঃ ব্রহ্মরূপাং বা।' যিনি বাক্য ও মনের অগোচর অর্থাৎ যাঁহার স্বরূপ সুবিজ্ঞেয়। যিনি ব্রহ্মরূপিণী।

পৃথ্বীধর 'কাং' পদের অর্থ করিয়াছেন,—'কাং বাণীং বাক্যরূপাম্'। যিনি বাণী বা বাক্যরূপিণী।

বিস্তারণ্য "আর্দ্রাং" পদের অর্থ করিয়াছেন,—

'ক্ষিরোদ-ক্ষীরোদধেঃ উৎপন্নত্বাৎ। আর্দ্রানন্দরূপাং-রূপরূপাং বা।' শ্রীদেবী ক্ষীরোদসাগর হইতে

উৎপন্না বলিয়া আর্দ্রা বা সিক্তদেহা। অথবা আর্দ্রা নক্ষত্রে উৎপন্না বলিয়া তিনি "আর্দ্রা" নামে অভিহিতা।" "আর্দ্রয়া রুদ্রঃ প্রথমান এতি" ইত্যাদি প্রয়োগ হেতু 'আর্দ্রা' শব্দের অর্থ রুদ্ররূপিণীও হইতে পারে।

পৃথ্বীধর "আর্দ্রাং" শব্দের অর্থ করিয়াছেন, 'শীতলগুণাং'। যিনি কোমলগুণবিশিষ্টা।

'শ্রীসূক্তের পঞ্চম মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

চন্দ্রাং প্রভাসাং যশসাং জ্বলন্তীং শ্রিয়ং
লোকে দেবজুষ্টামুদারাম্,
তাং পদ্মিনীমীং শরণমহং প্রপদ্যেঽলক্ষ্মী র্মে
নশ্যতাং ত্বাং বৃণে ॥'৫

অর্থাৎ—যিনি আনন্দদায়িনী ( চন্দ্রাং ), প্রকৃষ্ট জ্যোতিঃ-সম্পন্না, যিনি স্বীয় যশঃ প্রভাবে দীপ্যমানা, লোকমধ্যে দেবগণ কর্ত্তৃক সেবিতা ও উদার স্বভাবা আমি সেই পদ্মিনীর শরণ গ্রহণ করি, আমার অলক্ষ্মী নাশ হউক, ( হে শ্রীদেবি ! ) আমি তোমাকে বরণ করি।

বিদ্যারণ্যের মতে,—'পদ্মিনীং পদ্মলতারূপাং পদ্মাকারাং বা।' শ্রীদেবী পদ্মলতারূপা বা পদ্মাকারা বলিয়া 'পদ্মিনী' নামে অভিহিতা। পৃথ্বীধরের মতে, 'করধৃতকমলাং'। শ্রীদেবী স্বীয় করে (হস্তে) পদ্ম ধারণ করেন বলিয়া তাঁহার নাম 'পদ্মিনী'।

"পদ্মিনীম্ ঈং" এখানে "ঈং" শব্দের অর্থ কি ? টীকাকারগণ ইহার বিভিন্ন অর্থ করিয়াছেন—যথা (১) ঈমিতি নিপাতঃ অনর্থকঃ, (২) ঈকারবাচ্যাম্ ( বিদ্যারণ্য )। (৩) অস্ত স্ত্রী ঈ তাং বিষ্ণুসম্বন্ধীম্ ইত্যর্থঃ। (১) "ঈং" একটি অব্যয়, ইহার কোন অর্থ নাই, পাদপূরণার্থে ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে। (২) শ্রীদেবী ঈকার বাচ্যা। (৩) 'অ' শব্দে বিষ্ণুকে বুঝায়।

"আকারো বিষ্ণুরুদ্দিষ্ট ঈকার স্তু মহেশ্বরঃ।
মকারস্তু স্মৃতো ব্রহ্মা প্রণবস্তু ত্রয়াত্মকঃ ॥"

অর্থাৎ—অকার দ্বারা বিষ্ণুকে বুঝায়, ঈকার দ্বারা মহেশ্বর এবং মকার দ্বারা ব্রহ্মাকে বুঝায়। প্রণব ( ওঁ ) অকার, উকার এবং মকারাত্মক।

"ম" অর্থাৎ বিষ্ণুর পত্নী বলিয়া লক্ষ্মীর নাম "ঈ"।

চতুর্দ্দশ খিল্‌মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

আর্দ্রাং যঃ করিণীং যষ্টিং সুবর্ণাং হেমমালিনীম্।
সূর্য্যাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো ম আবহ ॥১৩

অর্থাৎ—যিনি রুক্মবর্ণা অথচ যষ্টিরূপা অর্থাৎ দণ্ডধারিণী, যিনি যষ্টিরূপা অর্থাৎ দণ্ডস্বরূপিণী, যিনি শোভনবর্ণা, স্বর্ণমালা-ভূষিতা, যিনি সূর্য্যবৎ প্রকাশমানা, যিনি স্বর্ণময়ী অর্থাৎ ধন-প্রাচুর্য্যরূপিণী, হে জাতবেদ ! সেই লক্ষ্মীদেবীকে আমার জন্য আবাহন কর।

এই মন্ত্রে 'যঃ করিণীং' স্থলে 'পুষ্করিণীং' এবং 'যষ্টিং' স্থলে 'ইষ্টিং' পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

'পুষ্করিণীং গজশুণ্ডাগ্রবর্ত্তীং বা পুষ্টিং পোষণকরীং' ( পৃথ্বীধর )। 'পুষ্কর' শব্দে হস্তীর শুণ্ডকে বুঝায়। দিগ্‌গজগণ শুণ্ডস্থিত কুম্ভদ্বারা লক্ষ্মীদেবীকে স্নান করাইতেছে, এইজন্য তিনি 'পুষ্করিণী' নামে অভিহিতা। অথবা 'পুষ্করিণী' শব্দ দ্বারা বুঝাইতেছে, তিনি পুষ্টি বা পোষণকারিণী। লক্ষ্মী 'ইষ্টি' বা যজ্ঞরূপা।

অগ্নিপুরাণে উক্ত হইয়াছে, চতুর্ব্বেদে চারিটি বিভিন্ন শ্রীসূক্ত আছে ;—

'শ্রীসূক্তং প্রতিবেদঞ্চ জ্ঞেয়ং লক্ষ্মীবিবর্দ্ধনম্।
হিরণ্যবর্ণাং হরিণীমৃচঃ পঞ্চদশ স্মৃতাঃ ॥
রথেষক্ষেষু যাজেতি চতস্রো যজুষি স্মৃতাঃ।
আবহন্তীং তথা নাম শ্রীসূক্তং সামবেদকে ॥
শ্রিয়ং ধাতর্দদাতি ত্বেতি প্রোক্তমাথর্ব্বণে তথা।
শ্রীসূক্তং যোজয়েদ্ ভক্ত্যা হুত্বা শ্রীস্তস্য বৈ ভবেৎ'॥
—( অগ্নিপুরাণ, ২৬৩।১—৩ )

অর্থাৎ—সকল বেদেই লক্ষ্মীর প্রীতির জন্য শ্রীসূক্ত দ্বারা ওতদ্বারা হোম করিবার বিধান আছে। "হিরণ্যবর্ণাং হরিণীম্" ইত্যাদি পঞ্চদশ মন্ত্র ঋগ্বেদোক্ত শ্রীসূক্ত। "রথেষক্ষেষু যাজ" প্রভৃতি চারিটি মন্ত্র যজুর্ব্বেদোক্ত শ্রীসূক্ত "আবহন্তীং" এবং "সান" এ মন্ত্রদ্বয়ই সামবেদীয় শ্রীসূক্ত। "শ্রিয়ং ধাতর্দদাতি মে" এই মন্ত্রটি 'অথর্ব্ববেদীয় শ্রীসূক্ত' বলিয়া অভিহিত।

যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীসূক্ত জপ অথবা শ্রীসূক্তে হোম করে, সে অচলা শ্রীলাভ করিয়া থাকে।

ঋগ্বেদীয় "সৌভাগ্যলক্ষ্মী" উপনিষদে শ্রীসূক্তের পঞ্চদশ ঋক্‌মন্ত্রের দ্বারা শ্রীদেবীর উপাসনা-বিধি বর্ণিত হইয়াছে। ভগবান্ আদি নারায়ণকে দেবগণ বলিলেন,—

"হে ভগবন্ নঃ কথয় সৌভাগ্যলক্ষ্মী বিদ্যাম্"।

হে ভগবন্! আপনি আমাদিগকে "সৌভাগ্যলক্ষ্মী বিদ্যার" উপদেশ করুন। তদুত্তরে ভগবান্ কহিলেন,—

"সর্বে দেবা যূয়ং সাবধান মনসো ভূত্বা শৃণুত। তুরীয়রূপাং তুরীয়াতীতাং সর্বোৎকটাং সর্বমন্ত্রাসনগত-পীঠোপপীঠ দেবতা-পরিবৃতাং চতুর্ভুজাং শ্রিয়ং হিরণ্যবর্ণামিতি পঞ্চদশর্চেতি ধ্যায়ত।"

অর্থাৎ—হে দেবগণ! তোমরা সাবধানচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর। এই শ্রীদেবী তুরীয় চৈতন্যরূপা ও তুরীয়াতীতা, ইনি সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্টা, সর্ব্ব মন্ত্র ও আসনগতা, পীঠদেবতা ও উপপীঠ দেবতাগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিতা, ইনি চতুর্ভুজা; শ্রীসূক্তের "হিরণ্যবর্ণাং" ইত্যাদি ১৫টি ঋক্‌মন্ত্র দ্বারা ইহার ধ্যান করিবে।

সৌভাগ্যলক্ষ্মী উপনিষদে শ্রীদেবীর এইরূপ ধ্যান বর্ণিত হইয়াছে,—

(১) 'অমল কমল সংস্থিতদ্যুরভঃপুঞ্জবর্ণা
করকমলধৃতেষ্টাভীতিযুগ্মাম্বুজা চ।
মণিমুকুট বিচিত্রালঙ্কৃতাঙ্গ প্রভোদ্ভাঃ
সকল ভুবনমাতা সন্ততং শ্রীঃ শ্রিয়ৈ নঃ॥

অর্থাৎ—যিনি অমল কমলোপরি সংস্থিতা পদ্ম পরাগ সমূহের ন্যায় বর্ণবিশিষ্টা (হরিদ্‌বর্ণা), যিনি চতুর্হস্তে বর অভয় ও কমলদ্বয় ধারণ করিতেছেন, যিনি মণিময় মুকুট ও বিচিত্র অলঙ্কারাদি দ্বারা সুশোভিতা, সেই সকল ভুবনমাতা শ্রীদেবী আমাদের শ্রীসাধনে সর্ব্বতোভাবে নিরতা হউন।

(২) 'কুমাকুমো বিলসদাতত-বরদ-করা তপ্তকার্তস্বরাভা,
তদ্রাদ্রাভেভ-যুগ্মধৃত কলশ-করদ্বন্দ্ব-মুক্তাম্বিরাদিচ্যমানা।
চক্রৌঘাবদ্ধ মৌলি-বিমলতর-দুকূলাতবল্লেপনাঢ্যা,
পদ্মাক্ষী পদ্মনাভোরসি-কৃতবসতিঃ
পদ্মগা শ্রীঃ শ্রিয়ৈ নঃ॥'

অর্থাৎ—যিনি চতুর্ভুজে পদ্মদ্বয়, অভয় ও বরমুদ্রা ধারণ করিতেছেন, যিনি তপ্তকাঞ্চনতুল্য প্রভাবিশিষ্টা, গুরুমেঘের ন্যায় হস্তিযুগল এক এক পার্শ্বে অবস্থান-পূর্ব্বক যাঁহার অভিষেক করিতেছে, যাঁহার কেশরাশি কুঙ্কুমলিপ্ত হইয়া মৌলিদেশে আবদ্ধ রহিয়াছে, যাঁহার পরিধানে শুভ্র কৌম বস্ত্র, যিনি রক্তবর্ণ আলেপন দ্বারা বিভূষিতা, যিনি পদ্মপলাশলোচনা, বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে অধিষ্ঠিতা এবং পদ্মোপরি সমাসীনা সেই শ্রীদেবী আমাদের শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত প্রসন্না হউন।

# তিব্বত ভারত সংস্কৃতি-সম্বন্ধ

( পূর্ব্বানুবৃত্তি )

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র কর, বি. এস্‌ সি

রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাস, সি. আই. ই অন্যতম বিশিষ্ট তিব্বত ভ্রমণকারী। চট্টগ্রামে ১৮ই জুলাই, ১৮৪৯ অব্দে বৈদ্যবংশে তাঁহার জন্ম। পঁচিশ বৎসর বয়সে দার্জিলিং ভুটিয়া বোর্ডিং স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে তিনি কর্মজীবন আরম্ভ করেন। তিব্বতী ভাষার শিক্ষকের সহিত শরচ্চন্দ্র ১৮৭৯ অব্দে দার্জিলিং প্রথমবার যান। দুই বর্ষ পরে তিনি আবার ঐ দেশ দর্শন করেন ও এককালে দুই বৎসর ( ১৮৮১-৮৩ ) তথায় অবস্থান করেন। বঙ্গ সরকারের অন্যতম সেক্রেটারি মেকাঞ্জির সঙ্গে তিনি ১৮৮৩ অব্দে সিকিমে ও পর বৎসর সিকিং গমন করেন। ১৮৮৭ অব্দে লণ্ডনের 'রয়াল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি' ইঁহাকে পুরস্কৃত করেন। এই সুধী-সমাজ ১৮৯৯ অব্দে শরচ্চন্দ্রের রচিত "তিব্বত-ভ্রমণ" ইংরাজীতে প্রকাশ করেন।

"He (Sarat chandra) also explored the Lhobrak ( Manas ) valley and again visited Lhasa A report of this work was prepared by Colonel, now Sir Thomas Holditch, and appeared in the "Report of the Exploration in Sikkim, Bhutan and Tibet from 1856-1886," which was published in 1889 by the Trigonometical Survey of India and is frequently quoted in the note with present narrative[১]."

শরচ্চন্দ্র রাসিয়ার সেণ্ট পিটার্সবার্গ ( বর্ত্তমানের নাম লেনিনগ্রাড—Leningrad) নগরে ইম্পিরিয়াল আর্কিওলজিক্যাল সোসাইটির সভ্য মনোনীত হইয়াছিলেন। 'লণ্ডন-টাইম্‌স' পত্রিকা সমসাময়িক এক সংখ্যায়, সিকিংস্থিত নিজস্ব প্রতিনিধি-লিখিত, এই সুযোগ্য বঙ্গসন্তানের সম্বন্ধে, প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিল[২]। তিব্বতে অবস্থানকালে শরচ্চন্দ্র তিব্বতী ভাষার চারিখানি মূল্যবান অভিধান সংগ্রহ করিয়া আনেন। ইহার মধ্যে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের একখণ্ড অপূর্ব তিব্বতী-সংস্কৃত অভিধানও ছিল। বহু বর্ষব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি সংস্কৃত প্রতিশব্দ সম্বলিত ১৩৪২ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এক বৃহৎ ইঙ্গ-তিব্বতীয় ভাষার অভিধান সঙ্কলন করেন। বাংলা সরকারের নির্দেশমতে সতীশচন্দ্র আচার্য ও দুইজন শ্বেতাঙ্গ পণ্ডিত ইহার পরিমার্জন সাধন করিলে ১৯০২ অব্দে তাহা প্রকাশিত হয়। ইহার নাম :—

"Tibetan English Dictionary with Sanskrit synonyms by S. C. Das, Rai Bahadur, C. I. E, revised and edited under the orders of the Government of Bengal by G. Sandberg and A. W. Heyde, 1902". তিনি আরও অনেক সুখপাঠ্য সুন্দর নিবন্ধ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের প্রায় অনেকগুলিই এখন দুষ্প্রাপ্য। যথা :—যোষিদ্ভাষা-বদান কল্পলতা (অনুবাদ গ্রন্থ), *Indian Pandits in the Land of Snow*, 1893, Narratives

১। "The Opening of Tibet—Perseval Landon—Introduction by Col. F. Younghusband p. 9.

১। Journey to Lhasa and Central Tibet—Sarat Chandra Das, C. I. E—Edited by the Hon. W. W. Rockhill, London, p X.

২। Indian Pandits in the Land of Snow—Sarat Chandra Das C. I. E, edited by Nabin Chandra Das, M. A, Calcutta, 1893—in the preparatory notes.

of a Journey to Lhasa, 1881-2, Calcutta 1885, Natratives of a Journey round Lake Yamdo-Palti and in Lhokha, Yarlung and Sakyé. 1882, Calcutta 1887, Journey to Lhasa and Central Tibet—edited by the Hon. W. W. Rockhill, 1902, Yig-Kur Nam Shag, 1901 ( a collection of letters, official and private, illustrating the different forms of correspondence received in Tibet ). A Brief Summary of Do Ka Zang, the Sutra of the Glorious Age—exhibited by the Hon. Sir Charles Elliot—published as a supplementary paper to the Journal of the Buddhist Zent Society of India etc. Darjeeling, 1895, Pag Sam Jon Zang ( History of the rise, progress and downfall of Buddhism in India by Sumpa Khan—Po Yeque pal Jor of Tibet in 1747 A. D. edited with a list of contents and analytical index in English by S. C. Das, Bon Gyal-Rub ( Succession of Bón Kings ).

তিব্বতী 'ডো কা জোঙ' ( অর্থাৎ স্বর্ণ যুগের সূত্র ) গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ইংরাজী অনুবাদও রায় বাহাদুর করিয়াছেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি অফ্ বেঙ্গল-এ এক অধিবেশনে মাননীয় স্যার চার্লস ইলিয়ট তাহা প্রদর্শন করেন। শরচ্চন্দ্র এই অনুবাদ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "আমি যখন এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে রক্ষিত তিব্বতী পুঁথি ইত্যাদি পর্যবেক্ষণে রত, সেই সময়ে অতি প্রাচীন ও জীর্ণদেহ একখণ্ড 'ডো কা জোঙ' পাই। ইহার পরিচয় প্রচ্ছদপটে এইরূপ দৃষ্ট হয়—'আর্য ভদ্র কল্পিকানাম মহাযান সূত্র'। ছাপা অস্পষ্ট। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে টাশীলাম্পোর নিকটবর্তী নার্থাঙের বৃহৎ মুদ্রণ সরকার আমি দেখিয়া আসিয়াছিলাম তখনই লক্ষ্য করিয়া আসি যে, কাঠের ব্লকগুলিতে খোদিত বর্ণাদি অত্যন্ত ক্ষয় হইয়া আসিয়াছিল। সুতরাং তাহাতে মুদ্রণ অস্পষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। কাঙ্গুরের অন্তর্গত ১০৮ খণ্ডের মধ্যে 'ডো কা জোঙ' অতি পবিত্র অংশরূপে পরিগণিত হয়। ইহার কারণ ইহাতে ভবিষ্যৎ ১০০৫ জন বুদ্ধের বিষয় আলোচিত হইয়াছে।"

"In examining the Tibetan manuscript and kylographs contained in the Asiatic Society Library,' I have found a very old manuscript volume of "Dokalzang".....The title page begins with two ornamental letters, called "Yig-go" or the auspicious head letters, followed by two perpendicular strokes meaning full points. Then in Tibetan character is written the following :—"Rgya-gar skad-du, Arya Bhadra Kalpikanama Mahayana Sutra."..... when I visited the Great Printing Establishment at Narthang, near Tashilhumpo in 1789, I found that the engraving on the wooden blocks of the Kahgywe has almost become worn out. Recent impressions from them must therefore be very indistinct. "Dokalzang" is considered holiest among the 108 volumes of the Kahgyur collection. ...There is a picture at each end of the tittle page [1]."

তিব্বতী ভাষার অনুবাদক হইয়া শরচ্চন্দ্র ১৯০২

১। A Brief Summary of Do ka Zang—The Sutra of the Glorious Age S. C. Das, C. I. E., exhibited by the Hon. Sir Charles Elliot at a meeting of the Asiatic Society of Bengal, 1895 ; p. 25.

খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। স্বীয় ভ্রমণে অর্জিত জ্ঞানে তিব্বতী ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব ও তিব্বত-ভারত সংশ্লিষ্ট প্রত্নতত্ত্বে তিনি বিশেষ পারঙ্গমী ছিলেন। প্রসিদ্ধ জাপানী পর্যটক একাই কাওয়াগুচিকে তিনি তিব্বতী ভাষা শিক্ষা দেন। এই বৌদ্ধ ভ্রমণ স্বরচিত "তিব্বতে তিন বৎসর" নামক ইংরাজী গ্রন্থে পুনঃপুনঃ শরচ্চন্দ্রের প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; তাহা হইতে তিব্বতে শরচ্চন্দ্রের ভ্রমণ বিষয়ে অনেক কথা জানা যায়। তিনিই বলিয়াছেন, "শরচ্চন্দ্র দাশ ইংরাজ সরকারের পদস্থ কর্মচারী। মাসিক বেতন ছয়শত টাকা। বাঙ্গালীদের মধ্যে তিনি বিশেষ গণ্যমান্য ব্যক্তি[২]।"

কাওয়াগুচির ভ্রমণের প্রায় বাইশ বৎসর আগে শরচ্চন্দ্র তিব্বত যান। তাঁহার ছদ্মবেশে ভ্রমণের কথা পরে যখন প্রকাশ পাইল, সংশ্লিষ্ট সকলেই তাহার জন্য শাস্তি পাইল।

জাপানী ভ্রমণ ও শরচ্চন্দ্র

জানীন্দ্রের সিকন দর্জেন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। আরও অনেক ব্যক্তিকে মৃত্যু বরণ করিতে হইয়াছিল। কাহারও কাহারও বা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়। তিব্বতের শিশুরা অবধি "বগির" নামের মত সে কাহিনী জানে। তাঁহার যথাযথ নাম হয়ত সেখানে অনেকে জানেনা, স্কুল বাবু বা স্কুল-মাষ্টার নামে সমধিক পরিচিত। শরচ্চন্দ্র অতি কৌশলে তিব্বত সরকারের ছাড়পত্র সংগ্রহ করিয়া ১৮৮১-২ অব্দে শিগচী অবধি গিয়া প্রায় দুইমাস থাকিয়া ফিরিয়া আসেন। ইংরাজ সরকারের প্রয়োজনে দ্বিতীয়বার একই উপায়ে তিনি তিব্বতে বিস্তৃত ভ্রমণ করেন। অতি গোপনে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া তিনি দেশে ফিরিলেন।

"……the suspicious monk, who posed to be a learned scholar, suddenly addressed me, saying that having been in India, I must have seen Sarat Chandra Das, who explored Tibet. …The monk then narrated how S. C. Das, twenty-two years ago, had cheated the Tibetan authorities, with a passport, how he robbed Tibet of her Buddhism, with which he returned to India; how disclosure of the affair, the greatest scholar and sage in Tibet, Lengchen Dorjechan, had been executed, not to mention many other priests and laymen who were put to death and many others whose property was confiscated[৩]."

"As I heard from a Tibetan, he conducted his mission with extreme caution, seldom venturing abroad in the daytime and when obliged to do so he took every care to avoid attracting the attention of natives. He spent most of his time in a room of a temple and there secretly carried out his investigation. In this way he stayed in Lhasa twenty days, then he went back to his sphere of work in other parts of Tibet and at last returned to Darjeeling after an absence of less than a year[৪]".

কর্মবীর শরচ্চন্দ্র দাশের অভিধানের ফলস্বরূপ

১। 'Three years in Tibet' by the Shramana Ekai Kawaguchi, 1909, p. 66। এই গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলায় "তিব্বত রাজ্যে তিন বৎসর" নামে অনুবাদিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল।

৩। 'Three Yers in Tibet' by the Shramana Ekai Kawaguchi, p. 223.

৪। Ibid p. 403.

প্রথম ইংরাজ সরকারের তিব্বত-সিকিম সীমান্ত নীতিও প্রভাবিত হইয়াছিল।

"Prior to the exploration of S. C. Das it was not uncommon sight, I have been told, to see a party of naked priests,.....proceeding towards Tibet. .....The exploration of S. C. Das, disguised as an oedinary Sikkimese Priest, and the frontier trouble that followed it, completely changed the attitude of Tibet towards India and the outer world and made it adopt a strict policy of seclusion. The publicity of the results of that exploration directed the attention of the Indian Government to the question of delimiting the boundary between Sikkim and its protectroate and Tibet ....a fort was built at a place that was beyond the legitimate boundary line of Tibet."[৪]

সরল প্রকৃতির তিব্বতীরা বিদেশীদিকে মানচিত্র ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে দেখিলে অত্যন্ত সন্দিহান হন।[৫]

শরচ্চন্দ্র তিব্বতে কতকগুলি অমূল্য তিব্বতী গ্রন্থের সন্ধান আনিয়াছেন :—(১) আচার্য শ্রীগুপ্ত প্রণীত কাব্যালঙ্কার, (২) চন্দ্র গোমী[৬] রচিত চন্দ্র ব্যাকরণ এবং (৩) আচার্য অমর সারস্বত ব্যাকরণ।

তিব্বতে গ্রন্থ সন্ধান

এখানে স্মরণ রাখা যাইতে পারে যে, যে প্রথম পুস্তক-রচয়িতা হওী হাজার বৎসরের অধিক পূর্বে জীবিত ছিলেন; তাঁহার পুস্তকের অনুবাদ কালই ছয়শত বছর আগে[৭]। ভারতের সহিত তিব্বতের সংস্কৃতিক সম্বন্ধের প্রাচীনতা ইহাতেই সূচিত হয়। শ্রমণ একাই কাওয়াগুচি সাক্যা মঠে বৃহৎ গ্রন্থাগারে বহু প্রয়োজনীয় বেশব গ্রন্থ দেখিয়া আসিয়াছেন—তাহা বহুলাংশে ভারত হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল।

"At the rear of this chamber there is another 60' ft high, 240' ft wide which is full of valuable collections of ancient Buddhist manuscripts, some written in gilded letters on dark blue-coloured papers and others in Sanskrit on the leaves of the fan palm tree ( Barassens flavelliornis ). Many of these Scriptures were brought all the way from India by the founder of the temple, Sakya Pandit and his successors who sent their preists to that country for the purpose[৮]".

শরচ্চন্দ্রের আর একটি উল্লেখযোগ্য কার্য—

Ibid ( purpage ) p. 576.

৪। "The greatest crime for a traveller is to draw maps, which is taken as a sure sign of being a spy....."—p. viii, vol I—Travels in Tartary, Thibet and China ( 1844-5-6 ) in 2 vols by M. Huc —translated into English by H. Hazlitt.

৭। "Chandragomin wrote a book on logic Known as Nyaa—Aiddhyaloka, the Tibetan translation of which is now available. His Tibetan name is Zla-wa-dge-bsnen." p 681, vol I-Hindu *Period—The History of Bengal*—R. C. Mojumder M. A. etc.

৮. Journey to Lhasa and Central Tibet—Sarat Chandra Das, C-I-E, 1902 page 112.

৯। 'Three Years in Tibet'—The Sramana Ekai Kawaguchi p. 242.

তিব্বতের পল্লী-গুরেহ্ ( যাম-ছো ) আকার, বিস্তৃতি ইত্যাদির তথ্য ১৮৮২ সালে তাঁহার দ্বারা সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ হইয়া শেষ হইয়াছিল। কাঞ্চনজঙ্ঘার উত্তর ও উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলের স্থানসমূহের যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তিনি আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন ইহার পূর্ব্বে সভ্যজগৎ এইসব অঞ্চলের বিষয় কিছুই জানিত না।

"The discovery by Sarat Chandra in 1882 of the true dimensions and shape of Lake Palli, seemed to Sir Alfred Croft so important that in June 1883, he despatched the Lama ( ligen-gyatso, ) a Tibetan from Sikkim and connected with the reigning family of that state, to cover the same ground in order to check off, verify and complete the survey of the Balen. This he successfully did, adding only to the latter's work a small portion to the south-east of the lake, and establishing great accuracy of previous survey."

( ক্রমশঃ )

---

# আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের প্রতি

**অনাদিনাথ দত্ত**

জ্ঞানের বিভিন্ন তীর্থে তপস্যায় থাকি নিমগন,
যে সিদ্ধি করেছো লাভ, সে সিদ্ধি যে অতি অতুলন।
মানবের মনীষার বহ্নিক তোমার মাঝারে
প্রাণময় গতি লয়ে প্রকাশিত আশ্চর্য্য আকারে।
হে সুধীসমাজ-গুরু! হে আচার্য্য, হে ব্রজেন্দ্রনাথ!
বিদ্যার যেসব ক্ষেত্রে করিয়াছ তুমি দৃষ্টিপাত,
সেথা হতে আনিয়াছ কত নব দুর্লভ সম্পদ
সমস্ত জাতির লেহে চিরগর্ব্ব গৌরব আস্পদ।
চিত্ত তব চিরমুক্ত সর্ব্ববিধ সঙ্কীর্ণতা হতে,
আজীবন একভাবে নিষ্ঠারত সুমহান ব্রতে।
সত্যেরে সমগ্রভাবে হেরিবারে আকুল হৃদয়ে
লভিলে প্রকৃতরূপে নির্বারিত তার পরিচয়ে।
সেই তব অবিশ্রান্ত সাধনায় হেরিয়াছ তুমি
দেশগত জাতিগত সব সীমা গণ্ডী অতিক্রমি',
শাশ্বত সত্যের রূপ জ্যোতির্ম্ময় উদ্ভিন্ন প্রকাশে
আনন্দে তাহার তত্ত্ব জ্ঞানলিপ্সু সবার সকাশে,
উদার প্রশান্ত চিত্তে ধীরভাবে অপূর্ব্ব বিনয়ে।
যাহারা তোমার কাছে আসিয়াছে শিক্ষাপ্রার্থী হয়ে
কাহারেও কোনদিন করেনি বিমুখ।
তব দ্বার—
সকলের তরে ছিল অবারিত মুক্ত অনিবার।
ধনী-দীন দ্বিজ-শূদ্র কোন ভেদ ছিলোনাকো তব
সবারে সমান স্নেহে দিয়েছো যে জ্ঞান নবনব।
নামযশ কীর্ত্তিখ্যাতি উদাসীন নির্জ্জন-নিবাসী
আপনাতে মগ্ন সদা আত্মভোলা। শুধুই প্রয়াসী—
হেরিবারে সেই সত্য যাহা দেশ কালের অতীত
তার ধ্যানে তাই তুমি অবিচল শান্ত সমাহিত।
শান্তসৌম্য সুগম্ভীর মূর্ত্তি তব নিয়ত নীরবে
জানাতো মহত্ত্ব তব তব পাশে সমাগত সবে।
দেশ-দেশান্তর হতে সুধী-জ্ঞানী-মনীষীর দল
তোমারে হেরিয়া তারা হয়ে গেছে বিস্ময়ে বিহ্বল।
জেনেছে অন্তরে মনে তুমি শুধু দার্শনিক নয়,
জ্ঞানের হিমাদ্রি তুমি,—রহিয়াছে তোমাতে সঞ্চয়—
অভ্রভেদী উচ্চতায় শত শত যোজন বিস্তারে
বিবিধ বিদ্যা ও জ্ঞান নানাভাবে বিবিধ প্রকারে।
ধন্য এই বঙ্গদেশ—যেথা তুমি নিয়েছো জনম
ধন্য সেই জাতি, যার মাঝে তুমি হে জ্ঞানীসত্তম।
এনেছো অমিত শ্রদ্ধা জগতের নানাদেশ হতে,
নবীন গৌরবে দীপ্ত বিশ্বমাঝে করেছো তাহতে।
তোমার জনম-দিনে নানাভাবে তব পুণ্যস্মৃতি
জাগায় অন্তরে আজ তবপ্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ স্তুতি।
হে বরেণ্য জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ আজ তাই তোমার উদ্দেশে
তোমারে প্রণাম করি অনুরাগে ভক্তির আবেশে।

---

যে বিদ্যাবিৎ মনীষী এবং বিশ্ববিশ্রুত দার্শনিক আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর তিনি ( ৭৮বি লাগপট উব রোড ) কলিকাতায় দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

# মন ও মানুষ

( পূর্বপ্রকাশিতের পর )

• স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

( স্মৃতি : তেতাল্লিশ )

স্বামিজী মহারাজের ( স্বামী অভেদানন্দ ) সঙ্গে আমাদের গুরু-শিষ্য-রহস্য সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা চলেছে। জিজ্ঞাসা করলাম : "মহারাজ, গুরু তো ইচ্ছা করলেই সকল দিক দিয়ে শিষ্যের কল্যাণ-সাধন করতে পারেন ?"

স্বামিজী মহারাজ—"সকল দিক দিয়ে বলতে তোমরা কি মনে করো যে টাকাকড়ি, মান-যশ—যাবতীয় ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে সঙ্গে পারমার্থিক কল্যাণও তিনি শিষ্যকে দান করেন ? তা কেন, ভগবানের কৃপালাভ মানে ভগবানের স্বরূপকে যিনি উপলব্ধি করেছেন তাঁর কাছে ভগবান ছাড়া ঐহিক সুখ-সম্পদ তো তুচ্ছ। চক্ষুষ্মান গুরু তাই শিষ্যের আসল শ্রেয়ঃ-লাভ আধ্যাত্মিক উন্নতির পথই খুলে দেন। তবে কি জানো—'ভগবান লাভ করবো' এই প্রবল ইচ্ছা শিষ্যের মধ্যেও থাকা চাই। *Where there is a demand, there is a supply* (পাবার আকাঙ্ক্ষা থাকলে সে আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়)। মনে একান্ত ইচ্ছা—আকুল-করা টান থাকা চাই। বীরের মতো চাইতে হয়, মাদাটে ভাবে নয়। রামপ্রসাদের কথা তো জানো ?—রামপ্রসাদ মা'র ( জগদীশ্বরীর ) কাছে কৃপা ভিক্ষা করেন নি, তিনি জোর ক'রে কৃপা আদায় করার জন্যে বলেছিলেন—'আর মা সাধন-সমরে, দেখি মা হারে কি পুত্র হারে'। করুণাময়ী জগদম্বার সঙ্গে—মহামায়ার সঙ্গে এরকম ভালোবাসার যুদ্ধই ঘোষণা করতে হয়। এ'যুদ্ধ আদর-আবদারের যুদ্ধ। আসল কথা হোল—সাধন-পথেও রোক্ থাকা চাই, উদ্যোম ও অধ্যবসায় চাই। পুরুষকার না থাকলে চলবে কেন ? নিজে কিছুই করবে না, পরমাগতিও আনবে না, নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে থাকবে তাতে কি হয় ? নিজের চেষ্টা চাই, আর সে চেষ্টার মধ্যে আন্তরিকতা থাকা চাই। চেষ্টাই তো সাধনা। মন-মুখ এক ক'রে চাইলেই তাঁর কৃপা পাওয়া যায়। তিনি তো দেবার জন্য সর্বদাই বসে আছেন, কিন্তু নেবার লোকেরই অভাব।

"কি জানো, গুরুশক্তিও শিষ্যে সংক্রমিত হয়—যদি অবশ্য শিষ্যের মধ্যে *receipient attitude* ( নেবার মতো ভাব ) থাকে। শিষ্যকে নেবার জন্য সর্বদাই তৈরী থাকতে হয়। গুরু ও ইষ্ট এক। ইষ্ট হচ্ছেন তোমার উপাস্য দেবতা—সাক্ষাৎ ভগবান। গুরুও তাই। গুরু মিডিয়াম্ ( medium—মাধ্যম বা মধ্যস্থ ), তাঁর মধ্য দিয়েই ইষ্টের কল্যাণময় রূপ প্রকাশিত হয়। তাই গুরু ও ইষ্টে কোন ভেদ নাই। তবে গুরুর কাছে *surrender* ( আত্ম-সমর্পণ ) করতে হয়। নিজের প্রয়োজনটী ষোলআনা বুঝে স্বার্থের জন্যে গুরুর কাছে চাইলে কি সত্যিকারের কিছু পাওয়া যায় ? সংসারে ষোলআনা ভোগও করব আর অবসর মতো ভগবানকেও চাইব—এ' কামনা ক'রে হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর একে বলতেন—ব্যবসায়ী বুদ্ধি। গুরু হচ্ছেন ভগবানের বৈঠকখানা। সকল স্বার্থবুদ্ধি জলাঞ্জলি দিয়ে তাই ভগবানেই মন-প্রাণ সমর্পণ করবে, ভগবান ছাড়া আর কিছুই চাইবে না, তবেই তোমার হৃদয় হবে ভগবানের বিলাসভূমি। তবেই ভক্ত-সাধক ভগবানের স্বরূপ-মহিমা উপলব্ধি করতে পারেন। গুরু শিষ্যকে এই উপলব্ধি করার পথে সাহায্য করেন মাত্র।"

আমরা সকলেই স্তব্ধ হ'য়ে শুনছি। আনন্দময় প্রসন্নোজ্জ্বল-মূর্তি স্বামিজী মহারাজ কখনো হাসিমুখে —কখনো বা গম্ভীরভাবে আমাদের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে গুরু-শিষ্যের রহস্য-কথা বিশ্লেষণ করছিলেন। হঠাৎ স্বামিজী মহারাজের সেবক এসে জানালেন—'এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান'। স্বামিজী মহারাজ বল্লেন—'আসতে বলো'। ভদ্রলোক এসে প্রণাম ক'রে এক দিকে বসতে স্বামিজী মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন—"মহাশয়ের কোথা থেকে আসা হচ্ছে?" ভদ্রলোক উত্তর দিলেন—"আজ্ঞে আমি ক'লকাতায়ই থাকি। আপনার নাম অনেক শুনেছি, আপনার লেখা দু'একখানা বইও পড়েছি। অনেকদিন থেকে ইচ্ছা ছিল আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। কিন্তু সংসারের কাজের চাপে সময় আর হোয়ে ওঠে নাই। তাই আজ একরকম জোর ক'রেই বেরিয়ে পড়লাম।"

"বেশ, বেশ। আমিও তো তাই একটু আগে এদের সব বলছিলাম—জোর ক'রে কিছু না করলে ম্যাদাটে ভাবে কি আর কিছু করা যায় জগতে? তা—মহাশয়ের কি করা হয়?"

"আজ্ঞে আমি দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক। লেখাপড়া নিয়েই থাকি। মাঝে মাঝে মনটা খারাপ হোলে দক্ষিণেশ্বর বা বেলুড়ে যাই। শান্তিও পাই।"

"শান্তি পাবেন বৈকি। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রত্যক্ষ লীলাস্থল দক্ষিণেশ্বর। শিক্ষকতা করেন, ছেলেদের জ্ঞান দান করেন—এর চেয়ে বড় কাজ কি আর হোতে পারে। তবে কি জানেন—ছেলেদের মধ্যে যাতে সত্যিকার জ্ঞানের উন্মেষ হয় সেটা করাই আসল কাজ। কেবলই বই মুখস্থ ক'রে পাস করা যেন পড়ার একমাত্র উদ্দেশ্য না হয়—অধ্যাপকদের ও স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটির কর্তৃপক্ষদের সে দিক দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

ভদ্রলোক উত্তর করলেন—"আজ্ঞে হ্যাঁ, এতো খুবই সত্যি কথা। ছাত্রদের মধ্যে একটা fixed ( নির্দিষ্ট ) লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকা দরকার। লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য বলতে আমি বলছি—সত্যিকারের চারিত্রিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন-গঠনের সুপরিস্ফুট ধারণা—সেটা ছাত্রদের মধ্যে থাকা উচিত। আর সঙ্গে সঙ্গে স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ও কর্তৃপক্ষরাও সে বিষয়ে সচেতন ও সচেষ্ট থাকবেন বৈকি। কিন্তু মহারাজ, আপনি তো জানেন—কর্তৃপক্ষ, অধ্যাপক ও ছাত্রদের মধ্যে সে ধারণার উন্মেষ খুব কমই আছে। কাজেই অধ্যাপন ও অধ্যাপনা সব-কিছুই হয় বটে, কিন্তু গতানুগতিক, *constructive* ( গঠনমূলক ) মোটেই নয়।"

স্বামিজী মহারাজ—"ঠিক কথাই বলেছেন। তবে ছাত্র-ছাত্রীদের ঘাড়ে বেশী দোষ চাপানোর পরিবর্তে আমি বরং অধ্যাপক ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির কর্তৃপক্ষদের ওপরই দোষ চাপানোর পক্ষপাতী। কেন জানেন? সিলেবাস্-নির্দিষ্ট বই-পত্র যা আছে তা তো পড়তে হবেই ডিগ্রি-কোর্স হিসাবে, কিন্তু তা ছাড়া আরো কতকগুলি বই নির্দিষ্ট থাকবে—যেগুলি তাঁদের চাক্ষুষ জীবন-গঠনের পক্ষে উপযোগী হবে। আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে, যাঁরা বই পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপকদের কর্তব্য হবে আরো কিছু বই পড়ানো—যেগুলি থেকে তারা তাদের ব্যবহারিক জীবনের খোরাক ও প্রেরণা পেতে পারে। এই বেশী-কিছু পড়ানোর জন্যে অধ্যাপকদের নিশ্চয়ই স্বাধীনতা থাকবে। তা ছাড়া বেশী-কিছু বলার স্বাধীনতারই বা অভাব কোথা বলুন। তবে যদি বলেন সময়ের অভাব, সীমাবদ্ধ ( *routined* ) সময় তার প্রতিবন্ধক, তাই ইচ্ছা থাকলেও নির্দিষ্ট লেকচার ( বক্তৃতা ) ছাড়া বেশী-কিছু অধ্যাপকেরা বলতে পারেন না, তাহলে আমার কথা হোল—এখানেই চাই স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটির কর্তৃপক্ষ ও পরিচালকদের সহযোগিতা। ফাঁকতাল বইয়ের ভার ছেলেমেয়েদের ঘাড়ে না চাপিয়ে অত্যাবশ্যক বইগুলি থাকবে তাদের ডিগ্রি কোর্সের জন্য সিলেবাসে

নির্দিষ্ট, আর কতকগুলি থাকবে এক্সট্রা-সিলেবাস ( তালিকা-বহির্ভূত ) বই, যেগুলি ছাত্রছাত্রীদের সত্যিকারের ব্যবহারিক জীবনের সহায়ক হবে। অধ্যাপকরা নিজেদের জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও আদর্শ দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের জীবনের ওপর আলোকপাত করবেন। আর এই শিক্ষা ও শিক্ষকতাই হবে স্থায়ী ও কার্যকরী।

দেখতে দেখতে এই আলাপ-আলোচনায় ভেতর দিয়ে আধঘণ্টারও বেশী কেটে গেল। এবার ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন বিদায় নেবার জন্য। স্বামিজী মহারাজ বল্লেন—"আচ্ছা, আবার তাহলে আসবেন সুযোগমতো একদিন, *standing invitation* ( স্থায়ী নিমন্ত্রণ ) আমার রইলো। ভদ্রলোক হাসিমুখে প্রণাম ক'রে বিদায় নিলেন।

স্বামিজী মহারাজ আমাদের দিকে চেয়ে তারপর বল্লেন—"ক্যামন, ভদ্রলোকটীকে বেশ অমায়িক ও মিষ্টভাষী ব'লে মনে হলো। কি জানো, আমার কথা হোল—দেশের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির আমূল একটা পরিবর্তন হওয়া উচিত। গতানুগতিকতার পরিবর্তে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে শিক্ষার ধারাকে আমাদের সংস্কার করতে হবে। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের গঠনোপযোগী হবে শিক্ষার আদর্শ, আর তাতেই সমাজ-চেতনার উদ্বোধন হবে। দেশের ছেলেমেয়েরাই তো আমাদের ভবিষ্যৎ সমাজের আশা ভরসা। তাদের ভেতর দিয়েই আসবে জাতীয় চরিত্র-গঠনের চেতনা। তারাই তো এই বর্তমান পঙ্গু সমাজের জীর্ণ শরীরে করবে নূতন প্রাণের সঞ্চার।"

( ক্রমশঃ )

---

# সংশয়

অধ্যাপক শ্রীসুবোধরঞ্জন রায়, এম, এ

হারাই হারাই আপনারে এই ভয়
নিতি মনে আনে শত ভীরু সংশয়।
মনেরে আমার কে যেন আড়ালে রাখে
কোন মায়াজালে তোমার মুরতি ঢাকে
সব আলো মোর নিভে যায় বারেবারে
হৃদয় আমার নিমেষেই তমোময়।
আপনারে আমি বাহির-ভুবন থেকে
রেখেছিনু দূরে শুধু আপনার করি,
কঠিন আঘাতে সবহারা হয়ে শেষে,
অন্ধ হৃদয় ওঠে হাহাকারে ভরি'
সুবাকার মাঝে যবে আমি লভি ঠাঁই,
নয়ন সমুখে কোন বাধা নাই,
আপনারে আমি চিনি নবনব রূপে,
মোরে নিয়ে একি খেলা তব লীলাময় ?

# শ্রীশ্রীশ্যামা-রহস্য

স্বামী দুর্গানন্দ

যিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' 'সচ্চিদানন্দ'স্বরূপ, অথবা 'সত্যংজ্ঞানমনন্তং' যাঁহার 'স্বরূপ লক্ষণ'—সেই নিষ্কল-নিরুপাধিক-নির্গুণ-ব্রহ্মে সৃষ্টি-নাই, কিন্তু শ্রুতিতে 'তটস্থ'-লক্ষণান্বিত সকল—বা সোপাধিক বা সগুণ-ব্রহ্মে সৃষ্টির বর্ণনা যথেষ্টই রহিয়াছে। যথা :—

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্", অর্থাৎ—হে সৌম্য, উৎপত্তির পূর্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সৎ-স্বরূপ ছিল। "তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি" অর্থাৎ সেই পূর্বোক্ত সৎ-ব্রহ্ম ইক্ষণ বা দর্শন করিলেন,—( ইচ্ছা বা আলোচনা করিলেন ) আমি একা আছি, বহু হইব ( প্রজা সৃষ্টি করিব )। এই সংকল্প কার্যে পরিণত হইল, তিনি একে একে ভৌতিক তত্ত্বনিচয় সৃষ্টি করিলেন, এবং সেই তত্ত্বরূপী দেবতাদের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম-রূপে আপনাকে বিশেষ বিশেষ আকৃতিতে জীব ও অজীবরূপে বিভক্ত করিলেন। ইহা-ছান্দোগ্য উপনিষদে "শ্বেতকেতু-আরুণি" উপাখ্যানে আছে।

"অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়তঃ। তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। [ তৈত্তিরীয় উঃ, ব্রহ্ম ] অর্থাৎ—অনভিব্যক্ত নাম-রূপে এই জগৎ, উৎপত্তির পূর্বে ব্রহ্মস্বরূপেই ছিল। সেই 'অসৎ' শব্দবাচ্য ব্রহ্ম হইতেই এই জগৎ নাম-রূপে অভিব্যক্ত হইল। তিনি নিজেই নিজেকে ব্যক্ত করিলেন, ইত্যাদি। ঐ তৈত্তিরীয় উপনিষদেই ভৃগুবল্লীতে আছে—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি।" অর্থাৎ—যাহা হইতে ব্রহ্মাদি ভূতবর্গ উৎপন্ন হয়, যাহাদ্বারা জীবিত থাকে এবং বিনাশ কালে যাহাতে বিলীন হয়, তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর; তাহাই ব্রহ্ম।

আমরা দেখিতে পাই, ব্রহ্মের এই সোপাধিক ভাবটি আমাদের পরিস্ফুট হইয়াছে। নিরুপাধিক নির্গুণ-ব্রহ্মের ধারণা এমনকি চিন্তাও সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। 'তত্ত্ব' তাই শ্রুতিসঙ্গত উপায়ে তত্ত্বজিজ্ঞাসু সাধকগণের জন্য প্রতীকাদি সহায়ে উপাসনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। উপাসনার বহু প্রতীক, তন্মধ্যে শ্যামার বিচিত্র প্রতীকটিতে আমাদের পূর্বোক্ত আলোচ্য ভাবটি বিশেষ ভাবে রূপায়িত হইয়াছে। নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মের এটি যেন খুব নিকটতম অবস্থা—তাই ইহাকে 'তটস্থ' বা নিকটস্থ বলা হয়। ইহা যেন চরম সত্যকে ধরিয়া পরম সত্যকে পাওয়া বা উপলব্ধি করা। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়—"লীলাকে ধরিয়া নিত্যে পৌঁছান'। যিনি নিত্য, লীলায় তিনিই জীব ও জগৎ রূপে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন। যিনি এক এবং অদ্বিতীয়, তিনিই যেন পুরুষ-প্রকৃতি রূপে দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছেন। শ্যামারূপটি যেন সেই সচ্চিদানন্দ পুরুষের অচিন্ত্য স্বরূপ-শক্তির একটি অভিন্ন ও অভিনব আনন্দ-ঘন প্রতিমূর্তি। ইনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী।

সাংখ্যদর্শনে যে পুরুষ-প্রকৃতির কথা আছে, তাহাতে পুরুষকে চেতন ও প্রকৃতিকে অচেতন, বলা হইয়াছে। পুরুষ চেতন হইলেও তিনি নিষ্ক্রিয় এবং প্রকৃতি জড়া, এজন্য উভয়ের কেহই একাকী সৃষ্টি করিতে পারেন না; কিন্তু সাংখ্যকার বলেন,—পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতিতে সৃষ্টি-সামর্থ্য সম্ভব হয়। গীতাতেও আছে "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্" ( ১৮।৬১ ) অর্থাৎ—আমার অধিষ্ঠানবশতঃ প্রকৃতি চরাচর জগৎ প্রসব করেন। যাহা হউক, সাংখ্যকার প্রকৃতির হস্তেই

সৃষ্টিকর্তৃত্ব অর্পণ করিয়াছেন এবং পুরুষকে নির্লিপ্ত রাখিয়াছেন।

তন্ত্রে কিন্তু, ত্রিগুণাত্মিকা-মায়া বা প্রকৃতিকে একেবারে জড়া ও মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করা হয় নাই; বরং চৈতন্যময়ী বলিয়া উহার সন্ধান নিরূপণ করিয়া যাহাতে চরম সত্যের সন্ধান মেলে তাহারই উপায় নির্দেশ করা হইয়াছে। গীতায় [ ৭ ৪-৫ ] ভগবানের অষ্টধা অপরা প্রকৃতি এবং একটি পরা প্রকৃতির বর্ণনা আছে। সেই অপরা প্রকৃতিই ক্ষেত্র ( দেহ ) এবং যেটি পরাপ্রকৃতি তাহাকেই 'ক্ষেত্রজ্ঞ' বলা হইয়াছে। অর্থাৎ একটি দেহ এবং অন্যটি জীব বা চেতন পুরুষ আত্মা। প্রকৃতি বা মায়া পুরুষ হইতে পৃথক নয়, উহা পুরুষেরই স্বরূপ-শক্তি, সুতরাং শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন। সেই মহাশক্তির আরাধনা করিলে শক্তিমানেরও আরাধনা হইয়া থাকে। তন্ত্রে সৃষ্টির রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া, প্রকারান্তরে সেই গূঢ় সাধনতত্ত্বই প্রদর্শন করা হইয়াছে।

কার্য দেখিয়াই কারণের অনুমান হয় এবং কার্যে কারণই অনুস্যূত থাকে; সুতরাং কারণ ও কার্য অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তির ন্যায় নিত্য সম্বন্ধযুক্ত। ইহাদের উভয়ের কেহই কাহাকেও ছাড়িয়া থাকেনা বা কাহাকেও পৃথক করা যায় না। সেই রূপ পুরুষ ও প্রকৃতিকে কখন পৃথক বলা যায় না। প্রকাশের তারতম্যে কখন শক্তির কখন নিষ্ক্রিয় এইমাত্র ভেদ। ক্রিয়া দেখিয়া শক্তির এবং জ্ঞানের সত্তার দেখিয়া চৈতন্যের ধারণা হইয়া থাকে। যখন বলা হয় চিৎশক্তি তখন বুঝিতে হইবে যে, চৈতন্যের সহিত শক্তির মিলিত সম্বন্ধ বর্তমান। তন্ত্রে ইহাকেই 'শিবশক্তির মিলন' অথবা 'পুরুষ প্রকৃতির মিলন' বলে। এই যুগল-মিলনেই সৃষ্টির কল্পনা। মুণ্ডকোপনিষদে আছে, "শিবশক্তি সমাযোগাৎ আদ্যন্তে সৃষ্টি কল্পনা।" শক্তিই জগজ্জননী এবং শিবই জগৎপিতা। যদিও ব্রহ্ম নির্বিকার, তথাপি তাঁহার চিন্তা যোগমায়া বা তাঁহার পরা-অপরা দুইটি শক্তির প্রভাবে সমস্ত বিশ্বের সৃষ্টি প্রলয় সংঘটিত হইতেছে। তন্ত্রে পরম ব্রহ্মকে 'অকুল' আর তাঁহার ব্যক্ত শক্তিকে 'কুল' বলা হইয়াছে। অথবা যেখানে গুণের প্রকাশ নাই, সেই নির্গুণ ব্রহ্মকে 'নিষ্কল-শিব' এবং যেখানে শক্তির প্রকাশ আছে সেই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বা মায়াকে বা চিৎ-শক্তিকে 'সকল-শিব' বলা হয়। 'কল' বা 'কলা' অর্থে অংশ। যিনি পূর্ণ তিনিই যেন সৃষ্টিতে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া বিচিত্র জগৎ রচনা করিয়া অনন্ত শক্তির মহিমা প্রদর্শন করিতেছেন। নির্গুণ ব্রহ্ম বা নিষ্কল-শিবের ধারণা সাধারণ জীবের পক্ষে দুঃসাধ্য, কিন্তু এই সগুণ-ব্রহ্ম বা স-কল-শিব অথবা শিব ও শক্তির যুগল উপাসনা সাধকের পক্ষে সহজ সাধ্য। তন্ত্রে সেই সহজ সাধ্য উপায় গুলিই অধিকারী বিশেষে নির্দেশ করা হইয়াছে।

যিনি ত্রিগুণাতীত তিনিই যেন তাঁহার স্বরূপ শক্তির প্রভাবে সগুণ ব্রহ্ম, সকল-শিব, সর্বজ্ঞ, ও সৃষ্টিকর্তা-ঈশ্বর। যিনি মায়াতীত ও মায়ার আশ্রয় ছিলেন, সৃষ্টিকালে তিনিই যেন মায়াকে আশ্রয় করিয়া স্রষ্টা বা ঈশ্বর হন। নির্গুণ ব্রহ্মে সৃষ্টি নাই, সগুণেই সৃষ্টির কল্পনা। সৃষ্টি, ঈশ্বরের লীলা-বিলাস। নিত্যে যিনি এক ও অদ্বিতীয়, লীলায় তিনি বহুরূপ ধারণ করেন। যোগমায়াই ঈশ্বরের লীলা-বিলাসিনী স্বরূপ-শক্তি। শক্তির প্রকাশ না হইলে শক্তিমানের লীলা হয় না। যে শক্তি অব্যক্ত ও নিষ্ক্রিয়াবস্থায় ( potential state ) ব্রহ্মের সহিত একীভূতা ( undifferentiated condition ) ছিলেন, তিনিই যেন সৃষ্টির ইচ্ছায় বিশক্তিতা হইয়া, পুরুষ ও প্রকৃতিরূপে যুগল মূর্তিতে ( twin aspects ) বিরাজ করেন। যেমন একটি কলাইয়ের অন্তর্গত দুইটি বিকাশোন্মুখ দানা একই অঙ্কুরে সন্নিবেশিত থাকে সেইরূপ। ইহাও প্রায় অব্যক্ত অবস্থাই বটে, অভিব্যক্তির ঠিক পূর্বাবস্থা। যাক হইবার জন্য যেন এইমাত্র চেষ্টা বা স্পন্দন আরম্ভ হইতেছে। ইহার পরই কলায়ের আবরণটি বিদীর্ণ হয় ও অঙ্কুরটি বাহির

হয়। অর্থাৎ—প্রথমটি শক্তির অব্যক্তাবস্থা, দ্বিতীয়টি অস্ফুটাবস্থা, এবং তৃতীয়টি ব্যক্তাবস্থা। এখানেই কল্প আরম্ভ হয়, বা কল্পনা, কার্য্যে পরিণত হয়। কলাযের ক্ষুদ্র চারাটি ক্রমে ক্রমে তাহার নিজের স্বরূপটি প্রকাশ করিতে থাকে।

যিনি ব্রহ্মের স্বরূপ শক্তি বা 'যোগমায়া' সৃষ্টি-লীলায় তিনিই 'মহামায়া'। মহাপ্রলয়ে জগৎ যখন কারণ-সলিলে বিলীন হয়, কারণরূপিণী যোগমায়া তখন যোগনিদ্রারূপে জীব-জগৎ এমন কি মহাবিষ্ণুকে পর্য্যন্ত তন্দ্রাচ্ছন্ন করিয়া রাখেন। ইহাই জীবজগতের বীজাবস্থা, নিষ্ক্রিয়াবস্থার অবস্থান। কল্পারম্ভে আবার বিক্ষোভিতা সৃজনোন্মুখী শক্তির স্পন্দন বা বৃত্তি শুরু হইলে, জীব ও জগতের নিদ্রাভঙ্গ হয়, সৃষ্টিকার্য্য চলিতে থাকে। 'যথাপূর্বমকল্পয়ৎ' অর্থাৎ পুনরায় পূর্ব-পূর্ব কল্পের নিয়মেই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়াদি হইয়া থাকে। একবার কার্য, কারণে বিলীন হয়, আবার কারণই কার্যরূপে পরিণত হয়।

এতক্ষণ আমরা যে ব্রহ্মশক্তি-যোগমায়ার কথা আলোচনা করিতেছিলাম, তন্ত্রে তিনিই আদ্যাশক্তি শ্যামা—চিদ্‌বিলাসিনী 'মহামায়া'। সৃষ্টি লীলায় তাঁহার অনন্তরূপে অনন্ত শক্তির স্ফুরণ হয়। যে শক্তির প্রভাবে তিনি জীবকে সংসার-পাশ হইতে মুক্ত করেন, তাহা 'বিদ্যা-মায়া,' আর যে শক্তির প্রভাবে জীবকে সংসারে আবদ্ধ করেন, তাহাকে বলা হয় 'অবিদ্যা-মায়া'। এই অবিদ্যা-মায়া তাঁহার আবরণী শক্তিবলে সত্যকে আবৃত এবং বিক্ষেপ শক্তির বলে অসত্যকে সত্যবৎ প্রতিভাত করিয়া জীবকে বিমুগ্ধ করে, বিবেকহীন করে। এই মহামায়াই সমুদয় বিদ্যা এবং শক্তিসমূহের ঈশ্বরী, তাই ইনি দশমহাবিদ্যার মধ্যে প্রধানা। কালী মূর্ত্তিতেই তাঁহার সকল ভাব ও সর্বশক্তির একত্র সমাবেশ, একই সঙ্গে তিনি ভয়ঙ্করী ও ক্ষেমঙ্করী।

যিনি 'কালী' তাঁহাকেই 'শ্যামা' বলা হইয়া থাকে। এই কালীর অনন্তভাব ও অনন্ত মূর্ত্তি; তন্মধ্যে সাধকগণ তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল যেগুলি, সেইগুলির উপাসনা করিয়া থাকেন। যাঁহারা ভোগবাসনা চরিতার্থে উপাসনা করেন না, সেই ত্যাগী সন্ন্যাসিগণ 'শ্যামা-কালীর' উপাসক, কিন্তু যাঁহারা গৃহস্থ অথচ মোক্ষাভিলাষী তাঁহারা 'দক্ষিণাকালী'কেই উপাসনা করিয়া থাকেন। দক্ষিণা-কালীর যে ধ্যান আছে, সৃষ্টি ও প্রলয়াদি ব্যাপারে তাহার ভাব-গাম্ভীর্য চিন্তার বিষয়। এখানে সংক্ষেপে তাহার সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

যিনি শুদ্ধ ব্রহ্ম, তিনি যেন শবরূপে নিশ্চেষ্ট হইয়া শায়িত আছেন। ধ্যানে তাঁহাকে 'মহাদেব' বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। তিনি নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়া থাকিলেও তাঁহার যে সৃষ্টির ইচ্ছা তাহাই যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূতা হইয়াছেন; ইনিই 'শ্যামা-কালী' ব্রহ্মশক্তি। এই শিব ও শক্তি উভয়েই কিন্তু উভয়ের প্রতি ঈক্ষণ বা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছেন—যেন সৃষ্টির জন্য উন্মুখ হইয়াছেন। এই মহাদেবের উপরে আরও একটি শায়িত শিবমূর্ত্তি, যাঁহাকে মহাকাল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি যেন মহাদেবেরই সক্রিয় প্রতিরূপ। এখন হরহৃদি-বিলাসিনী—শ্যামা সুন্দরী বিপরীতরতা-সক্তা হইয়া প্রসন্ন বদনে স্মিত-হাসি হাসিয়া বিশ্ব প্রসব করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাই কল্পের সূচনা। বিশ্বজননী শ্যামা তাঁহার স্বভাবসুলভ জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া-শক্তির প্রভাবে নিরন্তর এবং কল্পে কল্পে এই ভাবেই তাঁহার সৃষ্টি সংহার লীলা লইয়া আনন্দ করেন। কখন প্রকট লীলা, কখন অপ্রকট বা অব্যক্তলীলা।

প্রলয়কালে সৃষ্টির যে বীজগুলি তিনি কুড়াইয়া রাখেন, তাহাই বীজস্বরূপ বর্ণমালা—এবং তাহাই মুণ্ডমালারূপে তিনি গলায় ধারণ করেন; খড়্গ-মুদ্রায় সাধকের আসুরিক বৃত্তির সংহার ও অসদ্ভাবাপন্ন মনকে মুণ্ডমুদ্রায় ছিন্ন ও সরল করিয়া জীবকে সৎপথে পরিচালিত করেন। ঐরূপ অভয়-মুদ্রায় জীবের মৃত্যুভয় হরণ ও বর-মুদ্রায় জীবকে সংসার-বন্ধন হইতে তিনি মুক্ত

করিয়া লেন। রজোগুণসম্ভূত কামাদিরিপু রুধিরক্রপে কল্পিত। করালবদনা সেই রুধির পান করিয়া অট্টহাস্য সহকারে নৃত্য করিতেছেন। দুর্জয় ভোগ-বাসনা নিরোধ করিয়া সাধককে নিষ্কাম সাধনার উপযোগী করিবার অভিপ্রায়ে, জিহ্বাকে সংযত করিয়া দন্ত দ্বারা চাপিয়া রাখা হইয়াছে। জীবের শুভাশুভ কর্মফলই নরকর-কটি বেড়া এবং কর্ণদ্বয়ে দোদুল্যমান শব শিশু দুইটি জীবের কারণ-শরীর ও সূক্ষ্ম-শরীর জন্মমৃত্যুর চির অবসান সূচিত করে। দেশ ও কালের অতীতা, তাই তিনি দিগম্বরী। নিষ্কাম ও মুক্তিপ্রয়াসী ভক্তগণের এই রক্ষিণী-কালীই আরাধ্যা। দেবীর অঙ্গভূষণগুলি যেমন নিষ্কাম সাধকের যুক্তি সূচনা করে, তেমনি এগুলি যাহাদের ভোগাবসান হয় নাই, সংস্কাররূপে সঞ্চিত থাকিয়া তাহাদের পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে। প্রলয়ে সকল রূপের অবসান কালরূপে, তাই তিনি শ্যামাঙ্গিনী।

আদ্যাশক্তি জগজ্জননী কালী কত প্রকারের বিভিন্নরূপে কতভাবে বিবিধ লীলা করিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সর্বাঙ্গীন আধ্যাত্মিক অনুভূতির আলোকে শ্রীশ্রীকালীর সেই লীলা-বৈচিত্র্য প্রকাশিত হইয়াছে। এসম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেব তাই বলিয়াছেন :—

"আদ্যাশক্তি লীলাময়ী; তিনি নানাভাবে লীলা করছেন। তিনিই মহাকালী, নিত্যকালীর, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী,। মহাকালী, নিত্যকালী, কথা তন্ত্রে আছে। যখন সৃষ্টি হয় নাই, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, পৃথিবী ছিল না, নিবিড় আঁধার; তখন কেবল মা নিরাকারা মহাকালী—মহাকালের সঙ্গে বিরাজ করছিলেন।

শ্যামা কালীর অনেকটা কোমল ভাব—বরাভয়-দায়িনী। গৃহস্থ বাড়ীতে তাঁরই পূজা হয়। যখন মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি হয় তখন রক্ষাকালী পূজা ক'রতে হয়। শ্মশান-কালীর সংহার-মূর্তি। শব, শিবা, ডাকিনী যোগিনী মধ্যে শ্মশানের উপর থাকেন। রুধিরধারা, গলায় মুণ্ডমালা, কটিতে নরহস্তের কোমর-বন্ধ। যখন জগৎ নাশ হয়, মহাপ্রলয় হয়, তখন মা সৃষ্টির বীজ সকল কুড়িয়ে রাখেন। ... সৃষ্টির পর আদ্যাশক্তি জগতের ভিতরেই থাকেন। জগৎ প্রসব করেন, আবার জগতের মধ্যে থাকেন। ... মাকড়সা যেমন নিজের ভিতর থেকে জাল বা'র করে, আবার নিজে সেই জালের উপর থাকে। ঈশ্বর জগতের আধার আধেয় দুই।"

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার কোনও জিজ্ঞাসু ভক্তকে শ্যামা-রূপটি কেন হইল—তাহা বুঝাইবার জন্য বলিয়া-ছিলেন, "দূর থেকে শ্যামা। কাছে গেলে কোন রঙই নাই। দীঘির জল দূর থেকে কাল দেখায়, নিয়ে গিয়ে হাতে ক'রে তুলে দেখ কোন রঙ নাই। আকাশ দূর থেকে নীলবর্ণ। কাছের আকাশ তাখো কোন রঙ নাই। ঈশ্বরের যত কাছে যাবে, ততই যা বোধ হবে তাঁর নাম, রূপ নাই। পেছিয়ে একটু দূরে এলে আবার 'আমার শ্যামা মা' যেন ঘাস ফুলের হয়। ... একজন ভক্ত প্রতিমার গলায় সৈতা কেন, জিজ্ঞাসা করায় পূজক উত্তর দিয়েছিল, তাই তুমিই চিনেছ। আমি এখনও চিনিতে পারি নাই—তিনি পুরুষ কি প্রকৃতি। তাই সৈতে পরিয়েছি।

"যিনি শ্যামা, তিনিই ব্রহ্ম। যাঁরই রূপ তিনিই অরূপ। যিনি সগুণ তিনিই নির্গুণ। ব্রহ্মশক্তি—শক্তিব্রহ্ম—অভেদ। সচ্চিদানন্দময় আর সচ্চিদা-নন্দময়ী।"

পুনরায় ভক্তটি জিজ্ঞাসা করিলেন,—'যোগমায়া' কেন বলে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—"যোগমায়া অর্থাৎ—পুরুষ-প্রকৃতির যোগ। যা কিছু দেখছ সবই পুরুষ প্রকৃতির যোগ, শিবকালীর মূর্তি; শিবের উপর কালী দাঁড়িয়ে আছেন। শিব শব হ'য়ে প'ড়ে আছেন। কালী শিবের দিকে চেয়ে আছেন। এই সমস্তই পুরুষ প্রকৃতির যোগ। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, তাই শিব শব হ'য়ে আছেন। পুরুষের যোগে প্রকৃতি সমস্ত কাজ করছেন। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন। রাধাকৃষ্ণ যুগল মূর্তিরও মানে ঐ। ঐ যোগের জন্য বঙ্কিম ভাব। সেই যোগ দেখবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণের নাকে মুক্তা, শ্রীমতীর নাকে নীল পাথর। শ্রীমতীর গৌর বরণ মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল। শ্রীকৃষ্ণের শ্যামবর্ণ, তাই শ্রীমতীর নীল পাথর। আবার শ্রীকৃষ্ণ পীতবসন ও শ্রীমতী নীল বসন পরেছেন। আদ্যাশক্তিই এই জীব জগৎ ও চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন।"

# কেদার বদরী হোতে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

মন্দির-চূড়া থেকে তুষার পড়ছে গ'লে
বিগ্রহের বোধ হয় এতক্ষণে ঘুম ভাঙলো,
হিমেলি বাতাস :
কুয়াশার আলতেয় ক'রে নামছে বুঝি
অস্পষ্ট প্রভাতী আলো।
ঘুরে যেন শঙ্খ-ঘণ্টা বাজছে,
সারিবদ্ধ যাত্রী দল চলেছে অসংখ্য
সংসারের সহস্র বন্ধন ছিঁড়ে।

দেব-প্রয়াগের কোল থেকে এসেছি চ'লে
অনেকখানি,
যেখানে সীতা-উদ্ধারের জন্যে আসন পেতে
রামচন্দ্র করেছে তপস্যা
ভাগবতী প্রীতির উদ্দেশে।
স্নানের শঙ্খধ্বনি
এলো কানে।
চলেছি পর্ব্বতমালাবৃত পথ ধ'রে
ঊর্দ্ধপানে।
এঁকে বেঁকে নেমে চলেছে গাঙ্গেয় স্রোত
কোন্ উৎস থেকে উৎসারিত
দেব-বায়ু অভিলাষ।
সংশয় কুণ্ঠিত পদক্ষেপে
প্রাণের বিকাশ।
আদিত্যবর্ণ মহাপুরুষকে যারা দেখেছে
তাদের দণ্ডধরার সুর
শুনছি কেবলই।

হিমাদ্রির গিরিশৃঙ্গ দেখলাম
জীবনের সবজয়াশ্রয়ে।
মায়াগর্ভে কিম্বা মহামায়া গর্ভে আত্ম-অধিষ্ঠান—
জানি। শুধু তদবস্থার অতিব্যক্তির পথ
আবিষ্কারে আছি যে।

শঙ্কর! তোমার নৈষ্ঠিক উত্তরীয় যে উড়ছে'
পাষাণের বুক ভাঙা স্বর্ণাক্ষরা অদ্রিতক্ষায়,
তোমারে প্রণাম।

আত্মতত্ত্ব বিদ্যাতত্ত্ব শিবতত্ত্ব
অন্তর্ক্রান্তা নান্দ্যক্রান্তা বিষ্ণুক্রান্তা সীমার পরিধি
দ্বৈতাদ্বৈত ভাব অভাব এখানে হয়েছে এক
তত্ত্বের অপূর্ব্ব দিব্য বাদুঘরে
ওষধি ও বনস্পতি মাঝে।
শুদ্ধজগতের চেতন বর্ণের স্তরে যে বৈষম্য
তার তারতম্য বোধ আমারও হোলো এখানে।

তুষার শুভ্র মুখের বুকে
কী আনন্দে সুখে
নগ্ন দেহে বসে আছে ঐ মৌন সন্ন্যাসী!
মহারণ্য ভেদ ক'রে বহু পথ হেঁটে এলো একা
কতকাল আগে—তা কে জানে!
নির্জ্জন গুহায় করেছে কি উপলব্ধি
তুরীয় চৈতন্য?

কথা নাই, কথার অতীত ভাব,
লোক-যাত্রা নাই, আছে মহাপ্রস্থানের বার্ত্তা।
প্রস্তর কঠিন প্রাণ রাখিলাম পদপ্রান্ত 'পরে
প্রণাম প্রার্থনালয়ে কহিলাম—
'কুলালের মত কে আমারে রেখেছে পৃথক!
নিরন্তর ধ্যানমৌন যোগীশ্বর প্রসন্ন দৃষ্টিতে :
কানে এলো অবাক্ নারী পরমেশ-শক্তি।
এ বিশ্ব ঈশ্বরের চির-চঞ্চল প্রকাশের জ্যোতি
বৈচিত্র্যের মাঝে এনে দেয় ঐক্য প্রেমের পুলকে
অব্যাক্তভূমায়।
লীলায়িত ছন্দে নৃত্য করে নটরাজ
সৃষ্টি প্রলয়ের উর্ম্মিমুখর নৃত্যের কোথা শেষ?
কে যেন ঘুমায়!

বাসনার প্রেরণায় জড়ের বিকাশ
সত্য ধারণায় উহার বিশ্বোত্তীর্ণ ধ্যানের পূর্ণভাষ।
জ্ঞাত জ্ঞেয় মিলনের প্রয়াগ সঙ্গমে এসে
করিলাম মহাতীর্থ স্নান।
চৈতন্যের একাকার অব্যক্তধ্বনির রণরোলে
আনিলাম মানব মহান্।
তত্ত্বের প্রত্যক্ষ অনুভূত আনন্দের পরিক্রমা
আমারে ডাকছে ঐ অভ্রভেদী কৈলাস-শিখর

কেদার-বদরী হোতে হর-পার্ব্বতীর-পূর্ণরূপ
দেখিলাম। জীবন অঞ্জলি দিতে বড় সাধ হয়;
সে সৌভাগ্য হোলো কি দুর্লভ?
মানস সরোবরের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত
বারেবারে করেছে কে?
দাঁড়াও ওঙ্কারনাথ আবার সময় হোলো
চোখে অশ্রু ঝরছে যে!

---

# মহা-জাগতিক রশ্মি

আল্-কামাল-আবদুল ওহাব

**( Cosmic Ray )**

বিংশ শতাব্দীর সব বিজ্ঞানীদের সেরা বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনষ্টাইন আক্ষেপ ক'রে বলেছিলেন—"আজকের দুনিয়ার সমস্ত উদ্যম যেন আণবিক বোমার গবেষণাতেই শেষ হতে চলেছে। আপেক্ষিক তত্ত্ব থেকে দেশ-কাল-পরিব্যাপ্তির ( Space time continuum ) সাহায্যে বিশ্ব-প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটনের যে অপরিসীম সম্ভাবনা রয়েছে সেদিকটাকে চূড়ান্ত মাত্রায় অবহেলা করা হচ্ছে।

বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীর আক্ষেপ-বাণীতে সম্বিত ফিরে উঠলো বিজ্ঞানীদের নজর সাময়িক ভাবে সরিয়ে নিলেও পরমাণু রহস্য-সন্ধানের আর একদিক বিজ্ঞানীদের সামনে বিপুল সম্ভাবনার ক্ষেত্র প্রসারিত করে দিয়েছে—সে হচ্ছে মহাজাগতিক রশ্মি বা কস্‌মিক-রে (Cosmic Ray)।

মহাজাগতিক রশ্মির গবেষণা এখন প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে বলা যেতে পারে। কিন্তু চেষ্টার কসুর নেই মোটেই। বহু জটিল আর ব্যয়সাধ্য যন্ত্রপাতি ব্যবহার ক'রে দুরূহ সাধনার পর জানতে পারা গেছে যে, মহাজাগতিক রশ্মি আসলে কোন রশ্মিই নয়—এগুলো হচ্ছে প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন বিদ্যুৎ-কণিকা। বাইরের মহাবিশ্ব থেকে আমাদের পৃথিবীর ওপরে সহস্র ধারায় চলেছে এদের বর্ষণ। সমস্ত আকাশ জুড়ে এদের সঞ্চরণ—জলে, স্থলে আকাশে সকল পদার্থে এদের প্রবেশ অপ্রতিহত। প্রতি সেকেণ্ডে বিশ থেকে পঁচিশটা মহাজাগতিক রশ্মির কণা মানুষের মাথা থেকে পা পর্যন্ত ফুঁড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, যদিও আমরা তা টের পাইনে।

বর্ত্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে মহাজাগতিক রশ্মির অস্তিত্বের খবর জানা যায়। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এর আসল রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে সুরু করেছেন মাত্র গত কয়েক বছর থেকে।

বেশ কিছুদিন আগের কথা। ফরাসী বিজ্ঞানী হেনরী বেকেরেল তাঁর টেবিলের দেরাজের মধ্যে রেখেছিলেন কাগজে-মোড়া কতকগুলো ফটো-গ্রাফীর প্লেট আর তার পাশেই ছিল কতকগুলো ইউরেনিয়াম-ধাতু-ঘটিত ঘটিত লবণের টুকরো। একদিন হঠাৎ প্লেটগুলো ডেভেলাপ করতে গিয়ে

বেরেবেল দেখলেন—প্লেটগুলোর গায়ে কালো কালো দাগ প'ড়ে গেছে। বহু গবেষণার পরে জানা গেল—ইউরেনিয়াম থেকে কোন অদৃশ্য রশ্মি বেরিয়েই প্লেটের উপরে ওরকম দাগ ফেলেছে। আর এই তেজ এসেছে ইউরেনিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রীন ( nucleus ) থেকে। বিজ্ঞানীরা ইউরেনিয়ামের এই বিশেষ ধর্মের নাম দিলেন 'তেজস্ক্রিয়তা' বা 'Radio-activity'।

বিদ্যুৎ-সন্ধানীর এবার নজর পড়লো এই নবাবিষ্কৃত সত্যটির দিকে। গবেষণার পর গবেষণা চললো অবিরামভাবে।

বিদ্যুৎ নিয়ে গবেষণা করতে হলে প্রথমে চাই বিদ্যুৎবিহীন অবস্থা। বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায় বিজ্ঞানীরা কাজ আরম্ভ করলেন। গবেষণার প্রথমেই বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করলেন যে, কোন এক অজানা বিদ্যুৎ-শক্তির তাদের বিদ্যুতাবেশ মাপার যন্ত্রে (electroscope) প্রবেশ ক'রে কেবলি গোলযোগ ঘটাচ্ছে। এবার তাঁরা বিদ্যুতাবেশ মাপার যন্ত্রের চারিপার্শ্বে বেশ ভালো ক'রে পুরু সীসের পাত দিয়ে মুড়ে দিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য! তখনও সেই অদৃশ্য বিদ্যুৎশক্তি বিজ্ঞানীদের অলক্ষ্যে প্রবেশ করছে বিদ্যুতাবেশ মাপার যন্ত্রে। এবার তাঁরা সন্দেহ করলেন—এমন এক অদৃশ্য রশ্মির সন্ধান মিলছে যা পুরু সীসের পাতও সহজে ভেদ করে যেতে পারে। কিন্তু এই নূতন রশ্মির মূল উৎস কোথায়? বিজ্ঞানীরা তো ভেবেই সারা! পরীক্ষা করবার জন্য বিজ্ঞানীরা বেলুনে চ'ড়ে আকাশে উঠলেন। যতই ওপরে ওঠা যায় দেখা গেলো, এই রশ্মির তীব্রতা কমছে না বরং বেড়েই চলেছে। তা হলে বোঝা গেলো এই রশ্মি পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে আসছে না—আসছে বাইরের আকাশ থেকে। বিজ্ঞানীরা আরো লক্ষ্য করলেন যে, পৃথিবীর ওপর এই রশ্মির বর্ষণ সর্বস্থানে সমভাবে হচ্ছে। সুতরাং সূর্য বা কোন বিশেষ নক্ষত্র থেকে রশ্মিটার জন্ম হ'তে পারে না। আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বছর আগে সব বিজ্ঞানীরা একমত হলেন যে, বাইরের অনন্ত মহাবিশ্বে ( Cosmos ) এই রশ্মির জন্ম, তাই এই নব-আবিষ্কৃত রশ্মির নাম দেওয়া হলো 'কস্‌মিক রে' (Cosmic ray) বা 'মহাজাগতিক রশ্মি'।

ওপরের দিকে বায়ুমণ্ডলের চাপ বা পরিমাণ যত কমে আসে মহাজাগতিক রশ্মির তীব্রতাও ততই বাড়তে থাকে। মাটি থেকে ৬ মাইল ওপরে উঠে দেখা গেছে যে, সেখানে এই রশ্মির তীব্রতা ভূপৃষ্ঠ থেকে ত্রিশ গুণ বেশী। বিজ্ঞানীদের সন্ধানী মন তবু থামলো না, তাঁরা উঠলেন পাহাড়ের চূড়োয়, ডুবুরীর বেশে নামলেন সমুদ্রের তলদেশে। সমুদ্রের অতল তলদেশে এই রশ্মির সন্ধান পাওয়া গেল। দু'হাজার ফিট মাটির নীচেও বিজ্ঞানীরা পেলেন এর হদিস। অবশ্য তেজ সেখানে খুবই সামান্য।

কিন্তু এই প্রচণ্ড শক্তিশালী কণার উৎস কোথায়? পৃথিবীর সারা বিজ্ঞানীরা দিনরাত ভেবে হয়রান হচ্ছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কোন হদিসই মেলেনি।

বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা এই রশ্মির উৎস সম্বন্ধে জানাচ্ছেন বিভিন্ন মতবাদ। বিজ্ঞানী মিলিকান বলেন, "সম্ভবতঃ বাইরের অনন্ত মহাবিশ্বে বস্তুর ধ্বংস থেকেই এই আলোক-রশ্মির উৎপত্তি।" মহাজাগতিক রশ্মির ওপর গবেষণা করে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী পি এম এস ব্ল্যাকেট বলেন, "নতুন কোনো তিন জাতের নক্ষত্র নয়, হয়তো আইনষ্টাইনের দেশ-কালের ( Space-time ) বিশেষ রকমের প্রকৃতির সাথে মহাজাগতিক রশ্মির উৎপত্তির কোনো সম্পর্ক রয়েছে।"

আগেই বলা হয়েছে, মহাজাগতিক রশ্মিতে আছে বিদ্যুৎ-কণিকা। সুতরাং পৃথিবীর যে অংশে চুম্বক-শক্তি বেশী, তার টানে আপন পথ থেকে কিঞ্চিৎ সরে গিয়ে এই রশ্মি সেখানে জমা হ'তে থাকে। এই কারণেই বিদ্যুৎ-কণিকা মেরুদেশে জমা হয়ে সৃষ্টি হয়েছে মেরুপ্রভা বা মেরুজ্যোতি ( অরোরা বোরিয়ালিস )।

পরীক্ষা ক'রে জানা গেছে, বায়ুমণ্ডলে যেসব

মহাজাগতিক রশ্মি এসে আঘাত করে, তা-হলো উদ্‌জান ( Hydrogen ) গ্যাসের পরমাণু কেন্দ্রীন প্রোটন ( Proton ) কণিকা। এরা বায়ুমণ্ডলের পরমাণু-কেন্দ্রে এতো প্রচণ্ডবেগে আঘাত করে যে, এইসব পরমাণু কেন্দ্র ভেঙে চুরমার হয়ে নতুন নতুন কণিকার আকারে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে, যার ফলে সৃষ্টি হয় মেসন বা মেসোট্রন ( Mesotron ) নামে ক্ষণস্থায়ী আর এক শ্রেণীর নতুন কণিকা—যেমন বিপুল তার ভেদ তেমনি প্রচণ্ড এর ভেদ করবার ক্ষমতা।

মহাজাগতিক রশ্মির রহস্য সন্ধানের জন্য বিজ্ঞানীরা মেঘ-প্রকোষ্ঠ নামক একপ্রকার যন্ত্র তৈরী করেছেন—যার ভিতর দিয়ে কোনো বিদ্যুৎ-কণিকা গেলে তার পথের ওপর ছোট্ট ছোট্ট জমাট কুয়াসার ছাপ রেখে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তার আলোক-চিত্রও নিয়ে যায় সেখানে। এ ছাড়াও বিজ্ঞানীরা আর এক প্রকারের বিশেষ ধরণের ফটোগ্রাফীর প্লেট তৈরী করছেন যার ওপরে মেসন ( Meson )-কণা এসে তীব্র আঘাত করলেই প্লেটের মসলার ( Medicine ) পরমাণু কেন্দ্রীনগুলো ভেঙে টুকরো টুকরো হ'য়ে ছিটকে পড়তে থাকে—যার ফলে মেসন-কণাগুলো প্লেটের ওপর কালো কালো দাগ রেখে যায়। এই আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞানীদের কাজের অনেকখানি সুবিধাই হয়েছে বলতে হবে।

মহাজাগতিক রশ্মির রহস্য যত দুরূহ, বিজ্ঞানীরা ততই আগ্রহী মন নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন—এই রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্যে। সারা দুনিয়া এই রহস্যের মূল উৎসের জন্য বিজ্ঞানীদের মুখ চেয়ে ব'সে আছে। একদিন না একদিন এ রহস্যের মূল-সূত্র উদ্‌ঘাটিত হবেই—আর সেদিনও বোধ হয় খুব সুদূর নয়।

লোকসেবক—বৃহস্পতিবার ২৩ আশ্বিন ১৩৬২ ( ১০ই অক্টোবর ১৯৫৫ ) তারিখের সংখ্যা হইতে পুনর্মুদ্রিত।

---

# শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজীর স্মৃতিপূজা

**শ্রীঅমৃতলাল চক্রবর্ত্তী**

জীবন-সায়াহ্নে পেছনে-ফেলে-আসা দিনগুলির কথাই মনে পড়িতেছে। যে জীবন-পথ পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছি তাহার দুঃখকষ্ট বেদনার স্মৃতিই শুধু মনকে আজ মথিত করে না, পাথেয়ের সৌভাগ্যও মনকে দোলা দেয়। কর্ম্ম-জীবনে অনেক মনীষী, মহাত্মা ও বিশ্ববন্দিত পুরুষের সান্নিধ্য ও উপদেশ লাভে কৃতার্থ হইয়াছি—বিড়ম্বিত জীবনে তাহাই শতদলের মত প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছিল। দীর্ঘদিনেও উহার মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য লুপ্ত হয় নাই। আজ সেই স্মৃতি-উদ্যানের অপরিম্লান কুসুম চয়ন করিয়াই এক আলোক-সামান্য মনস্বীর উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিব।

প্রায় চৌত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে পূজনীয় স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ ঢাকা-ময়মনসিংহে শুভাগমন করিয়াছিলেন। আমেরিকা হইতে দেশবন্ধুর মত ভারতে মহাপ্রয়াণের দুই বৎসরের মধ্যেই ইহা সংঘটিত হইয়াছিল। সেসময়ে ঢাকায় তাঁহার সঙ্গে ছিলেন স্বামী শিবানন্দ ( মহাপুরুষ মহারাজ )। স্বামী অভেদানন্দজী ও মহাপুরুষ মহারাজ ১৯২২ সনের ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যেই ঢাকা সহরে উপনীত হইয়াছিলেন। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে তাঁহারা বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ স্বামী অভেদানন্দজী ঢাকার বিভিন্ন সভায় যেসব বক্তৃতা ও আলোচনা করিয়া

ছিলেন তাহাতে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের বিশিষ্ট সমাজে একটা বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। ময়মনসিংহে স্বামীজিদিগকে আনাইবার জন্য জন-সাধারণের মধ্যে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয় এবং জনসাধারণের প্রতিনিধিরূপে শ্রীহীরেন্দ্র নাথ সেন কয়েকজন তরুণ কর্ম্মীর সহিত স্বামীজীদের সহিত এই সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য ঢাকায় চলিয়া যান। হীরেন্দ্রবাবু একজন শিক্ষাব্রতী হইলেও তিনি ময়মনসিংহে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোগী ও বিশিষ্ট জনসেবক ছিলেন। হীরেন্দ্র বাবু ঢাকায় অবস্থান করিয়া স্বামীজিদের সঙ্গ করেন এবং প্রত্যেক সভাসমিতি ও আলোচনায় যোগদান করিতে থাকেন। স্বামী অভেদানন্দ ঢাকায় যে সকল বক্তৃতা ও আলোচনা করিতেছিলেন, হীরেন্দ্রবাবু উহার নোট রাখিয়াছিলেন। আমরা ঢাকা-নারায়ণগঞ্জে স্বামীজিদের পরিভ্রমণ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ তাঁহার নোটেই পাইয়াছিলাম। দুঃখের বিষয় হীরেন্দ্রবাবুর পরলোকগমনের পর এই নোটখানার আর উদ্ধার সাধন করিতে পারি নাই। আমাদের বিশ্বাস স্বামী অভেদানন্দের প্রদত্ত বক্তৃতা ও উপদেশের সারমর্ম্ম এই নোটের সাহায্যে সঙ্কলিত হইতে পারিত।

স্বামী শিবানন্দের সহিত স্বামী অভেদানন্দজী ১৯২২ সনের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে ময়মনসিংহে আগমন করেন। ময়মনসিংহে তাঁহারা উপনীত হইলে এক বিরাট জনতা শোভা যাত্রা করিয়া তাঁহাদিগকে মহুয়ার অমিদারের বাসা বাড়ীতে লইয়া যায়। এই প্রাসাদসদৃশ গৃহই স্বামীজিদের ও তাঁহাদের সহগামীদের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ইউরোপ ও আমেরিকা প্রত্যাগত সুপ্রসিদ্ধ স্বামী অভেদানন্দজীকে দেখিবার জন্য শিক্ষিত ব্যক্তিবৃন্দ ও রামকৃষ্ণ-অনুরাগীদের মধ্যে একটা বিপুল উৎসাহের সঞ্চার হয়। স্বামী অভেদানন্দজী স্থানীয় দুর্গাবাড়ীতে এক জনবহুল সভায় ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল—"আমার আমেরিকার অভিজ্ঞতা"। প্রায় দুই ঘণ্টা ব্যাপী বক্তৃতার সার সঙ্কলন আমরা করিয়াছিলাম—তৎকালীন সাপ্তাহিক 'চারুমিহির' পত্রিকায় উহার কতকাংশ প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দেশবিভাগজনিত দুঃখময় পরিস্থিতিতে এখন উহার উদ্ধার সাধন অসম্ভব। একমাত্র স্মৃতির উপর নির্ভর করা ব্যতীত অন্য উপায় আর নাই। স্বামী অভেদানন্দ তিনি তাঁহার বক্তৃতায় আমেরিকার শিক্ষানীতি, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ভারতবর্ষের প্রতি আমেরিকাবাসী বিভিন্ন সমাজের অনুরাগ প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া তিনি যুব-বাংলাকে উদ্দেশ করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা যেমন অগ্নিগর্ভ তেমনি শিক্ষাপ্রদ। স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা যাঁহারা স্বকর্ণে শুনিয়াছিলেন এমন শিক্ষিত শ্রোতারও সেই সভায় অভাব ছিল না। তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, স্বামী অভেদানন্দজীর কণ্ঠে যেন স্বামীজির বাণীই প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। গৈরিক বস্ত্রে বিমণ্ডিত দীর্ঘদেহ, মুখে প্রতিভার দীপ্তি, বচনভঙ্গী সাবলীল অথচ তেজোদীপ্ত মনে হইতেছিল, প্রত্যেকটী কথা যেন অন্তরের অন্তস্থল হইতে উৎসারিত।

স্বামী অভেদানন্দের বক্তৃতায় যুবক ও ছাত্রমহলে একটা আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা দলে দলে ব্যক্তিগতভাবে স্বামীজির দর্শন-লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। স্বামীজি যে কয়দিন ময়মনসিংহে ছিলেন সেই কয়দিন তাঁহার বাসভবনে যেন একটা জনতার প্রবাহ বহিয়াছিল। উকিল, মোক্তার অধ্যাপক-শিক্ষক, সমাজসেবী, কংগ্রেসকর্ম্মী প্রত্যেকেই স্বামীজিকে পরিবেষ্টন করিয়া প্রশ্নোত্তরে নিজ নিজ প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া লইতে ব্যস্ত। এমনকি মুসলমান সমাজের নেতৃস্থানীয় কেহ কেহ স্বামী অভেদানন্দকে সম্বর্দ্ধন করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যিনিই যে শ্রেণীর লোক তাঁহার সহিত সেইভাবেই আলোচনায় স্বামীজি প্রবৃত্ত হইতেন।

ঐরূপ লোকচরিত্রজ্ঞান ও বহুমুখী প্রতিভা সেকালে খুব অল্পই দেখা গিয়াছিল।

একদিনের আলোচ্য বিষয় আমার স্পষ্টই মনে মনে আছে। স্থানীয় আনন্দমোহন কলেজের অধ্যক্ষ রায় বাহাদুর ডাঃ ব্রজেশ্বর ঘোষ, সহকারী অধ্যক্ষ বঙ্গশ্রী রসায়ন শাস্ত্রবিদ্ ডাঃ পদ মুখোপাধ্যায়, দার্শনিক অধ্যাপক শ্রীযুত অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (বর্তমানে গোরক্ষপুর কলেজের অধ্যক্ষ) প্রমুখ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌গণ স্বামী অভেদানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা বিশেষভাবে স্বামিজীর সহিত শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। স্বামিজী আমেরিকা ও ইউরোপের শিক্ষাপদ্ধতি উল্লেখ করিয়া এই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি এমন স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দেন যে, উপস্থিত সকলেই যেন একটা নূতন আলোকের সন্ধান পাইয়াছিলেন। তিনি গঠনমূলক শিক্ষাপদ্ধতির উপর অধিক জোর দিয়া বলেন—"যে শিক্ষায় শিক্ষার্থীর শরীর মন ও বুদ্ধির সম্যক পরিস্ফূর্তি হয় তাহাই আদর্শ শিক্ষা।"

ইহার কিছু কাল পরে জনৈক শঙ্করতীর্থ উপাধি ভূষিতপণ্ডিত স্বামীজির সহিত শাস্ত্রব্যাখ্যা ও উহার অর্থসঙ্কট সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। স্বামীজি প্রসঙ্গক্রমে পণ্ডিত মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া বলেন—"যুগোপযোগী শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে হইবে, যে ব্যাখ্যা যে যুগের পরিপন্থী তাহা কখনও গ্রাহ্য হইবে না। কাজেই সমাজ ও জাতি যাহাতে গতির পথে অগ্রসর হইতে পারে সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই শাস্ত্রবাক্যের অর্থ করা প্রয়োজন। স্থিতিশীলতা প্রাণধর্মের পরিচায়ক নহে, সমাজের গতি-পথ রুদ্ধ হইলেই ইহার প্রাণশক্তি আর থাকে না। এখন পৃথিবী বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের দিকে অগ্রসর। কাজেই আমরা যদি কুসংস্কৃতা ও অন্ধ আচারের আশ্রয় লইয়াই নিশ্চিন্ত থাকি, তবে আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার—আমরা পৃথিবীর অন্য সমস্ত জাতি হইতে পিছনেই পড়িয়া থাকিব। আপনারা শাস্ত্রব্যবসায়ী, যদি সমাজ ও দেশের প্রকৃত হিতকামী হইয়া থাকেন, তবে যুগ-ধর্মকে বিস্মৃত হইবেন না—সঙ্কীর্ণতা ও শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা হইতে প্রতিনিবৃত্ত থাকুন—নূতন যুগে শাস্ত্রের নূতন ব্যাখ্যা ও তাহা না হইলে কালের তরঙ্গে প্রাচীনতার আবর্জনা ভাসিয়া যাইবে।" পণ্ডিত মহাশয় স্বামীজির এই প্রগতিমুখী তেজব্যঞ্জক কথায় আর প্রত্যুত্তর দিতে অগ্রসর হন নাই।

প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীব রায়বাহাদুর নারদাচরণ ঘোষ ও রায়বাহাদুর শশধর ঘোষ স্বামী অভেদানন্দের সহিত দীর্ঘ সময় সমাজ-উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা ছিলেন স্থানীয় 'হিন্দু-হিতসাধিনী সভা'র প্রধান উদ্যোক্তা। স্বামী অভেদানন্দ তাঁহাদের সহিত সমাজের উন্নতি সম্পর্কে অনেকক্ষণ ধরিয়া আলোচনা করেন। অস্পৃশ্যতা ও যুক্তিহীন আচার লইয়া এই আলোচনা ক্রমে পুষ্ট হইতে থাকে। যখন তিনি শুনলেন 'হিন্দুহিতসাধিনী সভা'র কার্যক্রমে অনাচরণীয়তা-বর্জন ( তখনো 'অস্পৃশ্যতা' শব্দটী সেইরূপ প্রচলিত হয় নাই ), তদুপরি হিন্দুসমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলন এবং তাহাদের বিপদে আপদে সাহায্য দান ও সহানুভূতি প্রকাশ ইহার কার্য-পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত, তখন তিনি ইহাতে সন্তোষ লাভ করিয়া উদ্যোক্তাদের হিন্দুসমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার জন্য নির্দেশ দেন। স্বামিজী বলিলেন—"অনুন্নত হিন্দু সমাজে বিবিধ সমস্যা—উহাদের অর্থনৈতিক কাঠামো সুদৃঢ় করার আবশ্যকতাও খুব বেশী। অবশ্য রাষ্ট্রশক্তি এই বিষয়ে আপনাদের সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবেন এই আশ্বাস পোষণ করিতে আমি আপনাদের বলিতেছি না। তবুও আত্মশক্তি জাগাইয়া তোলা অত্যন্ত প্রয়োজন। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের দুর্গতির আর শেষ নাই। তাহারা শিক্ষিত সমাজ হইতে ক্রমশই দূরে চলিয়া যাইতেছে। শিক্ষিত সমাজের প্রভাব প্রতিপত্তি তাহাদের মধ্যে নাই বলিয়াই তাহাদের মধ্যে অজ্ঞানতা ও যুক্তিহীন আচারের প্রাবল্য এত বেশী। যতদিন পর্যন্ত দরিদ্র-নারায়ণ-জ্ঞানে এদেশের লোকেরা তাই সমস্ত অবজ্ঞাত

জনসেবার প্রতি সেবার ভাব না জাগ্রত হইবে—ততদিন জন-উন্নয়ন কার্য্য আন্তরিক হইবে না। ঠাকুর (রামকৃষ্ণদেব) ও এই শিক্ষাই দিয়াছেন।" স্বামীজির উপদেশে 'হিন্দুহিতসাধিনী-সভা'র কার্য্যে একটা নূতন প্রাণের স্পন্দন দেখা গিয়াছিল। জনকল্যাণব্রতী মহারাজা শশিকান্ত আচার্য্য ও জমিদারশ্রীযুত ব্রজেন্দ্র নারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী (মুক্তাগাছা) এই সভার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। স্বামী অভেদানন্দজীর ব্যক্তিত্ব, বক্তৃতা, বহুদর্শিতা ও প্রতিভাদীপ্ত বচন-ভঙ্গিমা রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি ময়মনসিংহবাসীর গভীর শ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়াছিল। ফলে জমিদার, তালুকদার, শিক্ষিত ব্যক্তি ও যুবক মহলে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ ও রামকৃষ্ণ-আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য সে সময়ে ঐ অঞ্চলে প্রবল চেষ্টা হয়। বর্ত্তমান আশ্রম-ভবন ও মন্দির প্রতিষ্ঠা সেই চেষ্টারই ফল। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অনুরাগী যুবকগণ কল্যাণব্রতী শ্রীহীরেন্দ্রনাথ সেনের নেতৃত্বে পরিচালিত হইয়া সেখানে আশ্রম ও মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ময়মনসিংহের ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের অর্থদান ও সহানুভূতি ইহার পশ্চাতে ছিল। আর ইহার মূলে ছিল ধর্ম্মানুরাগী ত্যাগব্রতী যুবক কর্ম্মীদের অক্লান্ত শ্রম ও একান্ত সাধনা। আমরা দেখিয়াছি যুবকগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া রাজমিস্ত্রীদের সঙ্গে শ্রমিকের গৌরবাত্মক কাজে লিপ্ত ছিলেন। তাঁহাদের এই প্রেরণার উৎসমূল যে স্বামী অভেদানন্দজীর তেজগর্ভ বাণী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে ময়মনসিংহের রামকৃষ্ণ মঠ শুধু নিজস্ব ভূমিতে বৃহৎ অট্টালিকায় প্রতিষ্ঠিত নহে, ইহার সংলগ্ন ছাত্রাবাস, লাইব্রেরী ও বক্তৃতাগৃহ এবং ময়মনসিংহের অভ্যাগতদের জন্য বাসগৃহও আছে। ইহার ব্যয়ভার জনসাধারণই সম্পূর্ণ বহন করিয়াছে, কিন্তু ইহার মূলে যে স্বামী অভেদানন্দজীর অনুপ্রেরণা ছিল তাহা নিঃসন্দেহ।

অভেদানন্দজীর সহিত অনেক কংগ্রেসকর্ম্মী ও নেতৃস্থানীয়গণও সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ইহাদের প্রথম জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের ভাব-মূর্ত্তিই ছিল আদর্শ। স্বামীজির ভাব-মূর্ত্তি ইহাদিগকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। স্বদেশকে বৈদেশিক শাসনমুক্ত করিতে ইহারা যে ত্যাগ ও দুঃখবরণ করিয়াছিলেন স্বামীজির গ্রন্থাবলী ও বক্তৃতাই ছিল ইহার উৎস। এইজন্য কংগ্রেস-পন্থীগণও রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ ও কর্ম্মপদ্ধতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবান্। ময়মনসিংহে রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠায় ইহাদের সাহচর্য্য ও সহানুভূতি অনস্বীকার্য্য। স্বামী অভেদানন্দজীকে ইহাদের সেই অকপট শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার জন্যই ইহারা স্বামীজির সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজনৈতিক ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যেও তিনি মুক্তিযজ্ঞে উৎসর্গীকৃত প্রাণ দেশকর্ম্মীদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই। রাজনীতিক্ষেত্রের সেই দুর্য্যোগের সময় স্বামীজির উপদেশ ইহারা শ্রদ্ধানুত চিত্তেই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ছাত্রজীবনে আমি স্বামী প্রেমানন্দজীর সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম, কর্ম্ম-জীবনের প্রারম্ভে স্বামী অভেদানন্দজীর অতুল প্রতিভা ও আত্মোপলব্ধির জলন্ত বহ্নির পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়াছিলাম। ইহার কয়েক বৎসর পরে স্বামী নির্ম্মলানন্দজীও (তুলসী মহারাজ) ময়মনসিংহে যাইয়া শিক্ষিত সমাজে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। সেখানে তাঁহার অনুরাগী ভক্তবৃন্দ স্বতন্ত্র মঠও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তুলসী মহারাজ এইদেশে সেইরূপ পরিচিত নহেন। তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র ছিল দক্ষিণ ভারত। তবুও তাঁহারা শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলা-সহচর ও অন্যান্য সন্ন্যাসী। আমরা তাঁহাদের মধ্যেই শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিত্র আদর্শের ছবি পরিস্ফুটরূপে দেখিতে পাইয়াছি। তাঁহার মধ্যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শ ও বাণী জীবন্তভাবে লক্ষ্য করিয়াছি, যাঁহাকে নিজ সমক্ষে স্বচক্ষে দেখিয়াছি, আলাপ-আলোচনা করিয়া ধন্য হইয়াছি, সেই শক্তিধর প্রতিভাবান্ সাধক ও সিদ্ধ মহাপুরুষ অভেদানন্দজীর উদ্দেশে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করিয়া কৃতার্থ বোধ করিতেছি।

# গ্রন্থ-সমালোচনা

পুস্তক সমালোচনার জন্য প্রত্যেক পুস্তকের দুইখানি করিয়া কপি পাঠাইয়া দেওয়াই সাধারণ নিয়ম। অতএব গ্রন্থকার অথবা পুস্তক-প্রকাশক মহাশয়দিগের প্রতি আমাদের নিবেদন—'বিশ্ববাণী'তে কোনও পুস্তক সমালোচনা করাইতে হইলে তাঁহারা আমাদের নিকটে প্রত্যেক সমালোচ্য পুস্তকের দুইখানি করিয়া কপি পাঠাইবেন। —ইতি সম্পাদক, 'বিশ্ববাণী'।

**ইতিহাস**—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ডবল ক্রাউন ষোলপেজী সাইজ। মোট পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৬০ + গ্রন্থপরিচয় ৮ পৃষ্ঠা = ১৬৮ পৃষ্ঠা। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন এবং শ্রীপুলিনবিহারী সেন মহাশয়দ্বয়ের দ্বারা সঙ্কলিত। বিশ্বভারতীর 'লোক-শিক্ষা গ্রন্থমালা'র অন্তর্গত। প্রাপ্তিস্থান—বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, দুই নম্বর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ষ্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বিচিত্র মনীষার অবদান জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানাভাবে অভিনব ও অমিত ভাবরাশি ও চিন্তাসম্পদের দ্বারা সমস্ত ভারতবাসীকে সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যে নবরূপে সমৃদ্ধ ও গৌরবান্বিত করিয়াছে। মানব-মনীষার অতি অল্প বিষয়ই আছে—যাহা রবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর প্রতিভার দ্বারা ভাব ও চিন্তার নূতন ঐশ্বর্য লাভ করে নাই। ঐতিহাসিক বিষয়েও আজ প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্ব (১২৯২) হইতে রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি মৌলিক তথ্য ও চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ "ভারতী" 'বালক' 'প্রবাসী' প্রভৃতি সুবিখ্যাত মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এতদিন ধরিয়া জ্ঞানপ্রদ ও মনীষাদীপ্ত ঐসব প্রবন্ধ পূর্ব্বোক্ত মাসিক পত্রিকাগুলির বহু পুরাতন সংখ্যার পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়িয়াছিল। এইভাবে মাসিক পত্রিকায় বহু বৎসর বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকার জন্য বাঙলার পাঠক-সমাজ বহুমূল্যবান ঐ প্রবন্ধগুলির অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনা সম্বন্ধে যাঁহারা আজীবন ঐতিহ্যমত ব্যাপকরূপে ও গভীরভাবে অধ্যয়নশীল—এই প্রকার অতি অল্পসংখ্যক জিজ্ঞাসু ও মননশীল পাঠকই শুধু এই প্রবন্ধগুলির বিষয় সম্বন্ধে অল্প-বিস্তর অবগত ছিলেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের সমগ্র ধারাকে নিজের অসাধারণ বিচার-দৃষ্টি লইয়া কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয় স্বভাব, জাতীয় রীতিনীতি এবং সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিশেষত্বকে এই গ্রন্থে ব্যাখ্যান করিয়াছেন। ভারতবর্ষের জাতীয় চরিত্রের শক্তি ও দুর্ব্বলতা কোথায়—এত বড় মহান একটা সভ্যতা ও সংস্কৃতির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সমস্ত ভারতবাসীদের মধ্যে এক-জাতীয়ত্ববোধ এবং জাতীয় একতা ও সংহতি গড়িয়া উঠিল না কেন—কবিগুরু তাঁহার আশ্চর্য্য দৃষ্টির আলোকে সেইসব কারণ আমাদিগকে সুস্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন। ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রত্যেক ব্যাপারে ভারতবাসীদের সমস্ত গুণ ও দোষ অপক্ষপাত দৃষ্টিতে তিনি সুবিজ্ঞ বিচারের আলোকে আমাদের দেখাইয়াছেন। বহু শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে রাজপুত শিখ মারাঠা প্রভৃতি জাতি ও বহু স্বদেশপ্রাণ বীর ও যোদ্ধজনার অভ্যুদয় ভারতে হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক ব্যাপারে ভারতবর্ষ কেন পরাধীন হইল? কি কারণে ভারতবর্ষে সমস্ত অধিবাসীদের এক অবিচ্ছিন্ন জাতীয় শক্তিরূপে কেন উত্থিত ও অগ্রসামী করিতে পারিল না—সেই বিষয়ের সমস্ত কারণই কবিগুরু বহু তথ্য ও যুক্তি সহকারে এই গ্রন্থে প্রমাণ করিয়াছেন।

তবে এখানে একটি কথা সাধারণ পাঠকদের নিকট বলা আমরা একান্ত প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। কবিগুরুর এই গ্রন্থের নাম শুনিয়া পাঠক-সাধারণ যেন মনে না করেন—'ইতিহাস' বলিতে যে শ্রেণীর রচনার সহিত আমরা পরিচিত এই গ্রন্থটি

সেই শ্রেণীর পুস্তকেরই অন্তর্গত। রবীন্দ্রনাথ লোকোত্তর শ্রেণীর মনীষী—তিনি আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি ও অগ্রগতির অন্যতম বরেণ্য গুরু। জ্ঞানের কোন্ কোন্ বিষয়ে কি ভাবে প্রকাশ বিচার ও বীক্ষা করিতে হইবে তাহার সঠিক পথ ও যথার্থ কৌশলপদ্ধতি জাতির সুধীবৃন্দকে দেখাইয়া দেওয়াই তাঁহার প্রতিভার বিশেষত্ব। সাধারণভাবে ইতিহাসের গ্রন্থ রচনা করা তাঁহার কার্য্য নয়—জাতীয় ইতিহাসের অভিব্যক্তির আভ্যন্তরিক তত্ত্ব ও জাতির প্রকৃতিকে আবিষ্কার ও প্রদর্শন করার বিশেষ কার্য্য সাধনের জন্যই তাঁহার ন্যায় যুগদ্রষ্টা মনীষীর অভ্যুদয় হয়। আলোচ্য গ্রন্থে কবিগুরু আমাদের সেই পথকেই প্রদর্শন করিয়াছেন—যাহা অবলম্বন করিয়া চলিলে আমরা যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশ সমাজ ও জাতিকে প্রকৃত ঐতিহাসিক পটভূমিকায় দেখিতে বুঝিতে ও জানিতে পারিব। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন এবং শ্রীপুলিনবিহারী সেন মহাশয়েরা ( বহু বৎসর পূর্ব্বে রচিত ) কবিগুরুর এই সমস্ত প্রবন্ধ নিপুণভাবে সঙ্কলন ও ( গ্রন্থপরিচয় সমন্বিত ) সম্পাদনার দ্বারা এই গ্রন্থটি প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসু পাঠক-সমাজের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন।

—ইন্দ্রসেন

**স্বামী সারদানন্দের জীবনী :**—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য প্রণীত। ডবল ক্রাউন ষোল পেজী ৩৯০ পৃষ্ঠা। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি, শ্রীমা-সারদাদেবীর একখানি এবং শ্রীমৎ সারদানন্দ মহারাজের বিভিন্ন বয়সের তিনখানি ছবি সমন্বিত। প্রকাশক—গ্রন্থকার। প্রাপ্তিস্থান, মডেল পাবলিশিং হাউস—২৬ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। বোর্ড বাঁধাই। মূল্য চারি টাকা।

এই গ্রন্থটিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্ব্বত্যাগী প্রিয় শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দের (শরৎ মহারাজের) জীবনকাহিনী বর্ণিত ও তাঁহার উপদেশাবলী সঙ্কলিত হইয়াছে। পূজনীয় স্বামী সারদানন্দ যৌবনের প্রারম্ভেই ধর্ম্মান্বেষণের ব্যাকুলতায় দক্ষিণেশ্বর তপোবনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরণপ্রান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম দৃষ্টিতেই যুবক তপস্বী শরৎচন্দ্রকে দেখিয়াই নিজের অন্যতম লীলাসহচর বলিয়া তাঁহাকে আপন অন্তরঙ্গ শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে গ্রহণ করিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ, (বিবেকানন্দ) রাখালচন্দ্র, ( ব্রহ্মানন্দ ) কালীপ্রসাদ ( অভেদানন্দ ) প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তথাকথা যুবক শিষ্যদের সহিত শরৎচন্দ্রও যৌবনে সর্ব্বত্যাগ ব্রতে দীক্ষিত ও কঠোর তপস্যায় নিরত হইয়াছিলেন। গুরুর আশীর্ব্বাদে ও নিজের সুকঠোর তপস্যার ফলে সকল নরনারী ও সকল জীবের মধ্যে সেই এক অদ্বয় পরমাত্মাকে সর্ব্বদা পরিব্যাপ্ত দেখিবার যোগসিদ্ধ দৃষ্টি তাঁহার লাভ হইয়াছিল। ভগবদ্গীতায় ব্রহ্মজ্ঞ স্থিতপ্রজ্ঞ এবং মোহমুক্ত নিষ্কাম কর্ম্মযোগীর যে বর্ণনা আছে পূজনীয় শরৎ মহারাজ ছিলেন তাহার অন্যতম জীবন্ত দৃষ্টান্ত।

ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ অক্ষয়চৈতন্যজী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই সুযোগ্য লীলাসহচরের জীবনচরিত রচনা করিয়া যথার্থই একটি মহৎ ও গুরুদায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়াছেন। গ্রন্থকার অনেক বৎসর ধরিয়া বিশেষ ধৈর্য্য অধ্যবসায় ও সুগভীর শ্রদ্ধার সহিত সমস্ত ঘটনাবলী ও উপদেশমালা সংগ্রহ করিয়াছেন। শরৎ মহারাজের সান্নিধ্যে বহুবৎসর ধরিয়া গ্রন্থকারের থাকিবার সুযোগ হইয়াছিল। সেই সুযোগ তিনি সত্যই সদ্ব্যবহার করিয়াছেন—তাহা এই বইখানি পড়িলে বুঝিতে পারা যায়। বইখানিতে গ্রন্থকারের তথ্যনিষ্ঠা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। শরৎ মহারাজের নিজস্ব লিখিত ( শ্রীলীলাপ্রসঙ্গ, পত্রমালা প্রভৃতি ) রচনাবলী এবং তাঁহার সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আগত ব্যক্তিদের প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট ঘটনার বিবরণ হইতেও লেখক এই গ্রন্থের বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। কোনও স্থানে কল্পিত বা অতিরঞ্জিত কাহিনী এই গ্রন্থে স্থান পায় নাই। প্রত্যেকটি অধ্যায়ের বর্ণনা যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি মর্ম্মস্পর্শী। এই গ্রন্থে ধর্ম্মসাধনা সম্বন্ধে পূজনীয় শরৎ মহারাজের চিঠি উপদেশ ও কথোপকথনগুলি ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিদের নিকট শিক্ষাপ্রদ ও কল্যাণকর হইবে। এই পুস্তকের আর একটি প্রশংসনীয় দিক—আলোচ্য মহাপুরুষের চরিত্র বর্ণনায় কোথাও কোনও অতিরঞ্জন গোঁড়ামি ও সম্প্রদায়গত সঙ্কীর্ণতার চিহ্ন লেখকের রচনায় প্রকাশিত হয় নাই। সেজন্য বইখানি পড়িয়া আনন্দ ও তৃপ্তি পাওয়া যায়। আর সেইজন্যই এই পুস্তকটি শুধুই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তগণের নিকটেই ভাল লাগিবে—এমন নয়—ধর্ম্মানুরাগী ও উদারচিত্ত প্রত্যেক বাঙালী হিন্দু নরনারী মাত্রেরই নিকটেই এই বইখানি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের লাভ করিবে।

# সঙ্ঘবার্ত্তা

**পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের নবতি-তম জন্মমহোৎসব অনুষ্ঠিত—**

গত ২২ আশ্বিন ১৩৬২ ( ৯ই অক্টোবর ১৯৫৫ ) রবিবার শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে ( ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ) পূজ্যপাদ শ্রীমৎস্বামী অভেদানন্দ মহারাজের নবতিতম জন্মমহোৎসব সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এই পবিত্র উৎসব উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের মন্দিরে প্রভাত হইতে বিশেষ পূজা হোম স্তবপাঠপ্রভৃতি হইয়াছিল। বেলা নয়টার সময়ে সঙ্গীতবিশারদ শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার গায়ক-সমিতি শ্রীশ্রীরামনাম সঙ্কীর্ত্তন ও ভজনগান করেন। বেলা এগারোটা হইতে বারোটা পর্য্যন্ত সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীঅভেদানন্দ মহারাজের পুণ্য জীবনলীলার সম্বন্ধে কথকতা করেন। মধ্যাহ্নে প্রায় বারোশত ভক্ত নরনারী অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন। বেলা তিনটার সময়ে শ্রীভাষাপদ বসু মহাশয় ভক্তিপূর্ণ কণ্ঠে ও মধুর স্বরে শ্রীরামায়ণ-গান কীর্ত্তন করেন।

সন্ধ্যায় সাড়ে ছয়টার সময়ে বেদান্ত মঠের হল ও প্রাঙ্গণে একটি জনসভা হইয়াছিল। এক হাজারের উপর শ্রোতা এই সভায় সমবেত হইয়াছিলেন। এই সভায় সভাপতি ছিলেন—ধর্ম্মনিষ্ঠ ও শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত মাননীয় ডাঃ শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী এম এ., পি. এইচ. ডি, মহাশয়। শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী উদ্বোধন-সঙ্গীত গাহিবার শ্রীমৎস্বামী দুর্গানন্দজী শান্তিপাঠ করেন। তাহার পরে শ্রীঅভেদানন্দ মহারাজের জীবন বাণী কর্ম্মসাধনা ও আধ্যাত্মিক মহত্ত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তি বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন।

শ্রীমৎ স্বামী বেদানন্দ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন—"উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শুধু ভারতবর্ষেই নয়, সমস্ত পৃথিবীতে ধর্ম্মগ্লানি নাস্তিকতা এবং সম্প্রদায়গত বিবাদ বিসম্বাদের বীভৎসতা প্রচণ্ডভাবে দেখা দিয়াছিল। ধর্ম্মের নামে এইসব ঘৃণ্যতম মানববিদ্বেষ যুক্তিহীন আচার অনুষ্ঠান ও উদ্দেশ্য-বিস্মৃতি নিজের সুবিপুল আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা দূর করিয়া দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ নির্ব্বিশেষে ধর্ম্মান্বেষী সমস্ত নরনারীদের নিকটে প্রকৃত ধর্ম্মের জীবন্ত মূর্ত্তিকে পুনরায় প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মধ্যে ধর্ম্মের সুমহান ও অসম্প্রদায়িক রূপের জীবন্ত প্রকাশ দেখিয়া তখন অনেক বিখ্যাত ধর্ম্মনেতা ও মনীষী মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়াছিলেন। বাস্তবিক শ্রীরামকৃষ্ণদেব ছিলেন সকল ধর্ম্মমতের সাধনা ও অনুভূতির সমন্বয়-মূর্ত্তি। দক্ষিণেশ্বরের উদ্যানে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট সকল ধর্ম্মমতের ঐকান্তিক সাধক ও উপাসকেরা ধর্ম্মের সাধনার নির্দ্দেশ পাইবার জন্য আসিতেন। স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রভৃতি সিদ্ধতমা ও সত্যদ্রষ্টা মহামানবদের ন্যায় স্বামী অভেদানন্দও ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্ব্বত্যাগী লীলাসহচর এবং অন্যতম অন্তরঙ্গ প্রিয় শিষ্য। পূজনীয় স্বামী অভেদানন্দ নিজের তপস্যা আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও কর্ম্মসাধনার মধ্যে নিজের অসাধারণ স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্ব প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। স্বামী অভেদানন্দ ছিলেন একাধারে সিদ্ধযোগী, দার্শনিক মনীষী, বহু বিদ্যায় সুপণ্ডিত, মহান কর্ম্ম-সাধক ও মানবকল্যাণব্রতী। ইউরোপ ও আমেরিকায় ভারতীয় আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ভাব ও কর্ম্মসাধনা প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে বিরাট একটি আন্দোলনের সূচনা করিয়াছিলেন। ভারত-গৌরব স্বামিজীর অন্যতম সুযোগ্য গুরুভ্রাতারূপে স্বামী অভেদানন্দ গত পঁচিশ বৎসর অক্লান্ত অক্ষুণ্ণ অধ্যবসায়ে সেই মহাকার্য্যের বিরাট বিস্তৃতি সাধন

করিয়াছেন। আমেরিকার শিক্ষিত সমাজেই শুধু নয়, পাশ্চাত্যদেশে বহু প্রসিদ্ধ মনীষী স্বামী অভেদানন্দের ধর্মজ্ঞান দার্শনিক মনীষা ও বহু বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। আমেরিকা যুক্তরাজ্যে স্বামী অভেদানন্দের এই মহান ধর্ম-সাধনার সাফল্যের ফলে তাঁহার পরবর্তী বহু ভারতীয় মনীষী ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ভাবধারা প্রচারের জন্য পাশ্চাত্যদেশে আপনাদের অনুকূল ক্ষেত্র পাইয়াছেন। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁহার বক্তৃতা ও রচনাবলীর মধ্যে ধর্ম ও দর্শনের সম্বন্ধে যে ভাবসম্পদ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা ভারতীয় সংস্কৃতির মহান সম্পদ।

অধ্যাপক শ্রীসমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়—স্বামী অভেদানন্দের সত্যান্বেষণ ও ধর্মসাধনার সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিয়া দেখান যে, স্বামী অভেদানন্দ সত্যই একজন প্রকৃত সিদ্ধ মহাপুরুষ এবং উচ্চশ্রেণীর ধর্মগুরু। তাঁহার মধ্যে আধ্যাত্মিক অনুভূতি দার্শনিক মনীষা মানবপ্রেম নিঃস্বার্থ কর্মসাধনার আশ্চর্য সমাবেশ হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একজন সুযোগ্য শিষ্যরূপে স্বামী অভেদানন্দ নিজের জীবনে সংযম ও তপস্যার একটি উজ্জ্বল ও মহান দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন।

অতঃপর মাননীয় সভাপতি শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী মহাশয় মনোজ্ঞ ও জ্ঞানগর্ভ অভিভাষণের দ্বারা সমবেত শ্রোতাদের বিমুগ্ধ ও আনন্দিত করিয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ একাধারে পাণ্ডিত্য তথ্য ও শ্রদ্ধার সমাবেশে সকলের নিকট প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল। অভিভাষণের প্রারম্ভে সভাপতি মহাশয় বলেন—"আজ এখানে একজন শুদ্ধাত্মা ও মুক্তপুরুষের পুণ্য আবির্ভাবের উৎসবে আমরা সকলে সমবেত হইয়াছি। পূজনীয় স্বামী অভেদানন্দ শুধু একজন সাধনসিদ্ধ যোগীপুরুষ বা অসাধারণ শাস্ত্রতত্ত্ববিৎ মহাত্মা নহেন—তিনি বর্তমান যুগের অবতারপুরুষ ভগবান রামকৃষ্ণদেবের বিশেষ প্রিয় সাঙ্গোপাঙ্গদের মধ্যে অন্যতম। অতএব এই প্রকার অবতার-পার্ষদের আবির্ভাব উৎসবে আমি তীর্থযাত্রীর মতন এখানে তাঁহার উদ্দেশে ভক্তির অঞ্জলি ও অন্তরের প্রণাম নিবেদন করিতে আসিয়াছি। এইরূপ অনুষ্ঠানের উৎসবে পুণ্য পরিবেশে আসার সুযোগ পাইয়া আমি নিজেকে ধন্য ও কৃতজ্ঞ বলিয়া জ্ঞান করিতেছি।"

অতঃপর পূজনীয় স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের জীবনের নানাদিক সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় মনোজ্ঞ-ভাবে বর্ণনা ও ব্যাখ্যান করেন। পরিশেষে তিনি বলেন—"পাশ্চাত্যদেশে স্বামী অভেদানন্দের ধর্ম-প্রচারের মধ্যে সাধারণ ব্যক্তিদের ন্যায় আত্মপ্রতিষ্ঠা বা অহংভাবের বিন্দুমাত্র লেশ ছিল না। ঈশ্বরের প্রেরণা অন্তরে অনুভব করিয়াই তিনি এই মহৎ কর্মে অহংবোধশূন্য হইয়া শুদ্ধচিত্তে অক্লান্ত প্রচেষ্টায় দীর্ঘকাল নিযুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁহার মহাজীবনে দেখাইয়াছেন, তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষ কর্মফল-ত্যাগী হন কিন্তু কখনই কর্মত্যাগী হন না। কারণ কর্মত্যাগ ও কর্মফলত্যাগ কখনই এক প্রকৃতির বস্তু নয়। বিধাতার প্রদত্ত নির্দিষ্ট কর্মের ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া তিনি স্বধামে প্রত্যাগত হইয়াছেন। স্বামী অভেদানন্দের কর্মসাধনা ও রচনাবলী ভারতবাসী বিশেষতঃ হিন্দুমাত্রেরই পক্ষে অমিত গৌরবের সম্পদ। এই প্রকার মহাত্মার প্রদর্শিত সাধনপথেই মানবের শান্তি ও কল্যাণের সঠিক সন্ধান পাওয়া যায়।"

সভার শেষে সুপ্রসিদ্ধা গায়িকা শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী ( বেতিও ) ভক্তিবিগলিত প্রাণে ও সুমধুর কণ্ঠে কয়েকটি ভজনগান করিয়াছিলেন। সমবেত শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহার ভক্তিপূর্ণপ্রাণে ভজনগানে বিমুগ্ধ ও আনন্দিত হইয়াছিলেন।

**কীর্তন গান**—পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের নবতিতম জন্মোৎসবের উপলক্ষে কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে বিগত ১০ই অক্টোবর সোমবার এবং ১১ই অক্টোবর মঙ্গলবার দুইদিন ধরিয়া প্রসিদ্ধ কীর্তন-গায়ক কীর্তনকলানিধি শ্রীনন্দকিশোর দাস এবং তাঁহার সম্প্রদায় প্রতিদিন

সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা হইতে প্রায় দশটা অবধি কীর্তন গান করিয়াছিলেন। শ্রোতাদের সমাবেশে বেলান্ত মঠে তিলমাত্র স্থান ছিল না। প্রথম দিনে কীর্তন গানের বিষয়-বস্তু ছিল—'দানলীলা'—এবং তাহার পরের দিনে কীর্তনের পালা ছিল 'কলঙ্কভঞ্জিতা'।

**শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা-উৎসব**—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের মতন এবৎসরেও ( ১৩৬২ ) কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেলান্ত মঠে মহাসপ্তমী ( ৫ই কার্ত্তিক ) মহাষ্টমী ( ৬ই কার্ত্তিক ) এবং মহানবমী ( ৭ই কার্ত্তিক ) এই তিনদিন ধরিয়া জগজ্জননী শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর দশভূজা প্রতিমার পূজা নির্ব্বিঘ্নে ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। মহাসপ্তমীর দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়া সত্ত্বেও শ্রীরামকৃষ্ণ বেলান্ত মঠে পূজা-দর্শনার্থী নরনারী ও শিশুদের জনতার অভাব হয় নাই। মহাষ্টমী ও মহানবমীর দিন প্রভাত হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত সবসময়েই কলিকাতা বেলান্ত মঠে পূজা দেখিবার জন্য লোকসমাবেশে পূর্ণ ছিল। প্রত্যেক দিন শতশত ভক্ত নরনারী শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন। মহাসপ্তমী হইতে প্রত্যহ তিনদিন মধ্যাহ্ন হইতে প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বহু ভক্ত নরনারী বেলান্ত মঠে অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাসপ্তমীর দিন প্রায় পাঁচশত এবং মহাষ্টমী ও মহানবমীর দিন প্রায় সাতশত ভক্তনরনারী অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়াও প্রতিদিন দুঃস্থতারা ও অন্নহীন অনেক নরনারী ও শিশুকে মহানবমীর দিন অন্নপ্রসাদ ভোজন করানো হইয়াছিল।

মহাসপ্তমীর দিনে পুষ্পাঞ্জলি দানের পর শ্রীশ্যামাপদ বসু শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর মাহাত্ম্য গান করেন। তাহা ছাড়া শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্ত্তীর পরিচালনায় শ্রীদুর্গাদেবীর সম্বন্ধে গায়কদল কয়েকটি ভজন গান করিয়াছিলেন। আরতির পরে পূজার তিনদিনই রাত্রে কালীকীর্ত্তন গান হইয়াছিল। মহাসপ্তমীর দিন রাত্রে কালীকীর্ত্তন করিয়াছিলেন "গ্রেট ষ্টার কালীকীর্ত্তন সমিতি", মহাষ্টমীর দিন বাগবাজারের "বিশ্বনাথ কালীকীর্ত্তন সমিতি'র সভ্যরা কালীকীর্ত্তন গান করিয়াছিলেন। মহানবমীর দিন কালীকীর্ত্তন "শ্যামবাজার সুহৃৎ সমিতি"র সভ্যদের দ্বারা গীত হইয়াছিল। রবিবার ৮ই কার্ত্তিক রাত্রে যথাবিধানে শোভাযাত্রা সহকারে গঙ্গাগর্ভে প্রতিমার বিসর্জ্জন হইয়াছিল। তাহার পরে গভীর রাত্রে শান্তিজল-বর্ষণ, প্রণাম নমস্কার ও আশীর্ব্বাদ বিনিময়ের পরে এবৎসরের দুর্গাপূজার উৎসব পরিসমাপ্ত হইয়াছিল।

**শ্রীশ্রীলক্ষ্মী পূজা**—গত কোজাগরী পূর্ণিমার দিনে (রবিবার ১২ই কার্ত্তিক) কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেলান্ত মঠে শ্রীশ্রীলক্ষ্মী দেবীর প্রতিমাপূজা বিধিবিহিত ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। রাত্রে প্রতিমা দর্শনার্থী বহু ভক্ত নরনারী-প্রসাদ পাইয়াছিলেন। সঙ্গীত-বিশারদ শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পরিচালনায় গায়কগণ বিবিধ ভজনগান করিয়াছিলেন।

**ধর্ম্মালোচনা**—প্রতি সোমবার হইতে শনিবার পর্য্যন্ত সপ্তাহে ছয়দিন ধরিয়া কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেলান্ত মঠে বৈষ্ণবধর্ম্মাচার্য্য পণ্ডিত শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'শ্রীমদ্ভাগবত' শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

**শ্রীশ্রীরামনাম-সঙ্কীর্ত্তন**—প্রতি শনিবার বেলা তিনটার পরে কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেলান্ত মঠে সঙ্গীতবিশারদ শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্ত্তীর পরিচালনায় ভক্তগায়কেরা শ্রীশ্রীরামনাম-সঙ্কীর্ত্তন ও বিবিধ প্রকার ভজনগান করিতেছেন।

**কথকতা**—প্রতি রবিবার সন্ধ্যারতির পরে সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত' কথকতা করিতেছেন।

প্রতিষ্ঠাতা—স্বামী অভেদানন্দ

সপ্তদশ বর্ষ—দশম সংখ্যা

বার্ষিক মূল্য—চারি টাকা

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১১ি রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

ফোন—বড়বাজার

সম্পাদক—স্বামী সদাত্মানন্দ ও স্বামী বেদানন্দ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের পক্ষে ব্রহ্মচারী বসন্তকুমার কর্তৃক প্রকাশিত এবং

১৪১, বিবেকানন্দ রোড কলিকাতা-৬, ভারতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীবিনয়রঞ্জন সিংহ কর্তৃক মুদ্রিত।

# বিশ্ববাণী—অগ্রহায়ণ, ১৩৬২

## সূচীপত্র


| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | বদরীনারায়ণের পথে ( কবিতা ) | শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য | ৪৭১ |
| ২। | ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা-সারদাদেবী | ব্রহ্মচারী সুধাংশুকুমার চট্টোপাধ্যায় | ৪৮৩ |
| ৩। | ব্যক্তি সমাজ ও জাতি | শ্রীহিরণ্ময় দত্ত | ৪৮৬ |
| ৪। | চল্লিশ পরগণার—চল্লিসহর | শ্রীবিজয়গোপাল বসু | ৪৯২ |

জামসেদপুর—ব্র্যাঞ্চ

## হাওড়া মোটর কোম্পানী লিঃ

( স্থাপিত—১৯১৮ )

মোটর গাড়ীর যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

নিখুঁতভাবে ইঞ্জিন মেরামতি কার্য্য আমাদের বৈশিষ্ট্য

হেড অফিস—পি ৬, মিশন রো এক্সটেনসন, কলিকাতা—১

ফোন—২৩-১৮০৪ ( পাঁচ লাইন )

শাখা—বম্বে, দিল্লী, পাটনা, ধানবাদ, কটক ও গৌহাটি

বস্ত্র শিল্পে মোহিনীর অবদান অতুলনীয়

## মোহিনী মিলস্ লিমিটেড

— ১নং মিল — — ২নং মিল —

কুষ্টিয়া ( পাকিস্তান ) ● বেলঘোরিয়া ( ভারত )

এই মিলে প্রস্তুত ধুতি শাড়ী লংক্লথ প্রভৃতি ভারত ও পাকিস্তানে সমভাবে সমাদৃত

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ ঃ

## চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোম্পানী

রেজিষ্টার্ড অফিস :—২২নং ক্যানিং ষ্ট, কলিকাতা।

ডাক্তার হেমেন্দ্রমাধব মল্লিক, এম. এ, এম. ডি, বি. এল, আবিষ্কৃত

পেটেণ্ট

## ইক্-মিক্ কুকার

ইহাতে এক ঘণ্টার ভিতরে বিভিন্ন আমিষ ও নিরামিষ খাদ্য অতি সহজে একঘণ্টায় সুস্বাদুরূপে রন্ধন করা যায়। যে কোন খালোনী দ্রব্যের দ্বারা বিনা তত্ত্বাবধানে অতি অল্প খরচে রান্না চলে। মূল্য-তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

ম্যানেজার—ইক্-মিক্ কুকার, ২১১।১এ, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

## সূচীপত্র


| | | | |
|---|---|---|---|
| ৫। | ধর্মে অলৌকিকতা কি অপরিহার্য্য ? | শ্রীঅমিয়শঙ্কর নন্দী | ৪৯৯ |
| ৬। | তিব্বত ভারত সংস্কৃতি-সম্বন্ধ | শ্রীসুকুমার কর | ৫০২ |
| ৭। | মন ও মানুষ | স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ | ৫০৬ |
| ৮। | আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের প্রতি ( কবিতা ) | শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায় | ৫০৭ |
| ৯। | সুদূরের আলো | দীপেন্দু বসু | ৫০৮ |
| ১০। | জীবনের গান ( কবিতা ) | শ্রীকেদারেশ্বর চক্রবর্ত্তী | ৫১০ |
| ১১। | রামায়ণের বেদনা | শ্রীঅনিলকুমার হালদার | ৫১১ |
| ১২। | অশোক-লিপি ও ইতিকা | শ্রীকালিপদ হোড় | ৫১৭ |
| ১৩। | সুধামূর্ত্তির পার্শ্ববর্ত্তী মূর্ত্তিগুলির পরিচয় | | ৫২১ |
| ১৪। | ইতিহাসের দুইটি তথ্য | | ৫২৩ |
| ১৫। | গ্রন্থ-সমালোচনা | | ৫২৪ |
| ১৬। | সঙ্ঘবার্ত্তা | | ৫২৬ |


## 'বিশ্ববাণী'-র নিয়মাবলী

১। 'বিশ্ববাণী'-র বর্ষ আরম্ভ হয় প্রতি ফাল্গুন মাসে। বৎসরের যে কোন সময়ে আপনি গ্রাহক হইতে পারেন। তবে প্রথম সংখ্যা হইতেই লইতে হইবে।

২। 'বিশ্ববাণী'-র বার্ষিক মূল্য সডাক চারি টাকা, ষাণ্মাসিক দুই টাকা, প্রতি সংখ্যা আট আনা। মূল্য অগ্রিম পাঠাইতে হইবে।

৩। কোন গ্রাহকের ঠিকানা অল্পদিনের জন্য পরিবর্ত্তিত হইলে তিনি স্থানীয় ডাকঘরে নির্দ্দেশ দিবেন; বেশীদিনের জন্য হইলে পূর্ববর্ত্তী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে নতুবা পূর্ব্বের ঠিকানায় পত্রিকা প্রেরিত হইবে।

৪। 'বিশ্ববাণী'-র গ্রাহক মূল্য মনিঅর্ডার যোগে পাঠাইলে কুপনে নাম ও ঠিকানা বিশদ করিয়া লিখিবেন। কোনও মাসের সংখ্যা না পাইলে গ্রাহকগণ তাহার পরের মাসে সাত দিনের মধ্যে আমাদিগকে তাহা জানাইবেন।

৫। 'বিশ্ববাণী'র জন্য প্রবন্ধাদি পাঠাইবার কালে রচয়িতার নাম ঠিকানা যেন তাহাতে বেশ স্পষ্টাক্ষরে সন্নিবেশিত থাকে। 'বিশ্ববাণী'তে প্রকাশযোগ্য প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হয়। প্রবন্ধাদি হারাইয়া যাইলে বা কোন প্রকারে নষ্ট হইলে আমরা দায়ী থাকি না।

প্রবন্ধ স্বল্পায়তনে, ফুলস্কেপ চার পাতার মধ্যে, রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। দীর্ঘাকার প্রবন্ধ ছাপা অসম্ভব।

৬। প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাক-টিকিট পাঠানো চাই। ছয়মাস পরে অমনোনীত প্রবন্ধাদি নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। কোনও লেখা প্রকাশিত করা সম্পূর্ণরূপে সম্পাদকদের অভিমত সাপেক্ষ। উহার জন্য সম্পাদকেরা কোনও কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নহেন।

৭। কাহারও কোন বিষয় জানিতে হইলে ( গ্রাহক হইলে, গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া ) সর্ব্বদা **রিপ্লাই কার্ডে** অথবা ডাক-টিকিট সমেত এবং পূর্ণ ঠিকানার সহিত দিতে হইবে। অন্যথায় উত্তর দেওয়া হয় না।

# K.C.GANGULY
## & CO.

*Dealers in:-*

WEST END • FAVRE-LEUBA
& ANGLO SWISS

★ REPAIRING OUR SPECIALITY

12-1 RADHA BAZAR ST. CAL-1



স্বামী ওঁকারেশ্বরানন্দ প্রণীত

## ১। প্রেমানন্দ জীবন-চরিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইস চ্যান্সেলর ভারতবরেণ্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের এই জীবন-চরিতখানি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আধ্যাত্মিক শাখার গ্রন্থরাজির মধ্যে বিশেষ সম্মানীয় স্থান অধিকার করিবে।··· হৃদয়স্পর্শকারী সুন্দর ও প্রাঞ্জলভাবে বর্ণিত।" প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠায় ৪খানি সুন্দর ছবি সহ, সুলভ সংস্করণ মূল্য ৩.০ বাঁধাই ৪৲ টাকা।

## ২। প্রেমানন্দ ১ম ভাগ ২য় সংস্করণ ও ২য় ভাগ

সাধক ও ভক্তদিগকে প্রদত্ত অমূল্য উপদেশ সংগ্রহ।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ভূতপূর্ব ভাইস প্রেসিডেন্ট পূজ্যপাদাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী অচলানন্দজী মহারাজ লিখিয়াছেন—"পড়িয়া প্রাণে বড় আনন্দানুভব করিলাম"।

উদ্বোধন—"উপদেশ অংশ পড়িয়া সংগ্রাহককে কৃতজ্ঞতা না জানাইয়া থাকা যায় না।" সকল পত্রিকায়—উচ্চ প্রশংসিত। সুন্দর আর্ট পেপারে চারিখানি ছবি ইহাতে আছে। মূল্য যথাক্রমে ২।০ ও ২৸০

প্রাপ্তিস্থান :—**শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ**,—১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

পোঃ অঃ কুণ্ডা, দেওঘর, এস. পি., বিহার এই ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট লইলে ডাক মাশুল লাগিবে না।



# ডি. রতন এণ্ড কোং

## ফটোগ্রাফার্স

ফটো

২২-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিঃ ৬

ফোন: ৩৪- ৩৭১১

বিশ্ববাণী

সপ্তদশ বর্ষ | অগ্রহায়ণ—১৩৬২ | দশম সংখ্যা

# বদরীনারায়ণের পথে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

হরিদ্বার-হৃষিকেশ হোতে
পঞ্চপ্রয়াগ হোলো আরোহণ বহু উর্দ্ধে।
শুনেছি 'বদরী চলো'—
পাখীদের ডাক। এরা কি তীর্থের দূত?
ভাক্তি লয়ে যাত্রীরা গেছে বহুদূরে।
অন্ধকারোহী আরো দূরে—
পর্ব্বতের গাত্র বেয়ে নামে স্বর্ণধারা
বৈদিক মন্ত্রের মত শুনায়ে সঙ্গীত।
আশেপাশে হেরি চীর বৃক্ষশ্রেণী
ধ্যানমগ্ন ঋষিসম।
বহুবর্ষের পাদপলতা:
খস্‌খস্ শব্দ……
আর যেন ফিস্ ফিস্ কথাগুলি।
বন্য কুসুমের সুরভি
আনে আনন্দ পরম।

শৈল-সঙ্কটের ছিন্ন অঙ্গ
প্রতাপের চিহ্ন স্থানে স্থানে
মহাপ্রস্থানের যাত্রীর এনেছে ভ্রান্তি
আর মনের সংশয়।

পর্ব্বত-গাত্র হোতে কত যাত্রীর হয়েছে পতন
কেবা জানে!
লোহার ঝুলানো দোলানো সেতুর
সঙ্কীর্ণ পরিধি মাঝে।
পথ-চলা এপারের শৈল হোতে
ওপারের শৈল শীর্ষে।
গহন গিরির রুক্ষরূপ!
লতাপাতাদের আবেষ্টনে
দেবদারু আর ফার্ণ
আর পাইন গাছের সারি
আর ঊর্দ্ধে উঠ্‌বার সিঁড়ি
অপ্রশস্ত রহে।

পার্ব্বত্য সহর গ্রাম:
দুর্গম পথের ধারে ছোট ছোট চটি,
অসংখ্য সবুজ শস্যক্ষেত্র,
আর নানা সব্জী বাগান,
মধুর হরিণ করে খেলা।
স্থানে স্থানে বাংলার শোভা
স্মরণে আসে।

বস্ত্র সাবধের আর
মার্জ্জারের বীভৎস দৃষ্টির সাথে
করি' দৃষ্টি বিনিময়
পেয়েছি আতঙ্ক ;
তবুও নিঃস্ব
তীর্থ-দেবতার দর্শনের লাগি।

রাত কত হোলো ?
আরো কত দূর ? কত মাইল এলাম,
হৃষিকেশ হোতে
একশো আশি মাইলের শেষে বদরী-ধাম,
আজানার সাথে
চলে তাঁরি নাম।
নিরন্তর নিবিড় বনানী !
চলেছে তাঙীতে ধনিকের বল
যারা করেছে লুণ্ঠন, অর্থ
দরিদ্রের রক্ত শুষে
চাতুরী ও শাস্ত্রের কৌশলে।

চলেছে বৃদ্ধা নারী, মহা স্থবির,
পঙ্গু, খঞ্জ, অন্ধ, আতুর
সাধের সুরে আকস্মিক
অনন্তের সুর শুনি
মুক্তি-পিপাসায়।
চলেছে উদাসী গৃহত্যাগী
আত্মজয়ী মুক্তযোগী সিদ্ধ মহাত্মার
কঙ্কালার লোভে চীরবাস পরি'।

সাধুবেশী বহু ভণ্ডযাত্রী
চলেছে ধর্ম্মের নামে
যজন-যাজন ব্যবসায়
যারা প্রতারণা করে নিত্য, আর
নির্ব্বাহ করে জীবিকা
ত্রিপুণ্ড্র ললাটে পরি
ঝুলাইয়া রুদ্রাক্ষের মালা কণ্ঠদেশে।
আর যারা গেলো না
ধর্ম্মের সত্যরূপ আর জীবন্ত দর্শনে—
চলিয়াছে পতিতারা
তীর্থ-দর্শনে
পতিতপাবনের কৃপালভি'
ধুয়ে দিতে পাপ তীর্থ-প্রস্রবণের জলে।

চলেছে দেবতার অন্ন যারা
করেছে গ্রাস পরম আনন্দে।
দেবোত্তর সম্পত্তির সংটুকু খেয়ে
মোটর-বিহারী হোলো
নাচু আর কদলী দেখাবে গৃহদেবতারে।
চলেছে অসংখ্য ভক্ত
ভোগ-বিলাসের চরম স্তরে রহি'
ন্যাসের সুখ গুণে-গুণে করে
গ্লানিপূর্ণ দিবস যাপনা
ইন্দ্রিয়সম্ভোগ-সুখে অর্দ্ধনিশি,
নির্ব্বিকল্প ধ্যান সমাধিতে
তুরীয় স্তরে ডুবি দিয়ে দিয়ে
কাটায়ে দিন।
এইসব পুণ্যলোভাতুর
যাত্রী হোতে বিচ্ছিন্ন একক আমি
নিঃসঙ্গ—কেবা জানে
আবার ফিরিব কিনা ঘরে।

শাখামৃগ করে আন্দোলিত
পার্ব্বত্য বৃক্ষের শাখা ;
অদূরীর সম পরমাসুন্দরী নারী
হাসিমুখে করেছে ইসারা কত !
ভাষা বুঝিবার নাহি ক্ষমতা আমার,
দেহ হোতে যেন শুভ্র স্বর্গজ্যোতি ঝরে
এরা কি স্বর্গ হোতে এসেছে হেথায়
যাত্রীদের মনোহরণের তরে।

দূরে যেন পার্ব্বতীর ডাক শুনি
প্রাণ ওঠে কেঁপে।
তীর্থের দোলর যারা হীন লয়ে
গভীর নিশীথে চ'লে গেছে
না-বলা কথার ফাঁকটুকু রেখে।
ঊর্দ্ধে শিরিশৃঙ্গ ভেদি
বরফের হোতে আসে কাপে।

—'জয় ! কেদারনাথ কি জয় !—'
হোলো রাত্রি শেষ,
আরোহণ আর অবরোহণের
খেলা বাঁকা-বাঁকা
পাষাণের স্তরে স্তরে
সঙ্কীর্ণ সীমায়

একি অব্যক্ত আনন্দ !
ভাষার অতীত কূলে
শুধু আসে ভাব-উর্ম্মিমালা
নৃত্য করি।
সূর্য্যস্নাত তুষারের রশ্মিরাগে
স্বর্গ-দ্বার খুলে গেল যেন
হিম-অধিত্যকা মাঝে।
ঝলসিয়া ওঠে
তুষারের শুভ্র শস্ত
বিচিত্র বর্ণের সমারোহে।

সরযূনী আর
অলকানন্দার মিলনের মোহনায়
করিয়াছি স্নান।
বিল্ব-কেদারের পথে
অর্ঘ্য দিনু মোর।
হেরিলাম স্বর্গগঙ্গা জননীরে
মন্ত্রস্নান করাতে আমারে।
জন্মদাত্রী জীবনদাত্রী মাতৃদেবী
হেরিলাম পরীরীর মত
পরম বিস্ময়ে,
অনুকৃতি বাক্যাতীত
গৌরীকুণ্ডে হোলো।

গুপ্তকাশী হোতে
কাল-ভৈরবের বাণী এলো কানে,
আত্মতত্ত্ব বিশ্বতত্ত্ব শিবতত্ত্ব
মুগ্ধ হয়ে গেলো !
তুষিল শীতল আর
তপ্ত প্রস্রবণ ধারা
আমারে করালো স্নান।

পিতৃপুরুষের তৃপ্তিতরে
করিলাম পিণ্ডদান,
তর্পণের মহামন্ত্রে পূত হোলো
পুণ্য তীর্থশিলা,
নীলধারা আর গৈরিকধারার রূপ
তুলিবার নয়। নীললোহিতের লীলা
মনোরম। হরিদ্রাভ বারি লয়ে
সরলামুখীরে ধরি 'অর্ঘ্য' সঁপিলাম
অশান্তি-সংহার লাগি'।
ত্রিমূর্তি নারায়ণ হরপার্ব্বতীর
মন্দিরে বিবাহ-স্মৃতি আজো
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিব সূত্রে
যজ্ঞবহ্নি-শিখা লয়ে
স্বর্গায়তনে আরোহণ
চলে ঘুরে ফিরে।

ষোড়শঘটে আচার্য্য শঙ্করে
জানাবে প্রণতি অতীত ভারতের
ঐতিহ্য যেন মূর্ত্ত হোলো
সম্মুখে আমার।
তুষার-প্রশান্ত স্থানে স্থানে
হেরিলাম হিমাঙ্কুর
নীল হোতে কেদার দেউল-শির,
প্রভাতের পথ ছেড়ে
প্রত্যক্ষ হোলো।

পথে চলি একা
নাহি ভয়।
কে যেন আমারে বলে
'পথিক ! সন্ধ্যাস্নান করেছে সূর্য্য
হের মহাকাল
এখানে আকাশ আর পৃথ্বীর তীর্থ সঙ্গম।
চৈত্রেরের প্রস্রবণে তুমি করো স্নান
মুক্ত পাঠ করিবার হয়েছে সময়
আহ্নিক লয়ে।
চেয়ে দেখ আকাশে বুধুর কত
তারা হয়ে ওঠে,

আর মিশে যায় লীলা-পারাবারে, ওরা
বীজ,—ক'রে পড়ে আত্মার আত্মিক ক্ষেত্রে
ফসলের প্রত্যাশায়,
বিশ্ব করে আকর্ষণ, বিকর্ষণ
প্রতিদিন ধরি'।
তোমারও জীবন
এদেরই মত অনন্ত সমুদ্রবক্ষে
প্রণব-তরঙ্গ রেখা করে খেলা
তুমি মিশে যাবে সেথা
তীর্থ হোতে তীর্থান্তরে
তব জীবনের পরিক্রমা
করি' শেষ।
ওই হের
ধূমিটির চলিয়াছে একা,
পাছে বন্ধু সারমেয় রয়ে,
সশরীরে তুমি যাবে
এই মনে আশা-স্বর্গপথে
হায়রে মানব!
নতুন জীবন স্বপ্ন:
তুষার পড়িছে গলে
শৈলশৃঙ্গ হোতে;
হে শঙ্কর! তোমারে প্রণাম!

---

# শ্রীশ্রীমায়ের বাণী

আমি আর কি উপদেশ দেবো? ঠাকুরের (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের) কথা সব বইয়ে বেরিয়ে গেছে। তাঁর একটা কথা ধারণা কোরে যদি চলতে পারো তো সব হয়ে যাবে। উপদেশ নেয় এমন আধার কই? আধার চাই মা, নইলে হয় না।

বাসনা থাকতে জীবের যাতায়াত (বারবার জন্মগ্রহণ ও মৃত্যু) ফুরোয় না। বাসনাতেই দেহ হতে দেহান্তর হয়। • • • বাসনা থাকলে পুনর্জন্ম হবেই। যেমন এক খোল দিয়ে আর এক খোলে (শরীরে) ঢুকিয়ে দিলে। একেবারে বাসনাশূন্য হয় দু'একটি।

যে জন্মে মন বাসনাশূন্য হয়, সেইটি শেষ জন্ম।

পাপ-পুণ্য-প্রসঙ্গ যেখানে হয়, সেখানে যতলোক থাকে, তাদের সবাইকেই সেই ভালমন্দের একটু না একটু অংশী হ'তে হয়।

স্বামী বলো, পুত্র বলো, দেহ বলো—সবই মায়া। এইসব মায়ার বন্ধন। কাটতে না পারলে পার হওয়া যায় না। দেহে মায়া দেহাত্মবুদ্ধি, শেষে এটাকেও কাটতে হবে।

গুরু হওয়া বড়ো কঠিন। শিষ্যের পাপ গুরুকে নিতে হয়। ভালো শিষ্য হ'লে গুরুরও উপকার হয়। রাখাল (পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ) তাই মন্ত্র দিতে চায় না। বলে, "মা, মন্ত্র দিলে অমনি শরীর অসুস্থ হয়। মন্ত্রের নামে আমার গায়ে জ্বর আসে।"

'সাধন' মানে —তাঁর পাদপদ্ম সর্ব্বদা মনে রেখে, তাঁর চিন্তাতে মনকে ডুবিয়ে রাখা। তাঁর নাম জপ কোরবে।

যার শুদ্ধ মন, সে সব শুদ্ধ দেখে। অনেক সাধনা তপস্যা কোরলে, পূর্ব্বজন্মের অনেক তপস্যা থাকলে—তবে, এ জন্মে মনটি শুদ্ধ হয়।

# ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা-সারদাদেবী

শ্রীযতীন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা-সারদাদেবী বর্ত্তমান যুগে ঐশ্বরিক মহিমার দুই জীবন্ত বিরাট প্রতীক। ভারতবর্ষের ধর্মসাধনা ও মানবজীবনের মহত্ত্বের যে আদর্শ, তাহা এই যুগে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও শ্রীমা সারদাদেবীর মধ্যে প্রাণময় মূর্ত্তি ধরিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। বেদ উপনিষদ্ এবং পুরাণে প্রাচীন ভারতের মহর্ষিবৃন্দ ও ঋষি-পত্নীদের পবিত্রতাময় ও শুচিশুভ্র সুনির্ম্মল জীবনের পুণ্য কাহিনী আমরা পড়িয়াছি। রামকৃষ্ণদেব ও শ্রীমায়ের জীবন যেন প্রাচীন ভারতের সেইসব সত্যদ্রষ্টা ঋষি ও ঋষিপত্নীদের আধ্যাত্মিক ভাবরাশির ঘনীভূত প্রকাশ। শিব ও পার্ব্বতীর পবিত্র লীলা-কাহিনী আমরা শৈশব হইতে শুনিয়া ও পাঠ করিয়া আসিতেছি। আজ এযুগে শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদার অপরূপ জীবনকথা আমরা নানাভাবে শুনিয়াছি। এই দুই চিত্র পাশাপাশি রাখিয়া দেখিলে মনে হয়—শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদার জীবনলীলা হরপার্ব্বতীর দিব্যলীলারই যেন মানবীয় প্রকাশ।

আশ্চর্য্য ও অপরূপ সৌন্দর্য্যে সুন্দর শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীমা-সারদাদেবীর জীবন। সংযম তপস্যা পবিত্রতা শুচিতা দিব্যজ্ঞান ভক্তি মানবপ্রীতি এবং আর্ত্তপতিত ও সংসার-সন্তপ্তদের প্রতি অযাচিত ক্ষমা করুণা ও স্নেহের অজস্রতার এমন আশ্চর্য্য সমাবেশ এযুগে আর কোথাও দেখা যায় নাই। মানব-মানবীর সমাজে এই পৃথিবীতে সকলের সঙ্গে বাস করিলেও ঠাকুর ও শ্রীমা মানবসাধারণের ধূলি-মলিন স্তর হইতে অতি উচ্চে অতিমানবতার জ্যোতির্ম্ময় স্তরে অবস্থিত ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যেক রাত্রে সেই ছোট ঘরটিতে শ্রীরামকৃষ্ণের চরণপ্রান্তে উপবিষ্টা সারদাদেবী। ছোট তক্তাপোষে সমাসীন শ্রীরামকৃষ্ণ—ঐশ্বরিক ভাবাবেশে শান্ত সৌম্য আনন্দময় মূর্ত্তি। অধ্যাত্ম তত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীমা ঠাকুরকে এক একটি প্রশ্ন করিতেছেন। আর ঠাকুর একে একে তাহার উত্তর দিতেছেন। ঈশ্বরীয় স্বরূপের ও ভাবের কত আশ্চর্য্য অনুভূতির বাণী ঠাকুরের মুখ হইতে উৎসারিত হইতেছে। প্রশ্ন ও উত্তরে প্রতি রাত্রি প্রভাত হইয়া যায়। শ্রীমা ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া নিজের ঘরে চলিয়া যান। সত্যই একি অবিস্মরণীয় স্বর্গীয় সুষমার চিত্র। স্থূলদৃষ্টি ও ভোগাসক্ত নরনারীর মোহমলিন চক্ষে এই দুই মহাজীবনের অপরূপ মহিমা দেখিতে পায় না। শুদ্ধচিত্ত ও ভক্তিমান সাধকের ধ্যানদৃষ্টিতেই শুধু শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদার অলোকসামান্য জীবনের মহিমা ও অপার্থিব পরিচয় সূর্য্যালোকের ন্যায় প্রকাশিত হয়।

ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের বিচিত্রতা ও বিশেষত্ব—ধন-মান-ঐশ্বর্য্যলাভে রাজ্যজয়ে ও জাগতিক সমৃদ্ধির মধ্যে নিহিত নয়। আত্মসংযম পবিত্রতা ঈশ্বরপ্রাণতা এবং সমস্ত নরনারীকে আত্মবৎ নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসাই ভারতীয় জীবনাদর্শের বিশেষত্ব। বাহিরের বিষয়-সম্পত্তি ও ঐশ্বর্য্যের প্রতি লোভ এবং তাহা সঞ্চয় করাই ভারতের আত্মার উদ্দেশ্য নয়। অন্তরের শাশ্বত সম্পদ দিব্যস্বরূপতা ও অমৃতত্বের সন্ধান এবং সেইসব অক্ষয় সম্পদ লাভই ভারতাত্মার মর্ম্মকথা। আত্মার মধ্যে যে অশেষ অক্ষয় সম্পদ নিহিত আছে—সেই সম্পদের অর্জ্জন ও অধিকারেই ভারতের প্রকৃত মহত্ত্ব ও যথার্থ পরিচয়।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বার্দ্ধক্য-অবস্থায় গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া বনে যাইয়া ব্রহ্মতত্ত্বের উপলব্ধিতে সারাজীবন নিমগ্ন হইবার জন্য উদ্যোগী করিতেছিলেন। নিজ গৃহ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার সমস্ত

বিষয়-সম্পত্তি মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী নামে দুই স্ত্রীর মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন। কাত্যায়নী ঋষিপত্নী হইলেও সাধারণ নারীদের মতন বিষয়-সম্পত্তির প্রতি অনুরক্তা ছিলেন। কিন্তু মৈত্রেয়ীর প্রকৃতি ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি ছিলেন সম্পূর্ণরূপে ধর্মপ্রাণা ধ্যানশীলা ব্রহ্মবাদিনী ও আত্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু। সর্ব্বতোভাবে তিনি ছিলেন তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞ স্বামীর সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণী। সেইজন্য তিনি স্বামীর প্রদত্ত বিষয়সম্পত্তি কিছুতেই নিলেন না। স্বামীকে তিনি প্রশ্ন করিলেন, "এই সমস্ত ধনরাশি ও বিষয়-সম্পত্তির দ্বারা আমি কি জন্মমৃত্যুর স্রোত হইতে মুক্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিব?" মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তাহার উত্তরে তাঁহার সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণীকে বলিলেন, "না, তাহা হইবে না বটে, তবে ইহার দ্বারা তোমার সাংসারিক অভাব থাকিবে না।" তাহা শুনিয়া মৈত্রেয়ী তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞ পতিকে বলিলেন, "হে স্বামিন্! যাহার দ্বারা আমি অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিব না, তাহা লইয়া আমি কি করিব? ("যেনাহং অমৃতং স্যাম কেনাহং কিং কুর্য্যাম")।" তুমি আমাকে সেই সম্পদ দাও—যাহার কোনদিন ক্ষয় নাই, যাহা লাভ করিলে মানুষ মৃত্যুকে অতিক্রম করে—যাহার দ্বারা মানুষ চিরন্তন মুক্তি শান্তি ও পরমকল্যাণে চিরপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।"

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীর এই প্রকার মহান ও পবিত্র অভিলাষ শুনিয়া অতীব প্রীত হইলেন। অতঃপর যে প্রকার সাধনার অভ্যাসে মুক্তি ও অমৃতত্ব লাভ হয়, মৈত্রেয়ীকে সেই ব্রহ্মতত্ত্ব ও তাহার উপলব্ধির জন্য সাধন-পদ্ধতি তিনি শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৪।৫।৬) মৈত্রেয়ীকে প্রদত্ত যাজ্ঞবল্ক্যের উপদেশাবলী বিস্তৃত-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

আত্মতত্ত্বের উপদেশদান প্রসঙ্গে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছিলেন, "হে মৈত্রেয়ী, স্বামী যে স্ত্রীর নিকট অতীব প্রিয় ও অনুরাগের পাত্র হন—তাহার কারণ স্বামীর দেহ নয়। পরন্তু স্বামীর মধ্যে যে প্রেমস্বরূপ আনন্দস্বরূপ ও অমৃতস্বরূপ আত্মা বিরাজ করিতেছেন—সেই আত্মার জন্যই স্বামী তাঁহার স্ত্রীর নিকট এইরূপ অতিশয় প্রিয় ও প্রেমাস্পদ হন। স্ত্রীর প্রতি যে স্বামী গভীর-ভাবে অনুরক্ত হন—তাহার কারণ, স্ত্রীর মধ্যে সেই আত্মা বিরাজিত আছেন। অতএব তুমি একমাত্র এই আত্মাকে অবগত হও। এই আত্মা পুত্র হইতেও, বিত্ত হইতেও এবং অন্য সমস্ত বিষয় হইতেও মহত্তর পবিত্রতর ও প্রিয়তর। অতএব সর্ব্ব-তত্ত্বের শ্রেষ্ঠ এই আত্মাই একমাত্র—শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনের চিরন্তন বিষয়-বস্তু।"—বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ২।৪।৫

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে দাম্পত্যজীবনের যে আধ্যাত্মিক ভিত্তির কথা বলিলেন—তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিবার ও জানিবার মতন শুদ্ধচিত্ত ও পবিত্রহৃদয় নরনারীর সংখ্যা চিরকালই অতিশয় অল্প। দৈহিক সংসক্তির মোহকে জয় করিয়া স্বামী ও স্ত্রী একে অন্যের মধ্যে সেই অনন্ত প্রেম-স্বরূপ পরমাত্মাকে দেখিয়াছেন—এরূপ মহান আদর্শ দম্পতি এখনকার ইন্দ্রিয়পরতার যুগে একান্ত বিরল। ভারতবর্ষে একদিন ছিল সেই পবিত্রতাময় যুগ—যখন তপস্যাসিদ্ধ স্বামী ও ধর্মপ্রাণা স্ত্রী ভোগবাসনাকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়া আত্মার সহিত আত্মার মিলনে এবং দেহাতীত নিষ্কলুষ প্রেমে একে অন্যের প্রতি পবিত্রতম সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে অনুরক্ত হইতেন।

ভারতবর্ষীয় বিবাহের প্রকৃত আদর্শের পরিচয় এইখানেই। এখানে বিবাহিত জীবনের যথার্থ আদর্শ জগৎপিতা যোগীশ্বর শিব ও জগজ্জননী উমা। হিমালয়রাজের কন্যা উমা, যোগীশ্বর মহাদেবকে নিজের পতিরূপে লাভ করিতে কৈলাস পর্ব্বতে গিয়াছিলেন। কিন্তু সহজে উমার সেই অভিলাষ পূর্ণ হইল না। তখন উমা বুঝিতে পারিলেন—দেবদেব মহাদেবকে পতিরূপে লাভ করিতে হইলে চাই সুকঠোর তপস্যা—যাহার সাফল্যে প্রকাশিত হয় অন্তরের শাশ্বত ও অনবদ্য সৌন্দর্য্যরাশি। যিনি সর্ব্বতোভাবে দেহাতীত অবস্থায় ব্রহ্মস্বরূপতার

অবস্থিত—সেই কল্যাণসৌন্দর্যমূর্তি শঙ্করকে পতিরূপে লাভ করিতে হইলে চাই দেহের অতীত আত্মার সেই শাশ্বত অপার্থিব অবর্ণনীয় সৌন্দর্য প্রকাশ। তাই গিরিরাজকন্যা উমা উজ্জ্বল কৌষিক বস্ত্র এবং স্বর্ণমণিময় অলঙ্কার ও অন্যপ্রকার ভূষণ প্রভৃতি সমস্ত দূর করিয়া দিলেন। সর্বাঙ্গ চন্দনাবৃতা এবং বাকল-বসনা হইয়া কঠোর তপস্যায় একান্তচিত্তে তিনি নিমগ্না হইলেন। দীর্ঘকাল একনিষ্ঠ কঠোর তপস্যার ফলে তপস্বিনী উমা যোগীশ্বর মহাদেবকে স্বীয় পতিরূপে লাভ করিলেন। সমস্ত বাসনা কামনাকে জয় করিয়া অধ্যাত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতেই শিবের সহিত উমার পরিণয় ও মিলন সম্ভব হইল।

হরপার্বতীর এই দেহাতীত নিষ্কলুষ প্রেম ও দিব্যভাবময় মিলনের পুণ্যকাহিনী আমরা বাল্যকাল হইতে অজ্ঞতাবশতঃ 'কালিদাস প্রভৃতি প্রতিভাশালী কবিদের মনোরমা কল্পনার অপরূপ সৃষ্টি' বলিয়াই এতদিন মনে করিতাম। কিন্তু আমাদের সেই ভুল অবশেষে ভাঙিল। বর্তমান যুগে এই ভোগলালসাময় যুগে এই বাঙলাদেশে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব ও শ্রীমা-সারদাদেবীর আবির্ভাব হইল। সাধন-তপস্যাহীন অতিনগণ্য মানব হইলেও আভাসে ইঙ্গিতে বুঝিতে পারিলাম—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমায়ের জীবন সর্বতোভাবে আধ্যাত্মিক অনুভূতিময়। তাঁহারা উভয়ে ব্রহ্মস্বরূপতার সমাক উপলব্ধির জীবন্ত মূর্তিমূর্তি। পূর্ণ প্রেম পবিত্রতা ভক্তি সংযম ও তপস্যার পরাকাষ্ঠায় এই অপূর্ব দম্পতি হরপার্বতী লীলার নবতর রূপ দান করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও সারদাদেবী একে অন্যের মধ্যে সর্বদা অনন্ত প্রেমস্বরূপ পরমাত্মাকে দেখিতে পাইতেন। সেইজন্য তাঁহাদের বিবাহিত জীবন ছিল পার্থিব যোনাসক্তি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত—তাহা দিব্যমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। মানব ও মানবীর রূপ হইলেও তাই তাঁহারা দিব্যভাবের মূর্তি। সমস্ত নরনারীর প্রতি তাঁহাদের অবাধ ও অগাধ স্নেহ করুণা ও বাৎসল্যের ভাব। সমগ্র মানবজাতিই তাঁহাদের নিজ পরিবার এবং আত্মীয়। সমস্ত দেশের সকল জাতির অগণিত নরনারীই তাঁহাদের আপনার জন। কেহই তাঁহাদের পর নয়। তাঁহাদের উদার অকৃত্রিম ও নিঃস্বার্থ ভালবাসা দেশগত সকল সীমাকে অতিক্রম করিয়া—সমস্ত বিশ্ব-জগৎকে প্লাবিত করিয়াছে। জাতি-ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে—সমস্ত নরনারীই তাই তাঁহাদের সন্তান। তাঁহাদের সন্তানস্নেহ অপার ও অকূল। সেই সন্তান-স্নেহের মন্দাকিনী-ধারা শত শত সহস্র সহস্র নরনারীকে অভিষিক্ত ও ধন্য করিয়াছে। সমস্ত বিশ্বচরাচরের সহিত অধ্যাত্মযোগে একাত্মতার সম্বন্ধে তাঁহারা সম্বন্ধযুক্ত। তাঁহাদের আবির্ভাবে বাঙলাদেশ বাঙালী জাতি তথা ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী ধন্য পবিত্র ও কৃতকৃতার্থ।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও সারদাদেবীর সুদীর্ঘকাল অবস্থিতির জন্যই পুণ্যতোয়া ভাগীরথীতীরে অবস্থিত দক্ষিণেশ্বর তপোবন আজ নবযুগে নূতন কৈলাসধামে পরিণত। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীসারদা জননীর জীবন-লীলাকথা অমৃতময়। তাঁহার অনুধ্যানে ও অনুকৃতিতে মানুষের অন্তরের সমস্ত মলিনতা চিরতরে দূর হইয়া যায়, মানুষ নিজের মধ্যে পরমতত্ত্বের সন্ধান পায়। ইহা আদৌ কল্পিত কথা অথবা অন্ধবিশ্বাস নয়। ইহা প্রমাণিত সত্য। যে ব্যক্তি কায়মনোপ্রাণে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও সারদাদেবীর উপদেশকে আন্তরিক সাধনার দ্বারা বাস্তবে রূপায়িত করিয়াছে—সত্যই সে জীবনের মহত্তম লাভ করিয়াছে। জগদ্গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ ও জগন্মাতা শ্রীসারদার পাদপদ্মে আমরা বারবার ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া এই প্রার্থনা করি:—"হে জগদ্গুরো! শ্রীরামকৃষ্ণ, হে জগজ্জননি সারদে! তোমরা আমাদের মধ্যে সাধন তপস্যা ও ভক্তির সেই প্রবলতা জাগ্রত করো, যাহাতে আমরা তোমাদের সুযোগ্য সন্তানরূপে ধন্য হইতে পারি।

'ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্ম স্বরূপিণে,
অবতার-বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ।
যথাগ্নের্দাহিকাশক্তি রামকৃষ্ণে স্থিতা হি যা।
সর্ববিদ্যাস্বরূপায় তাং সারদাং প্রণমাম্যহম্।
জননীং সারদাং দেবীং রামকৃষ্ণং জগদ্গুরুম্।
পাদপদ্মে তয়োশ্চিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ।'

# ব্যক্তি সমাজ ও জাতি

শ্রীহিরণ্ময় দত্ত

পৃথিবীতে বিভিন্ন শ্রেণীর অসংখ্য জীব আছে। কোনও জীবই একাকী অবস্থান করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। প্রত্যেক শ্রেণীর জীবমাত্রকেই বাঁচিয়া থাকিবার জন্য একসঙ্গে দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতে হয়। মানবজাতিও এই প্রকারে দলবদ্ধভাবে থাকিয়া ও পরস্পরে নানা ভাবে একে অন্যের সহযোগিতা করিয়া চলিলেই ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে নিজের নিজের উন্নতি করিতে সমর্থ হয়। এইজন্যই মানুষমাত্রকেই বাঁচিয়া থাকিবার ও নিজ নিজ রাষ্ট্রীয় আর্থিক বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি-সাধনের জন্য একসঙ্গে একতাবদ্ধ হইয়া বাস করা একান্তভাবেই প্রয়োজন হয়।

সমান প্রকৃতির মানুষ একত্রে যেখানে একই উদ্দেশ্য লইয়া বাস করে তাহাকে 'মানব-সমাজ' বলে। এই সমস্ত সমাজগুলি যখন কোনও একটি বিশেষ সভ্যতা কৃষ্টি ও একই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে একটি অবিচ্ছিন্ন একতার সূত্রে একটি অখণ্ড জনসমষ্টিতে পরিণত হয়, তখন তাহাকেই বলে 'জাতি'। 'জাতি' শব্দটির ঠিক সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। এ সম্বন্ধে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজ-তত্ত্ববিদ্ মনীষী ও পণ্ডিতদের মধ্যে নানা রকম মত দেখিতে পাওয়া যায়। তবে সাধারণতঃ 'জাতি' বলিতে সমান সভ্যতা সমান সংস্কৃতি এবং একই রাষ্ট্রের অন্তর্গত একই রাজনৈতিক মতাবলম্বী হইয়া সেই উদ্দেশ্য সাধনকারী কোনও দেশের সঙ্ঘবদ্ধ জন-সমষ্টিকে বুঝাইয়া থাকে।

ব্যক্তি ও সমাজের উন্নতি পরস্পরের উপর সকল সময়ে নির্ভর করে। কোনও সমাজ শক্তিশালী ও উন্নতিলাভে সচেষ্ট না হইলে সেই সমাজের অন্তর্গত কোনও ব্যক্তির উন্নতি হইতে পারে না। আবার সমস্ত ব্যক্তি একটি মহান উদ্দেশ্য সাধনে একতাবদ্ধ, সঙ্ঘবদ্ধ এবং সমানভাবে সচেষ্ট না হইলে—সেই সমাজ, সেই দেশ বা জাতির কখনই উন্নতি হইতে পারে না।

যে আকারে ও যে অবস্থায় আজ আমরা পৃথিবীর দেশে দেশে মানুষের বিভিন্ন সমাজগুলিকে দেখিতে পাইতেছি, বর্ত্তমান আকারে ও অবস্থায় তাহারা পরিণতি লাভ করিতে অনেক শত বৎসর লাগিয়াছে। নানা দেশের প্রাচীন কালের ইতিহাস পড়িলে আমরা সেই তথ্য জানিতে পারি। প্রত্যেক দেশের মানবজাতিমাত্রেই অনেক হাজার বৎসর আগে তাহাদের আদিম অবস্থায় প্রায় বন্যজন্তুর মতনই গৃহহীন অবস্থায় ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইত। তখন পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই মানবজাতির অবস্থা একই রকম ছিল। মানুষ তখন বাড়ীঘর তৈয়ারী করিতে জানিত না, পাহাড়ের গুহায় কিম্বা মাটির ভিতরে গর্ত্ত করিয়া বাস করিত। তখন তাহারা বনের বেষ হরিণ শূকর প্রভৃতি জন্তুদের হত্যা করিয়া তাহাদের মাংস পোড়াইয়া নিজেদের ক্ষুধা মিটাইত। কাপড় বুনিতে ও জামা তৈয়ারী করিতে আদিম মানুষেরা জানিত না। গাছের ছাল কিম্বা জন্তু জানোয়ারের চামড়া পরিয়া পুরুষ ও নারীরা তখন লজ্জা নিবারণ করিত। লোহার কিম্বা ইস্পাতের অস্ত্র ব্যবহার করিতে মানুষ অনেক হাজার পরে শিখিয়াছে। প্রথমে মানুষ বা জন্তুর হাড়, তাহার পরে পাথর, তাহার পরে তামার তৈয়ারী অস্ত্রশস্ত্র মানুষ ব্যবহার করিত। এই ভাবে ক্রমে ক্রমে মানুষ সভ্যতার দিকে লৌহযুগে অগ্রসর হইয়াছে।

প্রকৃতির রাজ্যে অন্যান্য প্রাণী ও জীবজন্তু কীট পতঙ্গ প্রভৃতি যে অবস্থায় প্রথমেই ছিল, সেই অবস্থায় এখনও আছে। সেই আদিম অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া তাহারা জীবনযাপন করিতেছে। মানুষ কিন্তু সেই আদিম ও অসভ্যতার অবস্থায় সন্তুষ্ট হইয়া থাকিতে আদৌ পারে নাই। প্রকৃতির সেই

নিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া ক্রমিক উন্নতির পথে নানা বাধার মধ্য দিয়া সে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। প্রথমে প্রত্যেক মানুষ অন্যান্য পশু পাখীর ন্যায় বিচ্ছিন্ন হইয়া একা একা বাস করিত। কিন্তু পরে তাহারা দেখিল—এইভাবে একা একা বাস করার মধ্যে অনেক বাধা ও অসুবিধা আছে। সেই অসুবিধা দূর করিবার জন্য তখন কয়েক জনে মিলিয়া একজোট হইয়া একসঙ্গে থাকিতে লাগিল। তাহার পর ঐ দলে লোকের সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। তাহার মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই একে একে আসিয়া জুটিল। ঐ দলগুলি ঠিকভাবে যাহাতে চলিতে পারে, সেজন্য প্রত্যেক দলের অন্তর্গত নরনারীরা নিজেদের পছন্দমতন কোনও একজন বুদ্ধিমান কৌশলী ও শক্তিশালী ব্যক্তিকে নিজেদের 'দলপতি' গোষ্ঠীপতি বা 'সর্দার' মনোনীত করিয়া তাহার নেতৃত্বে চলিতে লাগিল। প্রত্যেক গোষ্ঠীপতি বা সর্দার নিজের বুদ্ধি কৌশলে নিজের দলকে চালাইতে লাগিল।

এই সমস্ত দলগুলির প্রকৃতি ও জীবনযাত্রা সর্বত্রই একরকম আকারের ও অবস্থার ছিল না। সমাজতত্ত্ববিদ্ মনীষীরা এজন্য ইহাদিগকে গোত্র গোষ্ঠী 'Clan' 'horde' 'group' 'Sept' ইত্যাদি নাম দিয়া প্রত্যেকের বিভিন্ন প্রকৃতিগত শ্রেণী নির্দিষ্ট করিয়াছেন। তবে এই সমস্ত দলগুলির প্রকৃতি ও অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন হইলেও—তাহাদের মধ্যে একটি বিষয়ে সাদৃশ্য ছিল। সেটি হইতেছে—একই স্থানে অবস্থানকারী একই রুচিপ্রবৃত্তির ও চালচলনের নরনারীরা মিলিয়া এক একটি দলে কোনও এক নির্দিষ্ট একত্রে বাস করিত। তখন নানাদেশের লোকে প্রায়ই একজায়গাতে থাকিত না। দলবদ্ধ হইয়া দেশের এক স্থান হইতে অন্যস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত।

এই অবস্থায় মানুষের দল গৃহহীন যাযাবর জাতির (nomad tribes) ন্যায় অনেক কাল পড়িয়া রহিয়াছিল। তাহার পরে তাহারা বুঝিতে পারিল, ঠিকভাবে বাঁচিতে হইলে নির্দিষ্ট একটা স্থানে নিজস্ব স্থায়ী বসতি স্থাপন করিতে হইবে। সেই হইতে মানুষের মধ্যে স্থায়ীভাবে থাকিবার গৃহ তৈয়ারী করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। বনজঙ্গল হইতে গাছের ডালপালা ভাঙিয়া তাহাদের দ্বারা কতকগুলি খুঁটি ও চালার কাঠামো ও বেয়াল তৈয়ারী করা হইল। সেই চালার চারদিকে গাছের সরু সরু ডালপালা ঘাস ও মাটি দিয়া ঢাকিয়া তাহার ছাদ তৈয়ারী হইল। এইভাবে একসঙ্গে সারি সারি কতকগুলি ঘর তৈয়ারী করিয়া এক এক দলের স্ত্রীপুরুষেরা নিজেদের সর্দারের অধীনে এক একটি বিশেষ নির্দিষ্ট স্থানে বাস করিতে লাগিল। স্থায়ীভাবে বাস করিয়া মানবজাতির সমাজ-জীবন যাপনের ইহাই প্রথম সূচনা। ক্রমে ক্রমে এইসব স্ত্রী ও পুরুষদের মধ্যে বিবাহ-প্রথা প্রচলিত হইল। তবে সেই সময়ে এক একজন পুরুষের একত্রে চারপাঁচটি স্ত্রী থাকিত। একপত্নীত্ব বা একটি স্ত্রীকে (monogamy) বিবাহ করা মাত্র কয়েক শত বৎসর পূর্বে কোন কোন দেশে প্রচলিত হইয়াছে।

তাহার পর হইতে ঐ সমস্ত দলে লোকের সংখ্যা বাড়িয়া চলিতে লাগিল। ক্রমেই তাহারা কাঠের তৈয়ারী বাড়ীতে বাস করিতে শিখিল। কোনও রকমে সুতা বুনিয়া নিজেদের পছন্দমতন দেহের আবরণ তৈয়ারী করিতে লাগিল। নানারকম ধাতুর ও মাটির তৈয়ারী বাসন-পত্র ও অস্ত্রশস্ত্রও ব্যবহার করিতে শিখিল। নিজ নিজ বাসভূমির মাটির উৎপাদনের বিভিন্নতা অনুযায়ী ধান গম শাক-সবজী প্রভৃতি চাষ করিতে লাগিল। বাড়ীতে গরু ছাগল ভেড়া পুষিয়া দুধ খাইতে শিখিল। নদীতে সমুদ্রে মাছ ধরিবার উপায়ও ক্রমে শিখিল। এইভাবে বিভিন্ন দেশে কোথাও এক এক রকমের, আবার কোথাও পাঁচ ছয় রকমের উপজাতি ও জনসমষ্টির উৎপত্তি হইল। ইউরোপে এইসব অর্দ্ধসভ্য জনসমষ্টি ক্রমেই উন্নত হইয়া গ্রীক ও রোম্যান জাতি ও তাহার পরে কালক্রমে গল হান কলাকত ও অন্যান্য জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। অনেক হাজার বছর আগে

ঐইভাবে বিভিন্ন রীতির ও প্রকৃতির জাতি ভারতবর্ষে পাশাপাশি উৎপন্ন হইয়াছে।

সেই বহু অতীত কালে ভারতবর্ষে এইসব বিভিন্ন জাতিদের নাম ও তাহাদের উৎপত্তি ও জীবনযাত্রার সঠিক ইতিহাস এখনও জানা যায় নাই। এবিষয়ে পুরাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ইতিহাস নৃতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে দেশবিদেশের মনীষী পণ্ডিতেরা এখনও গবেষণা করিতেছেন। অনেক হাজার আগেকার ভারতে বাসকারী বিভিন্ন শ্রেণীর ও দলের লোকেদের ইতিহাস আমরা এখনও সুস্পষ্টভাবে জানিনা। ঋগ্বেদে এবং অন্যান্য প্রাচীন শাস্ত্রে আর্য্য দস্যু দ্রাবিড় কোল এবং অন্যান্য জাতিদের বিবরণ দেওয়া আছে। কিন্তু এইসব জাতির উৎপত্তির আগেও অনেক আদিম জাতি ভারতবর্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াবাস করিত বলিয়া অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন।

১৯২৪ সালে স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহেঞ্জোদাড়ো ও হারাপ্পায় বহু প্রাচীন একটি সভ্যজাতির অস্তিত্বের সম্বন্ধে আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু ইহাদের জাতিগত আসল নাম কি ছিল, অথবা তাহাদের সভ্যতা কোন্ জাতীয় সভ্যতা, সে বিষয় লইয়া বিখ্যাত ঐতিহাসিক পণ্ডিতদের মধ্যে এখনও বাদানুবাদ চলিতেছে। মহেঞ্জোদাড়োর সভ্যতার কাল অনেকের মতে খৃষ্টপূর্ব্ব ছয় হাজার বৎসর। কয়েক বৎসর আগে নর্ম্মদার উপত্যকায় আর একটি প্রাচীন সভ্যজাতির অস্তিত্বের ও সভ্যতার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। অনেক ঐতিহাসিকের মতে—নর্ম্মদার উপত্যকায় আবিষ্কৃত সভ্যতা মহেঞ্জোদাড়োর সভ্যতা অপেক্ষা আরও অনেক প্রাচীনতর কালের।

ভারতবর্ষে বৈদিকযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া রামায়ণ মহাভারতের যুগ পর্য্যন্ত আর্য্যজাতির সভ্যতা ধর্ম্মনীতি, রাজ্যবিস্তার, সমাজজীবন সম্বন্ধে অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু আর্য্যজাতিই প্রাচীন ভারতে একমাত্র সভ্যজাতি ছিল না। আর্য্য-জাতি ছাড়াও প্রাচীন ভারতে দ্রাবিড় প্রভৃতি আরও কোন কোন সভ্যজাতি ছিল। দ্রাবিড় জাতিদের সভ্যতা আর্য্যদের সভ্যতার অপেক্ষা অনেক বিষয়ে উন্নত ছিল। বিশেষতঃ প্রস্তরের ও ইটের সুরম্য গৃহ নির্ম্মাণ, তাম্র পিতলের বাসনপত্র ব্যবহার, লোহার নানারকম অস্ত্র তৈয়ারী, এবং নগরের পথ ঘাট নির্ম্মাণে দ্রাবিড়রা আর্য্যদের অপেক্ষা উন্নত ছিল। রামায়ণে অযোধ্যাবাসী সূর্য্যবংশের রাজারা আর্য্যজাতির অন্তর্গত বলিয়া পরিচিত হন। রামচন্দ্র এই বংশের বিশিষ্ট প্রধান পুরুষ। লঙ্কার রাজা রাবণ 'দ্রাবিড়বংশীয়' বলিয়া অভিহিত হন। রামায়ণে দেখা যায়—আর্য্য রাজাদের ও সম্ভ্রান্ত লোকেদের বাড়ীতে কাঠের থাম কাঠের কড়ি বরগা এবং কাঠের দেওয়াল ও মাটি পাথরের মেঝে। লঙ্কার রাজা রাবণের প্রাসাদ ইট ও পাথর দিয়া সুদৃঢ়ভাবে তৈয়ারী। সেগুলি দেখিতে ছিল সুরম্য ও সুদৃশ্য। তাহা ছাড়া লঙ্কার পথ ঘাট জলাশয় স্নানাগার উদ্যান প্রভৃতি সমস্তই উন্নত ধরণের ছিল। দ্রাবিড়রা শিল্পকার্য্য ব্যাপারে ও বাড়ীঘর তৈয়ারীতে আর্য্যদের অপেক্ষা অনেক অগ্রসর নিপুণ ও সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন ছিল। এজন্য আর্য্যরা হিংসার বশে দ্রাবিড়বংশীয় রাজা রাবণ ও তাহার জাতিকে 'রাক্ষস' বলিয়া ঘৃণা ও ঈর্ষ্যা করিত।

উত্তর ভারতেই আর্য্য সভ্যতা প্রাচীন কাল হইতে বিকশিত ও পরিণত হইয়াছিল। দক্ষিণ-ভারতে সভ্যতার মূলে দ্রাবিড় জাতিদের অবদান ও কৃতকর্ম্মতাই প্রধান। বৈদিক যুগ হইতে উত্তর ভারতে আর্য্যজাতির সহিত অন্য কোন কোন জাতির বিবাহ ব্যাপারে রক্তগত সংমিশ্রণ হইতে আরম্ভ করিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধযুগের পরে ভারতে তাহা আরও প্রবলভাবে ঘটিয়াছে—বিশেষতঃ আসাম ও বাঙলা দেশে। আর্য্য সভ্যতার বিকাশের ফলে ধর্ম্মশাস্ত্র নীতিশাস্ত্র সমাজবিজ্ঞান শাস্ত্র অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি রচিত হইয়াছে। জ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগেও ভারতবর্ষের আর্য্যজাতিরা অবশ্য প্রথম উদ্ভাবক ও প্রবর্ত্তক। আর্য্যদের সমাজ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারিবর্ণে বিভক্ত ছিল। প্রথমে এই বর্ণভেদ

মানুষের প্রকৃতি গুণ ও কর্মের অনুসারে স্থির করা হইত। তাহার পরে বর্ণ ও জাতি (caste) বংশগত হইয়া পড়িল। তখন হইতে বংশগত ধারা ধরিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতির উৎপত্তি ধরা হইয়াছে। প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে বহু ঋষি দার্শনিক মনীষী শাস্ত্রকার রাজনীতিজ্ঞ ও যোদ্ধার উৎপত্তি হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণরাই শুধু ধর্মগুরু ছিলেন না। অনেক ক্ষত্রিয় রাজা ও ক্ষত্রিয় ঋষি সেসময়ে ধর্মশিক্ষকের আসনে বসিতেন। এমনকি উপনিষদে কোন কোনও ব্রহ্মজ্ঞ ক্ষত্রিয় রাজার (অজাতশত্রু) নিকটে অনেক ব্রাহ্মণ বংশীয় সাধক (বালাকি) নতশিরে ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধ প্রভৃতি অবতার-পুরুষেরা ক্ষত্রিয় ছিলেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুই জাতি প্রাচীন ভারতে শক্তিশালী বুদ্ধিমান ও নানাবিষয়ে দক্ষ ছিলেন। এই উভয় বর্ণের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা প্রভুত্বকামী এবং দেশ ও জনসমাজের নেতৃত্বপ্রয়াসী ছিলেন। সেজন্য প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুই শ্রেণীর মধ্যে প্রায়ই নানা ব্যাপারে সংঘর্ষ লাগিয়া থাকিত। পরশুরাম ও কার্তবীর্যার্জুনের যুদ্ধ এবং রামচন্দ্র ও ভীষ্মের সহিত পরশুরামের বিবাদ ও যুদ্ধ ইহার অন্যতম প্রমাণ।

ইউরোপের সভ্যতার ইতিহাসে মধ্যে দেখা যায় —সেখানকার লোকেদের সমাজ-ব্যবস্থায় স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে জীবনযাত্রায় তেমন ভেদ ও পার্থক্য নাই। ইউরোপীয় সমাজে সামাজিক সমস্ত ব্যাপারে পুরুষদের সহিত নারীদেরও সমস্ত বিষয়ে সমান মর্যাদা ও অধিকার দেওয়া আছে। ইউরোপের জাতিভেদ—মানুষে মানুষে শ্রেণীগত ভেদ। ভারতবর্ষে বংশগত জাতিভেদ আছে। ভারতবর্ষের সভ্যতায় ধর্মবিষয়ে অনেক ব্যাপারে উদারতা দেখা যায়। কিন্তু এখানে সমাজ-শাস্ত্রে ও ব্যবহার পুস্তকে নিয়মনীতি সম্বন্ধে থাকিলেও সামাজিক চালচলন অত্যন্ত কঠোর। এখানে নারীদিগকে মধ্যযুগের সময় হইতে সামাজিক ও ধর্মগত অনেক বিষয়ে অনুষ্ঠান সম্বন্ধে বহুশত বৎসর ধরিয়া বঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। তাহা ছাড়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চজাতিদের ও জমিদারের একাধিপত্যের জন্য সমাজের নিম্নবর্গগত অসংখ্য নরনারীকে মানব-জীবনের অনেক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া প্রায় পশুর মতন হেয় ও অবনত করা হইয়াছিল।

বৌদ্ধযুগের পরে ব্রাহ্মণযুগে সামন্ততন্ত্রীয় রাজাদের সহায়তায় তথাকথিত ব্রাহ্মণরা সৌরাহিত্য-বাদের জোরে ভারতবর্ষের নিম্নবর্ণের লক্ষ লক্ষ নরনারীদের উপরে অবাধে নির্যাতন ও অত্যাচার করিত। ইহার ফলে নিম্নজাতীয় শত শত হিন্দু নরনারী বারশ শতাব্দীর পর হইতে হিন্দুসমাজ ত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। দিনের পর দিন হিন্দু সমাজে জাতিভেদ শ্রেণীভেদ ও অস্পৃশ্যতার মাত্রা আরও বাড়িতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের নিম্নজাতীয় হিন্দুদের লক্ষ লক্ষ নরনারী মুসলমান হইয়া গেল। ইহার পরে ইংরাজ রাজত্ব (১৭৫৭) আরম্ভ হইল। এখনও জাতিভেদ অস্পৃশ্যতার মাত্রা বাড়িয়া চলিতে লাগিল। তাহার ফলে মাদ্রাজ পাঞ্জাব ও বাঙলায় শত শত হিন্দু নরনারী খৃষ্টান ধর্ম লইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙলায় মুসলমান ধর্মগ্রহণকারী হিন্দুদের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক। মুসলমান শাসনের সময়ে (১২০৬-১৭৫৭) দিল্লী ও আগ্রা পাঠান ও মোগল শাসকদের রাজধানী ছিল। সেখানে কিন্তু বাঙলার অনুপাতে মুসলমানদের সংখ্যা অনেক কম। ষোল হয় শতকরা বিশজন। বাঙলায় মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় শতকরা সত্তর-জন। তাহারই ফলে বাঙলার তিনভাগের দুইভাগ পাকিস্তানে চলিয়া গিয়াছে।

জাপান চীন বার্মা এইসব দেশে মানুষ যে ধর্মের লোকই হউক না কেন, তাহারা চীনা বর্মী বা জাপানীই থাকিয়া যায়। কেহই নিজের জাতীয়ত্ব ত্যাগ করে না। বিভিন্ন ধর্মের লোক হইলেও সমস্ত জাপানের লোক একই জাপানী জাতি।

তৈমনি বর্ণার সমস্ত লোক একই বর্ণী জাতি, চীনদেশের সমস্ত লোক একই চীনাজাতি।

ইউরোপ ও আমেরিকার সেখানকার প্রত্যেক রাজ্যের অধিবাসীরা একই জাতীয়ত্ববোধকারী লোক। ইংলাণ্ড ফ্রান্স জার্মাণী রাসিয়া আমেরিকা প্রভৃতি সকল দেশের লোকেরা যে ধর্ম শ্রেণী বা রাজনৈতিক মতের লোক হউক না কেন—তাহারা সকলেই নিজেদের এক দেশের অন্তর্গত এক একটি অখণ্ড ও অবিচ্ছিন্ন জাতি বলিয়া মনে করে। ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর অন্য সমস্ত স্বাধীন দেশের লোকেদের মধ্যে এই একজাতিত্ববোধ অস্থিমজ্জাগত। যে কোনও অবস্থায় তাহারা পতিত হউক না কেন, কিছুতেই তাহারা এই এক-জাতিত্ববোধ বিসর্জন দেয় না। রাসিয়ার প্রত্যেক নরনারীই জানে—"আমি প্রথমে রাসিয়ান, তারপরে অন্য কিছু।" ইংলাণ্ড ফ্রান্স জার্মাণী আমেরিকা প্রভৃতি দেশের লোকেদের মধ্যে প্রত্যেক নরনারী নিজেদের সমস্ত দেশবাসীর সহিত নিজেদের অখণ্ড ও এক জাতিত্ববোধে দৃঢ় বিশ্বাসী ও সংস্কারসম্পন্ন। ইহা ছাড়াও ঐসব দেশের জাতিদের আর একটি মহৎ গুণ—সেই গুণটি স্বদেশপ্রেম। "আমার ব্যক্তিগত পরিবারগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য গৌণ ( secondary ), সকলের আগে আমার দেশের স্বাধীনতা, সকলের আগে আমার দেশের রাষ্ট্রীয় সম্মান এবং জাতির সর্ববিষয়ে উন্নতি ও স্বাতন্ত্র্য—" এই মনোভাব ইউরোপ আমেরিকার প্রত্যেক দেশের লোকেদের মধ্যে অস্থিমজ্জাগত। এই একজাতিত্ববোধ ও এই স্বদেশপ্রেম অস্থিমজ্জাগত থাকার জন্য ইউরোপ আমেরিকার কোনও দেশকে পরাধীনতার দুর্ভোগ ও অপমানের ভার বহুকাল বহন করিতে হয় নাই। ইউরোপ আমেরিকার কোন কোন দেশের লোক কখনও কখনও বিদেশীর পরাধীন হইলেও—তাহাদের সেই পরাধীনতা বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। দেশের সমস্ত লোক একজাতিত্ব-বোধ ও স্বদেশপ্রেমের প্রেরণায় একত্রবদ্ধ ও সম্মিলিত চেষ্টার ফলে শীঘ্রই আবার নিজেদের দেশকে স্বাধীন করিতে পারিয়াছে।

এই একজাতিত্ববোধ (one-race-consciousness) ও স্বদেশপ্রেম ভারতবর্ষে কখনও জাগে নাই। ভারতবাসী আমরা গড়ে মজ্জায় আত্মকেন্দ্রিক। দেশপ্রেম নাগরিকতা-বোধ ( civic sense ) ও একজাতীয়ত্ববোধ যেন আমাদের জাতীয় প্রকৃতির বিরোধী। শুধু নিজের ব্যক্তিগত পরিবারগত ও শ্রেণীগত স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া আমরা কোনও বিষয়ে দেশ ও জাতির হিতকারী ভাবিতে ও কর্ম করিতে পারি না ও চাইনা—যদিও আমরা 'জগদ্বিখ্যাত ধার্মিকের জাতি'। ধর্ম বিষয়ে বিদ্যা জ্ঞান সংস্কৃতি ও সুনীতির ব্যাপারে অন্য সমস্ত জাতিদের অপেক্ষা ভারতবর্ষ উন্নত বটে। কিন্তু তাহার অধিবাসীদের মধ্যে কখনও জাতীয় একতা, একজাতিত্ববোধ ও স্বদেশপ্রেম সামূহিক ভাবে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। তাহা ছাড়া একতা সঙ্ঘবদ্ধতা, সময়নিষ্ঠা, ব্যবহারিক কর্মকুশলতা এবং পরস্পর সহযোগিতার দ্বারা দেশ জাতি ও সমাজের উন্নতি-সাধন করার গুণ চেষ্টা ও ইচ্ছা অধিকাংশ ভারতবাসীদের প্রকৃতিতে আদৌ নাই বলিলেই হয়। ইহা ছাড়াও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির ও জাগতিক কর্ম-কুশলতা এবং রাজনীতিক বাণিজ্যনীতিক এবং বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে উৎসাহ আগ্রহ ও কর্মনৈপুণ্য ভারতবাসীদের মধ্যে সাধারণতঃ নাই। আমাদের জাতির অধিকাংশ লোকই বহুশত বৎসর ধরিয়া পরনির্ভরশীল, কর্মবিমুখ বাচাল ও অদৃষ্টবাদী। ধর্মের নামে আলস্য ভাবপ্রবণতা যুক্তিবিচারহীনতায় আমরা অত্যন্ত অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। এইজন্য ভারত-বাসীদের বাদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশশতাব্দীর মধ্যভাগ (১২০৬ হইতে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ) পর্যন্ত বিভিন্ন বিদেশীর কাছে পরাধীন থাকিতে হইয়াছে। প্রায় সাড়ে সাতশত বৎসর ধরিয়া পরাধীন থাকিয়া ভারতবাসী হিন্দুদের বিদেশী শাসকজাতির কাছে অকথ্য লাঞ্ছনা বঞ্চনা নির্যাতন অত্যাচার অপমান ও অবজ্ঞা সহ্য করিতে হইয়াছে।

এই একজাতিত্ববোধ জাতীয় একতা ও স্বদেশপ্রেম এবং স্বদেশ ও সমগ্র সমাজের উন্নতির জন্য সমস্ত

ভারতবাসীর সম্মিলিত প্রচেষ্টা না থাকা—ভারতবর্ষে জাতীয় চরিত্রের ও জাতীয় সভ্যতার একটি মারাত্মক দোষ ও অপূর্ণতা। সেই চারপাঁচ হাজার বৎসরের —এমনকি তাহারও বহুকাল পূর্ব্ব হইতে—ভারতবর্ষ এখনও নানা প্রকার বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ও বিবাদপরায়ণ শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের বাসভূমি হইয়া আছে। সমাজ বা দেশের রাষ্ট্রীয় বা অন্যকোন সঙ্কট উপস্থিত হইলে ভারতবাসীরা কখনও একতাবদ্ধ ও সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এইসব জাতীয় বিপদ ও রাষ্ট্রীয় সঙ্কটকে উচ্ছেদ করিতে একত্রে মিলিয়া সংগ্রাম করে নাই। ছোটবড় অনেক রাজা, অনেক রকম জাতি ( sect, tribe, provincial people), অনেক রকম মতের ধর্ম্মের দল ( Religious community ), দেশের নানা অংশের অধিবাসীদের নানা রকমের ভাষা ও আচার-ব্যবহার ইত্যাদি—সমস্ত ভারতবাসীদের মনকে চিরদিন খণ্ড-বিখণ্ড ও ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়া দিয়াছে। দরাজুদ আলেকজাণ্ডার মহম্মদ বিন-কাশিম সুলতান-মামুদ মহম্মদ-ঘোরী প্রভৃতি কোনও বিদেশী যখনই দেশকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছে, তখন তাহার বিরুদ্ধে হয়তো কোনও স্বদেশপ্রাণ নির্ভীক বীরপুরুষ নিজের সামান্য সৈন্যদল লইয়া একাকী যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিয়াছেন। কিন্তু কখনও তাহার চারিপাশের রাজারা তাহাকে সাহায্য করিতে ছুটিয়া আসে নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপে যেমন—আলেকজাণ্ডারের আক্রমণকালে ( ৩২৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে ) পাঞ্জাবের সামন্ত রাজা পুরুর একাকী নির্ভীক সংগ্রাম ও বন্দী হওয়া। আকবর ও জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে রাণা প্রতাপের একাকী যুদ্ধ করা ( সপ্তদশ শতাব্দীতে )। ভারতবর্ষে মৌর্য্য, গুপ্ত, গুপ্ত প্রভৃতি আরও অনেক পরাক্রান্ত রাজবংশের অভ্যুদয় হইয়াছে। তাহার পরে রাজপুত, মারাঠা শিখ প্রভৃতি প্রবলেরও উত্থান হইয়াছে। কিন্তু এসমস্তই কোনও বিশেষ প্রদেশ অঞ্চল দল ও সম্প্রদায়ের ( community ) লোকেদের স্বল্পকালস্থায়ী উত্থান মাত্র।

পাঠান ও মোগল বাদসাদের শাসনকালের মধ্যে মধ্যে বিদেশীদের তাড়াইয়া দিয়া ভারতকে পুনরায় স্বাধীন করিবার রাজনৈতিক সুযোগ ও পরিস্থিতি আসিয়াছিল। কিন্তু এক-জাতীয়ত্ববোধ একতা এবং রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির অভাবে ভারতবাসীরা কখনও দেশস্বাধীনতার জন্য একত্রে চেষ্টা করে নাই। প্রদেশগত, রাজ্যগত ও সম্প্রদায়গত দলাদলি ঘৃণা ও বিরোধই—তখন ভারতবাসীদের স্বাধীন হইতে দেয় নাই। পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধের (১৭৬১ খৃষ্টাব্দে) সময়ে ভারতবাসীদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা-লাভের আর একবার মস্ত একটা সুযোগ আসিয়াছিল। তখন মোগল সম্রাটদের শাসন ও রাজনৈতিক আধিপত্যের শক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পাঠান প্রভৃতি অন্যান্য বিদেশী জাতির মধ্যেও ভারতবর্ষে তেমন শক্তিশালী শাসকও তখন ছিল না। সেই সময়ে একবার মারাঠা শিখ জাঠ রাজপুত ও অন্যান্য প্রদেশের নেতাদের মধ্যে দেশ-স্বাধীনতার কথা চলিতেছিল। কিন্তু পরস্পরের অহংকার দলাদলি ও ঘৃণার জন্য সেই কথাবার্ত্তা অঙ্কুরেই নষ্ট হইল। এদিকে ক্রমেই সুযোগ বুঝিয়া বণিকের জাতি চতুর ইংরাজরা সমস্ত ভারতবর্ষে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করিবার কৌশল চালাইতে লাগিল। তাহার পর ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমান সমস্ত অধিবাসীদের রাজনৈতিক অজ্ঞতা ও জাতীয়ত্ববোধহীনতার জন্য ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভারতবর্ষ ইংরাজদের কবলে আসিয়া পড়িল।

প্রায় একশো নব্বই বৎসর (১৭৫৭-১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ) ধরিয়া সাত-আটশো ইংরাজরা ভারতবাসীদের মধ্যে অবাধে রাজত্ব করিল। দিনের পর দিন সম্প্রদায়-গত ও প্রদেশগত ভেদনীতির (Divide and rule policy) কূটকৌশল ইংরাজেরা চালাইল। তাহার পর ধনে বাণিজ্যে শিল্পে শোষণ করিতে করিতে ভারতবাসীদের শ্রীহীন একটা জনসমষ্টিতে পরিণত করিয়া দিয়া ইংরাজরা এদেশ হইতে চলিয়া গেল। যাইবার সময়ে ভারতবর্ষের একটি বিশেষ অংশ পাকিস্তান রূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া গেল।

ভারতবর্ষ বহু শতাব্দীর পরে আজ স্বাধীন হইয়াছে। কিন্তু এখানে আমাদের নিজেদেরই কাছে জিজ্ঞাস্য—"আজ আট বৎসর ভারতবাসীরা স্বাধীন

হইয়াছে বটে—কিন্তু সমস্ত ভারতবাসীদের মধ্যে একজাতিত্ব-বোধ ও যথার্থ স্বদেশপ্রেম আজও কি জাগিয়াছে ?" বরং দেখা যাইতেছে—প্রদেশের সীমানা লইয়া ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশবাসীরা অপর প্রদেশের উপরে নানা ব্যাপারে ঈর্ষ্যাপরায়ণ বিরোধী ও বিদ্বেষী হইতেছে। মনে হয়—ইহাতে ভারতবর্ষ কিছুকাল পরে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন রাজ্যের ( Balkanised ) ভৌগলিক স্থানে মাত্র পরিণত হইবে। আজ পৃথিবীর অন্য সমস্ত জাতিদের জাতীয় অগ্রগতি এবং জাতীয় একাত্মতার সহিত আমাদের জাতির বর্ত্তমান অবস্থা মিলাইয়া দেখা একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। আজ আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই নিজে নিজেকে প্রশ্ন করিতে হইবে—"যাহাকে যথার্থ জাতীয়ত্ব ও জাতিত্ব-বোধ ও আন্তর্জাতিকতা বলা হয়, তাহা কি আমরা এখনও আয়ত্ত করিতে পারিয়াছি ? সমস্ত ভারতবাসী কি আজ প্রদেশগত, সম্প্রদায়গত, অঞ্চলগত ও ভাষাগত (provincial, communal, regional and linguistic ) প্রভৃতি বিভিন্নতার পশ্চাতে নিজেদের একমন একপ্রাণ ও এক উদ্দেশ্য লইয়া সর্ব্বাধীনভাবে জাতীয় উন্নতি সাধনের জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছে ? অথবা আমরা সেই পঞ্চদশ শতাব্দীর বিরোধ বিদ্বেষময় সামন্ত-তান্ত্রিক ও পৌরহিত্যবাদের যুগে এখনও আবদ্ধ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছি ?" বর্ত্তমানে স্বাধীন ভারতের প্রদেশে প্রদেশে পরস্পর ঈর্ষ্যা বিদ্বেষ ভেদভাব ও বিবাদ দেখিয়া কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বাণী মনে পড়ে :—

'যে এক তরণী—সঙ্ক লোকের নির্ভর,
খণ্ড খণ্ড করি তারে—ডুবিবে সাগর ?"—(নৈবেদ্য)

---

# চব্বিশ পরগণার—হালিসহর

শ্রীবিজয়গোপাল বসু

পশ্চিম বাঙলার চব্বিশ পরগণা একটি বৃহৎ ও বিখ্যাত জেলা। এখানে গঙ্গার পূর্ব্বতীরে 'হালিসহর' নামে একটি স্থান আছে। "শাক্ত মতাবলম্বী বিখ্যাত সিদ্ধপুরুষ ও ভক্তকবি রামপ্রসাদের জন্মভূমি ও বাসস্থান" বলিয়াই এখন হালিসহরের নাম বাঙলার হিন্দু নরনারীদের কাছে পরিচিত। কিন্তু হালিসহরের নাম শুধু মহাত্মা রামপ্রসাদের জন্মস্থান ও সাধনপীঠ বলিয়াই অতীতকালে খ্যাত হয় নাই। আজ হালিসহর জনশূন্যপ্রায় একটি পরিত্যক্ত স্থানে অবশ্য পরিণত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। কিন্তু অন্ততঃ দুইশত বৎসর আগেও হালিসহর ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য নবশাখ প্রভৃতি কয়েক হাজার স্বচ্ছল অবস্থার ব্যক্তিদের এবং আরও চার পাঁচ হাজার অন্য লোকেদের বাসস্থান ছিল। হালিসহরে পাঁচ ছয় শত বৎসর ধরিয়া বহু উচ্চবংশীয় ধনীমানী সুপণ্ডিত ব্যক্তি বাস করিতেন। হালিসহরে এক সময়ে সংস্কৃত বিদ্যাচর্চ্চার একটি বিখ্যাত কেন্দ্র ছিল। ন্যায় বেদান্ত সাংখ্য স্মৃতি তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রে অনেক মনীষী পণ্ডিত এখানে এক সময়ে বাস করিতেন। তাঁহাদের নিকটে অনেক মেধাবীছাত্র বাঙলার অন্য স্থান হইতে শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়নের জন্য আসিতেন। সংস্কৃত বিদ্যা ও শাস্ত্রে হালিসহরের পণ্ডিতেরা এমন অসাধারণ জ্ঞান ও দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন যে, তাহা নবদ্বীপ ভাটপাড়া ত্রিবেণী পূর্ব্বস্থলী বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিত সমাজকেও বিস্মিত করিয়া দিয়াছিল।

শুধু মনীষী পণ্ডিতদের বাসস্থান বলিয়া হালিসহর অতীত কালে খ্যাতি ও যশ অর্জ্জন করে নাই। আজ প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে, হালিসহরে দশনামী কয়েকজন বৈদান্তিক "সন্ন্যাসী. সাধক ও বৈষ্ণবভক্ত এখানে আশ্রম স্থাপন করিয়া বাস

করিতেন। তাঁহারা এখানে সাধনা ও সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। মহাত্মা রামচন্দ্র পুরী এবং তাঁহার গুরু প্রভৃতি সিদ্ধ মহাত্মাদের আশ্রম, আজ প্রায় ছয়শত বৎসর আগে এখানে কোনও স্থানে অবস্থিত ছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রথম দীক্ষাগুরু সিদ্ধমহাত্মা ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান ও সাধনাস্থল এই হালিসহর। সিদ্ধমহাত্মা শ্রীমৎ মাধবেন্দ্রপুরীও এখানে অনেক বৎসর তপস্যান্তে কাটাইয়া গিয়াছেন বলিয়া অনেক ঐতিহাসিক বলিয়া থাকেন।

কলিকাতার শিয়ালদহ রেলষ্টেশন হইতে ত্রিশ-মাইল দূরে উত্তরে রেলপথে হালিসহরে যাওয়া যায়। নৈহাটি জংশন হইতে হালিসহর প্রায় ছয় মাইল উত্তরে অবস্থিত। হালিসহর যে সময়ে বাঙলাদেশে একটি সমৃদ্ধ ও জনবহুল পরগণা ছিল—তখন কলিকাতা সহরের নাম কেহই কল্পনা করিতে পারে নাই। যেখানে আজ কলিকাতা সহরের আয়তন—সেইস্থান তখন গভীর জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। আজ কলিকাতা বিরাট বিখ্যাত জনবহুল মহানগরী—আর হালিসহর প্রায় জনহীন ও জঙ্গলে ভর্ত্তি একটি পরিত্যক্ত স্থান মাত্র! প্রকৃতির রাজ্যে ইহাই একটি নির্ম্মম নিয়ম। পুরাতনকে উচ্ছেদ করিয়া নূতনকে স্থাপন করাই প্রকৃতির চিরন্তনী রীতি।

বাঙলাদেশে খৃষ্টীয় একাদশ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত সামন্ত সেন বল্লাল সেন বিজয় সেন প্রভৃতি সেনবংশীয় রাজারা রাজত্ব করিতেন (১০৫০ হইতে ১২৩০ খৃষ্টাব্দ)। সেন বংশের রাজা লক্ষ্মণসেনের (রাজত্ব-কাল ১১৮৬ হইতে ১২০৬ খৃষ্টাব্দ) রাজধানী ছিল—পশ্চিম বাঙলায় নবদ্বীপে এবং পূর্ব্ববঙ্গে সুবর্ণগ্রামে। মোহম্মদ ঘোরীর (পরে কুতবুদ্দিনের) অন্যতম সেনাপতি বখতিয়ার খিলজী ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে বাঙলা দেশ আক্রমণ ও জয় করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে বাঙলা দেশে মুসলমান রাজত্বের আরম্ভ হইয়াছিল। মুসলমান রাজত্ব স্থাপনের ফলে বাঙলার হিন্দুদের সমাজে অনেক বিপর্য্যয় ও পরিবর্ত্তন দেখা দিতে লাগিল। এই সময় হইতে বাঙলার রাজভাষা সংস্কৃতের ও বাঙলার পরিবর্ত্তে হইল ফার্সী ও উর্দ্দু। মুসলমান বাদশা ও নবাবদের রাজদরবারে উচ্চপদ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভের জন্য হিন্দুসমাজের উচ্চবংশীয় ব্যক্তিরা তখন হইতে ফার্সী ও উর্দ্দু ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। মুসলমান শাসকদের ছোট-বড় সরকারি চাকরিতে হিন্দুদের উচ্চবংশীয় ও শিক্ষিত রাজকর্ম্মচারীরা তখন চোগা চাপকান পাগড়ী প্রভৃতি পরিয়া নবাব সরকারের দরবারে আদালতে ও অন্যান্য স্থানে যাইতে বাধ্য হইতেন। উচ্চবংশীয় হিন্দুদের তখন মুসলমান উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদের সামনে মাথা নীচু করিয়া সেলাম করিতে বাধ্য করা হইত। শুধু তাহাই নয়, মুসলমান শাসনের সময় হইতে হিন্দুদের অনেক মন্দির ও দেবস্থান ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইত। অবশ্য মুসলমান নবাব সুবাদারদের সকলেই হিন্দুদের প্রতি অত্যাচারী ছিলেন না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বুদ্ধিমান সুশিক্ষিত ও কর্ম্মনিপুণ হিন্দুদের গুণগ্রাহী ও পরিপোষক ছিলেন।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙলার নবাব ছিলেন হোসেন খাঁ। হোসেন খাঁর রাজধানী ছিল মালদহের কয়েক মাইল দূরে গৌড় নামক অঞ্চলে। একসময়ে গৌড় অঞ্চলে বহু হিন্দুরাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহারা এই অঞ্চলে অনেক রাজপথ সুরম্য প্রাসাদ মন্দির দীঘি প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাইয়া গিয়াছেন। এখনও গৌড় ও মালদহে হিন্দুরাজাদের প্রাচীন প্রাচীন কীর্ত্তির অনেক নিদর্শনের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। নবাব হোসেন খাঁ ছিলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের (জন্ম ১৪৮৬—দেহত্যাগ ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ) সমসাময়িক। শ্রীচৈতন্যদেবের দুই প্রধান পার্ষদ শ্রীমৎ রূপ গোস্বামী ও শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামী হোসেন খাঁর রাজসভার অন্যতম দুইজন বিশিষ্ট মন্ত্রী ছিলেন। ইঁহাদের কার্য্যদক্ষতায় প্রীত হইয়া হোসেন খাঁ রূপকে 'দবীর খাস' এবং সনাতনকে 'সাকর মল্লিক' উপাধি দিয়াছিলেন। রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী ছাড়াও আরও অনেকজন কৃতী ও সুদক্ষ বাঙালী হোসেন খাঁর প্রিয় মন্ত্রী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে মালাধর

বসু ( নবাবপ্রদত্ত উপাধি 'গুণরাজ খাঁ' এবং 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়' নামক কাব্যগ্রন্থ প্রণেতা ) এবং গোপীনাথ বসুর ( নবাব প্রদত্ত উপাধি 'পুরন্দর খাঁ' ) নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইঁহারা মাহীনগরের বসুবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

এই সমস্ত বিশিষ্ট বাঙালী ছাড়াও আর একজন বিশিষ্ট কায়স্থবংশীয় বাঙালী হোসেন খাঁর দরবারের সভাসদদের মধ্যে বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। ইঁহার নাম—দ্বিজোত্তম ঘোষ। দ্বিজোত্তম ঘোষ বাঙলার ঘোষবংশীয় কায়স্থ জাতিদের পূর্বপুরুষ মকরন্দ ঘোষের বংশধর। মকরন্দ ঘোষ হইতে দ্বিজোত্তম ঘোষ সাতপুরুষ পরবর্তী বংশধর। "কান্যকুব্জ হইতে আদিশূরের রাজসভায় পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও পাঁচজন কায়স্থ আসিয়া বাঙলায় বাস করিতে থাকেন" বলিয়া একটি জনশ্রুতি ইতিহাসের ঘটনার নামে অনেক কাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। মকরন্দ ঘোষের নাম "সে সময়ে বাঙলার রাজা আদিশূরের রাজসভার আগত পঞ্চকায়স্থের মধ্যে অন্যতম" বলিয়া পরিচিত। সে যাহা হউক, দ্বিজোত্তম ঘোষ হোসেন খাঁর অনুগ্রহে চব্বিশ পরগণার একটি স্থানে ( বর্তমান হালিসহর যেখানে আছে ) চারিবর্গ মাইল পরিমিত একটি বিরাট ভূমিখণ্ড পাইয়াছিলেন। তখন ঐ অঞ্চলটি নানা রকম গাছপালায় পূর্ণ একটি প্রকাণ্ড জঙ্গলের মতন ছিল।

এই বিরাট ভূমিখণ্ড এবং প্রচুর অর্থ পাইয়া দ্বিজোত্তম এখানে নিজের স্থায়ী বাসস্থান নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি সমস্ত বনজঙ্গল কাটাইয়া ঐস্থান পরিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। দ্বিজোত্তম দেখিলেন—একাকী এখানে বাসকরা সুখকর ও সুবিধাজনক হইবে না। সেজন্য তিনি বাঙলার অন্যসমস্ত গ্রাম হইতে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য নবশাখ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের এখানে আনাইলেন। এই সমস্ত নবাগত ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি ঐ ভূমিখণ্ড নানারকম সর্তের অনুসারে ভাগ ও বিলি করাইলেন। অনেক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিনামূল্যে এখানে ব্রহ্মোত্তর জমি পাইলেন। ক্রমেই এখানে অনেক বাড়ী ও অট্টালিকা বাগান দীঘি পথ ঘাট, দোকান বাজার প্রভৃতি স্থাপিত হইল। কামার কুম্ভকার স্বর্ণকার প্রভৃতি শিল্পী ও কারিগর অনেক জাতি এখানে দ্বিজোত্তম ঘোষের আবার বাসস্থান পাইল। গঙ্গার নিকটেই বলিয়া ব্যবসাবাণিজ্য প্রভৃতিও এখানে বেশ চলিতে লাগিল। অনেকগুলি সুরম্য অট্টালিকা, দেবমন্দির, প্রশস্ত পথ দীঘি ও পুষ্করিণী এখানকার শোভাবৃদ্ধি করিল। ক্রমেই এই স্থানটি বহু লোকের সমাবেশে একটি জনবহুল নগরে পরিণত হইয়া পড়িল। অনেক অট্টালিকা (উর্দু ভাষায় 'হাবেলী') এখানে পাশাপাশি থাকায় জন্য হোসেন সাহের নবাব সরকার হইতে এই নগরের নাম হইল 'হাবেলী সহর'। এই হাবেলী সহর কথাটিই অপভ্রংশ হইয়া পরে ইহার নাম **'হালিসহর'** হইয়া পড়িয়াছে।

হালিসহর একসময়ে বড় বড় ষোলটি পাড়াতে বিভক্ত ছিল। বহু শিক্ষিত ও ধনী ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈদ্যজাতির লোকেরা ইহার অধিবাসী ছিলেন। নিজেদের পাড়ায় বাসের সুবিধার জন্য ইঁহারা মন্দির ও দেবস্থান ও পাকাকুয়া বড় বড় পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা এবং চওড়া রাস্তা তৈয়ারী ও দুইপাশে বৃক্ষরোপণ করাইয়াছিলেন। তাহা ছাড়াও তাঁহারা নিজ নিজ পাড়ায় বিদ্যালয় ও চতুষ্পাঠিও স্থাপন করিয়াছিলেন। অনেকে প্রতিবেশীদের সুবিধার জন্য পল্লীর কোন কোন স্থানে কতকগুলি দোকানদারদের এখানে আনিয়া বসাইয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষা সাহিত্য ও শাস্ত্রগ্রন্থাদির অবাধ অধ্যয়ন ও চর্চার জন্য এখানে অনেক নিষ্কর ও অধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের বাসস্থান ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই সমস্ত অধ্যাপকেরা সংখ্যা ন্যায় বেদান্ত তন্ত্র স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞানী ছিলেন। ক্রমেই ব্যবসা বাণিজ্য ও বিদ্যাচর্চার একটি বিশিষ্ট স্থানরূপে হালিসহরের খ্যাতি ও গৌরব বাঙলা-দেশের অনেক জেলায় ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

সে সময়ে হালিসহরের পণ্ডিতেরা বাঙলা দেশে অত্যন্ত প্রসিদ্ধি ও খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। এসম্বন্ধে অনেক ঘটনার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তখনকার দিনে নিজের বিদ্যার শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ ও তাহা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা দিগ্বিজয় করিতে অন্যান্য পণ্ডিতদের দেশে মধ্যে মধ্যে যাইতেন। এক সময়ে নবদ্বীপ হইতে কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিত একবার হালিসহরের পণ্ডিতদের সহিত শাস্ত্রযুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন। নবদ্বীপের ঐ সমস্ত পণ্ডিত অধ্যাপকেরা হালিসহরের অন্তর্গত কুমারহট্টে সর্ব্বপ্রথমে উপস্থিত হইলেন। সেখানে স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী সুবিখ্যাত পণ্ডিত কামদেব শিরোমণি মহাশয়ের বাটিতে নবদ্বীপের পণ্ডিতবৃন্দকে সম্মান ও শ্রদ্ধার সহিত অভ্যর্থনা করা হইল। পল্লীবাসী পণ্ডিতেরা আসিয়া সযত্নে অতিথি পণ্ডিতদের প্রতি একান্ত যত্নের সহিত আতিথ্য সৎকার করিলেন।

হালিসহরে সেই সময়ে প্রায় সর্ব্বত্রই বহুস্থান হইতে আগত বিদ্যার্থীদের শাস্ত্র-অধ্যয়নের সমবেত কণ্ঠস্বর প্রভাতে মধ্যাহ্নে ও রাত্রে এই স্থানকে মুখরিত করিয়া রাখিত। বিদ্যানিষ্ঠ পণ্ডিতদের সুদৃষ্টান্ত এখানকার মধ্যে সাধারণ লোকেদের মধ্যেও শাস্ত্রের প্রতি অধ্যয়নে অনুরাগ জন্মাইয়াছিল। তাহার ফলে এখানকার জনসাধারণের মধ্যে অনেকেরই কোন কোন শাস্ত্রের সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা ও জানাশোনা ছিল। সুতরাং এই ব্যাপার হইতে বুঝিতে পারা যায়, সে সময়ে হালিসহরে বিদ্যা ও শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অনুশীলনের কি প্রকার অনুকূল পরিবেশ ছিল।

একদিন সেখানে পূর্ব্বোক্ত ঐ দুই পক্ষীয় বিরোধী পণ্ডিতদের মধ্যে একটি প্রস্তাব এইভাবে গৃহীত হইয়াছিল :—ঐ প্রস্তাবের অনুসারে —নবদ্বীপ হইতে আগত কোনও পণ্ডিতকে হালিসহরের কোনও পণ্ডিতের বাড়ীর পরিচারিকার নিকট নিজের অধীত বিদ্যার গভীরতা প্রমাণ করিতে হইবে। এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে পারিলে নবদ্বীপের সেই পণ্ডিত মহাশয়ের পাণ্ডিত্যের প্রতি স্থানীয় পণ্ডিতেরা যথোচিত মর্য্যাদা ও সম্মান দান করিবেন। নবদ্বীপবাসী পণ্ডিতেরা অগত্যা সেই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

কুম্ভকার জাতীয়া কোন প্রৌঢ়া নারী তাহার পঞ্চম বর্ষবয়স্ক শিশু পুত্রকে লইয়া অতিথি পণ্ডিতদের সেবাকার্য্যে রত থাকা কালীন ছেলেটি অকস্মাৎ ভীষণ চীৎকার আরম্ভ করিতে লাগিল। মাতার অনেক প্রচেষ্টার পর জানিতে পারা গেল যে, নিশাশেষে বায়সগণের "কা-কা" ধ্বনির হেতু অবগতির জন্য শিশুটি উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ক্রন্দন করিতেছে। অতিথি পণ্ডিতগণ কোমল মতি ঐ বালকের এরূপ জটিল প্রশ্নে বিস্মিত হইয়া গেলেন। শাস্ত্রবিচারে পূর্ব্বপক্ষেই জ্ঞান ও বিদ্যার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহারা ঐ নারীকে মনীষার আকর বলিয়া বোধ করিলেন। পুত্রের প্রশ্নের সদুত্তর প্রাপ্তির আশায় জননী পুত্রকে পণ্ডিতগণের নিকট প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা এই অশ্রুতপূর্ব্ব প্রশ্নের কোনই উত্তর দানে অক্ষম হইলেন না। তখন পরিচারিকা সন্তানের সান্ত্বনার জন্য নিজ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া আবৃত্তি করেন :—

"তিমিরারিস্তমোহন্তি শঙ্কান্বিত মানসাঃ।
বয়ং কাকাঃ, বয়ং কাকঃ ইতি জল্পন্তি বায়সাঃ।"

শ্রবণমাত্রেই ক্রন্দনরত বালক শান্ত হইল। অলঙ্কার-শাস্ত্রের এমন মধুর শ্লোক সামান্য একটি পরিচারিকার মুখে শুনিয়া পণ্ডিতগণ হতবাক্ হইয়া গেলেন। শিশুটির বোধশক্তিও তাঁহাদিগকে চমৎকৃত করিল। তাঁহারা বুঝিলেন, হালিসহরের পণ্ডিতগণ প্রত্যেকে জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের সাগর। সেখানকার স্ত্রী-পুরুষ শিশু-যুবক প্রত্যেকেই অল্পবিস্তর পাণ্ডিত্য-শক্তিশালী। অতএব হালিসহরে জয়লাভের আশা পরিত্যাগ করিয়া অতিথি পণ্ডিতগণ গোপনে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

আমরা এই প্রবন্ধে ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি— মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের দীক্ষাগুরু মহাত্মা ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান এই হালিসহর। নবদ্বীপ হইতে নীলাচলে গমনকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় গুরুধাম দর্শন করেন

এবং ভূমিতে গড়াগড়ি দিয়া বলিয়াছিলেন, "এই হালিসহর সামান্য নয়, ইহা আমার কাশী বৃন্দাবন, আমার ইন্দ্রপুরী স্বর্গধাম, আমার জীবন ধন প্রাণ। এখানকার মৃত্তিকায় আমার ভাবসমুদ্রের কাণ্ডারীর পদরজঃ মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে।" অন্তর্যামী মহাপ্রভু কয়েক মুষ্টি ধূলি বস্ত্রাঞ্চলে বন্ধন করিয়া সঙ্গে লইলেন।

'শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে' লিখিত আছে :—

"আপনে ঈশ্বর শ্রীচৈতন্য ভগবান্।
দেখিলেন শ্রীঈশ্বরী পুরীর জন্মস্থান॥
প্রভু বলে কুমারহট্টের নমস্কার।
শ্রীঈশ্বরী পুরী যে গ্রামে অবতার॥
কীর্তিলেন চৈতন্য বিস্তর সেই স্থানে।
আর কিছু নাই লভ্য ঈশ্বরপুরী বিনে॥
সেই স্থানের মৃত্তিকা আপনে প্রভু তুলি।
লইলেন বহির্বাসে বেঁধে এক ঝুলি॥
এই মৃত্তিকা আমার জীবন ধন প্রাণ॥"

—ইত্যাদি

কুমারহট্টের প্রান্ত দেশে জাহ্নবীর উপকূলে নির্মিত সুরম্য মন্দিরে ঈশ্বর পুরীর প্রতিমূর্তির নিত্য পূজা হইতেছে। ঐ মন্দিরের চত্বরে তাঁহার বাসভবন চিহ্নিত স্থান ও ভক্ত যাত্রীদের পুণ্যতীর্থ ক্ষেত্র।

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রিয় পার্ষদ শ্রীনিবাস ঠাকুরও এই হালিসহরের অধিবাসী ছিলেন। মুখুয্যে পাড়ার মধ্যে শ্রীনিবাস ঠাকুরের পাট আছে। তাঁহার তিরোধান দিবস উপলক্ষ্য করিয়া প্রতি বৎসর এখানে একটি মেলা বসে। নবদ্বীপ ভাটপাড়া প্রভৃতি স্থান হইতে বড় বড় পণ্ডিতেরা এখানে আসিয়া শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন। উৎসব উপলক্ষে সমাগত ভক্ত নরনারীদের মধ্যেও প্রসাদ বিতরণ করা হইয়া থাকে। বলরাম তর্কসিদ্ধান্ত, কামদেব ন্যায়-বাচস্পতি প্রভৃতি সুবিখ্যাত মনীষী পণ্ডিতেরা এই কুমারহট্টে জন্মগ্রহণ ও ছাত্রজীবন যাপন করিয়া ছিলেন।

এক সময়ে হালিসহরে অনেক ধর্মনিষ্ঠ, সদাচারী ও সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ ও শাস্ত্রনিষ্ঠ ব্যক্তির বসবাস ছিল। রজক-বীর একদিন প্রাতঃকালে গঙ্গাগর্ভে সুপরিস্ফুট নারিকেল মালা দ্বারা বিশুদ্ধ উচ্চারণের সহিত পিতৃপুরুষের তর্পণ করিতে-ছিলেন। তাঁহার ক্রিয়া-কলাপে আকৃষ্ট নৌকারোহী কোনও পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁহার কাছে আসিয়া তর্পণ-কার্য শেষে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন—কস্ত্বম্ (তুমি কে?) ধোপা উত্তরে বলে—রজকোঽহম্ (আমি রজক)। পণ্ডিত—কিং করোষি ত্বম্ (তুমি কি করিতেছ)? রজক—তর্পণমহম্ করিমি (আমি পিতৃপুরুষের তর্পণ করিতেছি)।" রাজা প্রতাপাদিত্য যখন সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া বাঙলাদেশকে একটি স্বাধীন হিন্দু রাজ্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন—তখন তিনি হালিসহরের প্রতি বিশেষ প্রভাবান্ ছিলেন। হালিসহরের কিছুদূরে পার্শ্ববর্তী জগদ্দলে এবং শ্যামনগরে সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ এবং বিস্তৃত খাদি খুদ প্রভৃতি খনন করাইয়া তিনি হালিসহরেরই মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। জগদ্দলে আসিয়া প্রতাপাদিত্য কুমারহট্টেই বাস করিতেন। সেখানকার গুণী, জ্ঞানী এবং বিদ্বান্দিগকে নানা প্রকার দানে তিনি উৎসাহিত করিয়া গিয়াছেন। হালিসহরের বাসিন্দাদের নিকট প্রতাপাদিত্যের প্রদত্ত ব্রহ্মত্র, দেবত্র মহাত্রাণাদি নিষ্কর ভূমির সনদ এখনও সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। ভোগ-বৃদ্ধলার জন্য প্রতাপাদিত্য চারিটি 'সমাজ' সৃষ্টি করেন—কুমারহট্ট তাহাদের একতম। এই কুমারহট্ট সমাজই 'হালিসহর সমাজ' নামে সুপরিচিত। অষ্টাদশকালে ইহার আদর ছিল, কদর ছিল ও সমঝদার ছিল। বাঙলার অন্যস্থানের সম্ভ্রান্ত লোকে এখানে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত করিয়া নিজেদের সম্মানিত বোধ করিতেন। প্রতাপাদিত্যের পরাজয় ও মৃত্যুর পরে যশোহর-চাচড়া রাজবংশের একটি শাখা হালিসহরে উঠিয়া আসে। সেই বংশীয় ব্যক্তিদের বাসভবনের ধ্বংসাবশেষ নিদর্শন হালিসহরের অন্যতম গৌরবের বস্তু। এখানকার 'রাজবাটী' পল্লীর নাম চাচড়ার রাজবংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

প্রতাপাদিত্যের পক্ষস্থ সামরিক কর্ম্মচারিগণের অনেকেই হালিসহরের বিভিন্ন স্থানে বাস করিতেন। তাঁহারাও নিজেদের এবং সাধারণের সুখ-সুবিধার জন্য অনেক জনহিতকর অনুষ্ঠান করিয়া হালিসহরকে গরিমাময় করিয়া গিয়াছেন। কোণা গ্রামে নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর হস্তিশালার অন্যান্য হটুয়ারার দুর্গ-প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ হালিসহরের অন্যতম ঐতিহাসিক কীর্ত্তির স্থান।

খৃষ্টীয় ১৭১৬ অব্দে সংস্কৃত পণ্ডিত সুরসিক কবি অযোধ্যারাম হালিসহরের মুখুজ্যে পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। অদ্ভুত গোস্বামী বা 'আজু গোসাঞি' তাঁহার সাধারণ নাম। বিখ্যাত শক্তিসিদ্ধ ও সাধক কবি রামপ্রসাদও তাঁহার সমসাময়িক এবং কিছু দূরবর্ত্তী প্রতিবেশী ছিলেন। হালিসহরের বুকে বসিয়া রামপ্রসাদ অনেক শ্যামাসঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। রামপ্রসাদের একনিষ্ঠ ভক্তি ও গভীর সাধনার আকর্ষণে জগজ্জননী কালী তাঁহাকে বহুবার দর্শন দিয়াছিলেন। রামপ্রসাদের জীবনের অনেক কথা বাঙলার ঘরে ঘরে সুপরিচিত। সাধক-কবি রামপ্রসাদের গান বাঙালীর প্রাণের সামগ্রী। 'জগজ্জননী রামপ্রসাদের সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়া তাহার গান শুনিতেন' বলিয়া অনেক কাহিনী বাঙলাদেশে প্রচলিত আছে। জগজ্জননীর আবির্ভাবে হালিসহর সত্যই একটি তীর্থস্থান হইয়াছে। রামপ্রসাদের রচিত বর্দ্ধ-সীতাবলী বাঙলার সঙ্গীত-সাহিত্যে প্রসিদ্ধ। হালিসহর রামপ্রসাদের সাধনা ও তাঁহার মাতৃনাম গানের এখন প্রধানতঃ জনসমাজে বিখ্যাত। সেজন্য তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রেষ্ঠ সাধক ও মনীষী পুরুষদের নাম লুপ্ত হইয়া হালিসহর এখন রামপ্রসাদের স্মৃতির সহিতই শুধু এইস্থান যুক্ত হইয়া রহিয়াছে।

রামপ্রসাদের কথা উঠিলে হালিসহরের কথা মনে উঠে, আবার হালিসহরের কথা উঠিলে রামপ্রসাদের কথা মনে উঠে। ১৭১০ খৃষ্টাব্দে (অথবা কাহারও মতে ১৭১২ খৃষ্টাব্দে) সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে রামপ্রসাদ পরলোক গমন করেন। তখন ভারতে ইংরেজ আধিপত্যের সূত্রপাত হইয়াছে। কলিকাতা নগরী তখন মিল্লীর ও মুর্শিদাবাদের গৌরব হরণ করিয়া নিজেকে সমৃদ্ধ করিতেছিল। ঐ সময় হইতে শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিগণ এই নূতন স্থানে ব্যবসা বাণিজ্য এবং চাকুরি দ্বারা জীবিকা-অর্জ্জনের জন্য বাস করিতে থাকেন। হালিসহর হইতেও ঐ সময়ে অনেকে কলিকাতায় চলিয়া আসেন। প্রধান ব্যক্তিদের দেশত্যাগে জনপদের স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষা বিষয়ক ধর্ম্ম বিষয়ক অবনতি ঘটে। সিপাহীবিদ্রোহের বহ্নি প্রশমিত হইবার পর, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে হালিসহর মহামারিরূপে ভীষণ ম্যালেরিয়া রোগ দেখা দেয়। তাহাতে বহুলোকের মৃত্যু হইয়াছিল। যাঁহারা জীবিত থাকিলেন তাঁহাদের অনেকেই হালিসহর ত্যাগ করিয়া অন্যস্থানে চলিয়া গেলেন। আর্থিক অবস্থার দৈন্য কিম্বা অন্য কোনও কারণবশতঃ যাহাদের পক্ষে অন্যত্র যাওয়া সম্ভব হইল না, কেবলমাত্র তাঁহারাই বাধ্য হইয়া হালিসহরে রহিয়া গেলেন। ই-বি-আর রেল কোম্পানি রেলপথ প্রস্তুত করিবার কালে এবং কাঁচরাপাড়ায় রেল কোম্পানির প্রকাণ্ড কারখানা প্রতিষ্ঠার সময়ও বহু গৃহস্থ ব্যক্তি সপরিবারে স্থানান্তরে গমন করিতে বাধ্য হন। তাহার পরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় (১৯৩৯-৪৪) এখানে আমেরিকানরা সৈন্যাবাস, যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুতের কারখানা প্রভৃতি স্থাপনের জন্য ভূমি ক্রয় করেন। সেইজন্য অনেকে পৈতৃক বাসভবন ছাড়িয়া গিয়াছেন। এই প্রাচীন স্থানের অভ্যন্তর প্রদেশে এখন জনবসতি খুবই কম। অনেক দুতলা তিনতলা বাড়ী জনশূন্য ও জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া সর্প-শৃগালের থাকিবার জায়গায় পরিণত হইয়াছে। কোন কোন বাটিতে দুই একজন মাত্র বৃদ্ধ বা প্রৌঢ় বয়সের পুরুষ বা স্ত্রী তত্ত্বাবধায়ক রূপে বাস করিতেছেন। সপরিবারে বাসকারী গৃহস্থ লোকের সংখ্যা এখন এখানে খুবই কম। এখানে একটি মিউনিসিপ্যালিটি আছে। সেই প্রতিষ্ঠান হইতে বড় বড় রাজপথগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং রাত্রে

পথের ধারে আলো দিবার ব্যবস্থা আছে। প্রকাণ্ড স্থানে ৺শিবমন্দির ও অন্যান্য বহু দেবালয় জীর্ণ দশায় বর্তমান। বৎসরের কোন বিশেষ বিশেষ পর্বদিনে ঐ সমস্ত ধর্মাধিষ্ঠানে অতি দীনভাবে দেবতার পূজা-ভোগ হইয়া থাকে। রামপ্রসাদের বাসভবনের জমির একাংশে দুইটি ঘর ও খোলা দালান নির্মিত হইয়াছে। প্রত্যেক বৎসরে কার্তিকমাসে কালীপূজার দিন অতি সমারোহে এখানে ৺কালীপূজা হইয়া থাকে। বটগাছের তলায় যে পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসিয়া রামপ্রসাদ সাধনা করিতেন সেখানে একটি ইট ও সিমেন্টের বেদী তৈয়ারী করাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

রামপ্রসাদের হালিসহর এখন অস্বাস্থ্যকর এবং স্বল্প বসতিপূর্ণ হইলেও শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দের ভক্ত-শিষ্যগণ এখানে গঙ্গাতীরে একটি সুদৃশ্য মঠ স্থাপন করিয়াছেন। অনেক গৃহত্যাগী উদাসীন ব্যক্তি এখানে আস্তানা করিয়া সেখানে ভগবানের নামগান ও জপ করিয়া থাকেন। আবার শান্তিপ্রয়াসী কোন কোন গৃহী গঙ্গায় স্নান এবং গঙ্গাতীরে আহ্নিক তর্পণাদি করেন। হালিসহর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, ডাকঘর, মিউনিসিপ্যাল অফিস, রামপ্রসাদ লাইব্রেরী, দাতব্য চিকিৎসালয়, 'গুড উইল ফ্রেটার্নিটি' থানা পুলিস মাঠ প্রভৃতি ইহার গৌরব বর্দ্ধনে সহায়তা করিতেছে। গঙ্গাতীরের সোপানাবলী সমন্বিত পার্কের সিমেন্ট নির্মিত বৃহৎ ছত্র এখানে একটি দর্শনীয় বস্তু।

বর্তমানে হালিসহর গত বৈভব হৃতগৌরব হইলেও ইহার স্থান মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ হয় নাই। জন্মভূমিতে বসিয়া রামপ্রসাদ যে শুধু শ্যামাসঙ্গীতই রচনা করিতেন, শুধু তাহা নহে। কাব্য-জগতেও তাঁহার অন্যান্য দান আছে। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরেরও পূর্বে রামপ্রসাদ একটি 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচনা করেন। তবে রামপ্রসাদের রচিত 'বিদ্যাসুন্দর কাব্য' জনসমাজে তেমন প্রচারিত হয় নাই। এজন্য অনেকেই এই কাব্যগ্রন্থের কথা জানেন না।

হালিসহরে এখন শুধু ধর্মবিশ্বাসী বাঙালী হিন্দু নরনারীরা সিদ্ধসাধক রামপ্রসাদের জন্মভূমিরূপে সেখানে প্রায়ই তীর্থদর্শন করিতে যান। এই স্থানটির আশেপাশে এখন বনজঙ্গল পরিষ্কার ও রাস্তা মেরামত করা হইয়াছে। তাহা ছাড়াও রামপ্রসাদের বাসস্থান ও সাধনপীঠের স্থানে এখন কালীমন্দির ও নাট্য-মন্দির নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে। আশাকরা যায়—একদিন এই স্থানটি ক্রমেই একটি জনসমাদৃত তীর্থস্থলে পরিণত হইবে।

---

প্রাচীন যুগের ঋষিবৃন্দ আমাদের পূর্বপুরুষ,—ইহা সত্যই আমাদের গর্বের বিষয়। উপনিষদের অমিত আধ্যাত্মিক ভাবসম্পদের জন্য আমরা গৌরব বোধ করিতে পারি। কিন্তু এইসব সত্ত্বেও আমি স্বীকার করিতেছি—জাতিহিসাবে আজ আমরা দুর্বল—অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি। বর্তমানে আমাদের জাতির যাবতীয় দুর্গতির এক-তৃতীয়াংশ কারণ—আমাদের শারীরিক দুর্বলতা। হে আমার যুবক বন্ধুগণ, তোমরা আগে দেহে মনে শক্তিমান ও সবল হও—ধর্ম তাহার পরে আপনিই আসিবে।

—স্বামী বিবেকানন্দ

# ধর্ম্মে অলৌকিকতা কি অপরিহার্য্য ?

শ্রীঅমিয়শঙ্কর নন্দী

প্রায়ই আমরা দেখতে পাই—কোনও সাধুর শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভরিত—হয় তাঁর অলৌকিক কার্য্যকলাপের মধ্য দিয়ে। কোন্ সাধু যোগাসনে বসে শূন্যে ভাসতে পারেন, কোন্ মহাত্মা পায়ে হেঁটে নদী পার হন, কোন্ মহাপুরুষ হাত বুলিয়ে লোকের অসুখ সারিয়ে দেন, কোন্ 'বাবা' চোখের দিকে তাকিয়ে অপরের মনের কথা ব'লে দেন—এই রকম সব ঘটনা এদেশের জনসাধারণকে সাধুবিশেষের প্রতি আকৃষ্ট ক'রে থাকে। মুগ্ধ বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে সর্ব্বশ্রেণীর নরনারী দলে দলে জড়ো হন ঐ অলৌকিক ক্রিয়াসাধকের আশে পাশে। এসম্বন্ধে রামকৃষ্ণ-এর নেপাল-বাবার কথা সর্ব্বাধুনিক নজীর হিসেবে স্মরণ করা যেতে পারে। তা ছাড়াও আমাদের আশে পাশে ছোট বড় ও রকম কত ঘটনাই যে ঘটেছে ও ঘটছে, সে খবর অনেকেই অল্পবিস্তর রাখেন। এখন কথা হলো—এ সকলের মূলে কোন্ মনস্তত্ত্ব কাজ করছে? ধর্ম্মের ব্যাপারে এ রকম ভাবে বিচার বিবেচনার বিসর্জন কতটুকু সমর্থনযোগ্য? তার চাইতেও বড় কথা—অলৌকিকত্ব ধর্ম্মের মাপকাঠি কি না?

আমি এ প্রশ্নগুলোর একটি মাত্র উত্তর হতে পারে না,—এর এক রকমের উত্তরও হতে পারে না। এ সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন ধারণা পোষণ ক'রে থাকেন এবং তা করা খুবই স্বাভাবিক। তবুও কতকগুলো বিষয়ে আমরা যে একমত হতে পারবো সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ধর্ম্মের ব্যাপারে অধিকাংশ লোক যে একটু বেসামাল হয়ে পড়েন, তার কারণ হচ্ছে ব্যক্তিগত রহস্যপ্রিয়তা ও ধর্ম্মের রহস্যময়তা ( Mysteriousness )। ধর্ম্মকে আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে একটা আলাদা ভাবতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে, প্রাত্যহিক আচরণের সঙ্গে তার যে যোগসূত্র রয়েছে সে কথা আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি। অথচ একথা অনস্বীকার্য্য যে, ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের মহত্তম বিকাশেই ধর্ম্মাচরণের সার্থকতা। ধর্ম্ম এক বস্তু, অপরদিকে প্রতিদিনের সাংসারিক জীবন বিপরীত জিনিষ, এ কখনই সত্য হতে পারে না। উভয়ের মধ্যে মিলনের সেতু যদি খুঁজে না পাওয়া যায়, তাহলে বুঝতে হবে কোথাও একটা মস্ত বড় গলদ রয়ে গেছে।

আমাদের দেশে প্রবাদ বাক্যরূপে সাধারণতঃ বলা হয় 'যত্র জীবঃ তত্র শিব'। এই উক্তি অতি উচ্চাঙ্গের দার্শনিক কথা। সর্ব্বজীবের প্রতি কী অকুণ্ঠ প্রেমই না এই উক্তিতে ফুটে উঠেছে—ঐ স্বল্প কয়টি কথার মধ্য দিয়ে। কিন্তু আমাদের আচরণে উক্ত মহাসত্য কতটুকু রূপায়িত হয়েছে আজ পর্য্যন্ত? কত লক্ষ লোককে রেখেছি আমরা অস্পৃশ্য ক'রে? কথা বলবার সময় ও বই লিখিবার কালে যে নীতিকে আমরা স্মরণ করি, মানুষের সঙ্গে ব্যবহারের সময় সে কথা একেবারে বিস্মৃত হই। নতুবা অস্পৃশ্যতারূপ শুচিবাইকে দূর করবার জন্য আইন পাশ করবার প্রয়োজন আজ হতো না। এই পরস্পর বিরোধিতা আমাদের জীবনে কি ক'রে সম্ভব হলো? তার কারণ—অন্তরে বাহিরে সত্যনিষ্ঠার অভাব ঘ'টে। যে মিথ্যাচার, যে কপটতা, যে অ-প্রেমকে আমরা আধুনিক জীবনযাত্রার প্রশ্রয় দিয়ে চলেছি, তারই বিষময় ফল আজ ফলতে সুরু করেছে চারিদিকে।

বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও বৈষয়িক উন্নতি যেমন মানুষের দীর্ঘদিনব্যাপী অনুশীলনের ফলে সম্ভব হয়েছে, ধর্ম্মীয় উচ্চ উচ্চ ভাবসমূহও ঠিক তেমনই ভাবে মানুষের মস্তিষ্কে বিকশিত হয়েছে। অথচ বিজ্ঞান ও বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে আমরা অত্যন্ত সচেতন, অথচ ধর্ম্ম ও দর্শনের বেলায় রয়ে যাচ্ছি

উদাসীন। তার কারণ—প্রথম দুইটি আমাদের ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধানে প্রত্যক্ষ সহায়তা করে—ধর্মীয় অনুষ্ঠান ঠিক তেমনটি করে ব'লে আমরা ভাবিনা। এ ক্ষেত্রে আর একটি জিনিষ আমাদের মন জুড়ে থাকে। সে হচ্ছে কতকগুলো প্রচলিত আচার অনুষ্ঠান, পূজো ব্রত ইত্যাদি। প্রকৃত ধর্মের সঙ্গে এগুলোর সংযোগ অতি অল্পই রয়েছে। কতকগুলো পূজো আমরা কেবলমাত্র তথাকথিত সংস্কার থেকে ক'রে থাকি, যেমন:—শীতলাপূজো, মনসাপূজো, শনিপূজো ইত্যাদি। ধর্মবোধের প্রেরণা এসবের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় না। প্রকৃত ধর্মের প্রতি আমাদের অনুরাগ যে কত সামান্য এইসব ঘটনা তারই অন্যতম প্রমাণ।

ধর্ম মানুষকে করে সংস্কারমুক্ত, বিচার-বুদ্ধিকে করে স্বচ্ছ ও নির্মল, বিবেককে করে প্রবুদ্ধ। এ কথাগুলো আমরা যে না জানি, তা তো নয়। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সব চাইতে বেশী কুসংস্কার গ'ড়ে উঠেছে তথাকথিত ধর্মকে অবলম্বন ক'রে। যেখানে ঘটবে বন্ধনমুক্তি—সেখানেই আমাদের কুসংস্কারের বাধা। সেজন্যে হোঁচট খেতে হয় পদে পদে। এই বিচারবিমুখতা, অন্ধ কুসংস্কার, গতানুগতিক জীবনযাপন-প্রণালী বর্তমান যুগের পক্ষে যখন অনুপযোগী হয়েছে, তখন একে পরিহার করতেই হবে—তার প্রাচীনত্বের দোহাই সে যতই কেননা দিক। ত্যাগ ক'রতে হবে অলৌকিকত্বের মোহ, বুঝতে হবে যে কেবল রহস্যময় ব'লেই কোন বিষয় গ্রহণীয় হ'তে পারে না; মনে রাখতে হবে, আপাততঃ ব্যাখ্যার অতীত ব'লেই কোন বস্তু হঠাৎ উৎপন্ন হয়ে উঠে নি।

কোন সাধু মনের কথা ব'লে দিতে পারলে তাঁর প্রতি আমরা বিস্ময় ও ভক্তিতে গদগদ হয়ে উঠি। কিন্তু আমার প্রতিবেশী যে মানুষটি অপরের আপদে-বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়েন, তাঁকে তো আমরা এর সিকিমাত্র সম্মানও দিই না! নিজের একটাকা পুঁজি থেকে বারো আনাই যিনি দুঃস্থার্তকে দিয়ে বসেন, তাঁর মহত্ত্ব সম্বন্ধেই বা আমরা কতটুকু চিন্তা করি? বালিকে চিনি-বানানেওলানা, রোগের অব্যর্থ ঔষধদাতা সাধু আমাদের চিত্তকে অধিকতর আকৃষ্ট করে। অথচ প্রকৃতই মহৎ, দেবোপম নীতিপরায়ণ দয়ালু মানুষ সমাজে যে নেই এমন নয়। চলতি অর্থে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী নন ব'লেই জনচিত্তে তাঁরা সাড়া তোলেন না। তাঁদের আমরা মাঝেমাঝে যেটুকু সম্মান দিই তা মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। এই সম্মান পাওয়া না পাওয়াতে অবশ্য শ্রদ্ধেয়দের কিছু এসে যায় না। কিন্তু আসলে ক্ষতিগ্রস্ত হই আমরা। মহৎ ও মহত্ত্বের প্রতি সম্মান না দেখানোতে নিজেদের চিত্তদৈন্যই প্রকট হয়ে উঠে। তাছাড়া রয়েছে সামাজিক ক্ষতির দিক। অলৌকিকের দিকে আকর্ষণ মাত্রিক দেখার ঝোঁকের মতই প্রবল। দ্বিতীয়টি তেমন ক্ষতিকর নয়, কারণ আমরা একটু আমোদ উপভোগের নিমিত্তই ম্যাজিক দেখতে গিয়ে থাকি। কিন্তু প্রথমটি আমাদের মনকে মোহগ্রস্ত ক'রে ভবিষ্যৎ অবনতির রাস্তা খুলে দেয়।

বহু অলৌকিক ক্ষমতাশালীদের দেখে থাকবেন—নৈতিক জীবন যাঁদের সুপবিত্র নয়। সুতরাং এমন লোকদের সাধু ব'লে সমাজে প্রতিষ্ঠা দিয়ে আমরা মানুষের সম্মুখে ঊর্ধ্বগামিতার অপ-আদর্শই কি স্থাপন করছি না? এ কথা কি বিশ্বাসযোগ্য যে, নীতিভ্রষ্ট হয়েও সাধু হওয়া চলে? বরং আমাদের এখন ভেবে দেখবার সময় এসেছে—ছু একটা ম্যাজিক দেখিয়ে ভক্ত জড়ো করা কতটা সাধুত্বের পরিচায়ক? এও যেন স্মরণ করি—প্রাচীন ও আধুনিক কালে যথার্থ সাধু মহাত্মা ব'লে পরিচিত মহাত্মারা এ সম্বন্ধে কি ব'লে গেছেন, এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজেরাই বা কতটুকু অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন করেছেন?

যাঁরা যথার্থ ধর্মাত্মা ও সাধুপুরুষ, তাঁদের জীবন-চরিত ও জীবনযাত্রা দেখে বুঝতে পারা যায়—ঐ সব অলৌকিক ভেল্কীবাজীকে তাঁরা চিরদিন ঘৃণা ক'রেই এসেছেন। সাধারণের বহু পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও তাঁদের অনেকে অলৌকিক কিছু দেখাতে রাজী

হননি। তবু যে তাঁদের জীবনে মাঝে মাঝে অনৈসর্গিক, আপাত-অসম্ভব কোন কোন ঘটনার সমাবেশ হয়েছে, তার মধ্যে একটা তাৎপর্য্য—স্থান, কাল পাত্রানুযায়ী একটা প্রয়োজনীয়তার ইঙ্গিত রয়েছে। ঐ সমস্ত ঘটনা অনেক সময় ঘটেছে তাঁদের সাধনপথের বিশেষ বিশেষ স্তরে পৌঁছবার মুখে—হয়তো সেগুলো সাধনজীবনে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। আমরা বুঝতে পারি না ব'লেই ঐগুলিকে অপ্রাকৃত কিছু ব'লে ভেবে নিয়েছি। অনেক সময় এমনও হয়েছে যে, ঐ অলৌকিক ঘটনা তাঁদের দেহমনকে অবলম্বন ক'রে ঘটলেও তাঁরা নিজেরা ছিলেন সম্পূর্ণ অনবহিত। এইসব ঘটনায় উপস্থিত জনমণ্ডলী ও ভক্তবৃন্দের দায়িত্বও সমধিক। তাঁদের ভাব-গদগদ দৃষ্টিভঙ্গীতে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা প্রায় সময়ই থাকেনা না। ফলে ঘটনার অতিরঞ্জন অনেক ক্ষেত্রেই ঘটেছে, প্রকৃত তথ্য হয়েছে বিকৃত। আধুনিক ভক্তবৃন্দও যে এ দোষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত তা বলা চলে না—এবং এইখানেই আমাদের সাবধান হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। শিক্ষাদীক্ষা ও বৈজ্ঞানিক মানস-চেতনার গর্ব্ব যদি সত্যই আমাদের করতে হয়, তবে উচ্ছ্বাসকে মাত্রা ছাড়াতে না দিয়ে ঘটনার সত্যনির্ণয়ে মনোনিবেশ করা দরকার। লক্ষণীয় এই যে, আমাদের দেশে গুরু, গোঁসাই, মহান্ত, অবতার ইত্যাদির প্রচুর সমাবেশ। তাঁদের এক এক জনের শিষ্য সংখ্যা উপেক্ষণীয় নয়, বরং অনেক সময় রাজনৈতিক নেতাদেরও ঈর্ষ্যা উদ্রেক করে। ঐ সাধুদের সকলেই যে ভণ্ড ও মতলববাজ এমন নাও হতে পারে—কিন্তু ভেজাল যে রয়েছে এ কথা অস্বীকার করবো কি করে? বহুলোক সাধুবেশ ধারণ ক'রে থাকে জীবিকার্জ্জনের নিমিত্ত। সুতরাং ওদের কাছ থেকে আমরা কি বড় জিনিষ আশা করতে পারি? নকলের সংখ্যা এখন এত বেশী হয়েছে যে, এখন আসলকে চেনা একেবারে মুস্কিল হয়ে পড়েছে।

ভোগবাদী-বিলাসব্যসনের হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করবার দায়িত্ব আমাদের। যুক্তিহীন আচার-আচরণ থেকে মানুষের মুক্তি আজ একান্ত প্রয়োজন। 'বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর' এসব বহুদিনের বাঁধাবুলিকে এখন আর প্রশ্রয় দেওয়া সঙ্গত হবে না। ঐসব বুলিগুলোর স্থান-কাল-পাত্র হিসেবে অর্থবোধ করতে হবে। মনুষ্য-সমাজের একটি অতি সাধারণ অথচ ব্যাপক দৌর্ব্বল্য এই যে, অনেক কাল ধ'রে কোন ব্যাপার চ'লে এলেই তাকে সে সত্যের আসন দিয়ে বসে। এইভাবে আমরা প্রতিনিয়ত কতটা যে অতিগ্রস্ত হচ্ছি তার ইয়ত্তা করা যায়।

ধর্ম্মের সম্বন্ধে সঠিক ধারণা নেই ব'লেই আজ আমরা চিত্তদৌর্ব্বল্যকে ভক্তির উচ্ছ্বাস ব'লে ভুল করছি। যুক্তিকে বিসর্জ্জন দিয়েছি আধ্যাত্মিক মুক্তির লোভে। অপাত্রে অর্ঘ্য দেওয়ার আনন্দ পেয়েছে প্রশ্রয়—সত্যের আলো হয়েছে কুয়াসাচ্ছন্ন। তবু কি হয়নি ফেরার সময়?

---

আমাদের এখন আবশ্যক—শক্তিসঞ্চার। আমরা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি। সেইজন্যই আমাদের মধ্যে এই সকল গুপ্তবিদ্যা, রহস্যবিদ্যা, ভূতুড়ে-কাণ্ড সব আসিয়াছে। উহাদের মধ্যে হয়তো কিছু সত্য থাকিতে পারে, কিন্তু ঐগুলিতে আমাদিগকে প্রায় নষ্ট করিয়া দিয়াছে।

—স্বামী বিবেকানন্দ

# তিব্বত ও ভারত সংস্কৃতি-সম্বন্ধ

( পূর্ব্বানুবৃত্তি )

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র কর, বি. এল. সি.

পার্সিভ্যাল লাণ্ডন তিব্বতে তাঁহার সাময়িক অভিযান ( ১৯০৩-৪ খৃষ্টাব্দে ) বিষয়ক গ্রন্থে শরচ্চন্দ্র দাসের কথা অনেকবার লিখিয়াছেন। সিকেন লামা ১৮৮২ অব্দে দাসমহাশয়কে বিশেষ সাহায্য করেন; তাঁহার জন্যই শরৎচন্দ্রের লাসা অবধি অগ্রগতি সম্ভব হয়। দলাই লামা কিরূপ আড়ম্বরে সদম্ভ অভিধিকে অভ্যর্থনা জানান, তাহার বিশদ বিবরণ শরচ্চন্দ্রের রচনা হইতেই লণ্ডন স্বীয় গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।[১] এই অভিযানের বর্ণনায় দেখা যায় যে, এই সামরিক দলে যে সকল ভারতীয় যান তাঁদের সংখ্যা ১১২৮। ইহাদের মধ্যে ছিলেন বত্রিশজন অফিসার, ব্রিটিশদের সংখ্যাছিল মোট ৩২৩ জন।[২] তন্মধ্যে মিত্রবংশীয় জনৈক কর্মচারীর নাম দৃষ্ট হয়। "Mr Mitter, confidential clerk of the Mission—immediately manned the upper works and a certain number of the followers displayed considerable martial energy in positions of more or less personal danger."[৩] ইঁহার নাম সিদ্ধেশ্বর মিত্র, নিবাস কোন্নগর। জ্ঞানচন্দ্র তাঁহার জনক। তাঁহার পিতা প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের দৌহিত্র, সরোজনলিনী দত্তের খুল্লতাত ও প্রখ্যাত সিবিলিয়ান বি. দের জ্যেষ্ঠা ভ্রাতা। সিদ্ধেশ্বরের এক ভ্রাতা সিদ্ধযোগেন হায়দ্রাবাদের ( নিজাম রাজ্যে ) পুরাতন ও সুপরিচিত প্রবাসী উকিল ছিলেন।[৪]

তিব্বত-অভিযান ( ১৯০৩—১৯০৪ )

বেডাঃ এ-এই গ্রন্থে রচিত "পশ্চিম তিব্বত" গ্রন্থে শরৎচন্দ্র দাসের কথা আলোচিত হইয়াছে। কর্ম্মকুশলতার জন্য তিনি প্রথমে 'রায় বাহাদুর' এবং পরে 'সি. আই. ই' উপাধি প্রাপ্ত হ'ন। এই স্বনাম-ধন্য পুরুষ এই জানুয়ারী, ১৯১৭ অব্দে অমরধামে যাত্রা করেন। তিব্বতের সহিত শরচ্চন্দ্র নিজ নাম চিরকাল জড়িত করিয়া গিয়াছেন।[৫]

রাজা রামমোহন রায় ( ১৭৭৪-১৮৩৩ ) অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া সুদীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া ভারতের এই প্রতিবেশী দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন। বোম্বাযোগায় গ্রন্থে স্বামী বিবেকানন্দেরও অনুরূপ পর্যটনের কথা আছে[৬]। হিমালয় পরিভ্রমণে স্বামী বিবেকানন্দ অপরাপর দ্রষ্টব্যের মধ্যে অমরনাথতীর্থেও যান। অমরনাথ তীর্থ ও তাহার শোভা দর্শন করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "আজ কি আনন্দই লাভ করিয়াছি। এই তুষার-লিঙ্গরূপী শিবমূর্ত্তি ভগবানের সাক্ষাৎ স্বরূপ।.....আর কোন তীর্থক্ষেত্রে এত আনন্দ পাই নাই"[৭]। "তিব্বতী বাবা" নামে পরিচিত বৈরাগিক সাধু-

১। The Opening of Tibet by Perseval Landon, p 119, p p 375 etc.,

২। Ditto pp. 458-9.

৩। Ditto p. 150.

৪। 'অঙ্কের বাহিরে বাঙ্গালী', জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ১৯৩১, তৃতীয় ভাগ পৃ ২১০-১, ৪৪২।

৫। 'The Life of Vivekananda and the Universal Gospel,' Romain Rolland, Advaita Ashrama. Mayavati, 1947 ; p. 27.

৬। স্বামী বিবেকানন্দ, ২য় সং, ১৩৫৩ সাল, ৪র্থ খণ্ড, প্রবাসবাস বহু, পৃ ৮১১।

পুরুষ বহুবর্ষ ধরিয়া তিব্বতে সাধনভজন করেন। ওঁহার জন্ম শ্রীহট্টে, গার্হস্থ্যনাম নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী। ১৬ বৎসর বয়সে তিনি সন্ন্যাসী হইয়া দেশবিদেশে ভ্রমণ করেন। এইভাবে তিনি চীন, শ্যাম, ব্রহ্মদেশও পর্যটন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মে তিনি "ফুঙ্গি বাবা" নামে পরিচিত। এই সাধু সিদ্ধপুরুষই শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'সোহহং স্বামী' নাম দিয়াছিলেন।[৩] বর্দ্ধমানের নিকট পালিতপুরে এবং হাওড়া তাঁতীপাড়ায় ওঁহার মঠ আছে। ঐ মঠের অনতিদূরে 'তিব্বতী বাবা লেন' নামে সেখানে একটি পথও আছে।

অজ্ঞাত পর্যটক

শিল্প নিদর্শনে ভারতের প্রভাব আজও তিব্বতে দেখা যায়। জগতের সর্ব্বত্রই শিল্পীরা নিজ দেশের মত করিয়া চিত্র অঙ্কন বা মূর্ত্তি গঠন করেন। তিব্বতের শিল্পীরা কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম করিয়াছেন, দেখা যায়। ওঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এ চিরন্তন নীতি মানিয়া চলিলেও, অনেকে ধর্ম্মবিষয় চিত্র-অঙ্কনে বা মূর্ত্তি-গঠনে ভারতীয় ধারা রক্ষা করিয়া চলেন। মঠে, গোম্পায় চিত্র বা বিগ্রহাদি যাঁহারা দেখিয়া আসিয়াছেন ওঁহারা একথার সত্যতা উপলব্ধি করিবেন। পার্সিভাল লাওন তদীয় তিব্বত ভ্রমণ-কাহিনীতে[৪] মঠের বিগ্রহ সমূহের যেসব সুদৃশ্য চিত্র সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহা দেখিলে ভারতীয় মন্দিরের কথা বলিয়া মনে হয়। আর্য্যসুলভ মুখাকৃতি ও আদর্শ এইসব মূর্ত্তিতে সুস্পষ্ট।

তিব্বতীয় শিল্পে ভারতীয় প্রভাব।

"Everywhere exists a tendency to adopt in religious images the figure peculiar to the artist's own nation. But it is a peculiarity of the religious representations of Tibetan Buddhism that they display two well defind co-existing types, the one showing the Tibetan featuers, the other having retained the marks of Indian origin[৫].

তিব্বতের জ্যোতির্বিজ্ঞান ভারত ও চীন হইতেই প্রাপ্ত; তাহাতেও এই দুই দেশের সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ প্রকট।

যেমীনিনের কথা নয়, সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় তিব্বত ও কৈলাস ভ্রমণকালে এক লামার সহিত পরিচিত হন। লামা যে সকল কথা ওঁহাকে বলিয়াছিলেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, "এই সকল লামার মধ্যে একজন শিক্ষিত লামার সহিত আমার পরিচয় হয়।...যখন তিনি অবগত হইলেন, আমি একজন বঙ্গদেশীয় কাশীলামা, তখন তিনি ভক্তি-মিশ্রিত ভাষায় প্রাচীনকালে আমাদের বঙ্গদেশ হইতে যে সকল দেবচরিত্র বাঙ্গালী তিব্বতে যাইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম ও চিকিৎসা-শাস্ত্র সংক্রান্ত নানাপ্রকার জ্ঞানপ্রচার করিয়াছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে সদাচার, সামাজিক শিষ্টাচার প্রভৃতির প্রচলন করিয়াছিলেন ওঁহাদের কথা কহিয়া আমাকে অপূর্ব্বভাবে অভিভূত করিয়াছিলেন[১]।"

বাঙ্গালাদেশ সম্বন্ধে তিব্বতীয়া সচেতন

ভারতের সংস্পর্শের অবিচ্ছেদ্য নিদর্শন আজিও আমরা ওতঃপ্রোতভাবে নানা ক্ষেত্রে তিব্বতীদের মধ্যে দেখিতে পাই। সূর্য্য প্রণামে ওঁহাদের মন্ত্র—ওঁ মরীচিনম্ স্বাহা। আহারের সময়ে দেবতা ও পিতৃপুরুষদের নিবেদন মন্ত্র:—"ওঁ গুরু বর্জ্জ নৈবেদ্য আঃ হুং। ওঁ সর্ব্ব বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব বজ্র নৈবেদ্য আঃ হুং। ওঁ দেব ডাকিনী শ্রীবজ্রপাল সপরিবার নৈবেদ্য আঃ হুং[২]।

আহার ও যোগসূত্রের নিদর্শন

৩। বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী (তিব্বত ভারত), জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস, ১৩৫২, পৃ ২৯৮—৩০০।

৪। Buddhism in Tibet, Emil Schlagintweit, 863. p. 218.

৫। The Opening of Tibet, Perseval Landon, 1905, p. 104.

১। কৈলাস-যাত্রা, সত্যচরণ শাস্ত্রী, পৃ: ২৬৮-৬

২। পরিব্রাজক স্বামী অভেদানন্দ (কাশ্মীর ও তিব্বতে) পৃ: ৫২৬।

—গ্রন্থপঞ্জী—

কৈলাস-যাত্রা ; সত্যচরণ শাস্ত্রী ; বসুমতী সাহিত্য মন্দির হইতে প্রকাশিত।

জাতাযাত্রীর পত্র ; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পরিব্রাজক স্বামী অভেদানন্দ (কাশ্মীর ও তিব্বতে)

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী ; ১ম, ৩য় খণ্ড, ১৯৩১ অব্দের সংস্করণ, রায়-প্রমোদন দাস।

বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব ১ম সং, ১৩৫৬ সাল, ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় ; বুক এম্পোরিয়ম, কলিকাতা।

বাংলার ভ্রমণ, দুই খণ্ডে, পূর্বঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ হইতে প্রকাশিত, ১২৯০ সাল।

মৃত্যুকোপনিষৎ।

মহাভারত।

মানস-সরোবর ও কৈলাস ; সুশীল ভট্টাচার্য্য, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৩৩৮ সাল।

স্বামী বিবেকানন্দ, চারিখণ্ডে, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৩৩ সাল, প্রমথনাথ বসু।

হিমালয় পারে কৈলাস ও মানস-সরোবর, ২য় সংস্করণ, ১৩৫৪ সাল, প্রফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায়।

বাংলার সাধনা, ক্ষিতিমোহন সেন, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা।

The Abode of Snow ; Andrew Wilson ; William Blackwood & Sons, Edinburgh & London.

Academy Annual, 1952 ; Academy of Fine Arts, Indian Museum, Calcutta,

An Account of an Embassy to the Court of the Teshou Lama in Tibet, a narrative of a Jouerney through Bhootan and part of Tibet ; Captain Samuel Turner, to which are added views taken on the spot by Lieut Samuel Davis and Observations Botanical, Mineralogical and Medical by Robert Saunders, London, 1800.

Buddhism in Tibet, Emil Schlagintweit, LL. D., Tribner & Co., London, 1863.

A Brief Summary of Do Ka Zang, the Sutra of the Glorious Age, by Sarat Chandra Das, C. I. E. exhibited by the Hon. Sir Charles Elliott at a meeting of the Asiatic Society of Bengal, 1895.

In the Forbidden Land ; A Henry Savage Landor, in 2 vols. Harper Buds, New York and London, 1899.

Himalayas, Abode of Light ; Nicholas Roerich, Nalanda Publication, Bombay. 1946.

*Histoire De la Mission Du Thibet* by Adrien Launay, Destee De Brouweret cie Live, Paris.

History of Bengal, vol I, Hindu Period, R. C. Majumdar. Holy Macentain, Bhagwan Sri Namsa, translated by Purohit Swami, 1908.

Indian Pandits in the Land of Snow, Sarat Chandra Das, C. I. E.

Indian Theachers of Buddist Universities ; P. N. Bose.

Indo-Aryans, 2 vols, Rajendra Lal Mitra C.-I.-E. 1881.

Journey to Lhasa and Central Tibet by Sarat Chandra Das, C.-I.-E, edited by the Hon. W. W. Rookhill (Chosen by the Royal Geographical Society, London to edit his papers.) John Murray, London, 1902.

Life of Vivekananda and the Universal Gospel by Romain Rolland, Advaita Asbrama, Mayavati, 1947.

March of India, Vol V, no. 2, Nov.-Dec. 1952. Delhi.

Narrative of his Mission to Tibet, G. Bogle.

Narrative of a Journey to Lhasa by Sarat Chandra Das, C. I. E, 1885.

Narrative of a Journey round Lake Yomdo-Palti and in Lhokhu Yarling and Sakya in 1882., by Sarat Chandra Das, C. I. E. 1887.

Narratives of the Mission of George Bogle to Tibet and the Journey of Thomas Manning to Lhasa by Clements-R Maukham, C. B., F. R. S, of the Geographical Dept., India Office ; Tribner & Co. London, 1879.

Opening of Tibet ; Perseval Landon, introduction by Col. F. Younghusband. Doublesday, Page & Co, New York, 1905.

Pag Sam Jon Zang—Part I ( in Tibetan )—History of the Rise, progress and downfall of Buddhism in India by Sema Khan-po Yeque Pal Jor, the great bistrio-grapher and chronologist of Tibet, 1747 A. D. Edited by Sarat Chandra Das C. I. E. Foreign Corresponding Member of the Imperial Archaelogical Society of St. Petersburg, Associate Member of the Asiatic Society of Bengal etc. Published by the Presidency Jail Press, Calcutta, 1908.

The Statesman; ( Calcutta Daily Newspaper, ) 4. 10. 1952.

Tibetan English Dictionary with Sanskrit Synonyms by Sarat Chandra Das, C. I. E, Revised and edited under orders of the Govt. of Bengal by G. Sandberg and A. W Heyde, 1902.

Trans Himalaya—Discoveries and Adventures in Tibet by Dr. Sven Hedin, MacMillan & Co. New York, 1909.

Travels in Tartary, Thibet and China by M. Huc 1844-5-6 translated by W. Hazlitt in 2 vols, 1900.

Trip to Sacred Kailas, Manasarvwar, Swami Sivananda, Swarg Asram, Rishikesh, 1932.

Three Years in Tibet by the Shramana Ekai Kawaguchi, 1909.

Truth abont Tibet, A Maccallum —An Account of the Mission of Col. Younghusband to Lhasa and of the preceding negotiations, London 1905.

Western Tibet—A History of—Rev. A. H. Francke, London 1907.

Western Tibet, Schering

What India Thinks, compiled and edited by C. Roberts, The National Literature Co. Cal 1939.

( সমাপ্ত )

# মন ও মানুষ

( পূর্বপ্রকাশিতের পর )

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

( স্মৃতি : তেতাল্লিশ )

স্বামিজী মহারাজ ( স্বামী অভেদানন্দ ) পূর্বপ্রসঙ্গের সূত্র ধ'রে আবার বলতে লাগলেন—"তারি জন্যে তো স্বামিজীর ( স্বামী বিবেকানন্দ ) ইচ্ছা ছিল—অতীতের অধ্যাত্ম আদর্শ ও বর্তমানের অগ্রগতির ধারা ও নূতন প্রতিভা এই দুয়ের সংমিশ্রণে গ'ড়ে তোলা একটী বিরাট শিক্ষাকেন্দ্র ( University ), যেখান থেকে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাদের জীবনের আদর্শ ও লক্ষ্য হবে সুনির্দিষ্ট ও গঠনমূলক। সেই শিক্ষাকেন্দ্রটী পরিচালিত হবে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের দ্বারাই। শ্রীশ্রীঠাকুরের (শ্রীরামকৃষ্ণ) উদার আদর্শকে ভিত্তি ক'রেই গঠিত ও পরিচালিত হবে সেই শিক্ষাকেন্দ্র। সকল দেশের ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সঙ্গীত ও অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে সেখানে, আর সমন্বয়াবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারাকে অনুসরণ ক'রে সকল শিক্ষার আদর্শ বা লক্ষ্যের মধ্যে থাকবে একটা সমন্বয়ের ভাব। হাতেনাতে বা ব্যবহারিক শিক্ষার জন্যে সকল দেশের কৃষি-শিল্প ও কারিগরি-শিক্ষারও ব্যবস্থা থাকবে। মোটকথা সকল দেশের কাল্‌চার ( culture—সংস্কৃতি ) ও কৃষ্টির কেন্দ্রস্বরূপ হবে সেই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটী। নানান্ দেশ থেকে বিচক্ষণ ও বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতরা এসে শিক্ষাদানের নেবেন ভার। বছরে একবার —কি দু'বার কাল্‌চারাল্ কন্‌ফারেন্সের ( cultural conference ) থাকবে ব্যবস্থা। বিভিন্ন দেশের চিন্তাশীল মনীষীরা যোগদান ক'রে বিভিন্ন বিষয়ের করবেন আলোচনা। শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি সম্বন্ধে নূতন নূতন আবিষ্কার ও গবেষণার তথ্য হবে সেই সব আলোচনার বিষয়। তাদের পারস্পরিক আদানপ্রদান ও তথ্য-বিনিময়ের দ্বারা সকলের চিন্তাক্ষেত্র হবে প্রসারিত ও সমৃদ্ধ। প্রাচীন কালের গুরুগৃহের মতো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এ্যাটাচ্‌ড্ ( সংশ্লিষ্ট ) থাকবে ছাত্র ও শিক্ষকদের জন্যে সব হোষ্টেল। ছাত্ররা শিক্ষকদের সঙ্গে পাবে অবাধ মেলামেশার সুযোগ। তাতে ক'রে ছাত্রদের নৈতিক চরিত্র ও শিক্ষাদীক্ষার ধারা হবে গঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত। অবশ্য শ্রীশ্রীঠাকুরের মহান্ জীবনাদর্শের ওপরই সুপ্রতিষ্ঠিত হবে ছাত্র ও শিক্ষকদের সাংস্কৃতিক ও ব্যবহারিক জীবন। সর্বোপরি ভারতের ত্যাগ, তপস্যা, সহিষ্ণুতা ও আধ্যাত্মিকতাই হবে সকল-কিছু শিক্ষার একমাত্র আদর্শ।

"আমি যখন লণ্ডনে ছিলাম, স্বামিজীর ( বিবেকানন্দ ) সঙ্গে একদিন আলাপ-আলোচনা হয় এইসব প্রসঙ্গ নিয়ে। সত্যিকারের মানুষ তৈরী করা শিক্ষাই তিনি ছিলেন পক্ষপাতী। বেদ-বেদান্তের চর্চা আবার দেশে ( ভারতবর্ষে ) ফিরে আসুক, এটাও ছিল তাঁর মনের একটী কামনা।

"আমার নিজের কথাও তো তাই। মানুষ তৈরী করা শিক্ষার ভেতর দিয়ে এখন গ'ড়ে তুলতে হবে নূতন ক'রে আমাদের দেশকে। যে শিক্ষায় মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে করে নিকটতম, সে শিক্ষার দ্বারা ভগবানের সঙ্গে পাতায় মানুষের নিবিড় সম্বন্ধ, যে শিক্ষার দ্বারা মানুষের অন্তরের পবিত্র ভাব হয় সম্প্রসারিত, সে শিক্ষাই তো মানুষের কাম্য ও কল্যাণকারী। শিক্ষার আলোকছটায় অজ্ঞান-অন্ধকার যাবে দূরে, তবেই না তাকে বলবে তুমি শিক্ষা।

"তবে নিশ্চয়ই জেনো যুগনায়ক ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের আগমনে সমগ্র পৃথিবীতে নবযুগের সূচনা হয়েছে। ভারতের নবজাগরণ অবশ্যম্ভাবী। শিক্ষায়, দীক্ষায় ও জীবনের পবিত্রতায় এই ভারতবর্ষই দেখাবে তার আদর্শ অন্য দেশগুলিকে। ভারতবর্ষই শোনাবে সমগ্র পৃথিবীকে তার সাম্য-মৈত্রীর বাণী।"

স্বামিজী মহারাজকে এবার তামাক দেওয়া হোল। তিনি গড়গড়ার নলটী মুখে দিয়ে আবার বলতে লাগলেন—"বেলুড়ে নূতন ধরণের একটী ইউনিভার্সিটী (বিশ্ববিদ্যালয়) তৈরী করার মতো আর একটা বড় কাজ করার আমার ইচ্ছা ছিল। সেটা হোল—ভারতবর্ষের সমস্ত সাধু-সম্প্রদায়কে একত্র ক'রে একটী 'সম্মিলিত সাধু-সঙ্ঘ' তৈরী করা। সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সকল সাধু-সন্ন্যাসী হবে সেই সঙ্ঘের সভ্য। বছরে অন্ততঃ একবার হবে সমস্ত মঠাধীশ ও সাধু-সন্ন্যাসীদের নিয়ে কন্‌ফারেন্স (সাধু-সম্মিলন)। সকল রকম মতবাদের হবে নিরপেক্ষভাবে, তাতে আলোচনা ও সকল মতদ্বৈধের হবে সমাধান ও সমন্বয়। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়-বাণীই হবে সেই সাধু-সঙ্ঘের আদর্শ। তাতে ক'রে মৈত্রী ও ভালবাসার ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে বিরাট একটী অসাম্প্রদায়িক সাধু-প্রতিষ্ঠান উঠবে গ'ড়ে; দেশের প্রাণ ও সংহতি-শক্তির হবে উদ্বোধন; বর্ষের জগতে আসবে এক নবজাগরণ।"

(ক্রমশঃ)

---

# আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের প্রতি

**শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়**

ধ্যানের অতল তলে হয়ে নিমগন,
সহস্রষ্টা আর্যঋষিগণ,
দেখেছেন অভ্রান্তিত যে তত্ত্ব মহান্
কী অখণ্ড ঐক্য বিদ্যমান—
অণুপরমাণু তৃণকণে প্রতি জীব জড়ে
এ নিখিল বিশ্বচরাচরে।
অসীম সে প্রাণসত্তা এক অদ্বিতীয়,
অগোচর বাক্য ও ইন্দ্রিয়,
প্রতি প্রাণী পদার্থের অস্তিত্ব-নিদান,
সে তত্ত্বের নূতন সন্ধান—
হে আচার্য্য জগদীশ! নিজ প্রতিভায়
পাশ্চাত্যের মনীষী-সভায়
জানায়েছো সকলেরে ঘুচায়ে সংশয়ে
দেশে দেশে আপনার বিস্ময়ে।

হে মহাতাপস জ্ঞানী, বিজ্ঞানী মহান!
তুমি এসে করেছ প্রমাণ
'এই বিশ্বে যাহা কিছু সবি প্রাণময়,
কোন বস্তু-কণু জড় নয়,
সুখ-দুঃখ-অনুভবে হর্ষ-বেদনায়
তারা নিজ চেতনা জানায়।'
তাই তব স্নেহস্পর্শে তরুতৃণলতা,
অন্তরের মূক মর্মকথা—
জানাইল সাড়া দিয়ে কতনা প্রকারে
দিনে দিনে লিপির আকারে।
আজীবন ছিলে তুমি যে তপস্যারত,
সিদ্ধ হলো সে মহান ব্রত,
তাইত বিজয়লক্ষ্মী বরমাল্যখানি
স্নেহভরে তব কণ্ঠে আনি'
করেছে তোমারে আজ সর্ব্ব-স্বদেশীর
দেশে দেশে প্রিয় বরণীয়।
ভারত-গৌরব তুমি, গর্ব্ব বাঙালীর,
তব প্রতি করি নতশির।

ভারতগৌরব ও বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক মনীষী আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ৩০ নভেম্বর তারিখে বিক্রমপুর রাঢ়িখালে একটি সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ২৩ নভেম্বর তারিখে গিরিডিতে (বিহার) আচার্য্য বসু দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

# সুদূরের আলো

• জ্যোতিষ্মান্ বসু

বিশ্ব-সৃষ্টির বিচিত্র মহিমা বর্ণন ক'রে কাস্ত-কবি (রজনীকান্ত সেন) গেয়েছিলেন,

"লক্ষ লক্ষ সৌরজগৎ
নীল গগন-গর্ভে!"

বিজ্ঞান ঠিক ঐ কবির মতই, আকাশ মাঝে অগণিত সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে নিশিদিন মোহিত হ'য়ে রয়েছে। স্রষ্টার পরিচয় প্রকাশ সৃষ্টির মাঝেই। শাস্ত্রমতে তাঁকে পূর্ণরূপে খতিয়ে দেখার চেষ্টাও নাকি বাতুলতা। কিন্তু বিশ্ব-রূপের মহিমা বোঝা, নিশ্চয় দুষ্টতা নয়। তাই কোন বৈজ্ঞানিকই বাতুল নন।

আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় এই বিশ্ব-জগৎ অনন্ত—এই অনন্ত জগৎ আঁধারে পরিপূর্ণ। সেই আঁধার-সমুদ্রের মাঝেমাঝে আলোর অসংখ্য দ্বীপ আকাশকে ক'রে তুলেছে অপূর্ব্ব। নভঃ পরিসরে এই দ্বীপগুলি হতে আলো, লোক হতে লোকান্তরে এক দুরন্ত বেগে[১] এগিয়ে চলেছে নিক্ষাক 'দূতের' মত। কিন্তু কী এর বার্ত্তা, এই আলো কি জানাতে চায়, তা কি কেউ ভেবেছেন? সৌন্দর্য্য-বিকাশই আলোকের ধর্ম, এ অবশ্য সাধারণ কথা—কিন্তু এ ছাড়াও অপর সন্ধান ঐ আলো দিতে পারে তা বিজ্ঞানের তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে এখন ধরা পড়েছে। আজকে ঐ আলোই জানিয়ে দিচ্ছে নানা সংবাদ, গ্রহ-নক্ষত্রাদির নানা কথা, তাদের উপাদান, তাদের উত্তাপ, তাদের আপেক্ষিক গতি—এই রকম আরও কত কি? আপনারা নিশ্চয় উৎসুক হয়েছেন এবার, কি ক'রে তা সম্ভব হচ্ছে? এই পর্য্যায়ে তা বিশদ ভাবে বর্ণনা করা সম্ভব না হ'লেও, তার খানিকটা বলবার চেষ্টা করবো।

১। আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১৮৬০০০ মাইল।

আলোককে অবলম্বন ক'রে বিজ্ঞানের বহু শাখা-প্রশাখা গ'ড়ে উঠেছে। যে বিশিষ্ট শাখার কথা এখন বলবো—তা হলো "বর্ণালী বিদ্যা" (Spectroscopy)। এই বিদ্যার প্রয়োগ আজ নানা স্থানে। বর্ণালী-বিদ্যা এখন দূরকে নিকট করেছে, অজ্ঞেয়কে জ্ঞেয় ক'রে তুলেছে। এই বিদ্যার জন্ম হলো ১৬৮০ খৃষ্টাব্দ হতে আচার্য্য নিউটনের (Sir Isaac Newton—জন্ম ১৬৪৩, মৃত্যু ১৭২৭) হাতে।

আচার্য্য নিউটন গবেষণার ফলে দেখেছিলেন, যদি সূর্য্যালোককে একটি স্বচ্ছ ত্রিকলি (Prism) বা প্রিজম-এর মধ্য দিয়ে ভেদ করানো হয়, তাহ'লে দেখা যায় ঐ ভেদিত (permeated) সূর্য্যালোক সাত প্রকার রঙে (colour) বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। ত্রিকলির মাঝে প্রবেশের পথে যদি একটি লম্বা ছেঁদা (rectangular) রাখা হয়, তাহলে ঐ ছড়িয়ে-পড়া ঐ আলো দেখতে হয় খানিকটা ফিতার মত (band like); যা আবার যথাক্রমে লাল, কমলা, হলুদে, সবুজ নীল, গাঢ়নীল ও বেগুনে আলোর মালা দিয়ে তৈরী। আচার্য্য নিউটনের এই আবিষ্কার বর্ণালী-বিদ্যার আদি ভিত্তি। এই লাল, কমলা ইত্যাদি বর্ণমালাকে বিজ্ঞানীরা 'বর্ণালী' বা 'Spectrum' বলেন।

বর্ণালীকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যায়। যে বর্ণালীর বিভিন্ন বর্ণগুলি পার্শ্বস্থ বর্ণের উপর গ'ড়ে গিয়ে এক অপরিষ্কার বর্ণালী সৃষ্টি করে তাকে বলে 'অশুদ্ধি বর্ণালী'। আর যে, বর্ণালীর বর্ণগুলি পার্শ্বস্থ অপর ভিন্ন রঙ থেকে পৃথকভাবে থাকে, তাকে বলা হয় 'শুদ্ধ বর্ণালী'। ত্রিকলির মধ্যে প্রবেশামুখ সাদা আলোর রশ্মিগুলি

যদি পরস্পর সমান্তরাল ( parallel ) হয়, তাহ'লে তার ফলে শুদ্ধ বর্ণালী সৃষ্টি হয়। সূর্য্যালোকের রশ্মিগুলি পরস্পর সমান্তরাল ব'লে, সূর্য্যালোকের বর্ণালী সব সময়েই শুদ্ধ।

অপরভাবে বর্ণালীকে দুই ভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়—প্রথম শ্রেণীর বর্ণালীর নাম 'বিকিরণ-বর্ণালী' ( Emission Spectrum ) ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বর্ণালীর নাম 'শোষণ-বর্ণালী' ( Absorption Spectrum )।

কোনও বস্তুকে অতিশয় উত্তপ্ত করলে ঐ বস্তু থেকে বিশিষ্ট প্রকার আলো নির্গত হতে থাকে। যেমন একখণ্ড চুণ-পাথরকে অক্সি হাইড্রোজেন ( Oxy-hydrogen ) শিখা দিয়ে উত্তপ্ত করলে অত্যুজ্জ্বল সাদা এক রকমের আলো সৃষ্টি হয়। আবার বস্তু বিহীন ( non-luminous ) করলা বাস্পের শিখায়, লবণজলে ভিজানো পলতে ধরলে হলুদে আলোর সৃষ্টি হয়। এই আলো কেবল একটি-রং-বিশিষ্ট ব'লে একে বলা হয় "একরঙা আলো" ( mono-chromatic light )। এই প্রকারে উৎপন্ন আলোকের বর্ণালীকে বলে 'বিকিরণ-বর্ণালী' ( emission spectrum )।

পূর্ব্বোক্ত ভাবে উৎপন্ন আলোটিকে যদি কোন দ্রব্যের আরকের মধ্য দিয়ে ( Solution of the material ) অথবা কোনও দ্রব্যের অপেক্ষাকৃত শীতল বাষ্পের ভিতর দিয়ে ভেদ করিয়ে বর্ণালী গ্রহণ করা হয়, তাহলে দেখা যায়, এই বর্ণালীর স্থানে স্থানে বর্ণ লুপ্ত হয়েছে। এই প্রকারের বর্ণালীকে শোষণ-বর্ণালী (absorption Spectrum) বলা হয়।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে জর্মানীর বৈজ্ঞানিক ফ্রোন্‌হোফের[২] প্রথম লক্ষ্য করেন যে, সূর্য্যালোক থেকে উৎপন্ন বর্ণালীর নানা স্থানে কালো-কালো কতকগুলি সূক্ষ্ম রেখা বর্ত্তমান রয়েছে। এই রেখাগুলিকে তাঁর নাম অনুসারে বলা হয় "ফ্রোন্‌হোফেরের রেখা" (Fraunhofer's Line)। বৈজ্ঞানিক ফ্রোনহোফের এই প্রকারের ৫০০ সরু-টি রেখা গুনে ছিলেন। বর্ত্তমানে আরো উন্নত ধরনের যন্ত্রাদির সাহায্যে ২০,০০০ হাজারটি রেখার সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। এই রেখাগুলির মধ্যে সবচেয়ে সুস্পষ্ট রেখাগুলিকে যথাক্রমে A. B. C. D. ইত্যাদিতে নামকরণ করা হয়েছে। ফ্রোন্‌-হোফেরার ঐ সূর্য্য ছাড়াও আকাশের অপরাপর নক্ষত্রাদির আলোকের বর্ণালীতে ঐ প্রকারের রেখা দেখেছিলেন। কিন্তু তখন তিনি ঐ রেখাগুলির কারণ সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। তাহলেও এই রেখাগুলি যে বিশেষ মূল্যবান, তা' তিনি অনুমান ক'রে বর্ণালীতে অবস্থান হিসাবে, তাদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ( wave length ) নিরূপণ করেছিলেন।*

এর পরে কিছুদিন কেটে গেল। ইতিমধ্যে কির্‌কোফ্ নামে এক বৈজ্ঞানিক দেখলেন, যদি সূর্য্যালোকের বর্ণালীর পার্শ্বে, লবণ জলের বর্ণালী, যার নাম 'একরঙা সোডিয়াম আলো,' রাখা যায়, তাহলে দেখা যায় যে, সূর্য্যালোকের বর্ণালীর হলুদে আলোর মধ্যবর্ত্তী "D"-রেখা স্থানে, সোডিয়াম বর্ণালীর হলুদে আলো অবস্থান করছে। অর্থাৎ সোডিয়াম'-এর আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ও "D" রেখার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য একই।

এই পরীক্ষা, বৈজ্ঞানিক কির্‌কোফ্ (Kirchoff —জন্ম ১৮২৪, মৃত্যু ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ ) প্রবর্ত্তিত নিয়ম

২। জোসেফ ফন ফ্রোনহোফার ( Joseph Von-Fraunhofer )। ইনি ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে বাভেরিয়ার অন্তর্গত ষ্ট্রাউবিং ( Straubing ) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ফ্রোনহোফারের মৃত্যু হয়েছে। উন্নত শ্রেণীর প্রিজম ও টেলিস্কোপ আবিষ্কারের জন্যে—বিশেষতঃ সূর্য্যের বর্ণচ্ছত্রে কালো রঙের রেখাবলী ( lines ) আবিষ্কারের জন্যে—বৈজ্ঞানিক জগতে ফ্রনহোফার বিখ্যাত। তাঁর ঐ আবিষ্কার Fraunhofer's Lines নামে বৈজ্ঞানিক মহলে খ্যাতি পরিচিত।—সম্পাদক, বিশ্ববাণী

* কিন্তা বর্ণালীর লাল আলো হতে বেগুনী আলো পর্য্যন্ত বিস্তৃত। লাল আলো ও বেগুনী আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৭০০০ A° ও ৪০০০ A° ( এক A° = ১/১০০০০০০০ সেঃ মিটার ) সুতরাং ঐ দুই আলোর মধ্যবর্ত্তী কির্ত-বর্ণালীর পরিবর্ত্তে বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে আঘাত করা সম্ভব। এইভাবে কোন ফ্রোন্‌হোফেরার রেখা কত তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য স্থানে আছে তা নির্ণয় করা হয়েছে।

আবিষ্কারের মূল-স্বরূপ। সূর্য্যালোক বর্ণালীর ক্রোমোস্ফেয়ার রেখাগুলির কারণ, ঐ নিয়মের দ্বারা বুঝতে পারা সম্ভব হলো। কির্‌কোফের নিয়ম দেখালো—"যদি কোন দ্রব্যের আলোককে, ঐ দ্রব্যের আরক ( solution ) বা অপেক্ষাকৃত শীতল বাষ্পের মধ্য দিয়ে প্রেরণ করানো হয়, তাহলে ঐ আলো ঐ আরক বা বাষ্প মধ্যে শোষিত (absorbed) হয়ে যায়।"

বৈজ্ঞানিক 'কির্‌কোফ্'-এর ঐ নিয়মানুসারে ধারণা করা যেতে পারে যে, সূর্য্যের মধ্য-প্রদেশ একটি শ্বেত-আলোবিশিষ্ট জলন্ত পিণ্ড-বিশেষ, যার চতুঃপার্শ্ব অপেক্ষাকৃত শীতল বাষ্প-মণ্ডল দ্বারা আবৃত রয়েছে। সূর্য্যের মধ্যবর্তী ঐ জলন্ত পিণ্ডের শ্বেত আলো যখন অপেক্ষাকৃত শীতল আবহ-মণ্ডল ভেদ ক'রে আসে, তখন আবহ-মণ্ডলের উপাদান হিসাবে শ্বেত-আলোর ক্রমিক বর্ণালীর ( continuous spectrum ) ছেদ ঘটে। তাই সূর্য্যালোক উৎপাদিত বর্ণালী, এক প্রকার শোষণ-বর্ণালী বিশেষ। সূর্য্যালোক বর্ণালীর ক্রোমোস্ফেয়ার রেখাগুলি থেকে এজন্য সূর্য্যের আবহ-মণ্ডল, তথা সূর্য্যের উপাদান নিরূপণ করা সম্ভব। শুধু সূর্য্য কেন, সুদূরের যে কোনও নক্ষত্রের আলোকের বর্ণালী থেকে তার উপাদান ঐরূপেই ঠিক করা যায়। বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন, সূর্য্যের মধ্যে বা আকাশস্থ নক্ষত্রাদির মধ্যে হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, হিলিয়াম, কার্বন ইত্যাদির ক্রমিক পরিবর্ত্তন হচ্ছে—এবং সেখানে আণবিক ( atomic ) শক্তির বিশাল এক আলোড়ন চল্‌ছে*।

সুদূরের আলো আজ মর্ত্তবাসী আমাদের কাছে অজ্ঞাতের রাজ-দূত—ঐ নাক্ষত্রিক আলোর কাছ থেকে মানুষ আজ জান্‌ছে, বিশ্বের শক্তির প্রধান উৎস কি? ঐ অভিকায় জ্যোতিষ্কের মাঝে কিসের লীলা খেলা অবিরত চল্‌ছে। বিজ্ঞানের সাহচর্য্য মানুষকে আজ এগিয়ে নিয়ে চলেছে রহস্যভেদের নূতনতর নবীন অভিযানে।

* এ সম্বন্ধে বিশ্ববাণীতে প্রকাশিত "সূর্য্যালি" প্রবন্ধটি দেখুন। ( কার্ত্তিক, ১৩৩১ )।

---

# জীবনের গান

শ্রীকেদারেশ্বর চক্রবর্ত্তী, এম, এ, কাব্যতীর্থ

জানিনা কখন ভাসিবে মরণ
অজানা সিন্ধুপারে—
তাই গেয়ে যাই দুদিনের গান
কবিকের বীণাতারে।
আলকে মম মধুমাস আসে
ফোটে ফুল নিতি আসি,
ঝ'রে যায় ফুল, তবু সে অতুল
তারি গাই জয়বাণী
সুনীল আকাশে যে সুষমা ভাসে
যে শোভা অবনী'পরে
তারে ধরিয়াছি চোখের তারায়
হিয়ার নিমেষ ভরে।

মলিন বাতাস ছড়ায় সুবাস
বিহগের কলগীতি
আলোর আবেশে ঘুমছে পরাণ
উছলে পুলক প্রীতি
বিশ্ববীণার অদ্ভুত তারেতে
বাজিয়েছে যে রাগিণী
কেটেছে সংশয় আজ মনে হয়
তারে যেন আমি চিনি
হাসি আঁখিজলে গড়ি' পলে পলে
হৃদয়ে তাঁহারি ছবি
যুগ-যুগান্ত স্বপন-বিভোর
আকুল অমর কবি!

# রামায়ণের বেদনা

শ্রীঅনিলকুমার হালদার

তমসাতীরবাসী আদিকবি বাল্মীকি ক্রৌঞ্চ-মিথুনের বেদনার অজ্ঞাতসারে ছন্দোবদ্ধ যে শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছিলেন, রামায়ণের সর্বত্রই সেই বেদনার সুর অল্পবিস্তর মিশ্রিত হইতেছে। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সপ্তকাণ্ডের এত বড় কাহিনীতে তাহার এতটুকু ব্যতিক্রম নাই। শ্রেষ্ঠ কাব্যমাত্রেই বেদনার উপর প্রতিষ্ঠিত, কারণ উহাই চিরন্তন সত্য এবং শ্রেষ্ঠ কাব্য সত্য ও আনন্দকে অন্বেষণ করে বলিয়া ঐ দুঃখের পরিসীমা পার হইয়া তাহা বিশ্বতলে ভাসিয়া বেড়ায় না—তাহার প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে ক্রন্দনোচ্ছ্বাস, এবং ঐ অশ্রুজলেই স্বর্গীয় আনন্দের জ্যোতি। তাই—'Our sweetest songs are those that tell of saddest thought'

রামায়ণ মহাকাব্য এবং তাহা জগতের প্রত্যেক কবিকল্পনার মহার্ঘ অবদান; এই কাহিনীর পশ্চাৎভাগে তাই নিষণ্ণ অনুকৃতির ঘনীকৃত নির্যাস স্তম্ভিত হইয়া আছে। অযোধ্যা হইতে মিথিলা, সেখান হইতে দণ্ডকারণ্য, লঙ্কা অবধি রামায়ণের পটমণ্ডপ; উপরে স্তব্ধবর্ণ নীলাকাশ অস্বাভাবিক স্থির এবং নির্মল; পশ্চিমদিকে হয়ত একটী বিচিত্র বর্ণের ইন্দ্রধনু, কিন্তু তাহা সতথা খণ্ডিত,—সেখানেও আর্তক্রন্দন—সীতার পাতাল-প্রবেশ!

গ্রন্থখানি রচনা করিবার জন্য বাল্মীকিকে দীর্ঘকাল তপস্যা করিতে হইয়াছে; অসংযত মুখ জিহ্বায় উহার নায়কের নাম উচ্চারণ-প্রক্রিয়া লইয়া মনের রসায়নাগারে 'সার্ধ-চতুর্বিংশসহস্রবর্ণ' চিন্তা করিতে হইয়াছে, যাহাতে তাঁহার স্থিরীকৃত দেহের উপর কখন যে বল্মীকস্তূপের কঠিন আস্তরণ নির্মিত হইয়াছিল তাহা তিনি বাহির করিতে পারেন নাই। মুদ্রিত নয়ন উন্মীলিত করিয়া প্রথমেই দেখিলেন বৈখুবাসক্ত ক্রৌঞ্চপতিকে নিষাদ তীব্র শরাঘাত করিতেছে।—অবরুদ্ধ শোক উৎসারণের পথ পাইয়া সপ্তকাণ্ডের সপ্তশিলাসঙ্ঘাতে পর্বে পর্বে উৎসে হইয়া উঠিল, বয়স যতই পথ অতিক্রম করিয়াছে ততই সেই তরঙ্গবেগ অব্যাহত ও উচ্ছ্বসিত এবং শক্তিশালী। সেই বেগময় স্রোতধারা যখন শেষ সীমারেখায় আসিয়াছে তখন বিস্ময়ের সহিত পাঠক দেখিল, পুণ্যতোয়া সরযূ তখনো কলকল করিয়া সে ছুটিয়া চলিয়াছে। জগতের এতোবড়ো যে পরিবর্তন হইয়া গেল সেদিকে তাহার বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই। এতবড়ো যে ক্ষতি হইল তাহাতে সে আদৌ উদ্বিগ্ন নয়। শুধু শ্রোতা কল-শ্রুতির প্রত্যাশা করিয়া যখনই শিহন ফিরিল, তখন দেখিল তাহাতে তাহার চেতনার সীমা-পরিসীমা ছিন্ন হইয়াছে। সে অনেক দূর আগাইয়া আসিয়াছে, অথবা যেখানে ছিল সেখানেই আছে। শুধু যাহা ছিল তাহা আর নাই—সে-রামও নাই, সে-অযোধ্যাও নাই!

সেই ক্রৌঞ্চযুগলই মানবমূর্তিতে রাম ও সীতায় রূপান্তরিত। বাল্মীকি উহাদের কথা জীবনে ভুলিতে পারেন নাই বলিয়া সেই বেদনাই নানাভাবে এই দুইটি চরিত্রগঠনে কাজে লাগাইয়াছেন। বিশাল হরধনু ভঙ্গ করিয়া রাম মিথিলা হইতে বৈদেহীকে লইয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলে কিছুকাল পরেই চতুর্দশ বৎসরের জন্য রামকে বনগমনের আয়োজন করিতে হইয়াছে। জটাবল্কল ধারণ করিয়া মন্থর-পদে ত্রিমূর্তি বনাভিমুখে অগ্রসর; সম্মুখে রাম, পশ্চাতে লক্ষ্মণ, মধ্যে সীতা। বনেও শান্তি নাই। স্বর্ণমৃগের প্রলোভনে সীতা অপহৃতা এবং অশোক-কাননে বন্দিনী। অনেক কষ্টে সীতা উদ্ধার হইলেও অযোধ্যা লোকাপবাদভয়ে সীতা পুনশ্চ বিসর্জিতা—অশ্বমেধযজ্ঞকালে রামের পার্শ্বে সীতা নাই, আছে সীতার প্রতিমূর্তি স্বর্ণসীতা, কারণ "সস্ত্রীকঃ ধর্মমাচরেৎ"। বাল্মীকির তপোবন হইতে পুনরানীতা সীতা গৃহীতা

হইবার সর্ব্ব-সম্ভাবনাসত্ত্বেও সর্ব্বসমক্ষে পাতালে প্রবেশ করিয়াছেন। ক্রৌঞ্চ-দম্পতির বেদনা এই রাজ-দম্পতির বেদনায় ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে কি? পাঠকের চিত্তে কবি বারংবার আঘাত দিয়া তাহার মনকে সর্ব্বদা জাগ্রত রাখিয়াছেন। রামগুণধাম ও সর্ব্বলক্ষণযুক্ত। দশরথ অবর্ত্তে হইলে পাঠক প্রত্যাশা করিতেছে রাম যুবরাজ হইবেন—হইলেন বলিয়া! সহসা সেই মাঙ্গল্য-আয়োজন পড়িয়া রহিল। কাষায়বস্ত্র পরিয়া রাম বনে চলিয়াছেন, রাজ-প্রাসাদে দশরথ মূর্চ্ছিত, পুরবাসী চোখের জল মুছিতেছে, সারা রাজ্যেই হাহাকার পড়িয়া গেল—এ' কেমন প্রতিফল? ঠিক তেমনই রাম যখনই সীতাকে বুকে পাইতে চাহিয়াছেন—তখনই হয় অগ্নিপরীক্ষা, না হয় বিসর্জ্জন, না হয় পাতালপ্রবেশ। ক্রৌঞ্চও তাহার বধূকে পায় নাই, কোলে করিতে গিয়াছিল, ব্যাধ আসিয়া উভয়কে পৃথক করিয়া দিয়াছে। ঐ ব্যাধই অলক্ষ্যের বিধাতা, ভোগের বিরুদ্ধই তাঁহার শরসন্ধান; ইহারই বার্ত্তা—ভোগ নহে! ভোগ নহে?—'ভেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা—মা গৃধ!' কিন্তু পাশ্চাত্য সাহিত্যের ট্র্যাজিক রসই এখানে আশ্চর্য্য নিপুণতার সহিত পরিবেষিত হইয়াছে; সেইজন্য চরিত্রগুলির শিরা ও ধমনীতে দুঃখ এত সংহত ও নিবদ্ধ এবং সুবলয়িত। রামচন্দ্র সীতাকে চাহেন কিন্তু সীতার মানসমূর্ত্তি বড় জোর স্বর্ণসীতা লইয়া তাঁহাকে অভিলাষ পুরাইতে হইয়াছে এবং অশ্বমেধ-যজ্ঞান্তে ইষ্টসিদ্ধি কামনায় উৎসুক হইলেও তিনি সীতাকে পান নাই। ট্র্যাজিক চরিত্রের সেই সর্ব্বধ্বংসী মর্ম্মান্তিক চিত্র, সেই ব্যর্থ হাহাকার এবং ভিন্ন ভিন্ন করিয়া সর্ব্বাভীষ্ট-বিচ্যুতি এবং সেই দিগন্তপ্রসারিত মনোজগতের মরুসুলভ আলেখ্য—রামায়ণকারের বর্ণনার মধ্যে পাওয়া যায়। রামচন্দ্রের চরিত্র সর্ব্বাঙ্গিক ট্র্যাজিক এবং কাব্যের নায়ক হিসাবেও তিনি আদর্শ ট্র্যাজিক নায়ক।

মানুষের চরিত্রের মৌলিক উপাদানও এখানে প্রকট। বোধিদ্রুমমূলে কপিলাবস্তুর রাজপুত্র গৌতমও দীর্ঘ চিন্তার পর ঐ স্বরূপের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন—সেই চিরন্তন চেতনার বাল্মীকির মননশীলতার সমুদ্ভূতি; অর্থাৎ, দুঃখই জীবনের চরমতম সত্য; ইহাই তাঁহার সমস্ত প্রধান চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

সুতরাং উক্ত আখ্যান-বস্তু ও সংশ্লিষ্ট আদিক চেতনাই ইহার সার্ব্বজনীন আবিষ্কারের প্রধান কারণ। যুগান্তকালের এমন সার্ব্বভৌম স্বীকৃতি রামায়ণ, মহাভারত ছাড়া, বস্তুতঃ আর নাই। মুদীর দোকান হইতে ধনীর অট্টালিকার উচ্চতম কক্ষে পর্য্যন্ত রামায়ণপাঠের একটানা পরাবৃত্তের সুর কালে কালে ভাসিয়া আসিতেছে। রুচি পরিবর্ত্তনেও তাহার পটপরিবর্ত্তন হয় নাই—খাঁটি সাহিত্যরসের মর্ম্মাধার মর্ম্মকথাও তাহা; এখানে প্রাচীনতা নাই, আধুনিকতা নাই—যাহা আছে তাহা শাশ্বত, যুগপৎ কালে মনে তাহা সনাতন সংক্রামকতাধর্ম্মী।

আমাদের কৃত্তিবাসের রামায়ণ শুধু অনুবাদ নহে, বাঙালী কবির অধিমানসের কোমল স্পর্শে যে রূপকুসুম মুকুলিয়া উঠিয়াছে তাহা মূলের অপেক্ষা অধিক কবিত্বসম্পন্ন, যদিও এ কবিত্বে গভীরতা অল্প, কেবল রঙীন জালের-বাহুল্য। এখানে রামচন্দ্র চন্দন-চর্চ্চিত দেব-বিগ্রহ এবং সীতাও শ্রীভাবনম্রা শান্তস্বভাবা বাঙালী-ঘরণী, তাহার করকঙ্কণে পত্যনুরাগের নম্র ভালবাসা। রামবিরহে কৌশল্যার শোকখিন্নবাঙালীজননীর পুত্রশোকাতুরহাহাকার। লক্ষ্মণও আদর্শ ভ্রাতৃবৎসল, তাহার উপর প্রলেপ কিছু কম পড়িয়াছে। কিন্তু এখানে সেই সর্ব্বরিক্ত বেদনা, কাব্যের মর্ম্মকোষের মধু নবীভূত হইয়াছে, আমাদের ঘরের পুত্র, ভ্রাতা, ভর্ত্তার স্মৃতিকথার দীর্ঘনয়কেপে যে বাস্তব-জ্ঞানের প্রতিচিত্র চোখে পড়ে তাহা যেমনই করুণ, তেমনি মিষ্টও বটে।

ভরত রাজা হইয়াছেন—কিন্তু সেই রাজমস্তকে স্বর্ণমুকুট নাই, রাজছত্র নাই। কাষায়বস্ত্র পরিহিত, জটামুকুট সমন্বিত সাত্ত্বিক সাধুপুরুষ অসিধারব্রত গ্রহণ করিয়াছে। তাহার দুই চক্ষু মায়ের চতুর্দ্দশ-

বর্ষ-বনবাসের প্রত্যন্তক্ষণের প্রত্যাশায় স্নায়ুতাবে প্রদায়িত। রাজসিংহাসনে রামের পাদুকা স্থাপিত—ভরত রাজা নহেন, রাজার প্রতিনিধি মাত্র। নন্দীগ্রামের রাজদরবার বৈরাগীর ঐশ্বর্য্যের প্রতীক—তাহার চতুষ্পার্শ্বে বিষাদের হিমালয় এবং তথাকার নৈস্তাধিক্য রামায়ণের উক্ত বেদনার শীতলতা সঞ্চারিত করিয়াছে।

রামের অভিষেকের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণ হইতে রামায়ণের প্রকৃত আখ্যায়িকার আরম্ভ। যুবরাজ রামচন্দ্র রাজ্যভার লইবার যোগ্যতম প্রতিভূ, সীতা পাট-রাণী হইবেন, পুরবাসীদের আহ্লাদ আর ধরে না। সহসা সেই বিনামেঘে বজ্রপাত হওয়ায় একমুহূর্ত্তে ছায়াবাজীর মত সমস্ত পট পরিবর্ত্তন করিয়া কবি দেখাইলেন—সম্ভাবিত এবং প্রত্যাশিত আশা ও ইচ্ছাপূরণের প্রত্যক্ষক্ষণে বিরাট আশাভঙ্গ, অপ্রত্যাশিত দুর্দ্দৈব। সমগ্র রামায়ণেরই এই একটা মূল সুর। কত যাগযজ্ঞের ধূঁয়া উড়াইয়া দশরথের মহিষীগণ পুত্র পাইয়াছিলেন, কিন্তু পুত্রসুখ সেই মন্দভাগিনীদের কপালে ঘটে নাই; তাহারা সে-সুখ পাইবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকা সত্ত্বেও বঞ্চিত হইয়াছে। সে যেন নিতান্তই হইবার নয় বলিয়া। কিন্তু রাণীদিগের মধ্যে কৈকেয়ীর ভাগ্য আরো মর্ম্মান্তিক;—যে পুত্রের জন্য সে প্রাণ ধরিয়া সমগ্র রাজপরিবারের এতবড় সর্ব্বনাশ সাধন করিল, অবশেষে সেই পুত্রই তাহাকে গালি দিয়াছে, তাই দেখিতে দেখিতে তাহার সুখস্বপ্নের সালঙ্কৃত হর্ম্ম্য—একনিমেষে ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে।

রামচন্দ্র শুধু সীতাকে বিসর্জ্জন করেন নাই, সত্যানুরোধে লক্ষ্মণকেও তিনি বর্জ্জন করিয়াছেন। যে তাই 'মম প্রাণৈঃপ্রিয়তরা'—তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে নীলসমুদ্রের তরঙ্গবিস্তার পরিলক্ষিত হইয়াছে। রামচন্দ্র তাই যৌবনের শেষপ্রান্তে সরযূতীরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন—পিছনে বেদনার শত তরঙ্গোচ্ছ্বাস, তাঁহার মজ্জায় মজ্জায় সেই সুর ধ্বনিত। রামচন্দ্র সরযূর অগাধ জলে ঝাঁপ দিলেন—আত্মহত্যা করিলেন? রামায়ণের কোন্ প্রধান চরিত্র আত্মহত্যা করে নাই? ইচ্ছায় হৌক, অথবা অনিচ্ছায় হৌক দশরথ হইতে আরম্ভ করিয়া রাম, সীতা, রাবণ পর্য্যন্ত রামায়ণের প্রত্যেক ব্যক্তিই আত্মঘাতী। রামায়ণকার কবি অলৌকিকতার অবতারণা করিয়া নৈতিকতার জয়শ্রী প্রচার করিতে পারেন, কিন্তু আমি আনুপূর্ব্বিক লৌকিক কথাই বলিতেছি। রাবণ ভোগ করিতে চায়, কিন্তু ঐ ভোগের তৃপ্তি নাই, 'হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব' তাহা বাড়িয়াই চলে—রাবণ সে কথা জানিত, তবু তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয় নাই; মন্দোদরীর বাক্যে অথবা বিভীষণের বিরোধী কার্য্যকলাপে কিম্বা একে একে রক্ষোসেনাপতিদের পতনেও তাহার চৈতন্য লুপ্ত ছিল; সে ত' নিজে কম বিচক্ষণ ছিল না; তাহার আসন্ন মৃত্যু সে কি প্রত্যক্ষ করে নাই? উপলব্ধি করে নাই? উত্তর যদি নঞর্থক হয়, তবে সে উত্তর হাস্যকর বটে।

রামচন্দ্র সরযূর গভীর জলে নিমজ্জিত হইয়া কৃষ্ণবাস হইয়াছিলেন,—মহাকবি বাল্মীকির শিল্পদৃষ্টির প্রসারণ উহার মধ্যে এককেন্দ্রিক। উত্তরকাণ্ডের ঐ সরযূ একটা প্রতীক মাত্র, উহার গভীর নীলজলে উত্তালতা নাই, সংসারের সর্ব্বমানবীয় দুঃখের নিরুদ্ধ সদাপ্রবাহিত ধারাবিশেষ ওখানে সঙ্কেতিত হইয়াছে। মহাভারতের ঐ দুঃখ প্রস্তরীভূত। পঞ্চপাণ্ডব মহাপ্রস্থানিক পর্ব্বে মেরুপ্রদেশে দুর্গম পর্ব্বতারোহণ করিয়াছে, রামায়ণে চোখের জল স্থির থাকে নাই, মহাভারতে চোখের জল শুকাইয়া জমাট বাঁধিয়া পাথরে রূপান্তরিত। মহাভারতে ট্র্যাজেডির চূড়ান্ত, রামায়ণে সাধারণ-দৃষ্ট মানবীয় বেদনার চূড়ান্ত। মহাভারতের ট্র্যাজেডি আজও কেহ অতিক্রম করিতে পারে নাই; রামায়ণের বেদনাও অনতিলঙ্ঘ্য। রামায়ণের কবিও মহাভারত-কারের ন্যায় রামের সরযূপ্রবেশকে মহাপ্রস্থান বলিয়াছেন,—দুই কবি কি তবে গোপনে কোন অভিসন্ধি করিয়াছেলেন?

রাম যখন মহাপ্রস্থান করেন তখন কৌষেয় পরিধান এবং হস্তে কুশস্তারণ করিয়াছিলেন—

'ততঃ কৌমারবো রামো ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ
হুশান্ গৃহীত্বা পাণিভ্যাং মহাপ্রস্থানমুদ্যতঃ।'

—( উত্তরকাণ্ড : গৌড়ীয়পাঠ )

মহাপ্রস্থানের এই স্তবটুকি বাহুল্যগর্ভ, যুধিষ্ঠিরের হস্তে যষ্টি ছিল, স্বজনহত্যা সংগ্রামান্তে যখন রাজ-সিংহাসন তিনি পাইতে গিয়াছেন, সেখানে শত শত নিহত আত্মার অন্তরীক্ষে হাহাকার ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে, সেইজন্য তিনি সন্ধান করিতে চলিয়াছেন নূতন কোন জগতের। কিন্তু রামচন্দ্র বিপরীত দিগন্তে হতাশমান, হতভাগ্য মানুষ জগতে সংগ্রাম করিয়াছে বাঁচিবার জন্য, যখন সংগ্রাম শেষ হইল তখন শিকড়াক্রান্ত বালুময় ধূ ধূ। জীবন শূন্য, রিক্ত ও আর্তময়। এ' মানুষ একেবারে নিঃস্ব, নিরালম্ব, নিরাশ্রয়—সমগ্র অট্টালিকে তাহাকে বিদ্রূপ করিতেছে, তাই তাহার কৌমবস্ত্র পরিধান, তাই পাণিতে কুশগ্রহণ। এতো পরিব্রাজকের বেশ নহে, ইহার পিছনে অবরুদ্ধ অশ্রু গুমরিয়া মরিতেছে। রামচন্দ্রের জীবনের দুইটি মেরুতে দুইজন দাঁড়াইয়া ছিল,—এক মেরুতে প্রাণকল্পা পত্নী সীতা, আর এক মেরুতে প্রাণাধিক ভাই লক্ষ্মণ। সীতা পরিত্যক্তা হইলেও তিনি বিচলিত হ'ন নাই, কারণ লক্ষ্মণ ছিল, কিন্তু সেই লক্ষ্মণ বিসর্জিত হইলে তাঁহার চরণের নিম্নে ভূকম্পন আরম্ভ হইয়াছে। —আর তখনই মহাপ্রস্থানের আয়োজন ;—বাল্মীকি এতবড়ো শিল্পী। সরযূর আহ্বানও এই সময়ে, সরযূর গভীর নীল জল চিরন্তন বেদনার অর্ঘ্য প্রতীক্ষা, যদি না হইত তবে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন—একে একে সকলেই উহাতে ঝাঁপ দিবে কেন ?

সীতা-চরিত্রটি প্রারম্ভ হইতে উপান্ত অবধি পর্য্যবেক্ষণ করিলে এই প্রশ্নটিই জাগে—সীতা কি অভিশপ্তা ? সীতা অযোনিসম্ভবা, ধরিত্রীর দুহিতা, পৃথিবীর কোলেই তাহার শেষ শয্যা,—ইহা কাব্যের একটা গূঢ় কৌশল হইতে পারে। কিন্তু যে মানুষ 'ষষ্টি সহস্র বর্ষ' চিন্তা করিয়া ঐ কাব্য প্রণয়ন করিয়াছে, তাহার চিন্তাও গূঢ়সঞ্চারী এবং গভীর-তলচারী হইবে, ইহাই স্বাভাবিক। মিথিলার জনকদুহিতা সতাই বরবর্ণিনী, ত্রিলোকশ্লাঘিতা ; তাঁহার স্বয়ম্বর-সভায় বিশাল হরধনুভঙ্গকারী শ্রেষ্ঠ বীরকে তিনি মাল্যদান করিলেন। হরধনু ভগ্ন হইয়াছে, দুইখণ্ড হইয়াছে ;—তাঁহার জীবনও ঐ ধনুভঙ্গের তীব্র আর্তনাদ।

নবোঢ়া বধূর শ্বশুরালয়ে গমনপথেই বিরাট বিভ্রাট ; 'দশরথাত্মজ এই ধনুতে গুণ দাও'—এই বলিয়া পরশুরাম তাঁহার সদ্য-বিবাহিত স্বামীর গৃহ-প্রত্যাগমন পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে যাত্রায় কোনমতে উদ্ধার হইলে কিছুদিন রাজোদ্যানবাসের পর তিনি বল্কল পরিহিতা, সর্ব্বাভরণবিচ্যুতা এবং বনবাসিনী, সেখানে রাবণহস্তে নিগৃহীতা এবং অশোকবনে বন্দিনী। এবার অগ্নিপরীক্ষা, আবার তপোবনে পরিত্যক্তা। তারপর দারুণ দুঃখে উচ্চারণ করিলেন, 'মা ধরণী দ্বিধা হও।' প্রথম স্বামীমুখ দর্শন করিয়াছেন দ্বিখণ্ডিত ধনুক দেখিয়া, শেষবারের মতো স্বামীমুখ দর্শন করিলেন—দ্বিখণ্ডিত ধরণী দেখিয়া। ঐ দ্বিধাবিভক্ত হৃদয়ের ক্ষত মুখে বেদনার নৈরিক-নিঃস্রাব রামায়ণ পাঠককেও অশ্রুসিক্ত করিয়া তুলে।

পূর্ব্বে ভরতের কথা বলিয়াছি, লক্ষ্মণের জীবনও অনুরূপ তীব্র জ্বালাময়। লক্ষ্মণ প্রাকৃপ্রাণ, সুখে দুঃখে তাঁহাকে অনুরক্ত, মায়ের স্নেহছায়া অথবা প্রেয়সী ঊর্ম্মিলার অশ্রুসিক্ত আঁখি এবং প্রেমস্নিগ্ধ আলিঙ্গন তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। ইহারা তাহার জীবনের যেন কোন অবলম্বনই নয়। রবীন্দ্রনাথ ঊর্ম্মিলাকে 'উপেক্ষিতা' বলিয়াছেন—তাহা যথার্থই। লক্ষ্মণ—সিংহাসনে উপবিষ্ট রামের পিছনে ছত্রধারী, লক্ষ্মণ জটা-চীর পরিহিত রামের ছায়ানুচর—অতবড় শক্তি-শেলের যন্ত্রণাও সেইজন্য সে স্বীকার করিয়াছে অম্লানমুখে। তবুও তাঁহাকে রামচন্দ্র বিসর্জন করিলেন, রামচন্দ্র যে সত্যানুসারী। লক্ষ্মণ তাহাতে বিন্দুমাত্র অনুযোগও করে নাই, বীরপদে লোক-লোচনের অন্তরালে প্রয়াণ করিয়াছে। এ' যেন

সেই—'Shall we receive good at the hands of God and evil not receive'?—ইহার মতই।

উপরোক্ত মানুষগুলির প্রত্যেকেরই চরিত্রের মূলগ্রন্থি কেন্দ্রাতিগ বেদনাবোধ। এ' দুঃখ একান্ত রূপে মানুষের, কারণ ঐ দুঃখাপনয়ন দেবতারও অসাধ্য বা অতিদৈব; মানুষের জন্যই যেন ইহার সৃষ্টি, সেইজন্য দেবতা হইলেও তাঁহাদিগকে মানুষ হইতে হইয়াছে—এবং ঐ পরিবর্তনও রামায়ণের রচয়িতার নিজস্ব বা প্রাতিস্বিক।

রামায়ণের চরিত্রগুলি যদি এত স্বাভাবিক না হইত তবে উহার বেদনাও এতদূর সংক্রামকতা ধর্ম্ম পারিত না এবং উহার চিরন্তন অভিব্যক্তিও অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হইত। উহাদের শরীরের নাড়ীতে নাড়ীতে যে রক্তস্রোত প্রবাহিত তাহা আমাদেরই সগোত্র, সেইজন্য উহা আমাদের চিরকালের। দশরথের বিলাপের মধ্যে, কৌশল্যার অকরুণ বিধি মাতৃত্বধর্মের অনুরোধ চেষ্টার মধ্যে, ভরতের ম্লান মুখমণ্ডলের মধ্যে এবং সীতার দীর্ঘশ্বসিত অব্যক্ত হাহাকারের মধ্যে, রামের করুণ পাণ্ডুর জীবন, লক্ষ্মণের অন্তিম ক্ষোভ—এই সকলের মধ্যে যে তরঙ্গবুদ্ধ সমুদ্র সৃষ্টি হইয়াছে তাহার ওপার হইতে এ'পারে অর্থাৎ রামায়ণের জগৎ হইতে আমাদের মনোজগতের সহিত বাল্মীকি অক্ষয় সেতুবন্ধ যোজনা করিয়া দিয়াছেন। এই মহাশূন্যতা বহুযোজনব্যাপী হইতে পারে, কিন্তু তাহা দুরতিক্রম্য নয়, পরন্তু অনায়াসসিদ্ধ ও আনন্দময়।

সেই আনন্দ;—। রামায়ণের আখ্যান-বস্তু গভীর বেদনাগ্রস্ত হইলেও অপূর্ব্ব আনন্দকর; ঐ দুঃখে একটা আশ্চর্য্য উল্লাস আছে, ঐ উল্লাস যেন উটের কণ্টক-ভক্ষণ, অথবা মানুষের পক্ষে 'বৈছে ইক্ষুচর্ব্বণ'। অন্তরে কষ্টবোধ হইলেও তাহা ছাড়িবার উপায় নাই, জ্বালা বহু করিয়াও সুখ অনুভব, আঘাত পাইয়া আহ্লাদের উদ্রেক—ট্র্যাজেডির আনন্দ উহারই সামিল। এখানেই 'চোখের জল ফেলতে হাসি পায়।'

ঐ আনন্দ পরিবেশনার্থে পরবর্ত্তীকালে ঐ দুঃখের ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া একখানি উচ্চাঙ্গের কাব্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল—ভবভূতির "উত্তর রাম-চরিত"। ইহার প্রথম অঙ্কেই আলেখ্য দর্শন। চিত্র দেখিতে দেখিতে ক্লান্তিবশতঃ সীতার সহসা নিদ্রাকর্ষণ হইলে তিনি রামকে বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করিলেন, অমনি রামচন্দ্র বলিতেছেন:—

'প্রিয়ে কিমেতৎ।
বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা।'

—'সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা'—ইহা কি সুখ না দুঃখ? 'বিনিশ্চেতুং শক্যো ন তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না;—ইহা নিতান্তই পাঠকের পক্ষের কথা।

পুনশ্চ—রামচন্দ্রকে ভবভূতি সপ্তমাঙ্কে বাল্মীকির তপোবনে তাঁহার রচিত এক নাটক দৃশ্যার্থে উপস্থিত করিয়াছেন। সীতা প্রসববেদনায় কাতর, কিন্তু কেহ কোথাও নাই, অরণ্যও শ্বাপদসঙ্কুল। সীতা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল, তাহাতে রামচন্দ্র উদ্বিগ্ন হওয়ায় লক্ষ্মণ ইহা যে সঙ্কট তাহা তাঁহা স্মরণ করাইয়া দিল, তখন কথোক্ত নিঃশ্বাসের সহিত রাম বলিলেন,—

'এষ সজ্জোস্মি বজ্রময়ঃ'—আমি বজ্রময় কিনা তাই এই অবস্থার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। 'মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নৈপুণ্যের বিদ্যুৎ-চমক এখানে দেখা যায়।

কাব্য-প্রকাশের মর্ম্মমূলে এক একটা অসহ্য বেদনা থাকে; প্রকাশের ঐ বেদনাও আনন্দের আস্বাদহীন নয়—ইহা প্রত্যেক সৃষ্টিপ্রতিভাশালী লেখকই উপলব্ধি করিয়া থাকে। বাংলার এক আধুনিক কবি, যিনি দুঃখের ভূস্বর্গ গড়াইয়া চিরন্তনতার মধ্যে যে দিগন্তাহত উষর বালুময় মরুভূমি রচনা করিয়াছেন, তাঁহার ভাষায়,—

'আনন্দ নয় নয়,
নিজ দুঃখ, নিজ দুঃখ—দুঃখেরি কেবি হে।

যা' প্রত্যক্ষ নিষ্ঠুর দুঃখ, তারে মায়াময় বলি,
টেনে বুনে তারে আনন্দ ব'লে আপনারে কেন ছলি ?
চোখ বুঁজে যারে আনন্দ বলে আনন্দ করো বাবা,
চোখ চেয়ে যদি দুঃখই বলি কি তাহে এমন বাধা ?'

—[ মরীচিকা—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ]

আমাদের ভারতীয় দর্শনও দুঃখের মধ্যে যে আনন্দ আছে তাহার কথাই বলিয়াছে, ভগবদ্গীতায় উক্ত স্থিতধীর একটা প্রধান লক্ষণ হইতেছে,—'দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।'

সুতরাং সার্ব্বজনীন সংবেদনশীলতাই রামায়ণে সঞ্চারিত করিয়া মানব-সত্যের নিপুণ ভাষ্কর্য্যই কবি গঠন করিয়াছেন। কবি-জীবনের পটভূমিকায় যেমন কারুণ্য, তেমনি সেই কারুণ্যোদ্ভূত অনবচ্ছিন্নধারায় সমগ্র সৃষ্টির অন্তস্তলে' প্রবাহমান ও প্রস্রবণশীল ;—রামায়ণের কাব্যমূল্যও ঐখানে স্থিতিস্থাপকতা লাভ করিয়াছে এবং বাল্মীকির জীবনদর্শন আনুষঙ্গিক অন্যান্য প্রধান অপ্রধান কথাকে অতিক্রম করিয়া জয়ী হইয়াছে। জগতের দুস্তারাবৃত দুইটি মেরুর নৈসর্গ সমস্ত ক্রান্তিরেখা-গুলিতে পরখ করুন। তাহারই কথা তিনি মনোজ্ঞভাবে বলিয়াছেন ; চরিত্রগুলি সেই রসসৃষ্টির অনুকূল মাত্র ; সুতরাং এক হিসাবে তাহার রূপক। সেইজন্য উহারা আরো জীবন্ত এবং ঐ প্রাতিভাসিকতায় জগতের মূলসত্য,—পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি,—বিধৃত হইয়াছে। একমাত্র এই দৃষ্টিতেই চিন্তাশীল লেখক উপলব্ধি করেন—

'The world is a tragedy by an excellent poet'.—( *Thais*, Anatole France).

রামায়ণের এই বেদনা তাই বিশ্বমানবিক বেদনা। উহা কাব্যবেদনাও বটে। কারণ উহার পুনঃপুনঃ পাঠে সেই আস্বাদন আরো গাঢ় হইয়া উঠে। তবে সে আস্বাদন-ক্ষমতা সর্ব্বতোভাবে বীক্ষণসাপেক্ষ বটে, নহিলে ঐ বেদনা বিশ্বনাথের যন্ত্রের বেদনা বলিয়া ভুল হইতে পারে। বাল্মীকিও তাহা জানিতেন, তাই রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের সমাপ্তি-শ্লোকে তিনি বলিয়াছেন,—

'বিক্রোঃ শ্রিয়মিবং নিত্যং পুরুষাকৃতি ধীমতঃ।
সৃষ্টবান্ নিত্য মুদ্যুক্তো কাব্যং বাল্মীকিনাং কৃতম্ ॥'

—[ উত্তরকাণ্ড: গৌড়ীয় পাঠ ]

মেঘদূতের তর্জ্জমাপ্রসঙ্গে যক্ষ তাহার প্রিয়ার স্বপ্ন দেখে, একমাত্র তাহাকেই সে বুকে জড়াইতে চায়। ঐ প্রেম দু'টি মানুষকে লইয়াই সন্তুষ্ট ও সুখী। তাই সাময়িকভাবে বাষ্পবান অধিক বলিয়াই অশ্রুপাত করে ; কিন্তু রামায়ণ অনেক উর্দ্ধে, রামায়ণ সমস্ত জগৎকে বুকে জড়াইয়া কাঁদিতেছে। ঐ ক্রন্দন অনন্তকালেও থামিবে না এবং ইহাতে সুখ-বৈকল্য ও বেদনার দহন-জ্বালা—উহা হইল চিরকালের চিরকালের নীরব ক্রন্দনের নীরব অশ্রুপাত! অযোধ্যা হইতে দণ্ডকারণ্য, তথা হইতে মাল্যবান পর্ব্বত, পম্পা সরোবর, সমুদ্রের পরপারবর্ত্তী অশোক-কানন এবং সেখান হইতে আমাদের মানস সরোবর পর্য্যন্ত সেই সুরের ঐকতানে অনুরণন। ঐ দীর্ঘছন্দের কূলে কূলে সীমা অসীমের কুলুকুলু ধ্বনি—ইহারই সহিত সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া কোন সমালোচক বাঙ্‌লা রামায়ণে বৈষ্ণবপ্রভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

বাঙ্‌লা রামায়ণে কবিতার একটী অনতিস্পষ্ট সুর পাওয়া যায় একথা সত্য। বৈষ্ণব-কবিতাও ঐ অশ্রুসজলের কথা, সেখানে বেদনার কালিন্দীকূলে রাধা কমলিনীর সন্ধ্যাতারা মূর্ত্তি—সেইক্ষণে, সেই আনমিক শরীরে সে সর্ব্বপ্রথমে কাহাকে দেখিল!—রাধা দেখিল তাহাকে—যে চিরজীবন বাঁশরীর বাঁশী বাজাইয়া গোকুল ভুলাইয়াছে—

'নিরাই উঠলো তীরে রাই কমলমুখী
সমুখে হেরল বন্ধু কান !'

—[ বিদ্যাপতি ]

বৈষ্ণবকাব্যে মিলনেও সুখ নাই ; অনন্ত মিলনের মধ্যে থাকিয়াও—'প্রাণ কাঁদে বিচ্ছেদের ডরে।'

তাই রামায়ণ সেই অশ্রুনদীর তীরে—তমসা-তীরে এক পর্ণকুটীরে বসিয়া কোন অন্ধকার যুগে

বাল্মীকি রচনা ক'রিয়াছেন। ব্যাসদেবও জগতের চূড়ান্ত সত্যকে অপরোক্ষ করিয়া তিনি তাহারই এক কাব্যরূপ দিয়াছেন। জগতের প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে জীব জীবনের চূড়ান্ত কথাই নানা ছলে প্রচারিত হইয়া থাকে,—

'In all the great poetry and literature of the world the higher centres speak".

[Bernard Shaw—*Too true to be good*'.]

এবং যেমনি মানবের প্রসাদে বাল্মীকি মুনি গোটা জগৎকে যে হস্তামলকবৎ সুস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন সে কথা ইহার মুখবন্ধেই বলা হইয়াছে। অতএব রামায়ণ সেই কাব্য, এবং বাল্মীকি সেই কবি। উপনিষদের ভাষায় বলিতে গেলে তাহা:—'কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ।'

---

# অশোক-লিপি ও ইণ্ডিকা

শ্রীকালিপদ হোড়

ভারতীয় ঐতিহাসিকদের কাছে ম্যাসিডনের সম্রাট আলেকজাণ্ডারের ( জন্ম ৩৫৬—মৃত্যু ৩২৩ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ ) ভারত আক্রমণ ( ৩২৭ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে ) একটি বিশেষ অধ্যায়ের সূচনা ক'রেছিল। আমাদের 'ক্রনোলজী', (বর্ষপঞ্জী) ইতিহাসের যা' প্রধান ভিত্তি, তারও গোড়াপত্তন এখানেই। তবুও যত আলেকজাণ্ডারের প্রচণ্ড আক্রমণেই হঠাৎ খুলে গেছে প্রাচ্য পাশ্চাত্যের মধ্যবর্ত্তী হাজার বৎসরের রুদ্ধ দ্বার। এই খোলা পথেই খাস্থাকর উজ্জ্বল আলোর মত এদেশে এসেছেন মেগাস্থিনিস, তিনি লিখে গেছেন শিশু মৌর্যরাজ্যের খুঁটিনাটি বিবরণ তাঁর অবিস্মরণীয় গ্রন্থ 'ইণ্ডিকায়' ( Indica )।

ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে মৌর্যযুগকে ( আনুমানিক ৩২১ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ থেকে আরম্ভ এবং অশোকের মৃত্যুকালে ২৩২ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে শেষ। ) 'স্বর্ণ যুগ' বল্লে কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হবে না। আর এ' যুগ সম্বন্ধে আমরা যা' কিছু জানতে পেরেছি, তার প্রায় সবকিছুই মেগাস্থিনিসের 'ইণ্ডিকা' আর সম্রাট অশোকের অনুশাসনগুলোর ওপর ভিত্তি ক'রেই। মেগাস্থিনিসের উক্তির সত্যতায় আবার কেউ কেউ বিশ্বাসী নন। কিন্তু 'অশোক-লিপি' অবিশ্বাস করবার মত দুঃসাহস সৌভাগ্যবশতঃ এখনও কারো হয় নি। ইণ্ডিকা আর অশোকলিপি ঐ দুটোর যদি একটা তুলনামূলক আলোচনা করা যায়, তা' হলে আমরা দেখতে পাবো, —অনেক কিছু মিলে যাচ্ছে একটির সঙ্গে আর একটির। এগুলোর সত্যতায় সন্দেহ করবার মত তখন আর কিছু থাকবে না, উপরন্তু এ ফাঁকে মৌর্যযুগের বিখুঁত একটা বর্ণনাও পেয়ে যাবো আমরা। কিন্তু এ আলোচনায় আনুষঙ্গিক মিলকেই যথেষ্ট ব'লে মানবো না, তাদের সাদৃশ্য থাকলেও তা' নীচের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত ক'রে নেবো।

১। মৌর্যযুগে রাজার প্রতিপত্তি ছিল অসাধারণ। এ' সম্বন্ধে 'অশোকলিপি' থেকেই বেশী জানতে পারি আমরা। 'পরিষা' বা মন্ত্রী-পরিষদ তাঁর তাঁবেদার। ওদের মধ্যে মতভেদ হ'লেই তাঁকে জানাতে হবে,—যেন ধর্ম্মকেই ঠিক ক'রে দেবেন তিনি। ধর্ম্মমহামাত্র, রজ্জুক এবং অন্যান্য বড় বড় রাজকর্ম্মচারীদের ক্রমাগত আদেশ দিয়ে যাচ্ছেন তিনি। যুদ্ধ, বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপন, বিচার-আচার প্রভৃতি প্রধান প্রধান বিষয়েও তিনিই সর্ব্বেসর্ব্বা।

রাজার প্রতিপত্তি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মেগাস্থিনিসও পঞ্চমুখ। রাজ্যের প্রধান বিচারপতি স্বয়ং রাজা। তাঁর দেহরক্ষার জন্যে নিযুক্ত হয়ে রয়েছে অস্ত্রশস্ত্র প্রহরীরা। তাঁর জন্মোৎসবে ধনী দরিদ্রের আনন্দের সীমা থাকে না। জাঁকজমক দেখে রাজার প্রতিপত্তি অনুমান করে নেওয়া বিন্দুমাত্র কষ্টকর নয় আমাদের পক্ষে।

২। অশোক বলেছেন,—তাঁর আগে নাকি অনুচরেরা রাজার কাছে সব সময় খবরাখবর পেশ করতে পারতো না। সকল সময়ে জানাবার প্রথা নাকি তিনিই চালু করেন প্রথম। এ কিন্তু কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। কারণ মেগাস্থিনিস স্পষ্টই বলেছেন :

'The King remains in the court for the whole day without allowing the business to be interrupted.' এবং—

'The palace is open to all'

( Mccrindle-এর India as described by Megasthenes and Arrian' দ্রষ্টব্য )

সে যা-ই হোক,—'প্রজাসুখে সুখং রাজঃ প্রজানাং চ হিতে হিতম্'—কৌটিল্যের এ সারবান উপদেশ নিশ্চয়ই মৌর্য রাজারা মেনে চলতেন।

৩। অশোকের যেসব অনুচরেরা রাজ্যের খবরা খবর জানতো তাদের বলা হত 'প্রতিবেদক।' মেগাস্থিনিসের 'Over-seers'-রাও এই জাতের। এরাও রাজ্যের খুঁটিনাটি বিষয়ও জানাতো রাজাকে।

৪। অশোকের 'মন্ত্রী পরিষদ' বা 'পরিষা' র সাথে মেগাস্থিনিসের 'Councillors and assessors'-এর ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। 'পরিষা' 'যুক্ত' প্রভৃতি বড় বড় রাজকর্মচারীদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিতো। মহামাত্র রজ্জুক, ধর্মমহামাত্র প্রভৃতিও বোধ হয় ছিল এর অন্তর্ভুক্ত। 'মেগাস্থিনিসের' মতে 'Councillor-রা সংখ্যায় অল্প হলেও অত্যন্ত সম্মান পেয়ে থাকেন। এর কারণ তাঁদের দৃঢ় চরিত্র আর পরিপক্ক জ্ঞান। এদের থেকেই নাকি রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্মচারীদেরও নিয়োগ করা করা হ'তো।

৫। এক ধরণের প্রতিপত্তিশালী কর্মচারীকে অশোকের সময় বলা হতো, 'রজ্জুক'। এদের সম্বন্ধে তার স্তম্ভ অনুশাসনে তিনি বলেছেন :

'I have made them self-dependent in their judicial investigation and punishment'

(Dr. Bhandarkar-এর 'Asoke' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)

'Councillors' থেকে 'arbiters for judging disputes, নিয়োগ করা হতো,—মেগাস্থিনিস ইন্ডিকায় বলেছেন এ' কথা। আর এক জায়গায় তিনি বলেছেন :

'The noblest and richest administer justice and sit in council with the king...'

৬। মৌর্য সম্রাটদের রাজধানী 'পাটলীপুত্রের' কথা অশোক আর মেগাস্থিনিস দু'জনেই ব'লে গেছেন। মেগাস্থিনিসের 'Palibothra'-ই অশোকের পাটলীপুত্র। তখনকার ভারতে সহর ছিল অজস্র। মেগাস্থিনিস বলেছেন, 'এত সহর ছিল যে, গুণে শেষ করা যায় না।' ৫ম শিলানুশাসন ( Rock Edict V ) কলিঙ্গ অনুশাসন ও সাসনাথ স্তম্ভেও অন্যান্য সহরের কথা উল্লেখ করেছেন অশোক।

৭। কলিঙ্গ অনুশাসনের 'নগর ব্যবহারক' মেগাস্থিনিস বর্ণিত নগর-শাসক 'Astynomoi'-এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

৮। রাজাদের শিকার-যাত্রা সম্বন্ধে অশোক আর মেগাস্থিনিস দু'জনেই ব'লে গেছেন। অশোকের মতে—রাজারা আগে 'বিহার যাত্রায়' বেরুতেন। শিকার এবং এই জাতীয় অন্যান্য আমোদ প্রমোদ হতো এতে। —মেগাস্থিনিসের মতে রাজাও অনেক নারী প্রহরী বেষ্টিত হয়ে শিকারে বেরুতেন—তা দেখে যুদ্ধযাত্রায় বেরুচ্ছেন ব'লেই মনে হতো তখন।

৯। মেগাস্থিনিস অবশ্যি রাখবার জন্যে রাজার বিরাট আড়ম্বরের কথা ব'লে গেছেন। ৬ষ্ঠ শিলানুশাসনে 'বিনীত' কথাটি বোধ হয় এই অর্থেই ব্যবহার করেছেন অশোক।

১০। মৌর্য রাজাদের সৈন্য বাহিনীও ছিল প্রকাণ্ড। মৌর্য প্রজাদের সাতটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন মেগাস্থিনিস।

'They ( i. e., the soldiers ) hold the 2nd place in respect of numerical strength.'—বলেছেন তিনি। কলিঙ্গ যুদ্ধে বন্দী এবং আহত নিহতের সংখ্যা থেকেই সৈন্যবাহিনীর বিরাটত্ব অনুমেয়। এই যুদ্ধে বন্দী হয়েছিল দেড় লক্ষ আর নিহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল একলক্ষ। এছাড়া ত্রয়োদশ শিলানুশাসনে অশোক বলেছেন—তিনি অনুতপ্ত হলেও শক্তিশালী।

১১। চন্দ্রগুপ্তের আমলেই ( ৩২১-২৯৭ খৃষ্ট-পূর্বাব্দ) মগধের সীমা সিন্ধুনদকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল, মেগাস্থিনিস তাঁর লেখা বিবরণের মধ্যে ব'লে গেছেন এ' কথা। অশোকও গান্ধার, কম্বোজ এবং যবনদিগকে নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। দক্ষিণে নিজ রাজ্যের সীমান্তবর্তী রাজাদের মধ্যে মেগাস্থিনিসের মতই অশোক উল্লেখ করেছেন পাণ্ড্য, সত্য আর তাম্রপর্ণীর।

১২। কলিঙ্গ দেশ যে অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল, এর প্রমাণও আমরা পাই 'অশোক-লিপি' আর 'ইতিকাতে'। মেগাস্থিনিসের মতে এদেশের ছিল ৬০০০০ পদাতিক, ১০০০ অশ্বারোহী এবং ৯০০ হাতী। কলিঙ্গ যুদ্ধে দেড়লক্ষ বন্দী আর এক লক্ষ নিহত হয়েছিল কলিঙ্গবাসী। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, স্বাধীনতার জন্যে কলিঙ্গবাসীরা প্রাণপণে যুঝেছিল অশোকের বিরুদ্ধে।

১৩। 'মেগাস্থিনিসের মতে ভারতীয় 'philosophers'দের একশ্রেণী ছিলেন 'Boutha' বা বুদ্ধের ভক্ত। বুদ্ধকে দেবতাজ্ঞানে পূজো করতেন এঁরা। অশোকও তাঁর অসীম ভক্তির কথা জানিয়েছেন সংঘমুখ্যদের কাছে। তিনি বলেছেন,

'Whatever has been said by Blessed Buddha all that has been well said.'

১৪। অশোকের মতো ভিক্ষুণীদের কথাও ব'লে গেছেন মেগাস্থিনিস। অশোকের সময়ে (২৭৩-২৩২ খৃষ্ট-পূর্বাব্দ) বিহারে বাস করতো এরা। মেগাস্থিনিসের সময়ে চিরকুমারী থাকার সর্তে শ্রমণদের সঙ্গে যেসব মেয়েরা পড়াশোনা করতো তারাই খুব সম্ভব পরিচিতা ছিল ভিক্ষুণী ব'লে।

১৫। ইতিকা আর অশোক-লিপি মনোযোগ সহকারে পড়লে একটা বিষয় কিন্তু খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে; তখনকার ভারতে ধর্ম প্রধান ছিল অনুনতি। মেগাস্থিনিস প্রথম এদের দু'ভাগে ভাগ করেছেন।

(১) যারা পাহাড়ে থাকে

(২) যারা সমতলে থাকে

কিন্তু এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে আবার ওদের দু'ভাগে ভাগ করেছেন তিনি—

(১) ব্রাহ্মণ (২) শ্রমণ।

আবার এই শ্রমণদেরও চার ভাগ করেছেন তিনি। অশোকও উল্লেখ করেছেন ব্রাহ্মণ, শ্রমণ ( বৌদ্ধ ) আর আজীবিকদের।

(১৬) রাজা কিন্তু সমান ব্যবহার করতেন প্রত্যেকের সঙ্গে। তিনি ব্রাহ্মণ এবং Hylobioi ( শ্রমণদের অন্তর্ভুক্ত ) উভয়েরই সাহায্য নিতেন দরকার মত। অশোকও ত্রয়োদশ শিলানুশাসনে বলেছেন:

'King Priyadarsin Beloved of the gods honours men of all sects·····,

প্রজাদেরও অন্যের ধর্ম-বিশ্বাসে আঘাত করতে বারবার নিষেধ করেছিলেন তিনি।

(১৭) মৌর্য যুগে ব্রাহ্মণদের প্রতিপত্তি ছিল অসীম। মেগাস্থিনিস বলেছেন—'The Brachmanes ( ব্রাহ্মণ ) are best esteemed for their more consistent opinions'. অশোকও শ্রমণদের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণদের কথাও উল্লেখ করেছেন।

১৮। অশোক-ব্যবহৃত 'আজীবিক' কথাটির

সংগে মেগাস্থিনিসের 'Hylobiai' বা 'Allobiai'-এর বেশ খানিকটা মিল আছে। তা ছাড়া মেগাস্থিনিসের মতে ওরা বনে থাকে। অশোকও অনেক গুহা দান করেছেন ওদের।

১৯। মেগাস্থিনিস বলেছেন ব্রাহ্মণেরা অহরহঃ মৃত্যুচিন্তা করে। অশোকের অনুশাসনগুলোতেও ভারতীয়দের এই বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। পরলোকের কথা বারবার বলেছেন তিনি। পরলোকের সুখই অধিকতর কাম্য তাঁর মতে।

২০। বহুবিবাহ ছিল মৌর্য যুগের একটি প্রচলিত প্রথা। অশোকেরই 'অবরোধন' ছড়িয়েছিল পাটলীপুত্র এবং অন্যান্য শহরে। সাধারণ লোকেও যে অনেকগুলি বিয়ে করতো—এ'কথা মেগাস্থিনিসও ব'লে গেছেন।

২১। মৌর্য যুগে যে মাংসাহার বেশ চলতো—এ' বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। অশোকের আগে নাকি পাকশালায় অজস্র পশুপাখী বধ করা হ'তো। চতুর্থ শিলানুশাসনেও এই এককথাই বলেছেন অশোক। পঞ্চম স্তম্ভানুশাসনে কি কি প্রাণী বধ করা যাবে না—তার এক বিস্তৃত তালিকা দিয়েছেন তিনি। কিন্তু তাঁর সময়েও পশুবধ বন্ধ হয় নি একেবারে। প্রত্যহ দুটি ময়ূর এবং একটি হরিণ বধ করবার অনুমতি দিয়েছিলেন অশোক। তবু তিনি বলেছেন :

'এতে পি চী প্রাণা পছা ন আরভিরে।' অর্থাৎ, পরে এই তিনটি প্রাণীও বধ করা হবে না।

মেগাস্থিনিস বলেছেন ; কচ্ছপের মাংস নাকি সুস্বাদু। তা'ছাড়া যাগযজ্ঞাদিতেও পশুবলি দেওয়া হতো তখন। ব্রহ্মচর্য পালন-কালে ব্রাহ্মণরা যে মাংস খেতেন না—এ' কথা লিখতেও ভুল করেননি মেগাস্থিনিস।

২২। মৌর্য যুগে মেয়েদের যে রীতিমত কড়া শাসনে রাখা হ'ত—এর সব প্রমাণ অশোক ব্যবহৃত 'অবরোধন' কথাটা। মেগাস্থিনিসও বলেছেন : 'The wives prostitute themselves unless they are compelled to be chaste.'

২৩। তখনকার ভারতীয়েরা আজকের মতই খুব উৎসবপ্রিয় ছিল ব'লে মনে হয়। রাজার অন্ত্যেষ্টিসব এবং অন্যান্য যাগ-যজ্ঞাদিতে আনন্দের বান ডেকে যেত দেশে। অশোকও এ' ধরণের উৎসব, 'সমাজের' কথা উল্লেখ করেছেন। নাচ, গান মাংসাহার হ'ত এতে। তা' ছাড়া অজস্র মেয়েলী উৎসবও হ'ত সেসময়। অশোক নিজেও প্রজাদের নানারকম স্বর্গীয় দৃশ্যাদি দেখিয়ে আনন্দ দিতেন।

২৪। ভারতের উর্বর জমিতে, মেগাস্থিনিসের মতে ঔষধের অনেক গাছ গাছড়া জন্মাত। অশোকও দ্বিতীয় শিলানুশাসনে উল্লেখ করেছেন এদের।

২৫। ভারতে দাস-দাসীদের সংগে ব্যবহার এত ভাল করা হত যে, মেগাস্থিনিস ব'লে গেছেন—ভারতে দাসপ্রথা নেই-ই। ভৃত্যের সংগে ভাল ব্যবহার করার কথা অশোকও ব'লে গেছেন ত্রয়োদশ শিলানুশাসনে।

২৬। মেগাস্থিনিসের মতে মৌর্য ভারতের জনসাধারণের একাংশ গ'ড়ে উঠেছিল কারিগরদের নিয়ে। গৃহস্থালীর টুকিটাকী থেকে যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম প্রভৃতি প্রস্তুত করত এরা। অশোকের লিপিগুলো যারা খোদাই করতো সেইসব শিল্পীদের এদের মধ্যে ধরা যায় না?

২৭। মৌর্যযুগে খাজনার হার একটু বেশীই ছিল। উৎপন্ন শস্যের একচতুর্থাংশ এবং আর একটি কর দিতে হতো চাষীদের—(মেগাস্থিনিস)। অশোকও করভার বিন্দুমাত্র কমিয়েছেন—একে একটা প্রকাণ্ড কাজ মনে ক'রে খোদাই করলেন তাঁর লুম্বিনী-স্তম্ভ-লেখে।

২৮। তখনকার ভারতে অন্যান্য শাস্তির সংগে মৃত্যুদণ্ডও চালু ছিল। কেউ—কোন কারিগরের হাত কেটে দিলে বা চোখ নষ্ট করলে শাস্তি পেতো—মৃত্যু। অশোকও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিতদের তিন দিনের ছাড় দিয়েছিলেন ধর্মকর্ম করবার জন্যে।

আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করলেই আমাদের আলোচনা শেষ হ'বে।

২৯। 'মৌর্য যুগে হাতীর প্রাচুর্য সম্বন্ধে অনেক ব'লে গেছেন মেগাস্থিনিস। আশ্চর্য্য এই, অশোকও দু' জায়গায় উল্লেখ করেছেন ওদের—

(১) চতুর্থ শিলানুশাসনে

(২) পঞ্চম স্তম্ভানুশাসনে।

তিনটি ভিন্নিই দিনে হাতী-শিকার নিষিদ্ধ করেছিলেন তিনি। হাতী শিকারের যে বিস্তৃত বর্ণনা দিয়ে গেছেন মেগাস্থিনিস তারই যেন এক ক্ষীণতম ইংগিত রয়েছে এখানে।

---

# সূর্য্যমূর্ত্তির পার্শ্ববর্ত্তী মূর্ত্তিগুলির পরিচয়

( ভারতীয় মূর্ত্তিশিল্পের কয়েকটি তথ্য )

## "এঁরা কে"

গত ১১ই শ্রাবণের যুগান্তরে "এঁরা কে" শিরোনামায় এক পত্রে শ্রীযুক্ত প্রভাত দত্ত মহাশয় প্রশ্ন করেছিলেন, "প্রাচীন ভারতের সূর্যমূর্ত্তির কতকগুলিতে সূর্যদেবের চারপাশে আরও যে চারজন দেবতার মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়" তাঁদের পরিচয় কি? তিনি আরও জানিয়েছেন যে, এঁদের পরিচয় জানবার জন্য তিনি অনেক বই ঘাঁটাঘাটি করেছেন, কিন্তু এঁরা সূর্যপুত্র এইটুকু ভিন্ন এঁদের যথার্থ পরিচয় কেউই দিতে পারে নি। পত্রলেখক "কতকগুলি মূর্তি" ব'লে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কোন্ কোন্ মূর্তি কোন্ জায়গা থেকে পাওয়া অথবা কোন্ যুগের তা তিনি জানান নি। কেবল "প্রাচীন ভারতীয়" বললে কথাটা পরিষ্কার হয় না। ভারতের প্রাচীন যুগটা বেশ কিছু লম্বা, তাই ঐতিহাসিক ভিত্তিতে সেটা ভাগে ভাগে বিভক্ত। আর অন্যান্য নানা দেবমূর্তির মত সূর্যমূর্তির যে পরিকল্পনা শিল্পযুগের প্রথম দিকটায় রচিত হয়েছিল, পরবর্তীকালে তার পরিবর্তন ঘটেছে।

প্রাচীন দেবমূর্তিগুলির আশেপাশে যে সব ছোটখাটো মূর্তি দেখতে পাই, মূর্তি শিল্প-রসজ্ঞদের ভাষায় তাঁদের বলা হয় Accessory Figures। গোড়ার যুগের সূর্যমূর্তিতে এই Accessory Figuresদের সংখ্যা ছিল ২।১টি, ( কখনো কখনো দেবতা একক ) ক্রমে তাঁদের দলবৃদ্ধি ঘটেছে। খৃষ্ট-পূর্ব প্রথম শতকে উৎকীর্ণ বুদ্ধগয়ার রেলিং-এর থামে যে সূর্যমূর্তি ক্ষোদিত দেখা যায়, তাতে সূর্যমূর্তির দুইপাশে রয়েছেন—শর-নিক্ষেপের ভঙ্গীরত দুই নারীমূর্তি। এঁরা হলেন উষা ও প্রত্যূষা। এই উষা এবং প্রত্যূষা পরবর্তী মাগধি ভাস্কর্যেও স্থান পেয়েছেন : অবশ্য আগের প্রাধান্য হারিয়ে ক্ষুদ্রাকারে। গান্ধার যুগে ক্ষোদিত এক মূর্তিতে রয়েছেন ( কাবুল মিউজিয়াম ) দুই পুরুষ মূর্তি—দণ্ড ও পিঙ্গল। এঁরা দুজন পরে প্রায় সকল মূর্তিতে স্থান পেয়ে এসেছেন। কুষাণ যুগে মূর্তিতে ( মথুরা মিউজিয়াম ) রথ আছে, রথাশ্ব আছে—কিন্তু দেবতা একক। গুপ্তযুগে কুমারা হতে পাওয়া ( কলিকাতা মিউজিয়াম ) এক মূর্তিতে দেবতার সঙ্গী দণ্ড-পিঙ্গল। (অন্যান্য বৈশিষ্ট্য এখানে আলোচ্য নয়)। তার পর ব্রাহ্মণ্য যুগে বিহার থেকে পাওয়া একটি মূর্তি, সাথে তাঁর দণ্ড-পিঙ্গল আর উষা-প্রত্যূষা। আর একটি মূর্তি রাজস্থান থেকে পাওয়া, তাতে রয়েছেন দণ্ড-পিঙ্গল এবং তাঁদের পিছনে অশ্বানন অশ্বিনীকুমার-যুগল—উষা-প্রত্যূষা

উপরে। তার পর পূর্বাঞ্চলের মূর্তিতে, বিশেষ ক'রে বাংলার শিল্পে সঙ্গীদের সংখ্যা বাড়ানো সাধারণতঃ নাই। পত্রলেখক এই জাতীয় মূর্তির কথা উল্লেখ ক'রে থাকবেন। তবে তিনি চারজন দেবতার কথা বলেছেন যাঁরা সূর্যপুত্র অর্থাৎ পুরুষ। কিন্তু পালযুগের (৮-৯ শতক) এই বাংলার ভাস্কর্যে বা তাঁরও পরবর্তী কালের মূর্তিতে যে সব Accessory Figures দেখি তা নারী ও পুরুষমূর্তির সমাবেশ। পুরুষরা হ'লেন—দক্ষিণে পিঙ্গল, তাঁর হাতে লেখনী ও শঙ্খ। ( কোনারকে ইনি বামে )—দণ্ড বা দণ্ডহস্ত দণ্ডী আর দণ্ডী সাধারণ মানুষ। নারীদের মধ্যে রয়েছেন দুই পাশে যথাক্রমে সুবর্চসী ছায়া ও সুবর্চসা। আর সেই পদ-নিক্ষেপের ভঙ্গীতে উষা এবং প্রত্যূষা রয়েছেন নীচে। এ-ছাড়াও আরো অনেক মূর্তির সমাবেশ হয়েছে এমন মূর্তিও আছে।

কোনারকের প্রার্থনারত ভঙ্গীতে দুই পুরুষ মূর্তি উপাসক বা বিদ্যাধর। উত্তরপ্রদেশ থেকে এক তল মূর্তির প্রতিলিপি দেখেছি অনুপস্থিত হ'লেও তার আশ-পাশের অনেক মূর্তির সুন্দর সমাবেশ বা প্রায় অক্ষত। এই যে অনেক সব মূর্তি, এদেরও পরিচয় আছে। সূর্যমূর্তি কেমনটি হবে, তার উল্লেখ কয়েকটি পুরাণে আছে। বিষ্ণুধর্মোত্তর বলছেন—মূর্তিতে থাকবেন পিঙ্গল—যিনি চিত্রগুপ্ত বা দণ্ড ও দণ্ডী; সূর্যদেবের চার পুত্র দেবব্রত,-যম ও দুই মনু—অরুণ দেবতার চার স্ত্রী—রাজ্ঞী, নিক্ষুভা ছায়া ও সুবর্চসা। উপরে যতগুলি দেবতার নাম করা হ'লো এছাড়াও কোনও কোনও মূর্তিতে আরও মূর্তি আছে। যেমন সাঁধুখি অরুণের ঠিক উপরে বা কাছাকাছি দুই নারী, যাঁদের বলা হয়েছে মহাশ্বেতা ও পৃথা। অন্যান্য মূর্তির তুলনায় সূর্যমূর্তি সম্বন্ধে আধুনিক পণ্ডিতদের আলোচনা হয়তো কমই। স্বর্গীয় গোপীনাথ রাও লিখিত *Elements of Hindu Iconography* বিরাট ও প্রামাণ্য গ্রন্থ। সেখানে সূর্যমূর্তির আলোচনা আছে। তবু অন্য দেবতাদের তুলনায় অল্প। স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত *Eastern Indian Medieval Sculpture* গ্রন্থের আলোচনা অতি সংক্ষিপ্ত, তবে সেখানে মৎস্য পুরাণের উদ্ধৃতি আছে, যার মধ্যে দণ্ড ও পিঙ্গল এবং 'নানা দেবতার' উল্লেখ রয়েছে। শ্রীযুক্ত শ্রীশিবরাম মূর্তি *Ancient India*-র Vol. 6a, তাঁর "Geographical and Chronological Factors in Indian Iconography" প্রবন্ধে সূর্যমূর্তির যতটুকু আলোচনা করেছেন, তা সংক্ষিপ্ত হ'লেও স্বচ্ছ। আর এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা পাওয়া যাবে—শ্রীযুক্ত বিরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত Surya—adityas and Navagrahas শীর্ষক সুলিখিত বৃহৎ প্রবন্ধে। ( *Journal of the Indian Society of Oriental Art, Vol. 16. Jan. 1950* ) পত্রলেখক এই সুন্দর গবেষণামূলক প্রবন্ধটি পাঠ করলে উপকৃত হবেন। বিষ্ণু ও সূর্যমূর্তি সম্বন্ধে তাঁর একখানি গ্রন্থ প্রকাশ হবার কথা ছিল। হয়েছে কিনা বলতে পারছি না। পত্রলেখকের প্রশ্ন কতটুকু ছিল ঠিক ধরা যায়নি। তবু সাধারণ অনুসন্ধিৎসুর পাঠকরাও যদি কিছু উপকৃত হন সেই উদ্দেশ্যে এই পত্র লিখিত হলো।—

**শ্রীইন্দু রক্ষিত,** ভারতীয় চিত্রকলা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত উপাধ্যায়, রাষ্ট্রীয় চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়, কলিকাতা।

মুদ্রাঙ্কন—মঙ্গলবার ৩০ শ্রাবণ ( ১৪ই আগষ্ট ১৯৫০ ) তারিখের সংখ্যা হইতে পুনর্মুদ্রিত।

# ইতিহাসের দুইটি তথ্য

## সম্রাট আকবরের ধাত্রীর মসজিদ

দিল্লীর এক বিস্তৃত নিস্তব্ধ প্রান্তে অবস্থিত একটি স্মৃতিস্তম্ভ। ইহা যে মহীয়সী নারীর নিষ্ঠার স্মৃতি বহন করিতেছে তিনিই সম্রাট আকবরকে লালন পালন করিয়াছিলেন। দিল্লী-মথুরা সড়কের পার্শ্বে অবস্থিত ক্ষুদ্র মসজিদ খয়ের-উল-মঞ্জীলে আর আজকাল দর্শক সমাগম হয় না। চার শতাব্দী পূর্বে সম্রাট আকবরের ধাত্রী মাহাম আনাঙ্গা এই মসজিদটী নির্মাণ করেন। শিশুকালে সম্রাট আকবরের দরবারে এই মহীয়সী নারীর যে কিরূপ প্রভাব ছিল বর্তমানে খুব কম লোকই তাহা জানেন।

মাহাম আনাঙ্গা শিশুকাল হইতে অভিষেক পর্যন্ত কোলে পিঠে করিয়া আকবরকে মানুষ করেন। সমসাময়িক লেখকরা বলিয়াছেন—কেবল দরবার ও হারেমেই নহে, স্বয়ং আকবরের উপর তিনি তাঁহার অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাহা কেবল তাঁহার নিজের জন্যই সম্ভব হইয়াছিল শুধু তাহাই নহে, ইহার মূলে তাঁহার স্বামীরও যথেষ্ট প্রভাব ছিল। ইহাতেই প্রমাণ হয় যে, তিনি কেবল ধাত্রীই ছিলেন না, তদপেক্ষা অধিক আরো কিছু ছিলেন। তাঁহার স্বামী নুদীম খাঁ হুমায়ুনের একজন বিশ্বস্ত অনুচর ছিলেন। বিপন্ন হুমায়ুন তাঁহারই উপর রাণী হামিদাবানু ও শিশু আকবরকে অমরকোট হইতে গানে লইয়া যাওয়ার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। অনেকে বলেন, মাহামই মোগল রাজ-দরবারে বিশেষ প্রভাবশালী ওমরাহ বৈরাম খাঁর পতনের মূল এবং এই ঘটনার পর হইতেই সম্রাটের দরবারে মাহামের প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। জনৈক সমসাময়িক লেখক বলেন যে, এই কূটনীতির খেলায় মাহাম তাঁহার আত্মীয় দিল্লীর কোতয়াল সাহাবুদ্দিন খাঁর সাহায্য লইয়াছিলেন। কথিত আছে, মাহাম আনাঙ্গার পরামর্শে সম্রাট আকবর একবার তাঁহার পীড়িতা মাতাকে দেখিতে সেকান্দ্রাবাদ যান। সাহাবুদ্দিন ও অন্যান্য আমীর ওমরাহ, যাঁহারা বৈরামের বিরোধী ছিলেন, তাঁহারা এই সুযোগ গ্রহণ করেন এবং গোপনে বৈরামের বিরুদ্ধে আকবরকে নানা কথা বলিতে আরম্ভ করেন। শুনা যায়, তাঁহারা নাকি সম্রাট আকবরকে এমন কথাও বলিয়াছেন যে, বৈরামের পরামর্শ না করিয়া যাত্রা করিলে তিনি সম্রাটের উপর ক্রুদ্ধ হইবেন। ইহাতে তরুণ সম্রাটের আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগে এবং তিনি বৈরামের প্রতি ক্রুদ্ধ হন। এই ঘটনার পরই বৈরামের পতন হয়। সাহাবুদ্দিন খাঁর সহায়তায় ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে খয়ের-উল মঞ্জীল নির্মিত হয়।

## নানা সাহেবের শেষ জীবন ?

### ('টাইমস'-এ চাঞ্চল্যকর ঘটনার তথ্য প্রকাশ)

লণ্ডন, ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৫—নানা সাহেবের শেষজীবন সম্পর্কে নানারূপ কাহিনী প্রচলিত থাকিলেও আজ পর্যন্ত তাঁহার শেষজীবন সম্পর্কে প্রামাণ্য কোন তথ্য সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই। অথচ নানা সাহেবের শেষ জীবন সম্পর্কে ভারতের ভূতপূর্ব জনৈক ব্রিটিশ রিক্রুটিং চীফ অফিসারের এক আত্মীয় এক নূতন ও চাঞ্চল্যকর তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। তিনি জানান যে, আজ হইতে ৫৫ বৎসর পূর্বে উক্ত অফিসারের অধীনস্থ জনৈক কর্মচারী সম্পূর্ণ আকস্মিক ভাবে হিমালয়ের এক গুহায় তাঁহার সাক্ষাৎ পান।

রিক্রুটিং অফিসারটির এই আত্মীয়টির নাম মিঃ এ ডিকার্স। তিনি এই সম্পর্কে 'টাইমস'এ একটি পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। সিপাহী বিদ্রোহের

পর ব্রিটিশ বাহিনী নানা সাহেবকে অনুসরণ করে। কিন্তু ১৮৫৮ সালে তিনি অদৃশ্য হইয়া যান। অনেক সন্ধান করিয়াও কেহ তাঁহার সন্ধান পায় না। মিঃ ডিকার্স লিখিয়াছেন যে, এই ঘটনার ৪২ বৎসর পরে ১৯০০ সালে ভারতীয় বাহিনীর (ব্রিটিশের) এক অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ সুবাদারের সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে তাঁহার (নানাসাহেবের) সাক্ষাৎ পান। উক্ত সুবাদারটিকে তদানীন্তন ব্রিটিশ রিক্রুটিং চীফ অফিসার ও মিঃ ডিকার্সের ভগিনীপতি (বৃটিশের অধীন) ভারতীয় বাহিনীতে সৈন্য সংগ্রহের কার্যে নিয়োগ করেন।

একদিন হিমালয়ের পাদদেশ দিয়া উক্ত বৃদ্ধ সুবাদারটি ক্লান্তিবশতঃ শিবালিকের নিকট একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে বিশ্রামার্থ উপবেশন করেন। মন্দিরের পূজারী এক অতিবৃদ্ধ তাঁহার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হন। এই আলাপের সময়েই বৃদ্ধ তাঁহাকে 'নানাসাহেব' বলিয়া চিনিতে পারেন। কারণ তিনি সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে বাল্যকালে নানা সাহেবের সহিত যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তিনি যে নানা সাহেবকে চিনিতে পারিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে তখন জানাইলেন না।

রিক্রুটিং অফিসার ঘটনাটিতে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু সরকার অতি বৃদ্ধ নানা সাহেবের জীবনের শেষদিনগুলি নিষ্কণ্টকে ও শান্তিতে কাটিতে দিতে মনস্থ করেন। —মাইকেল

---

# গ্রন্থ-সমালোচনা

পুস্তক-সমালোচনার জন্য প্রত্যেক পুস্তকের দুইখানি করিয়া কপি পাঠাইয়া দেওয়াই সাধারণ নিয়ম। অতএব গ্রন্থকার অথবা পুস্তক-প্রকাশক মহাশয়দিগের প্রতি আমাদের নিবেদন—'বিশ্ববাণী'তে কোনও পুস্তক সমালোচনা করাইতে হইলে তাঁহারা আমাদের নিকটে প্রত্যেক সমালোচ্য পুস্তকের দুইখানি করিয়া কপি পাঠাইবেন। —ইতি সম্পাদক, 'বিশ্ববাণী'।

**নিবেদিতা**—(ভারতপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের মানসকন্যা ও ভারতপ্রাণা শ্রদ্ধেয়া ভগ্নী নিবেদিতার জীবনচরিত)। অনুবাদিকা—নারায়ণী দেবী।

মূলগ্রন্থ *Nivedita—Fille de l'Inde* (নিবেদিতা—কিল্ দে লাঁদ্) মাতায় লিখিলে বের্ঁ কর্তৃক ফরাসী ভাষায় লিখিত। কয়েক বৎসর পূর্বে আমেরিকা যুক্তরাজ্য হইতে *The Dedicated* নামে ঐ মূল ফরাসী পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমান গ্রন্থটি নারায়ণী দেবী কর্তৃক উহার বাঙলা অনুবাদ। ডবল ক্রাউন ষোলপেজী সাইজ, মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৮২। বোর্ড বাঁধাই। সুদৃশ্য প্রচ্ছদপট। গ্রন্থের প্রথম দিকে শ্রদ্ধেয়া ভগিনী নিবেদিতার একটি ছবি আছে। প্রকাশক—শ্রীবিমলশঙ্কর বসু, এম.এ—উমাচরণ প্রদর্শনী, ৪৮।১।বি, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। প্রাপ্তিস্থান—মহেশ লাইব্রেরী, ২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য সাড়ে সাত টাকা।

বর্তমান ভারতের জাতীয় অগ্রগতির ইতিহাসের সম্বন্ধে যে সমস্ত সুশিক্ষিত ব্যক্তি বিশেষভাবে জ্ঞাত আছেন তাঁহাদের নিকট ভগিনী নিবেদিতার পরিচয় প্রদান নিষ্প্রয়োজন। সুদূর আয়র্লণ্ডে জন্মগ্রহণ করিলেও এই মহীয়সী পুণ্যচরিতা ও প্রতিভা-শালিনী নারী ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীদের সম্পূর্ণ-রূপে আত্মার আত্মীয় ছিলেন। ভারতপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব মহত্ত্ব বহুমুখী প্রতিভা কবিত্ব জীবনের বৈচিত্র্য ও অসাধারণত্বই এই মহীয়সী ও মনস্বিনী মহিলাকে ভারতবর্ষ হিন্দুধর্ম ও ভারতীয় সভ্যতার গৌরবময় ঐতিহ্যের দিকে আকৃষ্ট ও অনুরক্ত করিয়াছিল।

সত্যদ্রষ্টা ঋষি স্বামী বিবেকানন্দ এই অনাঘ্রাত

ও পবিত্র শুভ্র শতদল পদ্মটি ভারতজননীর চরণ-কমলে পূজার অর্ঘ্যরূপে নিবেদন করিয়াছিলেন। সেইজন্য চিরকুমারী ব্রহ্মচারিণী মার্গারেট নোবল 'ভগিনী নিবেদিতা' নামেই জনসমাজে শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত অধিকতর পরিচিতা। এযুগে ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে মহাপ্রাণ মহাকর্মী ও প্রতিভাশালী কয়েকজন বিখ্যাত নরনারী ভারতের সেবায় আপনাদের আজীবন নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের সহিত তাঁহাদের অনেকেরই অন্তরের যোগাযোগ নিবিড় ও অবিচ্ছিন্ন ছিল। কিন্তু কোন বিদেশী নরনারীই ভগিনী নিবেদিতার ন্যায় ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীদের জাতীয় সত্তার সহিত এমন সম্পূর্ণরূপে একাকার হইয়া যাইতে পারেন নাই। ভারতবাসীদের আশা আকাঙ্ক্ষা সুখ দুঃখ গৌরব ও লজ্জাকে ভগিনী নিবেদিতার মতন কোনও বিদেশী নরনারীই এমনভাবে সমগ্র অন্তরে আপনার আশা আকাঙ্ক্ষা সুখ দুঃখ বলিয়া নিজস্ব করিয়া ফেলিতে পারেন নাই।

স্বামিজীর শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে ভগিনী নিবেদিতাই ছিলেন সকল দিক দিয়া যোগ্যতমা ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। একথা স্বামিজী স্বয়ং বারবার মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। স্বামিজীর জীবনব্রত, তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা, তাঁহার চিন্তাসম্পদ ও ভাবরাশির বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব এবং তাঁহার কর্ম্মান্দোলনকে যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে দেখিবার দৃষ্টি তাঁহার শিষ্যবৃন্দের মধ্যে একমাত্র ভগিনী নিবেদিতার মধ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট ও অধিক ছিল, একথা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না। গুরুর প্রতি একান্ত অনুরাগ ও ভক্তি-শ্রদ্ধা সত্ত্বেও নিবেদিতা নিজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য চিন্তার স্বাধীনতা ও কর্ম্মসাধনার বিশেষত্ব কখনও বিলুপ্ত হয় নাই। আধুনিক ভারতবর্ষের জাতীয় অগ্রগতির প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই নিবেদিতা নিজের উদ্ভাবনী চিন্তা নির্দ্দেশ ও কর্ম্মশীলতার আশ্চর্য্য পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

আনন্দমোহন বসু, রমেশচন্দ্র দত্ত, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিজ্ঞানবীর আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, গোপালকৃষ্ণ গোখেল, বালগঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ ঘোষ, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ডন সোসাইটি), বিপিনচন্দ্র পাল, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব প্রভৃতি আধুনিক ভারতের জাতীয় অগ্রগতির বিচিত্র ও বিশেষ প্রধান প্রধান নেতাদের বিবিধ কর্ম্মান্দোলনে ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন নানাভাবে সহায়িকা ও নির্দ্দেশদাত্রী। একাধারে এত বিষয়ে আশ্চর্য্য প্রতিভা, কর্ম্মশক্তি মননশীলতা ও পুণ্যচরিত্রসম্পন্না এমন একজন মহীয়সী নারীর জীবন-চরিত রচনা কোনক্রমেই সহজসাধ্য কার্য্য নয়।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ফরাসী ভাষায় মাদাম লিজলে রেমঁ *Nivedita—Fille de l'Inde* নামক বৃহদাকার পুস্তকটি লিখিয়াছেন। মূল গ্রন্থটি রচনায় মাদাম লিজলে রেমঁ। ভারতবর্ষ (বিশেষতঃ বাঙলাদেশ) ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকা যুক্তরাজ্যে বহু ব্যক্তির নিকট অনেক প্রামাণ্য তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাকে অনেক বৎসর ধরিয়া অনেক পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। এতদিন পরে সেই পুস্তকের বাঙলা অনুবাদ প্রকাশ হওয়ায় বাঙলার সাহিত্যের একটি অভাব দূর হইল। শুধু তাহাই নয়, ভারতবর্ষ বিশেষতঃ বাঙলার জনসমাজের সেবায় নানা ক্ষেত্রে আমরণ আত্মনিয়োজিতা এই বরেণ্যা তপস্বিনীর জীবনচরিত এ পর্য্যন্ত রচিত না হওয়ায় —সমস্ত বাঙালী জাতির পক্ষে তাহা একটি দারুণ লজ্জার কারণ ছিল। বর্ত্তমান বইখানি প্রকাশিত হওয়ায় বাঙালী এই লজ্জা ও ত্রুটি হইতে অনেক পরিমাণে মুক্ত হইল। এই বইটির প্রামাণ্য তথ্যের একটি বিশেষ দিক—স্বামিজী ও নিবেদিতার লিখিত অনেক চিঠি হইতে উদ্ধৃত অসংখ্য উক্তিরাশি। প্রত্যেকটি অধ্যায় সুন্দরভাবে সাজানো হইয়াছে। অনুবাদের ভাষা বেশ সহজ ও প্রাঞ্জল। বইখানি ভগিনী নিবেদিতাকে জানিবার ব্যাপারে অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের অনেক দিক দিয়া সাহায্য করিবে। বর্ত্তমান পুস্তকটিতে ভগিনী নিবেদিতার জীবন প্রতিভা ও কর্ম্মসাধনার যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে—

তাহাতে জিজ্ঞাসু পাঠকরা নিঃসন্দেহে উপকৃত হইবেন।

**বাংলার মহাপুরুষ**—( শ্রীঅরবিন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত )—ডাঃ শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য প্রণীত। ডবল ক্রাউন, বোল পেজী সাইজ, মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২০। বোর্ড বাঁধাই। শ্রীঅরবিন্দের বিভিন্ন বয়সের কয়েকটি ফটো ছাড়াও পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের একাংশের একটি ছবি আছে। প্রাপ্তিস্থান —মডার্ণ বুক এজেন্সী :—১০নং কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা-১২। মূল্য দেড় টাকা।

এই বইখানির নামের দিক দিয়া পাঠকের পক্ষে একটু অসুবিধা আছে। 'বাংলার মহাপুরুষ' হঠাৎ এই নাম দেখিয়া পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন না— ইহা কোন্ মহাপুরুষের জীবনচরিত ?

আলোচ্য পুস্তকটিতে শ্রীঅরবিন্দের জীবন সম্বন্ধে মাননীয় গ্রন্থকারের লেখা—জীবনচরিত রচনার দিক হইতে সার্থক হইয়াছে।

এই বইখানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও ইহার গুণসম্পদ অনেক। এত অল্প পরিসরে শ্রীঅরবিন্দের মতন একজন অসাধারণ মনীষী জাতীয় নেতা ও ধর্মগুরুর জীবন-কথা রচনাবলী ও চিন্তাধারা বর্ণনা ও ব্যাখ্যানের ব্যাপারে গ্রন্থকার যে দক্ষতা ও রচনা-কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে মুগ্ধ হইতে হয়। আলোচ্য পুস্তকের বিষয়বস্তুগুলি যথাযথভাবে সুসজ্জিত করিয়া দেওয়ায় পাঠকের পক্ষে তাহাতে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। তাহা ছাড়া পুস্তকের ভাষা ও রচনাভঙ্গীর প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। মহাপুরুষ শ্রীঅরবিন্দের জীবন কর্মসাধনা ও চিন্তাধারার সম্বন্ধে যাঁহারা সহজে ও অল্পসময়ের মধ্যে জানিতে চাহেন গ্রন্থকারের এই বইখানি তাঁহাদের নিশ্চয়ই সাহায্য করিবে।

---

# সঙ্ঘবার্ত্তা

**শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা-উৎসব**—বিগত ২৭শে কার্ত্তিক ১৩৬২ ( ১৩ই নভেম্বর ১৯৫৫ ) রবিবার অমাবস্যা তিথিতে কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে শ্রীশ্রীশ্যামাপূজার উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এই উৎসব উপলক্ষে সন্ধ্যার সময়ে আরতির পরে সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত' কথকতা করিয়াছিলেন। বাগবাজার 'বিশ্বনাথ কালীকীর্ত্তন সমিতি'র সভ্যগণ কর্তৃক চারঘণ্টা ধরিয়া কালীকীর্ত্তন গান হইয়াছিল। উৎসবে বহু ভক্ত নরনারী আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া জগন্মাতা শ্রীশ্রীকালীমাতার পূজা অনুষ্ঠান হইয়াছিল। পরের দিন মধ্যাহ্নে প্রায় পাঁচশত নরনারী মঠে অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাত্রি নয়টার সময়ে মঠ হইতে শ্রীশ্রীকালী-প্রতিমা শোভাযাত্রার সহিত বাহির করিয়া গঙ্গাগর্ভে বিসর্জ্জন-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হইয়াছিল।

**ধর্ম্মালোচনা**—পণ্ডিত শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায় বৈষ্ণবদর্শনাচার্য্য সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে সোমবার হইতে শনিবার প্রত্যেক সপ্তাহে ছয়দিন ধরিয়া শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

**শ্রীশ্রীরামনাম সঙ্কীর্ত্তন**—কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে প্রাত শনিবার বেলা তিনটার পরে সঙ্গীতবিশারদ শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পরিচালনায় গায়কভক্তেরা শ্রীশ্রীরামনাম কীর্ত্তন ও বিবিধ ভজনগান করিয়া থাকেন।

**কথকতা**—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রতি রবিবারে আরতির পরে কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত' কথকতা করেন।

**শ্রীশ্রীমা-সারদাদেবীর জন্মোৎসব**—( বিজ্ঞপ্তি )।

আগামী ১৯শে পৌষ ১৩৬২ ( ৪ঠা জানুয়ারী ১৯৫৬ ) বুধবার কৃষ্ণাসপ্তমী তিথিতে কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে ও বাঙ্গালোর শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমে পরমারাধ্যা শ্রীমা-সারদাদেবীর ১০২তম জন্মোৎসব হইবে।

প্রতিষ্ঠাতা—স্বামী অভেদানন্দ

সপ্তদশ বর্ষ—একাদশ সংখ্যা

বার্ষিক মূল্য—চারি টাকা

পৌষ, ১৩৬২

প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

ফোন—বড়বাজার ১৮০৫

নূতন সংস্করণে

পরবর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হইল

স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত

# কাশ্মীর ও তিব্বতে

আমেরিকা যুক্তরাজ্য হইতে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রত্যাগমনের পরে শ্রীমৎ স্বামী স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের ১৯২২ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীর ও তিব্বতে ভ্রমণের মনোরম বর্ণনা।

ইহাতে আছে কাশ্মীরের সামাজিক প্রথা ও রাজনৈতিক বিবর্তনের ইতিহাস। কাশ্মীররের তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা।

তিব্বতে প্রচলিত বৌদ্ধধর্মের বিশিষ্ট মতবাদ ও সাধনপদ্ধতি। হিমিস মঠে প্রাপ্ত পুঁথিতে যীশুখৃষ্টের জীবনের অপ্রকাশিত ঘটনাবলীর বাঙলা অনুবাদ। ইহা ছাড়াও আরও অনেক ঐতিহাসিক তথ্য সংযোজিত।

অনেকগুলি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানের ফটোগ্রাফ সমন্বিত।

মূল্য পাঁচ টাকা

# মরণের পারে

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের

বিখ্যাত ইংরাজী পুস্তক—

**Life beyond Death**-এর সরল ও স্বচ্ছভাষায় বঙ্গানুবাদ

ডিমাই-সাইজ ১৯৫ পৃষ্ঠা

দেহত্যাগের পরে সূক্ষ্মদেহধারী বিভিন্ন আত্মার

অনেকগুলি চিত্তাকর্ষক ফটোগ্রাফ সমন্বিত

সকল মানুষের মৃত্যুর পরে তাহাদের কর্ম্মানুসারে কাহার কি প্রকার গতি ও অবস্থা হয় সিদ্ধযোগীর প্রত্যক্ষ অনুভূতিসঞ্জাত দৃষ্টিতে তাহার ব্যাখ্যান ও বর্ণনা

জীবাত্মার বিভিন্ন অবস্থা সম্বন্ধে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ব্যাখ্যান

মূল্য পাঁচটাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১২বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬ ফোন: বি. বি. ১৮০৫

সম্পাদক—স্বামী সদাত্মানন্দ ও স্বামী বেদানন্দ

১২বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের পক্ষে ব্রহ্মচারী বলভদ্রকুমার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৪১, বিবেকানন্দ রোড কলিকাতা-৬, ভারতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌হইতে শ্রীবিমলরতন সিংহ কর্তৃক মুদ্রিত।

# বিশ্ববাণী—পৌষ, ১৩৬২

## সূচীপত্র


| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | হিন্দুদের দৃষ্টিতে যীশুখৃষ্ট ও খৃষ্টানাচার্জের ধর্ম | স্বামী অভেদানন্দ | ৫২৭ |
| ২। | শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ | শ্রীভবানীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় | ৫৩২ |
| ৩। | যীশুখৃষ্টের উপদেশাবলী | | ৫৪২ |
| ৪। | চণ্ডীদাস ( কবিতা ) | শ্রীবিজেন্দ্রলাল নাথ | ৫৪৩ |

জামসেদপুর—ব্র্যাঞ্চ

## হাওড়া মোটর কোম্পানী লিঃ

( স্থাপিত—১৯১৮ )

মোটর গাড়ীর যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

নিখুঁতভাবে ইঞ্জিন মেরামতি কাজ আমাদের বৈশিষ্ট্য

হেড অফিস—পি ৬, মিশন রো এক্সটেনসন, কলিকাতা—১

ফোন—২৩-১৮০১ ( পাঁচ লাইন )

শাখা—বম্বে, দিল্লী, পাটনা, ধানবাদ, কটক ও গৌহাটি

বস্ত্র শিল্পে মোহিনীর অবদান অতুলনীয়

## মোহিনী মিলস্ লিমিটেড

— ১নং মিল — — ২নং মিল —

কুষ্টিয়া ( পাকিস্তান ) ● বেলঘোরিয়া ( ভারত )

এই মিলে প্রস্তুত ধুতি শাড়ী লংক্লথ প্রভৃতি ভারত ও পাকিস্তানে সমভাবে সমাদৃত

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ ঃ

## চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোম্পানী

রেজিষ্টার্ড অফিস ঃ—২২নং ক্যানিং ষ্ট, কলিকাতা

ডাক্তার হরমুজাদব মল্লিক, এম. এ, এম. ডি, বি. এস, আবিষ্কৃত

পেটেণ্ট

## ইক্-মিক্ কুকার

ইহাতে এক ঘণ্টার ভিতরে বিভিন্ন আমিষ ও নিরামিষ খাদ্য অতি সহজে একঘণ্টায় সুন্দররূপে রন্ধন করা যায়। যে কোন জ্বালানী দ্রব্যের দ্বারা বিনা তত্ত্বাবধানে অতি অল্প খরচে রান্না চলে। মূল্য-তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

ম্যানেজার—ইক্-মিক্ কুকার, ২১১।১এ, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

## সূচীপত্র


| | | | |
|---|---|---|---|
| ৫। | ১৮৫৩-৫৭ সালের বিপ্লবী বাঙালী | শ্রীঅনিলকৃষ্ণ সরকার | ৫৪৪ |
| ৬। | ভক্তশ্রেষ্ঠ বিদুর ( কবিতা ) | শ্রীশান্তিময় ঘোষ | ৫৪৬ |
| ৭ | ফার্সনিক রেনে দেকার্তের জীবনকথা | | ৫৪৭ |
| ৮। | দেকার্তের দার্শনিক মতবাদ | পুরাগ পরমপন্থী | ৫৪৯ |
| ৯। | বৈজ্ঞানিক কামি | শ্রীবীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় | ৫৫৩ |
| ১০। | প্রাচীন তাম্রলিপ্তির সংস্কৃতি | | ৫৫৪ |
| ১১। | মহাপুরুষ শ্রীমৎ শিবানন্দ মহারাজ | | ৫৫৬ |
| ১২। | শ্রীশ্রীমায়ের স্মরণে | শ্রীশোভা রায় | ৫৬১ |
| ১৩। | পত্রাবলীর-পাঠক | শ্রীঅনিলকুমার হালদার | ৫৬৩ |
| ১৪। | সঙ্ঘবার্তা | | ৫৬৬ |


## "বিশ্ববাণী"-র নিয়মাবলী

১। 'বিশ্ববাণী'-র বর্ষ আরম্ভ হয় প্রতি ফাল্গুন মাসে। বৎসরের যে কোন সময়ে আপনি গ্রাহক হইতে পারেন। তবে প্রথম সংখ্যা হইতেই লইতে হইবে।

২। 'বিশ্ববাণী'-র বার্ষিক মূল্য সডাক চারি টাকা, ষান্মাসিক দুই টাকা, প্রতি সংখ্যা আট আনা। মূল্য অগ্রিম পাঠাইতে হইবে।

৩। কোন গ্রাহকের ঠিকানা অল্পদিনের জন্য পরিবর্তিত হইলে তিনি স্থানীয় ডাকঘরে নির্দেশ দিবেন; বেশীদিনের জন্য হইলে পূর্ববর্তী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে নতুবা পূর্বের ঠিকানায় পত্রিকা প্রেরিত হইবে।

৪। 'বিশ্ববাণী'-র গ্রাহক মূল্য মনিঅর্ডার যোগে পাঠাইলে কুপনে নাম ও ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। কোনও মাসের সংখ্যা না পাইলে গ্রাহকগণ তাহার পরের মাসে সাত তারিখের মধ্যে আমাদিগকে তাহা জানাইবেন।

৫। 'বিশ্ববাণী'র জন্য প্রবন্ধাদি পাঠাইবার কালে রচয়িতার নাম ঠিকানা যেন তাহাতে বেশ স্পষ্টাক্ষরে সন্নিবেশিত থাকে। 'বিশ্ববাণী'তে প্রকাশযোগ্য প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হয়। প্রবন্ধাদি হারাইয়া যাইলে বা কোন প্রকারে নষ্ট হইলে আমরা দায়ী থাকি না।

প্রবন্ধ স্বল্পায়তনে, মূলতঃ চার পাতার মধ্যে রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। দীর্ঘাকার প্রবন্ধ ছাপা অসম্ভব

৬। প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাক-টিকিট পাঠানো চাই। ছয়মাস পরে অমনোনীত প্রবন্ধাদি নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। কোনও লেখা প্রকাশিত করা সম্পূর্ণরূপে সম্পাদকদের অভিমত সাপেক্ষ। ইহার জন্য সম্পাদকেরা কোনও কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নহেন।

৭। কাহারও কোন বিষয় জানিতে হইলে ( গ্রাহক হইলে, গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিবা ) সরাসরি রিপ্লাই কার্ডে অথবা ডাক-টিকিট সমেত এবং পূর্ণ ঠিকানার সহিত দিতে হইবে। অন্যথায় উত্তর দেওয়া হয় না।

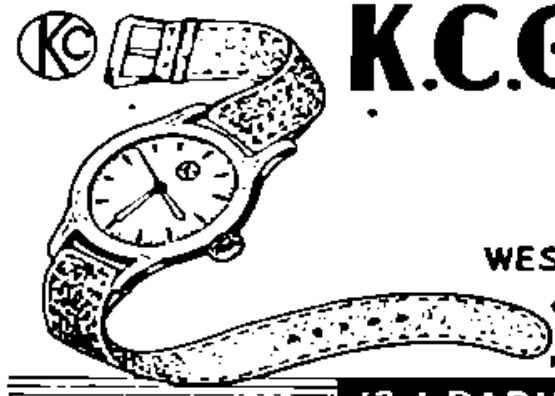

K.C.GANGULY
& CO.

*Dealers in:-*

WEST END • FAVRE-LEUBA
& ANGLO SWISS

★ REPAIRING OUR SPECIALITY

12-1 RADHA BAZAR ST. CAL-1

স্বামী ওঁকারেশ্বরানন্দ প্রণীত

## ১। প্রেমানন্দ জীবন-চরিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইস চ্যান্সেলর ভারতবরেণ্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের এই জীবন-চরিতখানি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আধ্যাত্মিক শাখার গ্রন্থরাজির মধ্যে বিশেষ সম্মানীয় স্থান অধিকার করিবে।··· হৃদয়স্পর্শকারী সুন্দর ও প্রাঞ্জলভাবে বর্ণিত।" প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠায় ৪খানি সুন্দর ছবি সহ, সুলভ সংস্করণ মূল্য ৩,০ বাঁধাই ৪৲ টাকা।

## ২। প্রেমানন্দ ১ম ভাগ ২য় সংস্করণ ও ২য় ভাগ

সাধক ও ভক্তদিগকে প্রদত্ত অমূল্য উপদেশ সংগ্রহ।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ভূতপূর্ব ভাইস প্রেসিডেন্ট পূজ্যপাদাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী অচলানন্দজী মহারাজ লিখিয়াছেন—"পড়িয়া প্রাণে বড় আনন্দানুভব করিলাম"।

উদ্বোধন—"উপদেশ অংশ পড়িয়া সংগ্রাহককে কৃতজ্ঞতা না জানাইয়া থাকা যায় না।" সকল পত্রিকায়—উচ্চ প্রশংসিত। সুন্দর আর্ট পেপারে চারিখানি ছবি ইহাতে আছে। মূল্য যথাক্রমে ২।০ ও ২৸০

প্রাপ্তিস্থান :— শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ,—১৯বি, রাজা রাধাকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

পোঃ অঃ কুণ্ডা, দেওঘর, এস. পি., বিহার এই ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট লইলে ডাক মাশুল লাগিবে না।

ডি, রতন এণ্ড কোং

ফটোগ্রাফার্স

ফটো

২২-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিঃ ৬

ফোন: ৩৪- ৩৭১১

সপ্তদশ বর্ষ | পৌষ—১৩৬২ | একাদশ সংখ্যা

# হিন্দুদের দৃষ্টিতে যীশুখৃষ্ট ও খৃষ্টানচার্চ্চের ধর্ম্ম

স্বামী অভেদানন্দ

যীশুখৃষ্টের অনুভূতিময় জীবনে প্রকাশিত যে-ধর্ম এবং খৃষ্টান ধর্ম-সম্প্রদায়ে আচার-অনুষ্ঠানে ও বিশ্বাসবিধিতে পূর্ণ প্রচলিত যে ধর্ম—তাহাদের মধ্যে হিন্দুরা বিরাট পার্থক্য দেখিতে পান। কারণ, হিন্দুদের সত্যান্বেষী দৃষ্টি হইতে দেখিতে পাওয়া যায়—ইহাদের উভয়ের প্রকৃতি ও প্রকাশ কখনই এক ও অভিন্ন নয়। মহামানব যীশু তাঁহার নিজ জীবনে ধর্মের যে উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সাক্ষাৎ শিষ্যদের ( Apostles ) নিকট যে ধর্মকে তিনি প্রচার করিয়াছিলেন—তাহার সঙ্গে এখনকার দিনে খৃষ্টানদের জনসমাজে ও গীর্জ্জায় যে ধর্মমত প্রতিপালিত হইতেছে, তাহারা একেবারেই ভিন্ন প্রকৃতির। বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক অনুভূতিপূর্ণ প্রকৃত ধর্মকে মহামানব যীশুখৃষ্ট আপনার অলোকসামান্য জীবনের দৃষ্টান্তে প্রচার করিয়াছিলেন। এই ধর্মকে 'খৃষ্টধর্ম' বলাই উচিত। আর সাম্প্রদায়িক মতবাদ ও আচার-অনুষ্ঠানে পূর্ণ যে ধর্ম গীর্জ্জাতে প্রচারিত ও অনুষ্ঠিত হয় তাহাকে 'খৃষ্টান ধর্ম' বা 'Churchianity' নামে অভিহিত করাই যুক্তিসঙ্গত। যীশুখৃষ্টের ব্যক্তি-জীবনের ভিত্তিতে পরবর্ত্তী কালে খৃষ্টান সম্প্রদায় যে ধর্মমতকে গড়িয়া তুলিয়াছে এবং যাহা সাধারণতঃ 'খৃষ্টান ধর্ম' বা 'Christianity' নামে পরিচিত, আসলে তাহাকে 'গীর্জ্জামতাবলম্বী ধর্ম' বা 'Churchianity'ই বলা উচিত।

যে ধর্মমত যীশুখৃষ্ট স্বয়ং উপলব্ধি ও প্রচার করিয়াছিলেন—তাহার মধ্যে সম্প্রদায়গত কোনও যুক্তিহীন মতবাদ বিশ্বাস উপাসনা-পদ্ধতি ও ধর্মীয় তত্ত্ববাদ ( theology ) ছিল না। যীশুখৃষ্টের নিজস্ব প্রচারিত ধর্ম মানুষের অন্তরের ধর্ম। সেই ধর্মে কোনও অনুষ্ঠান-পদ্ধতি কিম্বা পৌরহিত্যবাদ বা যাজিকতন্ত্রীয়তা নাই। সেই ধর্মের ভিত্তি কোনও বিশেষ পুস্তকের উপর স্থাপিত নয়। তাহা অন্তরের আকুলতা ও অনুভূতির ধর্ম। সেই ধর্ম বিশ্বপিতা ঈশ্বরকে সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করার এবং তাঁহার সহিত আলাপনের ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। অপর পক্ষে খৃষ্টান ধর্মের প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রচলিত ধর্মমত কোনও বিশেষ পুস্তকের উপরেই ভিত্তি করিয়া স্থাপিত। সাম্প্রদায়িক এই ধর্মমতে

উপাসকদের কতকগুলি অঙ্গীকার-বিধি ( creed ) মানিয়া চলিতে হয়। ধর্মমতগত ইহার বিশেষ একটি সাম্প্রদায়িক তত্ত্বশাস্ত্র আছে। এই মতের অন্তর্ভুক্ত কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠান ও পাল-পার্বণাদি আছে। সঙ্ঘবদ্ধ একটি যাজকমণ্ডলীর অধীনে অনুজ্ঞা ও নির্দেশ মানিয়া এই সম্প্রদায়কে চলিতে হয়।

খৃষ্টান সম্প্রদায়ে যে জন-পরিচিত ধর্মমত চলিয়া আসিতেছে, যীশুখৃষ্টের দেহত্যাগের ৩২৫ বৎসর পরে তাহার উৎপত্তির সূচনা হইয়াছে। সেই বৎসরটি সম্রাট কনষ্টান্টাইন-এর[১] ( Constantine—the Great নামে অভিহিত ) রাজত্বকালের বিংশতম বৎসর। ঐ বৎসরে নিসীয়া ( Nicea ) মহানগরে খৃষ্টান ধর্মনেতাদের একটি বিরাট সম্মিলন-সভা ( Council ) আহ্বান করা হইয়াছিল। রোমান সম্রাট কনষ্টান্টাইনের জীবন-কাহিনী সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন, এই তথাকথিত সাধুচরিত্র রোমান সম্রাট খৃষ্টান চার্চের অবলম্বিত সাম্প্রদায়িক মতবাদ ও নিয়ম-নীতির কিরূপ অন্ধ সমর্থক ছিলেন। 'ধার্মিক ও সাধুচরিত্র' বলিয়া প্রচারিত সম্রাট কনষ্টান্টাইন শুধু সন্দেহের বশবর্তী হইয়া নিজের এক পুত্র এবং তাহার স্ত্রী ফোষ্টাকে (Fausta) হত্যা করাইয়াছিলেন। শুধু তাহাই নয়, তিনি নিজের একজন শ্যালক লিসিনাস (Licinus) এবং লিসিনাসের নিরপরাধী পুত্রকে নিজ হাতে কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন। নিজের সিংহাসনলাভের পথে তিনি যাহাদের বিরোধী ও অন্তরায়রূপে দেখিয়াছেন—তাহাদিগকেই কনষ্টান্টাইন নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছিলেন। এই সমস্ত অঘন্যকার্য-সত্ত্বেও গ্রীক চার্চ ( Greek Church ) কনষ্টান্টাইনকে সিদ্ধপুরুষের পর্য্যায়ে উন্নীত করিয়াছিল। গ্রীক চার্চের মতাবলম্বী খৃষ্টানেরা এখনও পর্য্যন্ত 'সিদ্ধপুরুষ' ( Saint ) বলিয়া কনষ্টান্টাইনের স্মৃতিপূজা করিয়া থাকে।

৩২১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট কনষ্টান্টাইনই নিজে রাজাজ্ঞার দ্বারা ঘোষণা করেন—তখন হইতে ইহুদীদিগের ধর্মশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট বিশ্রামবারের ( Sabath day শনিবার ) পরিবর্ত্তে প্রত্যেক সপ্তাহের রবিবারকে খৃষ্টানরা বিশ্রামবার ( বা উপাসনার দিন ) হিসাবে পালন করিবেন। ইহুদীজাতি ও তাহাদের সম্পর্কীয় সমস্ত বিষয়ের প্রতিই কনষ্টান্টাইন বিদ্বেষী ও ঘৃণাপরায়ণ ছিলেন। সেইজন্য তিনি

১। কনষ্টান্টাইন নামে রোমান জাতীয় একাধিকজন সম্রাট পুরুষানুক্রমে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রথম সম্রাটের নামই এই প্রবন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই বংশে প্রথম কনষ্টান্টাইন সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও বিখ্যাত সম্রাট। এজন্য ইঁহাকে ইতিহাসে 'Constantaine the Great' নামে অভিহিত করা হয়। ইঁহার পিতার নাম Constantiuus Chlorus ( সম্রাট কনষ্টান্টাইনাস ক্লোরাস )। অনুমান ২৮৮ খৃষ্টাব্দে কনষ্টান্টাইন দি গ্রেট-এর জন্ম হইয়াছিল। ৩০৬ খৃষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর ইনি রাজ্যের ঘোড়াদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইয়া সম্রাটের পদ এবং সিংহাসন লাভ করেন। কনষ্টান্টাইন দি গ্রেট ২৭ অক্টোবর ৩১২ খৃষ্টাব্দে নিজের সাম্রাজ্য অধিকারের বিরোধী ম্যাক্সেন্টিয়াসকে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করিয়াছিলেন। সাম্রাজ্যের শান্তি ও নিরাপত্তার কারণে কনষ্টান্টাইন ৩১৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশে খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রতি সহিষ্ণুতা পোষণের জন্য রোমান প্রজাদের উপর একটি আইন জারী করিয়াছিলেন। ৩৩০ খৃষ্টাব্দে কনষ্টান্টাইন লিসিনাসকে পরাস্ত করিয়া নিজের নামের অনুকরণে 'কনষ্টান্টিনোপোল' নামে রাজধানী স্থাপন করেন। কনষ্টান্টাইন পূর্ব্বে খৃষ্টান ছিলেন না। কোনও একটি যুদ্ধে তিনি প্রায় পরাস্ত হইয়াছিলেন। সে সময়ে তিনি মনে মনে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যদি যীশুখৃষ্টের অলৌকিক শক্তির দ্বারা তিনি এই যুদ্ধে জয়ী হইতে পারেন, তাহা হইলে তিনি খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন। এই যুদ্ধে জয়ী হইবার ফলে ৩২০ খৃষ্টাব্দে কনষ্টান্টাইন খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম-বিস্তারে সম্রাট অশোকের মতন খৃষ্টান ধর্ম-বিস্তারেও কনষ্টান্টাইন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাজাশাসক হিসাবে কনষ্টান্টাইন সময়ে সময়ে প্রজাদের উপর দারুণ অত্যাচার ও নির্যাতন করিতেন। খৃষ্টান ধর্ম্মের তিনি একজন গোঁড়া পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলিয়া নিজের সৈন্যবলের সাহায্যে খৃষ্টান ধর্ম্মবিরোধী অন্যান্য ব্যক্তিকে বিনা দোষে হত্যা করিয়াছিলেন। ২২শে ৩৩৭ খৃষ্টাব্দে কনষ্টান্টাইনের মৃত্যু হইয়াছিল।—( ইতি, অনুবাদক )

ঘোষণা করিয়াছিলেন, "এখন হইতে সপ্তাহের প্রত্যেক রবিবার ঈশ্বরের প্রতি প্রার্থনা ও উপাসনার জন্য বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট হইল। কারণ রবিবার সূর্য্যেরই বার, এই দিনটি আমাদের প্রভুর (যীশুখৃষ্টের) জন্য নির্দ্দিষ্ট বিশেষ দিন।" সেই সময় হইতে খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকেরা এবং উপাসকেরা এই আদেশ মানিয়া আসিতেছে। এই রবিবার দিনটি (গ্রীস ও রোমে খৃষ্টানদের পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মসম্প্রদায়) পেগ্যানদের (Pagans) দ্বারা তাহাদের অন্যতম উপাস্যদেবতা সূর্য্যের উপাসনার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল—সেই তথ্যকে অস্বীকার করিয়াই খৃষ্টানরা প্রতি সপ্তাহের রবিবারকে ঈশ্বরের বিশেষ উপাসনার দিন বলিয়া স্বীকার ও পালন করিতে লাগিল।

খৃষ্টান ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মতবাদ নিয়মনীতি অঙ্গীকারবিধি (creed) প্রভৃতি কিরূপ হওয়া উচিত—কনষ্টাণ্টাইনই নিসিয়ার সম্মিলনে সমাগত বিশপদের (Bishops) নিকটে 'পবিত্রাত্মার (Holy Spirit) আদেশের অনুগামী' বলিয়া তাহা স্থির করাইয়া লইলেন। সেই হইতে খৃষ্টান ধর্ম্মমণ্ডলী ধর্ম্মীয় এইসব অঙ্গীকার-বিধিকে একমাত্র প্রামাণ্য বিষয় বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। এই অঙ্গীকার-বিধি প্রত্যেক রবিবারে উপাসনার সময়ে খৃষ্টানমণ্ডলীর গোঁড়া মতাবলম্বীদের গীর্জ্জায় উচ্চারিত হইয়া থাকে।

ইহার পরে খৃষ্টান মণ্ডলীর ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের বিধি-নিষেধের নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ করিবার জন্য কয়েকটি সাধারণ সম্মিলন-সভা আহূত হইয়াছিল। এইসব সম্মিলনে বিরোধী ব্যক্তিদের নিরস্ত ও উচ্ছেদ করিবার জন্য যে সমস্ত কাণ্ড ঘটিয়াছিল, তাহা অত্যন্ত বীভৎস ও ভয়ানক ব্যাপার। রাজনৈতিক চক্রান্ত, ধর্ম্মশাস্ত্রগত বাগ্‌বিতণ্ডা, ধর্ম্মযাজকদের পরস্পরের প্রতি নিন্দা ও কুৎসা প্রচার, বিরোধী ব্যক্তিদের প্রতি ক্রোধ ও ঘৃণার বশে অভিশাপ বর্ষণ, (anathemas), অসংখ্য নরহত্যা করিয়া রক্তস্রোত প্রবাহিত করা প্রভৃতি ব্যাপারের ঘটনাবলী দেখাইয়া দেয় যে, খৃষ্টিয়ান চার্চ্চের তথাকথিত ধর্ম্মমতকে প্রচলিত করিবার জন্য ঐ সমস্ত অঘন্য কাণ্ডই প্রধান কারণরূপে কার্য্য করিয়াছিল। খৃষ্টান ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ইতিহাসের পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে, নিসিয়ার খৃষ্টান মহাসম্মিলনে ধর্ম্মযাজকদের মধ্যে আলোচ্য বিষয়গুলি লইয়া বিতর্ক ও বিবাদ হইয়াছিল। তাহার ফলে সেখানে উপস্থিত যুবতী মহিলাদের অপমান ও বেত্রাঘাত করা হইয়াছিল। তাহার পরে অনেক অপবিত্র দ্রব্য ফেলিয়া দিয়া গীর্জ্জার অভ্যন্তর স্থানকে কলুষিত করা হইয়াছিল। অনেক ধর্ম্মগ্রন্থকে জলন্ত অগ্নিতে ফেলিয়া ভস্ম করিয়া দেওয়া হইল। বহু সন্ন্যাসীকে বিরোধীদের দল মাটিতে ফেলিয়া দুই পায়ে পদদলিত করিয়াছিল। নিসিয়ার সেই সম্মেলনে তথাকথিত সাধুচরিত্র বিশপগণ ও খৃষ্টান চার্চ্চের সাম্প্রদায়িক মত প্রবর্ত্তকদের দল এই রকম অশোভন কার্য্যই করিয়াছিলেন।

ইহার পরে ৪৩১ খৃষ্টাব্দে এফিসাস (Ephesus, এশিয়া মাইনরের অন্তর্গত অধুনালুপ্ত একটি প্রাচীন সহর—স্মার্ণা হইতে ৩৫ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল) নগরে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের আর একটি মহাসম্মিলন (Council) বসিয়াছিল। সেখানে সংখ্যায় অধিক খৃষ্টান সন্ন্যাসী ও বিশপের দল চিৎকারপূর্ণ ঘোষণার দ্বারা বলিয়াছিল, "যে ব্যক্তি ধর্ম্মের ব্যাপারে যীশুকে দুই রকম ভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট বলে সে মহাপাষণ্ড (Nestorious)*, তাহাকে দুইখণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলা হউক ("Whoso

২। 'নেষ্টোরিয়াস' (Nestorius)—খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে উপাসকদলের লোকেরা বিশ্বাস করে ও বলে—ঈশ্বরীয় প্রকৃতি ও মানবীয় প্রকৃতির সমাবেশে যীশুখৃষ্টের স্বরূপ ও চরিত্র গঠিত—গোঁড়া খৃষ্টান ধর্ম্মমতের উপাসকেরা (যাহারা বিশ্বাস করে ও বলে যীশুখৃষ্ট স্বয়ং ঈশ্বর) পূর্ব্বোক্ত খৃষ্টানদের 'নেষ্টোরিয়াস' অথবা 'মহাপাষণ্ড' বলিয়া ঘৃণা করে ও গালাগালি দেয়।—(ইতি, অনুবাদক)

speaks of two natures is a Nestorius, and let him be cut asunder. )।" দুইজন বিশপের মধ্যে ধর্মব্যাপারে বিরোধ হইতে হইতে তাহাদের মধ্যে একজন অপর ব্যক্তিকে ক্রমাগত এমন জোরে লাথি মারিতে লাগিল যে, সে ব্যক্তি মরিয়া গেল। কোনও একটি গীর্জার উপাসকদের সম্মেলনের শেষে দেখা গেল, পরস্পরে মারামারির ফলে সেখানে ১৩৭টি মানুষের মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে! সেই ঘটনার এরূপ প্রামাণ্য যুক্তি দেয় যে, খৃষ্টানসম্প্রদায়ের লোকেদের গোঁড়ামীর ফলে লোকে কিরূপ নির্দয় ও পাষণ্ড হইয়া পড়িত।

সম্প্রদায়গত খৃষ্টান ধর্ম-সৌধের স্তম্ভ বলিয়া অভিহিত ঐসব তথাকথিত সিদ্ধপুরুষদের সম্মিলন-সভা এই প্রকারই ছিল। ইহার দ্বারা আমরা সহজেই কল্পনা করিতে পারি, খৃষ্টান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় নিয়ম-নীতিকে গঠন করার ব্যাপারে ঐ সমস্ত সম্মিলন কোন্ প্রকার মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হইত? প্রকৃত ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষত্ব বাক্য ও চিন্তার সকলের স্বাধীনতা লাভ। কিন্তু প্রথম হইতে আজ পর্যন্ত খৃষ্টান ধর্ম-সম্প্রদায়ের ইতিহাস অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, ঐ সম্প্রদায়ে মানুষের স্বাধীনভাবে কথা বলার ও চিন্তা করার অধিকারকে রুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। আর ধর্মের নামে খৃষ্টান সম্প্রদায়ে বিরোধী মতাবলম্বী ব্যক্তিদের উপরে অভিশাপ নানাবিধ লাঞ্ছনা নির্যাতন জীবন্ত মানুষকে দগ্ধ করা এবং আরও অনেক দানবীয় অত্যাচার করা হইয়াছে। মানুষের প্রতি ভালবাসা দয়া প্রীতি শান্তি ও সহিষ্ণুতার বদলে সেখানে ঘৃণা নিষ্ঠুরতা নানাপ্রকার অত্যাচারই অবাধে রাজত্ব করিয়াছে। ধর্মের নামে তরবারি চালাইয়া শত শত মানুষকে হত্যার দ্বারা রক্তের নদী না বহাইলে খৃষ্টান ধর্মসম্প্রদায়ের এইসব যুক্তিহীন ও গোঁড়া মতবাদ পৃথিবী হইতে তখনই অন্তর্ধান করিত। খৃষ্টান সম্প্রদায়ে প্রচলিত তথাকথিত ধর্মের নামে আচরিত এই সমস্ত জঘন্য কার্য সুস্পষ্টভাবে পৃথিবীর ধর্মেতিহাসের অসংখ্য পৃষ্ঠায় লিখিত আছে। হিন্দুজাতি স্বভাবতঃই মানবতাধর্মী দয়ালু ধীরপ্রকৃতি ও শান্তিপ্রিয়। হিন্দুরা সর্বদাই অন্য সমস্ত জাতির প্রতি শান্তি ও শুভেচ্ছা প্রেরণ করিয়াছে। শান্তিপ্রিয় ও দয়ালুস্বভাব হিন্দুদের অন্তর খৃষ্টানদের সম্প্রদায়ে ধর্ম নামে অভিহিত এই সমস্ত হৃদয়হীন মতবাদকে যদি প্রত্যাখ্যান করে, তবে কি তাহার জন্য আমরা বিস্মিত হইব? হিন্দুরা স্বীকার করে—প্রত্যেক জীব বিশেষতঃ প্রত্যেক মানবের মধ্যে পরমাত্মা বিরাজ করিতেছেন। যে তথাকথিত ধর্মমতের সমস্ত নিয়ম ও পদ্ধতি কতকগুলি গোঁড়া ও অসার মতবাদের উপরে স্থাপিত, অসংখ্য নিরীহ নরনারীর হৃদয়কে নির্মমভাবে ক্ষতবিক্ষত করিয়া যাহাকে উর্বর করা হইয়াছে এবং শত শত পুণ্যাত্মা শহীদদের রক্তপাতের দ্বারা যাহা পরিপুষ্ট—সেই প্রকার মতকে যদি হিন্দুরা ধর্ম বলিয়া স্বীকার না করে, তাহা হইলে কি আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হইব?

অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসের জন্য হিন্দুদের দেশ ভারতবর্ষে এখন সাম্প্রদায়িকতাবাদী খৃষ্টান ধর্মপ্রচারকরা দলে দলে উপস্থিত হইয়াছে। এই সমস্ত তথাকথিত ধর্মপ্রচারকদের মুখ হইতে দুর্ভাগ্যবশতঃ হিন্দুদের নানা প্রকার যুক্তিহীন ও অসঙ্গত কথা শুনিয়া তাহা সহ্য করিতে হইতেছে। সাম্প্রদায়িকতাবাদী ঐ সব খৃষ্টান প্রচারকরা বলিয়া বেড়ায়—গীর্জায় প্রচলিত এই ধর্ম কেমন করিয়া 'হিদেন' ( heathen পৌত্তলিক বা নিকৃষ্ট শ্রেণীর ধর্মমতাবলম্বী) বলিয়া অভিহিত পৃথিবীর লোকদিগকে সভ্য করিয়া তুলিয়াছে, কেমন করিয়া ইহা দেশে দেশে শান্তি আনিয়াছে এবং এই ধর্ম কেমন করিয়া পাপীদের আত্মাকে পাপমলিনতা হইতে উদ্ধার করিয়াছে!! কিন্তু হিন্দুরা সত্য ও স্বাধীনতার প্রতি অনুরাগী। বাক্য ও চিন্তার স্বাধীনতাই জীবন-পথে তাহাদিগের পথপ্রদর্শক তারকা। যুক্তিশীলতা অকপট সত্যানুরাগ ও সত্যান্বেষণের প্রকৃতিই সম্মুখে উপস্থাপিত সমস্ত বিষয়ের কারণ ও তত্ত্বকে পরীক্ষা ও অনুসন্ধান

করিয়া দেখিতে সুদূর অতীত কাল হইতে হিন্দুদের মন অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া আসিতেছে। কোনও বিষয়ে অন্ধবিশ্বাস স্থাপনে হিন্দুদের প্রবোচিত করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। যে কোনও বিষয়ের মতবাদকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে হিন্দুরা যুক্তি ও বিচারের দ্বারা উহাকে আগাগোড়া পরীক্ষা ও যাচাই এবং সত্যের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ বলিয়া তাঁহাদের নিজ দেখে পরিচিত বিষয়ের সহিত উহাকে তুলনা করিয়া দেখেন। এই জিজ্ঞাসু স্বভাব এবং সত্যানুরাগের বশে হিন্দুরা যে সমস্ত ঘটনার ফলে খৃষ্টানদের সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সেইগুলি জানিবার জন্য উহার ইতিহাসকে অধ্যয়ন করে। জিজ্ঞাসু ও সমালোচকের মন লইয়াই হিন্দুরা প্রথমে বাইবেল শাস্ত্রকে পড়িতে আরম্ভ করে। এই ব্যাপারে প্রতিপদে হিন্দুরা যুক্তি ও বিচারশক্তিকে প্রয়োগ করে। পাশ্চাত্য দেশের অনেক মনীষী খৃষ্টান ধর্ম্মের মতবাদ এবং খৃষ্টান সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও বিস্তারের ব্যাপারে অনেক প্রামাণ্য তথ্য আবিষ্কারের দ্বারা অনেক জ্ঞাতব্য পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত মনীষী স্বতন্ত্র বিচার শক্তির ও অপক্ষপাত পরীক্ষার দ্বারা খৃষ্টান ধর্ম্মমত ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও প্রসারের অনেক গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। সেইসব তথ্যপূর্ণ রচনাবলীর গ্রন্থ যতগুলি সম্ভব সংগ্রহ করিয়া হিন্দুরা খৃষ্টান সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত ও তাহার নানা ঐতিহাসিক বিবরণ জানিবার চেষ্টা করে।

টমাস পেন ( Thomas Paine )*—*Age of Reason* নামক তাঁহার বিখ্যাত পুস্তকে প্রবল যুক্তি ও বিচার শক্তির দ্বারা বাইবেলের ধর্ম্মমতের অসারতা প্রমাণ ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মতবাদকে খণ্ডন করিয়াছেন। আমি জানি বাইবেল পড়িবার আগেই অনেক শিক্ষিত হিন্দু টমাস পেন-এর ঐ বইখানি বেশ মনোযোগের সহিত পড়িয়া থাকেন। ম্যাথু, লুক ও মার্ক-এর রচিত বলিয়া প্রচারিত নিউ টেষ্টামেণ্টের প্রথম তিনখানি গ্রন্থে (Synoptic Gospels in the New Testament) যীশুখৃষ্টের জীবন-কাহিনী বর্ণিত আছে। শিক্ষিত হিন্দুমাত্রেই জানেন বর্ত্তমান শতাব্দীতে পাশ্চাত্য দেশে বহু স্বাধীন চিন্তাকারী মনীষী—( যাঁহারা নিজেদের সহিত খৃষ্টান ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কোনও সম্বন্ধ রাখেন না, অথবা নিজেদের খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পরিচয় দেন না )—বাইবেলে বর্ণিত যীশুখৃষ্টের জীবনকাহিনী ও ব্যক্তিগত অস্তিত্বকে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া স্বীকার করেন না। সেজন্য বাইবেলে বর্ণিত যীশুর ব্যক্তিত্বের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে হিন্দুরা সন্দেহ করিয়া থাকেন। বাইবেলের ঐতিহাসিক তথ্য সম্বন্ধে সমালোচনাপূর্ণ বিখ্যাত রচনাবলী Higher Criticism নামে পরিচিত। এই সমস্ত গ্রন্থে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, গ্যালিলেবাসী যীশুর জীবনকথা ও উপদেশাবলীর সহিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর কোন সামঞ্জস্য নাই। এই সমস্ত কাহিনী ও উপদেশ অন্য সমস্ত সূত্র হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। হিন্দুরা এই সমস্ত তথ্যকেও অবগত আছেন।

ভারতবর্ষে আসিয়া পাশ্চাত্য দেশীয় খৃষ্টান মিশনারীরা প্রচার করেন—নিউ টেষ্টামেণ্ট গ্রন্থ (যাহাতে

*। টমাস পেন—Thomas Paine। ইনি থেটফোর্ড ( নরফোক ইংলণ্ড ) ২৯ জানুয়ারী ১৭৩৭ তারিখে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি Deist নামে পরিচিত আধুনিক ও বিপ্লবী চিন্তা ও ভাবের বলিষ্ঠ লেখক প্রচারক ও বক্তা। টমাস্ পেন অত্যন্ত স্বাধীন প্রকৃতির চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন। Common Sense পুস্তকে টমাস পেন ব্যক্তিমাত্রেই রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের দাবী সমর্থন করিয়াছেন। ধর্ম্ম সামাজিক প্রথা রাজনীতি প্রভৃতি যে কোনও ব্যাপারে কোনও যুক্তিহীন অসঙ্গত ও অন্যায় মত ও নিয়মকে তিনি কখনও সহ্য করেন নাই। খৃষ্টান ধর্ম্মের গোঁড়ামী কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাস ও অনেক নির্ব্বোধ প্রথার তিনি চিরশত্রু ছিলেন। 'Age of Reason' নামক পুস্তকে তিনি প্রবল যুক্তির দ্বারা বাইবেলের ধর্ম্মমতকে খণ্ডন করিয়াছেন। আমেরিকা ও ফ্রান্সের স্বাধীনতা-সংগ্রামে ( ১৭৭৫-১৭৭৬ ) টমাস পেন বিশেষ প্রধান সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ৮ই জুন নিউ ইয়র্কে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছিল /—( ইণ্ডি. অনুবাদক )

যীশুখৃষ্টের জীবনকাহিনী ও উপদেশাবলী সঙ্কলিত আছে ) অলৌকিক ভাবে প্রকাশিত (revealed) এবং উহা সাক্ষাৎভাবে স্বয়ং ঈশ্বরের বাণী। খৃষ্টান ধর্মসম্প্রদায় বাইবেলের মাঙ্গলিক গ্রন্থগুলিকে (Gospels) অভ্রান্ত ও প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরের বাণী বলিয়া গ্রহণ ও স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু শিক্ষিত হিন্দুমাত্রেই জানেন—যীশুখৃষ্ট স্বয়ং নিজস্ব কোনও রচনা লিখিয়া যান নাই। Gopel বা মাঙ্গলিক গ্রন্থগুলিও যীশুখৃষ্টের কোনও সাক্ষাৎ শিষ্যের দ্বারা রচিত নয়। শিক্ষিত হিন্দুরা এইসব ব্যাপারও জানেন। হিন্দুসমাজের শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই জানেন, বাইবেল অথবা বাইবেল ছাড়া অন্য সমস্ত গ্রন্থে যীশুর জীবনকথা ও উপদেশাবলী সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে—তাহাদের রচনার সমসাময়িককালে উহার সমর্থক অথবা ঐ প্রকার কোনও রচনা কেহই লিখিয়া যান নাই। খৃষ্টান সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রথম রচনা 'সেণ্টপলের পত্রাবলী' (Epistles of St. Paul) নামে অভিহিত। কিন্তু ঐ সমস্ত পত্রগুলির সবই যে সেণ্টপলের নিজের লেখা—তাহার সত্যতার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সেণ্টপলের লেখা বলিয়া পরিচিত চতুর্দ্দশটি পত্রের মধ্যে মাত্র চারিটি পত্রকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। সেই চারিটি পত্র যথাক্রমে :—রোমানদের প্রতি পত্রাবলী, কোরিন্থিয়ানদের প্রতি প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রাবলী এবং গ্যালিসিয়ানদের প্রতি পত্রাবলী (Epistle to the Romans, First and Second Epistles to the Corinthians, and the Epistle to the Galatians)।

তাহার পরে আর একটি বিষয়। পল নিজে কখনও যীশুখৃষ্টকে দেখেন নাই, শুধু নাকি একবার কি একটা অলৌকিক অনুভূতিতে তিনি যীশুকে দেখিয়াছিলেন। মাত্র একবার তিনি যীশুর নিজস্ব ভাষায় একটি বাণী বলিয়াছিলেন। সেই বাণীটি যীশুর শেষরাত্রিতে ভোজনের সময়ে ( পিটার প্রভৃতি তাঁহার শিষ্যবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া ) তাঁহার উক্তির স্মরণে অনুরূপ বাক্য। পলের সেই বাণীটি এইরূপ :—"এই পেয়ালাটি আমার রক্তে পূর্ণ একটি নূতন পাত্র, এই পাত্রের মধ্যে যে পানীয় দ্রব্য আছে তাহাকে তোমরা পান করিবার সময়ে আমার স্মৃতি জাগ্রত হইবে।" সেণ্ট পল ( যীশুর দেহত্যাগের অনেক পরে তাহার ধর্মমতের নামে ) অনেক নূতন নিয়ম ও অনুশাসন খৃষ্টান মণ্ডলীর ও সম্প্রদায়ের ধর্মমতের মধ্যে প্রচলিত করিয়াছিলেন। খৃষ্টান ধর্মসম্প্রদায়ের অনেক গোঁড়া নেতা ও আচার্য্য তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। যীশুখৃষ্টের নিজস্ব প্রচারিত সত্যকার খৃষ্টধর্ম্মকে সেণ্টপল কখনও প্রচার করেন নাই—ইহা একটি সুবিদিত ঘটনা। যদি তিনি ইহা করিতেন তাহা হইলে য়্যান্টিয়ক (Antioch) নামক স্থানে ( যীশুর প্রধান শিষ্য ) সেণ্ট পিটারের সহিত ধর্ম্মবিষয়ে ঝগড়া করিয়া তাঁহার মুখের উপর দুর্বিনীত বাক্য বলিবার বিষয়ে তিনি গর্ব্ব করিতেন না। সাম্প্রদায়িক খৃষ্টান ধর্ম্মের পাদ্রী-প্রচারকেরা হিন্দুদের নিকটে নিউ টেষ্টামেণ্ট ( বাইবেল ) গ্রন্থকে 'সাক্ষাৎ ঈশ্বর হইতে আগত ( revealed ) বাণী' বলিয়া প্রচার করেন। এই শ্রেণীর খৃষ্টান সাম্প্রদায়িকতাবাদী প্রচারকদের হিন্দুরা জিজ্ঞাসা করেন : "যদি ঈশ্বর সত্যসত্যই নিজের বাণীকে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহা হইলে তিনি একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কেন এত অধিক সংখ্যক লোকের মধ্যে প্রেরণা দিলেন? আর কেনই বা ঐশ্বরিক প্রেরণায় রচিত ঐ সমস্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে মাত্র চারখানি গ্রন্থ ছাড়া আর বাকী সমস্তগুলি ভ্রান্তিপূর্ণ ও জাল বলিয়া পরবর্ত্তীকালে খৃষ্টান যাজকমণ্ডলী বাতিল করিয়া দিয়াছিল?

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ দিক হইতে ইরিনিয়াস ( জন্ম ১২০ খৃষ্টাব্দে—২২০ খৃষ্টাব্দে নিহত ) আদিম খৃষ্টান সমাজের একজন প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য ছিলেন। ইরিনিয়াস গল ( Gaul ) অঞ্চলের লিয়ন্স ( Lyons ) নামক সহরের বিশপ ছিলেন। ইরিনিয়াসের ধর্ম্মাচার্য্য হইবার পূর্ব্বে কেবল মাত্র

চারখানি মাঙ্গলিক ( Four Gospels ) গ্রন্থের কথা ইতিহাসে শোনা যায় না। খৃষ্টান সম্প্রদায়ের ধর্মগত নিয়মাবলীর ( Canon ) তিনিই প্রকৃত প্রবর্ত্তক। প্রাথমিক যুগের খৃষ্টান ধর্মাচার্য্যদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম লুক ও জন এই চারখানি গ্রন্থের কথাই প্রচার করিয়াছিলেন। এই চারখানি মাঙ্গলিক গ্রন্থই একমাত্র প্রামাণ্য শাস্ত্র বলিয়া কেন খৃষ্টান মণ্ডলীর দ্বারা গৃহীত হইবে তাহার সম্বন্ধে ইরিনিয়াস্ যে মত দিয়াছিলেন তাহার বিশেষত্ব থাকিলেও যুক্তির দিক দিয়া তাহা আদৌ সন্তোষজনক নয়। এসম্বন্ধে ইরিনিয়াস বলিয়াছিলেন, "মাঙ্গলিক গ্রন্থগুলি ( Gospels ) সংখ্যায় চারিটির অধিক কিম্বা অল্প থাকা ইহা সঙ্গত নয়। যে হেতু পৃথিবীর চারিটি অংশ, সৃষ্টির চারিটি উপাদান, ঋতুকাল চারিটি এবং চারিপ্রকার বিভিন্ন আবহাওয়ার বায়ু—অতএব খৃষ্টান সম্প্রদায়েরও চারিটি স্তম্ভ থাকা উচিত। এই কারণেই ধর্মশাস্ত্ররূপে চারিটি গস্পেল ( Gospels ) থাকাই উচিত।" এখন দেখুন, এই বিখ্যাত খৃষ্টান বিশপের যুক্তি কেমন বিচক্ষণতাপূর্ণ!

অধিকন্তু গস্পেল গ্রন্থগুলিতে অনেক স্থলে ভাবের বিরোধিতা, অসঙ্গতি ভ্রম ও সামঞ্জস্যহীনতা আছে। সেজন্য বিচারশক্তিসম্পন্ন কোনও হিন্দু পাঠক এই গস্পেলগুলিকে অভ্রান্ত এবং ঈশ্বরের সাক্ষাৎ বাণীরাশি বলিয়া মানিতে পারেন না। খৃষ্টান ধর্মসম্প্রদায় ভ্রম ও অসঙ্গতিপূর্ণ বাইবেলের এই প্রকার মতবাদ প্রচার করিয়া থাকে। হিন্দুরা এই রকম মতবাদকে গোঁড়ামী এ যুক্তিহীনতাপূর্ণ মত বলিয়া বাতিল করিয়া দেন।

খৃষ্টান ধর্মসম্প্রদায়ের প্রধান অনুশাসনের নাম 'Apostles Creed' ( খ্রেরিতদের মত ও নীতি ) ইহার অপর নাম 'Twelve Articles of Faith' ( খৃষ্টান ধর্ম্মের বিশেষ দ্বাদশটি অনুশাসন )। নিসিয়ার সম্মিলনে এই সমস্ত অনুশাসনকে সমর্থন ও বিস্তৃত আকারে পরিণত করা হইয়াছিল। Reformation Theology বা খৃষ্টান সম্প্রদায়ের ধর্মগত নিয়মনীতির পরিমার্জ্জিত আকারের মূলভিত্তি পূর্ব্বোক্ত খ্রেরিতদের অনুশাসনাবলী। ইহাই পরে উনচল্লিশটি অনুশাসনের আকারে এপিস্কোপাল দলের খৃষ্টানদের মণ্ডলীগত ধর্মানুশাসনরূপে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। হিন্দুরা বিচারদৃষ্টির দ্বারা দেখিতে পান —এই সমস্ত অনুশাসন শুধু কতকগুলি যুক্তিহীন ও অসার মত ও নিয়ম মাত্র। বিজ্ঞান ও দর্শনের হইতে এগুলিকে সমর্থন করা যায় না। মানুষের যুক্তিকেও ইহারা আকৃষ্ট করিতে পারে না। যে সমস্ত বিষয় যুক্তিসঙ্গত শুধু সেই সমস্তই গ্রহণ করা যাইতে পারে, অন্যথায় ইহা গ্রাহ্য হইতে পারে না। যেহেতু খৃষ্টান ধর্ম্মে বিশ্বাসবিধির এই সমস্ত অনুশাসন বিজ্ঞান ও দর্শনের যুক্তির উপর স্থাপিত নয়, যেহেতু ঈশ্বর আমাদিগকে জ্ঞানবিচারের এবং স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার শক্তি দিয়াছেন, তখন কোনও ব্যক্তির উক্তি অথবা ভাবণকে বিনাবিচারে অন্ধভাবে মানিয়া লইলে আমরা তাঁহার ইচ্ছার বিরোধী কার্য্য করিতেছি বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। যে কোনও বিষয় দেখিলে আমরা তাহার সম্বন্ধে নিশ্চয়ই প্রশ্ন করিব। যুক্তি-বিচারের নিয়মপদ্ধতি প্রয়োগের দ্বারা তাহাকে আগাগোড়া পরীক্ষা করিয়া দেখিব। সেইজন্য হিন্দুরা বলেন, খৃষ্টান ধর্মসম্প্রদায়ের এইসব অনুশাসনবিধিকে গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে সেগুলিকে আমরা ভালোভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিব।

খৃষ্টান ধর্মসম্প্রদায়ের প্রথম অনুশাসনটি হিন্দুমাত্রেরই কাছে সত্যকে জানিবার পথে দারুণ একটি বাধা বলিয়া মনে হয়। কারণ এই অনুশাসনটি বাইবেলে বর্ণিত বিশ্বজগতের সৃষ্টির কাহিনীকে ভিত্তি করিয়া রচিত। বাইবেলের আদিপুস্তকে ( the Genesis ) বিশ্বজগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—বিশ্বজগৎ হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন কোনও এক পুরুষের দ্বারা শূন্য অথবা অনস্তিত্ব হইতে মাত্র ছয়দিনে বিশ্বজগৎ সমস্ত প্রাণী ও পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে। জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে

এইরূপ বর্ণনা হিন্দুদের নিকটে শিশুসুলভ অজ্ঞতা ও আত্মগুরী কাহিনী বলিয়াই মনে হয়। কারণ হিন্দুরা এমন এক প্রকার ঐতিহ্যের মধ্য দিয়া জীবনযাপন করিয়াছে যাহার মতে—বহু লক্ষ বৎসরের ক্রমিক অভিব্যক্তির নিয়ম অনুসারে সমস্ত বিশ্বজগৎ এবং যাবতীয় প্রাণী ও পদার্থ বর্তমান অবস্থার পরিণতি লাভ করিয়াছে। হিন্দুদের মনে কখনও এমন আত্মগুরী বিশ্বাস স্থান পায় না যে, তাঁহারা মনে করিবেন—এই বিশ্বজগৎ মাত্র ছয় হাজার বৎসর পূর্বে উৎপন্ন হইয়াছে! তাঁহারা ইহাও বিশ্বাস করেন না যে, সূর্যের অস্তিত্বের পূর্বে পৃথিবী উদ্ভূত হইয়াছে। হিন্দুরা বলেন, বাইবেলে এই যে সৃষ্টিকাহিনী লিখিত হইয়াছে—তাহা মানুষ বা দেবতা যাহার দ্বারাই লিখিত হউক—উহার একটি যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখানো তাঁহার পক্ষে উচিত ছিল। অনস্তিত্ব হইতে বিশ্বজগতের উৎপত্তির মতবাদ হিন্দুরা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারেন না। প্রাচীনকাল হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত হিন্দুদের ঋষি মুনি সিদ্ধ মহাত্মা ও দার্শনিকেরা অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ লিখিয়াছেন। এই সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে কোথাও আপনারা দেখিতে পাইবেন না যে, বিশ্বজগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন কোনও এক পুরুষের দ্বারা অনস্তিত্ব হইতে হঠাৎ এই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে।

খৃষ্টান ধর্মসম্প্রদায়ের দ্বিতীয় অনুশাসনটির ভিত্তি একটি বিশেষ বিশ্বাস-বিধির উপরে স্থাপিত। এই অনুশাসনের অনুসারে—যীশুখৃষ্টই ঈশ্বরের একমাত্র জাত পুত্র ( the only-begotten son of God )। হিন্দুদের কাছে শুধু ইহা ভাবের গোঁড়ামি ভিন্ন ইহার মধ্যে আদৌ কোন অভিনবত্ব নাই। অবতারবাদ অথবা শব্দব্রহ্মবাদ ( theory of *Logos* ) পূর্ব হইতে ইন্দো-আর্য জাতির নিজস্ব একটি ধর্মীয় মতবাদ। আর হিন্দুরা বিশ্বাস করেন, পূর্ব-পূর্ব যুগে ঈশ্বরের অনেক অবতারের আবির্ভাব হইয়াছে এবং পরবর্তী যুগেও বহু অবতার আবির্ভূত হইবেন। অবতারবাদ বা theory of *Logos* অথবা ঈশ্বরের পুত্ররূপে জাত মহামানববাদ প্রভৃতি ধর্মমত প্রথমে ভারতবর্ষেই উদ্ভাবিত হইয়াছিল। এই মতবাদ ( যীশুর জন্মগ্রহণের বহুশত বৎসর পূর্বে ) প্রথমে ভারতবর্ষ হইতে গ্রীসদেশে গিয়াছিল। খৃষ্টপূর্ব যুগে গ্রীক দার্শনিকদের রচনাবলীতে এই মতবাদ স্বীকৃত হইয়াছিল। হিরাক্লিটাস ( ৫৩৫-৪৭৫ খৃষ্টপূর্বাব্দ ), প্লেটো ( ৪২৯-৩৪৭ খৃষ্টপূর্বাব্দ ) নিও-প্লেটোনিষ্ট সম্প্রদায়, ফিলো ( ২০ খৃষ্টপূর্বাব্দ—৫৪-খৃষ্টাব্দ ) এবং তাঁহার দার্শনিক মতাবলম্বী—যিনি সেন্ট জনের সুসমাচারের রচয়িতা বলিয়া প্রমাণিত—প্রভৃতি মনীষী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে এই মতবাদ গৃহীত হইয়াছিল। এই মতবাদ ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতে হইতে অবশেষে অনেক কাল পরে খৃষ্টান ধর্মসম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান ধর্মনীতি বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।[২]

হিন্দুদের মধ্যে অসংখ্য ব্যক্তি অবতারবাদে বিশ্বাস করেন। কিন্তু খৃষ্টান ধর্মসম্প্রদায়ে প্রচলিত ও অন্ধবিশ্বাসপূর্ণ যে উদ্ভট অবতারবাদ মিশনারীরা অখৃষ্টানদের নিকট প্রচার করেন—সেরূপ অবতারবাদে হিন্দুরা বিশ্বাসী নন। এবিষয়ে হিন্দুদের প্রথম আপত্তি—ঈশ্বর কি কেবল শুধু একবার মাত্র বিশেষ কোনও এক দেশে কোনও একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন? তিনি কোনও স্থানে কোনও যুগে যদি অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে অন্য কোনও দেশে এবং অপর কোনও যুগে তিনি কেন অবতীর্ণ হইবেন না? খৃষ্টান চার্চের সমস্ত মতবাদ ও বিশ্বাস জগৎ ও সর্বজীবের পিতা পরমেশ্বরের অশেষ প্রেম ও করুণাকে বিশেষ দেশ জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে

২। Theory of Logos অর্থাৎ খৃষ্টান ধর্মসম্প্রদায়ের শব্দব্রহ্মবাদ এবং Cross অথবা ক্রুশীকোপাসনার উৎপত্তির ঐতিহাসিক কারণ সম্বন্ধে পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দ Soll of God, The Word and Cross in Ancient India, Necessity of Symbols প্রভৃতি পুস্তকায় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।—ইতি, অনুবাদক।

সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। এই প্রকার সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি ও মনোবৃত্তির লোকেদের জানা উচিত মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের প্রেম ও করুণা সর্বদাই সমান এবং অনন্ত ও অবিশ্রান্ত। সকল যুগ সকল দেশ এবং সকল জাতি ও সকল ধর্মের লোকেদের প্রতি ঈশ্বরের স্নেহ প্রেম ও করুণা অশেষ। সূর্যের আলোকের ন্যায় সমস্ত নরনারী এবং সকল প্রাণী ও পদার্থের উপর তাঁহার তাঁর প্রেম স্নেহ ও ও করুণা অবিশ্রান্তভাবে বর্ষিত হইতেছে। অবতারবাদ সম্বন্ধে হিন্দুদের ধারণা সুন্দরভাবে ভগবদ্গীতায় এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতারবাদ সম্বন্ধে বলিতেছেন, "যখনই ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখনই সমস্ত ধর্মবিরোধী ভাব ও অনাচারকে নাশ করিতে এবং ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করিতে আমি মানবরূপ ধারণ করিয়া এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া থাকি।"—( গীতা, চতুর্থ অধ্যায়, ৭-৮ )

—( আগামী সংখ্যায় সমাপ্ত হইবে )

---

# শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ

## শ্রীভবানীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্তমান যুগে ভারতবর্ষে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এবং তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের সম্মিলন ধর্মজগতের ইতিহাসে সত্যই নূতন একটি যুগের সূচনা করিয়াছে। গুরু ও শিষ্যরূপী এই দুই অলোকসামান্য পুরুষ প্রকৃত ধর্মকে নানাসম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ মতবাদ গোঁড়ামী দলাদলি ও অনর্থ আচার-অনুষ্ঠানের মরুবালুরাশির মধ্য হইতে আবার আবিষ্কার করিয়াছেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে এবং তাঁহাদের জীবনকালের প্রথম দিকে দেশে দেশে ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মানুষ্ঠানের নামে নানাবিধ সম্প্রদায়ে কতকগুলি অসার ওগতানুগতিক নিয়মনীতি ও যুক্তিহীন প্রথাই ধর্মের স্থলাভিষিক্ত প্রাধান্য লাভ করিতেছিল। ধর্মের মূল-নীতিকে বিসর্জ্জন দিয়া প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকেরা আপনাদের সম্প্রদায়ের মতবাদ বিশ্বাস উপাসনা-প্রণালীকেই ঈশ্বরলাভের একমাত্র পথ বলিয়া অভ্যাস ও প্রচার করিতেছিলেন। বিচার-বুদ্ধির অভাবে তখন প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়ের লোকেরাই মনে করিত ( ও এখনও করে )—"আমার ধর্মমতই একমাত্র সত্য ধর্মমত ও শ্রেষ্ঠ ধর্মমত। আমার সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্ত নিয়ম ও বিশ্বাসবিধির অনুসারে চলাই ঈশ্বরলাভের একমাত্র পথ। ধর্ম শুধু একমাত্র আমাদের সম্প্রদায়েই আছে। অপর কোথাও ধর্ম নাই। অন্য সমস্ত ধর্মমতে আদৌ ধর্ম নাই। ঐসব মতের ধর্ম ভ্রান্ত-ধর্ম। অতএব আমার ধর্মমতের বাহিরে যাহারা অন্য ধর্মকে মানিয়া চলে—তাহাদের কোন জন্মেই মুক্তিলাভ হইবে না। মৃত্যুর পরে তাহারা অনন্তকাল নরকে থাকিয়া অশান্তি ও যন্ত্রণা ভোগ করিবে।" !!

ধর্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহাদের এইরকম সঙ্কীর্ণ বিশ্বাস ও বিকৃত ধারণা তাহারা ধর্মদ্বেষী ও ধর্মপ্রাণ নয়। তাহারা ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও পরধর্মবিদ্বেষী। ধর্মের প্রকৃত আদর্শ কি তাহার সম্বন্ধে কোনই ধারণা তাহাদের নাই। তাহাদের মন কখনই সুস্থ মন নয়। সেই মন অজ্ঞানান্ধ ও একপ্রকার ব্যাধিগ্রস্ত। সত্যকে ঠিকভাবে জানিবার

বুঝিবার ও ধারণা করিবার শক্তি আগ্রহ ও প্রচেষ্টা ইহাদের মধ্যে আদৌ নাই। দুঃখের বিষয়, 'ধার্ম্মিক' নামে পরিচয় প্রদানকারী নানাদেশে অধিকাংশ লোকের মানসিক অবস্থাই এইরূপ শোচনীয়। অজ্ঞাতসূত্র ও চিন্তাশক্তিহীন এই সমস্ত ব্যক্তিদের 'ধর্ম্মবিশ্বাসী' 'ধর্ম্মানুরাগী' বলা অপেক্ষা ধর্ম্মান্ধ বা fanatic বলাই অধিকতর সঙ্গত।

প্রত্যেক দেশে মানবসমাজে এই প্রকার ধর্ম্মান্ধ যুক্তিশক্তিহীন ও ভাবপ্রবণ ব্যক্তির সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। সেজন্য সকল দেশেই জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মের সত্যকার রূপটি আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না। জনসাধারণের মধ্যে সত্যান্বেষণ ও প্রকৃত বিচার-দৃষ্টির একান্ত অভাব। সত্য ও অসত্যের, ধর্ম্ম ও সাম্প্রদায়িকতার পার্থক্য দেখিবার মতন দৃষ্টি তাহাদের মধ্যে আদৌ নাই। ধর্ম্মের প্রাণবস্তুর সহিত পরিচিত হইবার জন্য যে আকুলতা আগ্রহ ও আন্তরিকতা থাকা দরকার, ধর্ম্মবিশ্বাসী বলিয়া পরিচিত শতকরা নিরানব্বই জন নরনারীর মধ্যে তাহা মোটেই নাই। তাহারা কিছুতেই বুঝিতে পারে না—ধর্ম্ম কখনও বাইরের হুজুগ দলবাঁধা ও গুলতানির ব্যাপার নয়—ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে অন্তরের শুদ্ধতা পবিত্রতা ও ধ্যানলভ্য বস্তু। অন্তর সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধ ও পবিত্র না হইলে ধর্ম্মলাভ হওয়া অসম্ভব—ইহা তাহারা কিছুতেই বুঝিতে পারে না—অথবা বুঝিতে চায় না। শুধু কতকগুলি দেশাচার লোকাচার সামাজিক প্রথা ও ব্রতব্রত পালন এবং দেবমন্দির ও তীর্থস্থানে যাওয়া-আসা এবং সেখানে হৈ-চৈ গোলমাল করাকেই তাহারা ধর্ম্মসাধনা বলিয়া আঁকড়াইয়া থাকিতে ভালবাসে।

এইজন্যই দেখা যায়—অন্তরের মধ্যে সংসংস্কার ও পবিত্রতা এবং আন্তরিক ভক্তিভাব না থাকিলে অতি উচ্চশ্রেণীর মহাপুরুষদের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে অনেক বৎসর থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ ব্যক্তি ধর্ম্মজীবনে কখনই অতি সামান্যও উন্নতি করিতে পারে না। অবতারপুরুষ, ঋষি, অথবা ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষদের আধ্যাত্মিক ভাবরাশিকে আত্মসাৎ ও নিজস্ব (absorb) করিয়া ফেলিতে পারে, এমন সুযোগ্য শিষ্য ও উন্নতচিত্ত ব্যক্তির সংখ্যা চিরদিনই অল্প। যুগে যুগে যে কোন দেশে যে কোন অবতার-পুরুষ আসিয়াছেন, তখনই এই ব্যাপার বারবার সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়া আসিতেছে। অবতার-পুরুষের কাছে ধর্ম্মলাভের আশায় আসিয়াছে দিনের পর দিন শত শত নরনারী। কিন্তু তাঁহার ভাবকে সমগ্রভাবে ও যথার্থরূপে গ্রহণ ও বাস্তব জীবনে রূপ দিতে সমর্থ হইলেন মাত্র কয়েকজন শুদ্ধাত্মা ও মুক্তাত্মা। এইজন্যই ঈশ্বরপুত্র যীশুখৃষ্ট বলিয়াছেন, "Many were called but few are chosen."

প্রায় দীর্ঘ বারশ বৎসর ধরিয়া দক্ষিণেশ্বরের তপোবনে শ্রীরামকৃষ্ণদেব শৈব শাক্ত বাউল বৈষ্ণব বৈদান্তিক প্রভৃতি ধর্ম্মমতের সাধনায় অবিশ্রান্তভাবে নিরত ছিলেন। এই সমস্ত ধর্ম্মমতে সাধনায় সিদ্ধ হইবার পরে জগজ্জননীর নিকট হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যাদেশ শুনিয়া জানিয়াছিলেন—শীঘ্রই কয়েকজন শুদ্ধাত্মা ও সর্ব্বত্যাগী ব্যক্তি তাঁহার নিকটে তাঁহার আধ্যাত্মিক ভাব-সম্পদের অধিকারীরূপে আসিবেন। শুধু তাহাই নয়, সে সময়ে জগজ্জননী শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবকে ইহাও জানাইয়া দিয়াছিলেন—ঐ সমস্ত ধ্যানসিদ্ধ মুক্তপুরুষদের মধ্যে কয়েকজন বিশেষভাবে আধ্যাত্মিকগুণ ও শক্তিসম্পন্ন। আবার ইহাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তিনিই দেশে দেশে শ্রীরামকৃষ্ণের উদার অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মকে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিবেন। যোগদৃষ্টিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব —তাঁহার এইসব অন্তরঙ্গ লীলাসহচরদের আধ্যাত্মিক ভাবমূর্ত্তি সেই সময় হইতে দেখিয়া তাঁহাদিগকে চিনিয়া রাখিয়াছিলেন। সেজন্য তিনি ১৮৭৫ সালের পর হইতে তাঁহাদের আগমনের জন্য আকুল ও উৎসুক হইয়া প্রতিদিন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব (ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা ও প্রধানাচার্য্য) মহাত্মা কেশবচন্দ্র-সেনের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন।

আচার্য্য কেশবচন্দ্র ছিলেন একাধারে যেমন একজন ধর্ম্মাত্মা ও ঈশ্বরজ্ঞানিত পুরুষ—অপরদিকে

তেমনি ধর্মসাধনার ব্যাপারে উদারচিত্ত এবং যে কোনও সম্প্রদায়ের সাধক ও সিদ্ধপুরুষদের গুণগ্রাহী। যে কোনও ধর্মমতের প্রকৃত কোন সিদ্ধমহাত্মার আধ্যাত্মিক মহত্ত্ব ও গুণরাশির সমাদর করা তাঁহার চরিত্রের অন্যতম বিশেষত্ব ছিল। আচার্য্য কেশবচন্দ্রই গাজীপুরের সিদ্ধ মহাযোগী পওহারী বাবার মহত্ত্ব ও পবিত্র জীবনের কথা কলিকাতার শিক্ষিত সমাজে সর্ব্বপ্রথমে প্রচার করিয়াছিলেন। ১৮৭৫ সালে মার্চ্চমাসে (বেলঘরিয়ার জয়গোপাল সেনের বাগান বাড়ীতে) কেশবচন্দ্রের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রথম সাক্ষাৎ ও পরিচয় হইয়াছিল। একে অন্যের মহত্ত্ব বুঝিতে পারিলেন। তাহার পর হইতে একে অন্যের কাছে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। অবশেষে জগজ্জননীর এই দুই প্রিয় পুত্র আধ্যাত্মিক সম্বন্ধের অচ্ছেদ্য বন্ধনে বিজড়িত হইয়া পড়িলেন। সেই সময় হইতে কলিকাতার নানাস্থানে বক্তৃতায় সমাজমন্দিরে অথবা বন্ধুবান্ধবদের সম্মিলনে আচার্য্য কেশবচন্দ্র সকলের নিকট পরমহংসদেবের লোকোত্তর চরিত্রের তাঁহার সুগভীর ও সুবিপুল আধ্যাত্মিক অনুভূতির ও উদার ধর্মভাবের কথা প্রচার করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে কলিকাতার শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, অথবা সম্ভ্রান্ত ও সাধারণ সকল শ্রেণীর লোকেই 'দক্ষিণেশ্বরবাসী মহাপুরুষের' কথা জানিতে পারিলেন। সেই হইতে সকাল অথবা বিকালে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিবার ও তাঁহার উপদেশ শুনিবার জন্য লোকেরা যাওয়া-আসা আরম্ভ করিল। ক্রমেই দক্ষিণেশ্বরে ধর্মবিশ্বাসী নানামতের লোকদের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। এক একদিন ঐ সময়ে (১৮৭৯-১৮৮০) চল্লিশ পঞ্চাশজন করিয়া লোক সারাদিনের মধ্যে কোন না কোন সময়ে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত থাকিত। তবে ইহারা সকলেই যে ধর্মলাভের আকুল প্রেরণা-বশে দক্ষিণেশ্বরে যাইত একথা মনে করিলে সঙ্গত হইবে না। বেশীর ভাগ লোকই হুজুক ও কৌতূহলের বশে সেখানে যাইত। আবার অনেকে কোন উদ্দেশ্য না লইয়া শুধু এমনিই সেখানে যাওয়া-আসা করিত। আবার তাহা ছাড়া ধর্মাচরণকারী বলিয়া পরিচিত হইলেও এমন অনেক লোক তখন দক্ষিণেশ্বরে যাইত যাহারা —প্রকৃত পক্ষে ছিল ঐশ্বর্য্যলোলুপ এবং সাংসারিক ভোগাসক্ত ও সুবিধাবাদী।

যোগদৃষ্টিতে পরমহংসদেব এই সকল ধর্মার্থী ব্যক্তিদের অধিকাংশের মধ্যেই দেখিলেন—তাহাদের মধ্যে একবিন্দু ভক্তি-বিশ্বাস অথবা নিষ্ঠা নাই —আছে শুধু তামসিকতা ও কতকগুলি যুক্তিহীন আচার-নিয়ম প্রাণ্ড ধারণা ও আত্মম্ভরী বিশ্বাস। তাহারা শ্রদ্ধাহীন ও অজিজ্ঞাসু। তাহাদের মন ভাবপ্রবণ ও বহির্মুখী। ধর্ম্মের কথা বলিতে আসিয়া তাহারা শুধু কতকগুলি আবোল-তাবোল কথা বলে। ধর্ম্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধে যত আত্মম্ভরী ও অসম্বন্ধ প্রলাপ ইহাদের কাছে। এই রকম লোকের ভীড়ে শ্রীরামকৃষ্ণের শুদ্ধ পবিত্র চিত্ত কখনই স্বস্তি বোধ করিতে পারে না। তিনি ইহাদের উপস্থিতিতে অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ করিতেন। সেইজন্য প্রত্যেক রাত্রির নিস্তব্ধ নিশীথ প্রহরে কাতর হইয়া তিনি জগজ্জননীকে সজল নেত্রে সকরুণ স্বরে প্রার্থনা জানাইয়া বলিতেন: "মা তোর সর্ব্বত্যাগী সন্তানদের নিয়ে আয়। তাদের সঙ্গে প্রাণখুলে তোর কথা বলি। বিষয়ী সংসারী লোকদের কাছে থেকে থেকে আমার প্রাণ জলে পুড়ে খাক্ হয়ে গেলো।"

জগজ্জননী তাঁহার প্রিয়তম পুত্রের এই কাতর প্রার্থনা শুনিলেন। অবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রাণের বাসনা পূর্ণ হইল। ১৮৮০ সালের প্রায় শেষ দিক হইতে তাঁহার সর্ব্বত্যাগী লীলাসহচরেরা একে একে তাঁহার কাছে দক্ষিণেশ্বরে আসিতে লাগিলেন। এখানে কোন্ সন্ন্যাসীশিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে কোন বৎসরে ও কোন্ মাসে আসিয়াছিলেন—তাহার বিবরণ আমরা দিব না। আমরা শুধু এখানে শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার সর্ব্বপ্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের একত্র সম্মিলিত জীবনের সম্বন্ধে দুই-চার কথা বলিবার চেষ্টা করিব।

১৮৮১ সালের জুন মাসে কোনও এক উৎসবের উপলক্ষে সুরেশচন্দ্র মিত্রের শিমুলিয়ার বাড়ীতে

স্বামী বিবেকানন্দ ( তখন নরেন্দ্রনাথ দত্ত—বয়স ১৮ বৎসর—সবেমাত্র ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষা দিয়াছেন—) তাঁহার গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত প্রথম পরিচিত হইয়াছিলেন। স্বামিজী তখন জেনারল এসেম্বলী ইনিষ্টিটিউসনের ( বর্ত্তমান স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ ) ছাত্র ছিলেন। প্রথম দর্শনেই সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রনাথের প্রতি স্নেহশীল ও আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। যোগদৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ তখন দেখিয়াছিলেন—এই বালকের মধ্যে অপরিমেয় ধর্ম্মভাব লুকায়িত আছে। এই বালকই তাঁহার প্রিয় লীলাসহচরদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। এইজন্য রামকৃষ্ণদেব একান্ত স্নেহের সহিত নরেন্দ্রনাথকে দক্ষিণেশ্বরে যাইবার জন্য সেদিন অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই অনুরোধ নরেন্দ্রনাথ তখনি রাখিতে পারেন নাই। প্রায় তিনমাস বাদে রামচন্দ্র দত্ত, সুরেশচন্দ্র মিত্র ও দুইজন বন্ধুর সহিত একদিন বিকাল বেলায় দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের কাছে নরেন্দ্রনাথ গিয়াছিলেন। সেদিন নরেন্দ্রনাথের মুখে আদি ব্রাহ্মসমাজের দুইটি ব্রহ্ম-সঙ্গীত[১] শুনিয়া পরমহংসদেব ভাবাবিষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন। তাহার পরে নির্জ্জনে নরেন্দ্রনাথকে পরমহংসদেব লইয়া গেলেন। গুরু ও শিষ্যের মধ্যে সেদিন একান্তে কী কথা হইয়াছিল তাহা তাঁহাদের কেহই অপর ব্যক্তিদের কাছে প্রকাশ করেন নাই। শুধু এইটুকু জানা যায়—পরমহংসদেব নরেন্দ্রনাথকে সেদিন একান্ত ব্যাকুলতা ও স্নেহ-মমতার পূর্ণ কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "তোর জন্যে আমি এতকাল ধ'রে বসে আছি—আর তুই এতদিন বাদে এলি ?"

নরেন্দ্রনাথকে প্রথম দেখিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণের মনে হইয়াছিল—এই যুবকই তাঁহার ধর্ম্মাদর্শ প্রচারের ভাবী সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাতা। ঠিক এই কথাই ঈশ্বরপুত্র যীশুখৃষ্ট তাঁহার সর্ব্বপ্রধান শিষ্য সিমোনকে একদিন বলিয়াছিলেন, "সিমোন! তুমি প্রস্তরের মতনই অবিচল ও সুদৃঢ়। তোমার উপরেই আমি ভিত্তি করিয়া আমার ধর্ম্মসঙ্ঘের সৌধকে নির্ম্মাণ করিব।" লাটিন ভাষায় প্রস্তরের নাম পিটার ( Peter )। সেইজন্য সন্ন্যাস দীক্ষার পরে জেবিডিপুত্র সিমোনের নাম হইয়াছিল—পিটার। এই সিমোন পিটারই বিশ্ববিখ্যাত সেণ্ট পিটার।

বালক নরেন্দ্রনাথের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন ভারতের কোন্ একজন প্রাচীন ব্রহ্মবিদ ঋষিকে। মানসিক ও আধ্যাত্মিক দুই দিক দিয়া নরেন্দ্রের অনেক গুণ ও আশ্চর্য্য মহত্ত্ব দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে নিজের সমস্ত স্নেহ ভালবাসা উজাড় করিয়া দিয়াছিলেন। কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ংই বলিয়াছেন, "এত ভক্ত এলো গেলো, কিন্তু নরেন্দ্রের মতন আর একটিও এখানে এলো না।" আবার নানা রকমের উপমা দিয়া অন্যান্য সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী শিষ্যদের সহিত নরেন্দ্রের তুলনা করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রায়ই বলিতেন ; "এরা সব পদ্মের মতন। কারুর দশদল বিশদল, কিম্বা বড়জোর একশো দল ( পাপড়ি )। নরেন্দ্র সহস্রদল পদ্ম। মাছের মধ্যে নরেন্দ্র রুই মাছ। আর সবাই কেউ কেউ মিরগেল বা এমনি। এরা সবাই ঘটি পেলাস। নরেন্দ্র জলের জালা। এরকম বড় আধার আর একটিও এলো না।" আবার অন্য সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "নরেন্দ্র নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বর-কোটি, আপনা ব্রহ্মজ্ঞানী"। "মহামায়া ওর কাছে যেতে ভয় পায়। গুণদেবের মতন ওকে মায়া কখনও স্পর্শ কোরতে পারে নি।" "নরেন্দ্র আমার বল। সভার মধ্যে নরেন্দ্র থাকলে আমার ভরসা।"

দক্ষিণেশ্বরে একদিন (১৮৮২) আচার্য্য কেশবচন্দ্র আসিয়াছেন। অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিও সেদিন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যুবক-বয়সী নরেন্দ্রনাথও সেদিন বসিয়া আছেন। একথা সেকথার পরে শ্রীরামকৃষ্ণ হঠাৎ কেশবচন্দ্রকে বলিলেন, "তাখো না কেশব! বক্তৃতা দিয়ে জগৎমাতানো এই রকম একটা

১। প্রথম গানটি—"মন চল নিজ নিকেতনে"—( তাল ঝাঁপতাল—একতালা সুর )—রচয়িতা, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী। দ্বিতীয় গানটি—"যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে"—( তাল—আড়াঠেকা সুর)—রচয়িতা, বেচারাম চট্টোপাধ্যায়।

শক্তিই তোমার মধ্যে আছে। নরেন্দ্রের মধ্যে ঐ রকম আঠারোটা শক্তি আছে। দেখলুম কেশবের মধ্যে জ্ঞানের শিখা জ্বলছে। আর নরেন্দ্রের মধ্যে জ্ঞানসূর্য্য রয়েছে।" অন্য কোন ব্যক্তি অপরের প্রতি ঐরকম প্রশংসার কথা শুনিলে ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হইতেন, হিংসা ঈর্ষ্যায় জ্বলিয়া মরিতেন। কিন্তু কেশবচন্দ্রের প্রকৃতি ছিল একেবারেই ভিন্ন প্রকৃতির। অপরের মধ্যে কোনও গুণ দেখিতে পাইলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইতেন। এজন্য শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে ঐ কথা শুনিয়া কেশবচন্দ্র প্রসন্ন চিত্তে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "সে তো খুব ভালো কথা মশাই। নরেন আমার চেয়ে বড়ই হবে—কেন ছোট হবে?"

নরেন্দ্র তখন বালক। জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁহার খুবই কম। নিজের ভবিষ্যৎ মহত্ত্ব প্রতিভা ও গৌরবের কথা তাঁহার কাছে তখন অজ্ঞাত ছিল। সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে ঐ কথা তাঁহার কাছে প্রশংসার অপব্যয় বা অতিরঞ্জন বলিয়া মনে হইল। সেজন্য ঠাকুরের কথার তিনি অনেকদিন ধরিয়া প্রতিবাদ করিয়া-ছিলেন। ঠাকুর কিন্তু নরেন্দ্রের সেই আপত্তিকে কোনই আমল দিলেন না। বরং নরেন্দ্রকে তিনি বলিলেন, "আরে আমি কি ওসব বানিয়ে বলছি! মা (জগজ্জননী) তোর সম্বন্ধে আমাকে যেমন দেখিয়ে দিয়েছেন, আমি তেমনিই বলেছি।" নরেন্দ্র কিন্তু ঠাকুরের ঐকথা মোটেই শুনিতেন না। বলিতেন, "মা দেখিয়ে দিয়েছেন—নী, আপনার মাথার খেয়ালে ওরকম ভাবেন—তা কে জানে!"

ঠাকুরের কাছে পরিচিত হইবার আগে নরেন্দ্র হিউম বেন মিল স্পেন্সার কোঁতে প্রভৃতি পাশ্চাত্য-দেশীয় নাস্তিক ও অজ্ঞেয়বাদী মনীষীদের বই পড়িয়া-ছিলেন। এজন্য তাঁহার মনে ধর্ম্মব্যাপারে কোনও অতীন্দ্রিয় অনুভূতি সত্য বলিয়া তখন বিশ্বাস হইত না। তাহা ছাড়াও ব্রাহ্মসমাজে বাল্যকাল হইতেই তাঁহার যাওয়া-আসা ছিল। ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে তিনি তখন নিরাকার এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরেই বিশ্বাসী ছিলেন। দেবদেবীদের অস্তিত্বে তাঁহার তখন কোন বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল না। সেজন্য পরমহংসদেবের দেবদেবীদের দর্শন ও তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তা বলার ব্যাপারকে নরেন্দ্র মনে করিতেন অলীক—অথবা ভ্রান্ত অনুভূতি। এইজন্য দেবদেবীদের প্রতি বিশ্বাস ও তাঁহাদের উপাসনার বিরুদ্ধে নরেন্দ্র তখন পরমহংসদেবের সহিত প্রায়ই তুমুল তর্ক করিতেন। দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরে যাইয়া কালীমূর্ত্তিকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রণাম ও স্তব করিতেন। কিম্বা আপনার ভাবে রামপ্রসাদ কমলাকান্ত প্রভৃতি শাক্তকবি মহাত্মাদের রচিত শ্যামাসঙ্গীত গাহিতেন। নরেন্দ্র তখন এসব পছন্দ করিতেন না। সেজন্য দেবদেবীদের প্রতি কখনও বিদ্রূপ কিম্বা অবজ্ঞাপূর্ণ মন্তব্য করিতেন। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ ইহাতে ব্যথিত হইয়া নরেন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "তুই আমার মাকে কেন যা তা ব'লে গালাগালি দিস? তোর যদি আমার মাকে ভালো না লাগে, তবে তুই এখানে আর আসিস নি।" নরেন্দ্র কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষোভ করিতেন না। বরং পূর্ব্বের ন্যায় প্রতি সপ্তাহে ঠাকুরের কাছে সময়মত যাওয়া-আসা করিতেন। ক্রমে ক্রমে সাধনার গভীরতায় ডুবিয়া অনুভূতির চক্ষে নরেন্দ্র সাকার দেবদেবীদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলেন। তাহার পর অনেকদিন ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলেন—পরমহংসদেব তাঁহার ভাবচক্ষে অতীন্দ্রিয় যেসব বিষয় দর্শন করেন সে সমস্তই সম্পূর্ণ সত্য। তাহা কখনও মনের ভুল (hallucination) নয়।

"ছেলেবেলা হইতেই ঈশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শন-লাভের জন্য নরেন্দ্র ব্যাকুল হইয়াছিলেন। কিশোর বয়স হইতেই তিনি নানা প্রকার ধর্ম্মমতের নেতা ও আচার্য্যদের সহিত মেলামেশা করিয়াছিলেন। এই সমস্ত ধর্ম্মপ্রচারক ও আচার্য্যদের প্রত্যেককেই তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, তাঁহারা চাক্ষুষভাবে ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন কি না? কিন্তু তাঁহারা কেহই নরেন্দ্রের এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নাই। তখন নরেন্দ্রের মনে হইল—তবে কি কেহই ঈশ্বরকে দর্শন করিতে সক্ষম হয় না? ঈশ্বরের অস্তিত্ব তবে কি শুধুই কথার কথা?

সন্দেহ অবিশ্বাস ও নাস্তিকতার ঝড় নরেন্দ্রের মনে দেখা দিতে লাগিল। এইভাবে আরও কয়েক মাস কাটিল। তাহার পরে হঠাৎ একদিন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা তাঁহার মনে হইল। আবার নরেন্দ্রের এই আশঙ্কাও হইল—পাছে পরমহংসদেবও তাঁহাকে এবিষয়ে আশাজনক কোনও উত্তর দিতে না পারেন![১]

যাহা হউক, একদিন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া নরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া আসিলেন। সৌভাগ্যক্রমে সেদিন রামকৃষ্ণদেব তাঁহার সেই ঘরে একাই বসিয়াছিলেন। নরেন্দ্র ছুটিয়া আসিয়া আকুল স্বরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশাই আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন?" সেই প্রশ্ন শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ তখনি উত্তর দিলেন, "হাঁ, নিশ্চয়ই দেখেছি, এই যেমন তোকে দেখছি—এর চেয়ে আরও স্পষ্টভাবে ঈশ্বরকে দেখতে পাই।" নরেন্দ্র শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন! জীবনে এই তিনি সর্ব্বপ্রথম এমন একজন লোককে দেখিতে পাইলেন—যিনি তাঁহার কাছে আসার বাণী শুনাইয়া বলিলেন, "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্—আদিত্যবর্ণং তমসঃপরস্তাৎ।" শুধু তাহাই নয়। পরমহংসদেব নরেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "ঈশ্বরকে সত্যিই দেখা যায়—এই যেমন তুই আমি বসে কথা কইছি, এই রকম চাক্ষুষ তাঁকে দেখা যায়।" তাহার পর আবার পরমহংসদেব নরেন্দ্রকে বলিলেন, "তুই যদি আমার কথামত সাধন কোরে যাস্, তাহলে তুইও তাঁকে দেখতে পাবি।" নরেন্দ্র মুগ্ধ হইলেন, উৎসাহিত হইলেন। তাঁহার চক্ষের সমুখে জ্যোতির্ম্ময় অপূর্ব্ব এক নূতন লোক দেখা দিল। নরেন্দ্র মনেপ্রাণে বুঝিলেন, "প্রত্যক্ষ অনুভূতি না হইলে—সাক্ষাৎ ভাবে ঈশ্বরকে না দেখিলে ধর্ম্মজীবনের কোনই অর্থ হয় না। নিজের ব্রহ্মস্বরূপতার পূর্ণ প্রকাশই ধর্ম্ম। মতবাদ আচার অনুষ্ঠান ব্রতব্রত পালন মন্দির ও তীর্থে ভ্রমণ এসবই গৌণ। অনুভূতি—প্রত্যক্ষ অনুভূতিই আসল ধর্ম্ম। অনুভূতি না হইলে ধর্ম্মজীবন একেবারেই নিষ্ফল।"

গুরুর নির্দ্দেশে নরেন্দ্র সাধনা করিতে করিতে করিতে ক্রমেই গভীর হতে গভীরতর ভাবে অনুভূতির রাজ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। অসাধারণ পবিত্রতা ও সৎসংস্কার লইয়াই নরেন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শৈশব হইতেই তাঁহার মধ্যে আপনা আপনি ধ্যানতন্ময়তা দেখা যাইত। সত্যই স্বামিজীর আকৃতি প্রকৃতির মধ্যে এমন একটি অপরূপ অপার্থিব ভাব ছিল যে, সেই ভাবটি ধ্যানসিদ্ধি ও ধ্যানতন্ময়তার জীবন্ত প্রতীক। ধ্যানে নিমগ্ন স্বামিজীর যে ছবিখানি আছে—সেই মূর্ত্তির ভাবগাম্ভীর্য্য ও স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য প্রকাশের তুলনা আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। সমাধিবান সিদ্ধযোগীর যে অবর্ণনীয় অবস্থা, তাহা স্বামিজীর ঐ ধ্যানমূর্ত্তিতে সর্ব্বতোভাবেও সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়া উঠিয়াছে।

সাধনার অতল গভীরতায় ডুবিয়া প্রজ্ঞানেত্রে নরেন্দ্র দেখিলেন—ধর্ম্মের সাধনাগত প্রত্যেক দিক প্রত্যেক পথই সত্য। বিভিন্ন শ্রেণীর সাধক অনুভূতির এক এক স্তরে সেই পরমসত্যকে এক একটি রূপে উপলব্ধি করিয়াছেন। সেই সমস্ত অনুভূতির সম্পূর্ণ সমাবেশে ধর্ম্মকে প্রকৃতরূপে ও সমগ্ররূপে দেখিতে পাওয়া যায়। উপাসকদের বিভিন্ন রুচি সংস্কার ও সামর্থ্য অনুযায়ী ধর্ম্মসাধনার পদ্ধতিও অনেক প্রকার। বিভিন্ন দিক হইতে ধর্ম্মসাধনাকে অভ্যাস করিলে তবেই ধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গীন রূপের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে। এই জন্য নিতান্ত নিরক্ষরের মূর্ত্তিপূজাও সাধনার ব্যাপারে উপাসকদের অবস্থার দিক দিয়া কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না। মূর্ত্তিপূজা, দেবদেবীদের উপাসনা, অবতারপুরুষদের উপাসনা, সগুণব্রহ্মের ধ্যান এবং নির্গুণ অদ্বৈততত্ত্বরূপে স্বীয় স্বরূপের ভাবনা ও উপলব্ধি—এসমস্তই পথে-পরিপূর্ণ সত্যতত্ত্বকে উপলব্ধির জন্য উত্তরোত্তর সোপান।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাজীবনে নরেন্দ্রনাথ ইহাই নিজের অনুভূতির আলোকে প্রত্যক্ষ করিয়া ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তিনি তাই বিরাট ব্যক্তিত্বশালী একজন আদর্শ ধর্ম্মগুরু অথবা অবতার-

১। স্বামিজীর My Master নামক ইংরাজী বক্তৃতা হইতে এই দুইটি অনুচ্ছেদের ভাব গৃহীত হইয়াছে। ইতি, লেখক।

পুরুষ বলিয়াই দেখেন নাই। শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি দেখিয়াছিলেন, সকল সম্প্রদায়ের অতীত সার্বজনীন ধর্মের মানবমূর্তিধারী ও জীবন্ত প্রকাশরূপে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের নাম ও ব্যক্তি-জীবনকে বিবেকানন্দ এখানে ওখানে প্রচার করেন নাই। দ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত অদ্বৈত মতের সমস্ত অনুভূতির সমন্বয়-মূর্তি, সাকার নিরাকার সগুণ নির্গুণ সমস্ত ভাবের সমাবেশ-মূর্তিরূপেই স্বামিজী রামকৃষ্ণদেবকে দেখিয়াছেন জানিয়াছেন ও সেই ভাবেই তাঁহাকে প্রচার করিয়াছেন। স্বামিজী জানিতেন—সার্বজনীন ধর্মের সকল ভাবের ও অনুভূতির জীবন্ত ব্যাখ্যা ও মূর্তি ছিলেন—ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। ঠাকুরের উপদেশ ও বাণী বেদ উপনিষদ গীতা তন্ত্র ভাগবত বাইবেল প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম শাস্ত্রেরই নবতর প্রকাশ। সেজন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নাম ও জীবনকথা প্রচার অপেক্ষা স্বামিজী সর্বদা প্রাধান্য দিয়াছেন—যে সার্বভৌমিক ধর্মাদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে বিশেষভাবে এই যুগে বিচিত্র রূপে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে, সেই ধর্মের বিচিত্রতাকে ও অপরূপতাকে। বুদ্ধদেব, যীশুখৃষ্ট ও শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি অবতারপুরুষদের অন্তরঙ্গ শিষ্যেরা তাঁহাদের নিজ নিজ সদ্গুরুর ব্যক্তিজীবন ধর্মমত ও বাণীর দিকটাই প্রধানতঃ প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান শিষ্য স্বামিজী এখানে নিজের আশ্চর্য বিশেষত্ব দেখাইয়াছেন। সতেজে ও সুস্পষ্টভাবে স্বামিজী ঘোষণা করিয়াছেন, "বরং তাঁর নাম ডুবে যাক্, কিন্তু তাঁর উপদেশ ফলবান হোক্।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন, "নরেন্দ্রের মধ্য দিয়াই তাঁহার শক্তি সমগ্র জগতে অনেক বিচিত্র সব কার্য করিবে।" আবার একটি কাগজেও তিনি সনন্দ লিখিয়া দিয়াছিলেন—"নরেন শিক্ষে দিবে।" সত্যই শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে আধুনিক যুগে যে আধ্যাত্মিক শক্তি ও ভাবরাশি সঞ্চিত হইয়াছিল—সেই শক্তি বিবেকানন্দকে অবলম্বন করিয়া দেশে দেশে অসংখ্য নরনারীকে সত্যকার ধর্মের আদর্শ ও সাধনপদ্ধতিকে দেখাইয়া দিয়াছে। স্বামিজীর মধ্যেই ঠাকুর রামকৃষ্ণ আবার এক নূতন ভাবে সমগ্র জগতে প্রকাশিত হইয়াছিলেন।

গুরু ও শিষ্য—উভয়ে দুই বিভিন্ন দেহধারী হইলেও প্রকৃতপক্ষে এক ও অবিচ্ছিন্ন সত্তা। উভয়ে স্বরূপতঃ ছিলেন এক ও অভিন্ন আত্মা। শ্রীরামকৃষ্ণ মূর্তিমান বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র। বিবেকানন্দ সেইসব জীবন্ত শাস্ত্রের জীবন্ত ভাষ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ উদীয়মান সূর্য—বিবেকানন্দ সেই সূর্যের উদার উজ্জ্বল আলো করশ্মি। একে অন্যের সহিত চির অবিচ্ছিন্ন। অনিবার্য ভাবে একে অন্যের আধ্যাত্মিক পরিপূরক। একজনকে ছাড়িয়া অন্যকে ভাবিতে পারা যায় না। শ্রীরাম-লক্ষ্মণ, শ্রীকৃষ্ণার্জুন, প্রভৃতি দুইনাম আমাদের ভারতবর্ষে কাব্যে পুরাণে ও শাস্ত্রে অভিন্নতার চিরন্তন প্রতীক হইয়া আবহমান প্রদীপ্ত আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ এই যুগ্ম নাম সেই অভিন্নাত্মার প্রতীকমালায় এই যুগে আসিয়া নূতন ভাবে সম্মিলিত হইয়াছে। ভারতের আধ্যাত্মসাধনায় তাহা নূতন ভাগবতী কাহিনী। জয়তু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, জয়তু স্বামী বিবেকানন্দ।

---

"মানবত্বের অভাবে, চিন্তায় চিন্তায় দেশ উৎসন্ন হয়ে গেছে—তার তোরা কি কচ্ছিস? ফেলে দে তোর শাস্ত্র-মাস্ত্র গঙ্গাজলে। দেশের লোকগুলোকে আগে অন্নসংস্থান করবার উপায় শিখিয়ে দে—তারপর ভাগবত প'ড়ে শোনাস্। কর্মতৎপরতার দ্বারা ঐহিক অভাব-দূর না হ'লে ধর্মকথায় কেউ কান দেবে না।

—স্বামী বিবেকানন্দ

# যীশুখৃষ্টের উপদেশমালা

ঈশ্বরপুত্র যীশুখৃষ্ট তাঁর শিষ্যদের ও আরও অন্যান্য লোকেদের অনেক জায়গায় ধর্মের সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর সেই সমস্ত উপদেশের কিছু কিছু বাইবেলের চারখানা বই-এ ( ম্যাথু, লুক মার্ক ও জন-এর লেখা মাঙ্গলিক পুস্তকে—Gospels according to St. Matthew, Luke, Mark and John ) পাওয়া যায়।

প্রভু যীশুখৃষ্ট নানাস্থানে যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন—সেইসব উপদেশ থেকে বেছে বেছে কতকগুলো এখানে তুলে দেওয়া হলো :—

তোমরা সত্যকে উপলব্ধি করো, সত্যই তোমাদের মুক্তি দেবে।

যাদের অন্তর পবিত্র, তারা ধন্য—কারণ তারা নিশ্চয়ই ঈশ্বরের দর্শন লাভ করবে।

প্রার্থনা করো, তাহলেই তোমাকে ( ধর্মতত্ত্ব ) দেওয়া হবে। অন্বেষণ করো, তাহলেই তুমি ঈশ্বরের সন্ধান পাবে। ( অন্তরের ) দরজায় আঘাত করো, দরজা খুলে যাবে।

তোমাদের অন্তরকে যদি শিশুদের মতন সরল ক'রে ফেলতে না পারো—তাহলে তোমরা কখনই ভগবানকে পাবে না।

ছুঁচের গর্ত্ত দিয়ে একটা উটের চ'লে যাওয়া হয়তো সহজ ও সম্ভব হতে পারে। কিন্তু ধনী লোকদের পক্ষে আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশ করা এর চেয়েও অসম্ভব ব্যাপার।

যদি তুমি সমস্ত পৃথিবীকে লাভ করো, কিন্তু নিজের আত্মাকে হারাও, তাহলে তাতে তোমার কি লাভ হলো? এই বিশ্বজগতে এমন কি শ্রেষ্ঠ সম্পদ আছে, যাকে আত্মার সঙ্গে ( সমান মূল্যবান বস্তুরূপে ) বিনিময় করা যায়?

এইসব শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও। কারণ এরাই স্বর্গরাজ্যের ( ঈশ্বরকে লাভ করবার ) উপযুক্ত।

নতুন ভাবে আবার জন্মগ্রহণ না করলে কেউই আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশ করবার উপযুক্ত হয় না।

অসাধুতার কাছে পরাজয় স্বীকার করো না, নিজের সাধুত্বের দ্বারা অসাধুতাকে জয় করো।

শুধু ভাত রুটি খেয়েই মানুষ বেঁচে থাকে না। ভগবানের বাণীর শক্তিতেই মানুষ বেঁচে থাকে।

'আগামী কাল কি খাবো'—এই রকম ভাবনা কখনো কোরো না। আগামী কাল তার নিজের ভাবনা নিজেই ভাববে।

তোমরা সকলের আগে ভগবানকে পাবার চেষ্টা করো। আর বাকী সব ( দরকারী জিনিস ) তোমাদের কাছে আপনা থেকেই আসবে।

ঈশ্বর সত্যস্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ। অতএব তাঁকে সত্যস্বরূপে ও জ্ঞানস্বরূপে উপাসনা করাই কর্ত্তব্য।

দুজন প্রভুকে কেউই একসঙ্গে সেবা করতে পারে না। তোমরা ঈশ্বর ও আর্থিক লালসা—এই দুজনের সেবা একসঙ্গে কোরতে পারবে না।

সাবধান, তোমরা যেন লোক-দেখাবার জন্যে কখনো ধর্মাচরণ করো না। তা যদি করো, তাহলে ঈশ্বরের করুণা ও প্রসন্নতা তোমরা লাভ কোরতে পারবে না।

সমস্ত হৃদয় মন ও অন্তর দিয়ে ভগবানকে ভালোবাসো—আর তাঁর উপাসনা করো। এক মাত্র এই হচ্ছে ধর্মের প্রধান ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষা।

অনেক লোককেই ( ধর্মতত্ত্বলাভের জন্যে ) এখানে আহ্বান করা হয়। কিন্তু মাত্র কয়েকজনই তার যোগ্য অধিকারী ব'লে প্রমাণিত হয়।

তোমাদের এই দেহই ভগবানের মন্দির। অতএব কুচিন্তা ও কুকাজের দ্বারা এই মন্দিরকে

কখনো অপবিত্র করো না। সুচিন্তা সুকাজ ও প্রার্থনা দিয়ে এই দেহ-মন্দিরকে সব সময়ে পবিত্র রাখবে।

তোমরা কি জানোনা যে, তোমরা পরমেশ্বরের মন্দির-স্বরূপ—আর তিনি স্বয়ং তোমাদের অন্তরে সবসময়ে বিরাজ করছেন?

আমার কাছ থেকে যেমন ব্যবহার পেতে চাও, অন্য লোকদের প্রতিও তোমরা সেইরকম ব্যবহার করবে।

শৃগালেরও থাকবার জন্যে একটা গর্ত আছে, পাখীরও বাস করবার জন্যে একটা বাসা থাকে, কিন্তু মানুষের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণকারী আমার মাথা গুঁজে থাকবার মতনও একটুও জায়গা নেই।

যে সমস্ত লোক আমার পিতা পরমেশ্বরের ইচ্ছাকে পালন করে—শুধু সেই লোকেরাই আমার ভগ্নী বা ভাই।

ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষেরা ( Prophets ) কখনও নিজের দেশবাসী আত্মীয়স্বজন ও নিজ সমাজের লোকের কাছে শ্রদ্ধাভক্তি পান না। কিন্তু অন্যসব দেশের লোকেরা তাঁকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে।

সামান্য বিষয়ে যে নিজের বিশ্বস্ততা প্রমাণ করে, মহান বিষয়েও সে নিজের বিশ্বস্ততাকে অটুট রাখে। সামান্য ব্যাপারে যে অনাচারী—মহৎ বিষয়েও সেই লোক অনাচারী হয়।

ঈশ্বরের রাজ্য পানভোজনের রাজ্য নয়, তাঁর রাজ্য ধর্ম ও শান্তির রাজ্য, তাঁর রাজ্য পরমাত্মাকে উপলব্ধির আনন্দ-রাজ্য।

যদি তোমাদের মধ্যে কোন লোক ধর্মের ভাণ করে—অথচ নিজের বাসনাকে সংযত করে না, কিন্তু নিজের হৃদয়কে নিজেই প্রতারণা করে—সে ব্যক্তির ধর্ম বৃথা অভিমানে পূর্ণ।

ঈশ্বর পরম প্রেমস্বরূপ। যে লোক ( ভগবানের প্রতি ) প্রেমপরায়ণ, প্রেমেই যে অবিরত মগ্ন, সে ঈশ্বরেই অবস্থিত। কারণ ( ভগবৎ- ) প্রেমশীল মানুষের অন্তরেই ঈশ্বর অবস্থান করেন।

যদি কেউ বলে, 'আমি ভগবানকে ভক্তি করি' কিন্তু সে মানুষদের ঘৃণা করে—তাহলে সে ( ঈশ্বরে ভক্তির নামে ) মিথ্যাকথা বলে। কারণ এই চোখের সামনে বিদ্যমান নিজের ভ্রাতৃস্বরূপ মানুষদের যে ভালবাসে না,—সে অদৃশ্য ও অগোচর ঈশ্বরকে কেমন করে ভালোবাসতে পারে?

স্বর্গ ও পৃথিবী পরিণামে ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু আমার বাণী কিছুতেই ধ্বংস হবে না।

---

# চণ্ডীদাস

অধ্যাপক—শ্রীবিজেন্দ্রলাল নাথ, এম, এ

পাষাণ দেবতা পায়ে নিবেদিত হতো যবে
মানুষের ব্যথার ক্রন্দন,
দেবতা রহিতো মূক, চাহিতো না চক্ষু মেলি
জাগিতো না হৃদয়-স্পন্দন
বেদনার মূলাধারে মানুষের মর্মবাণী
সেই দিন পুড়ে হতো ছাই—
জীবনে জীবন লভি সেইদিন মহাকবি
বজ্রকণ্ঠে বলেছিলে—
'সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।'

এ মহা সত্যের বাণী বিদ্যুৎ-দীপ্তিতে যবে
চকিত করিল তব প্রাণ,
সেদিন হইতে কবি ব্যথার বিদীর্ণ চিত্তে
রচিয়াছ মানুষের গান।
তব কাব্য নহে সে তো ছন্দে ছন্দ গাঁথিবার
রূপকার কবির প্রয়াস,—
জীবন-সঙ্গীতে তব শৃঙ্খলিত মানুষের মন
ফেলেতাই মুক্তির নিঃশ্বাস।

# ১৮৫৩-৫৭ সালের বিপ্লবী বাঙ্গালী

অধ্যাপক—শ্রীঅনিলকৃষ্ণ সরকার

আমরা চোখের সামনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে দেখিলাম —গোয়েবলস্ ও মিত্র-পক্ষের প্রচার কাহিনী। বিজয়ীপক্ষ যুদ্ধজয়ের ইতিহাস লিখিয়া যায়; বিপক্ষের অনেক কথা অনাবশ্যক বা আবশ্যক বোধে চাপিয়া যায়। সত্যবদ্ধ ঐতিহাসিক পরাজিতের পক্ষের কোন কোন ভাল কথা সত্যের খাতিরে একটু মাত্র উল্লেখ করিয়া নিজ সততার সাক্ষ্য নিজ বিবেকের কাছে দিয়া যায়। তাহা অস্পষ্ট বলিয়া তার পরিপূর্ণ রূপ ইতিহাসের নেপথ্যে থাকিয়া যায়। সিপাহী যুদ্ধে বাঙ্গালী কেন ব্যাপক-ভাবে বিস্ফোরণে অংশ গ্রহণ করে নাই; তাহার নেপথ্যে কি অবস্থা ছিল, এবং তাহার যে চেষ্টা ছিল তার বিবরণ নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি ও উহার বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয়।

'The Raja ( Kandarpeswar residing at Jorehat ) himself a mere tool of his Dewan Maniram Dutt,—who was at this time in Calcutta.....The Raja was arrested in Assam, treasonable correspondence from Maniram Dutt··· was discovered, —this traiter ( Maniram Dutt ) was at the same time seized in Calcutta ( then sent to Assam, then tried and hunged'···

The zeminder of Pachet ( Manbhum ) arrested,·····in Singhbhum Porahat Raja ( and his Dewan excited the Kols; ultimately 8000 to 4000 etc. under them fought and wounded severely Capt. Halte and Lt. Hale, the British forces retired )·····

The districts in the neighbourhood of Calcutta were subjected to panics ( ইংরাজ মহল সমেত ), which in almost ( অন্ততঃ কোন কোনটা সত্য ) every instance were groundless, which were allayed by a great show of precaution in the posting of troops····· disarming of whole body of native soldiers of Barrackpore and Calcutta;

···in Calcutta large purchase of arms were made by some public ( in some groups ), some people employed the disarmed native soldiers as lathials ( অর্থাৎ secret mobilisation )·· ·· but that was prohibitted..... ( native disarmed soldiers when marching between Barrackpore and Calcutta will seize secret arms from a wayside Mosque )···rumonrs spread after that a large number of upcountry rebels are arriving in disguise to Calcutta by boats to stir up.....কাটছাঁট দিয়া উপরের অর্থপূর্ণ অংশগুলি প্রায় অবিকলভাবে C. E. Buckland লিখিত "*Bengal under the Lt. Goveonors*, being the narratives etc. from 1854-1898—হইতে উদ্ধৃত হইল।

ঐ সব উদ্ধৃতির নির্গলিতার্থ অগ্র ও পশ্চাৎ পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনার দ্বারা ধনিষ্ঠরূপই একমাত্র হইতে পারে। যথা:—সিপাহী বিদ্রোহ হয় ১৮৫৭-৫৮ সনে। ১৮৬০ বা ১৮৬২ সনে গৌহাটি ও আসামের প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলিত বাহন বাঙ্গালা ভাষা ইংরাজরা তুলিয়া দেয়।

পাচেট ও পোরাহাট রাজারা এই সেদিন পর্য্যন্তও জমিদারি সেরেস্তার কাগজপত্র বাঙ্গালাভাষায় লিখিত। উড়িষ্যার তাহাদের প্রাথমিক শিক্ষার বাহন হিসাবে বাঙ্গালাভাষা ইংরাজরা ১৮৩০ বা ১৮৩২ সনে উচ্ছেদ করে। আসামের ( ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার ) মনিরাম দত্ত সিপাহী বিদ্রোহের সময় কলিকাতায় বাঙ্গালী সমাজেই বাস করিয়াই বিপ্লবের ষড়যন্ত্র করিত। পাচেট এবং পোরাহাটের জমিদারগণের এজেন্টগণেরও কলিকাতায় বাঙ্গালী-সমাজে বাস করিয়া বিপ্লবের সহিত যোগাযোগ রাখিত। বারাকপুরের হিন্দুস্থানী সিপাহীরা আগে থেকে বিস্ফোরণ করাতে ইংরাজ সমস্ত পুলিশ ও সৈন্য ( তা সে নেটিভ বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী সমেত ) সবাইকে নিরস্ত্র করিল রাজভক্ত মাদ্রাজী, শিখ, গুর্খা ও গোরা সৈন্য এবং কলিকাতার এবং বাঙ্গালার মফঃস্বলের নীলকর সাহেবদের অস্ত্র দ্বারা সজ্জিত করিয়া কলিকাতার পাড়ায় পাড়ায় ঘাঁটি বসাইয়া নিরন্তর পাহারা দিতে লাগিল এবং বিপ্লব দমনার্থে দেশের চতুর্দ্দিকে ষ্টীমবোটে ও স্থলপথে সেখান হইতে সৈন্য লইয়া পাঠাইতে লাগিল। কলিকাতা অঞ্চলের সমস্ত প্রাইভেট বাজারে অস্ত্রশস্ত্র কেনা-বেচা বন্ধ ও বাজেয়াপ্ত হইল। ষড়যন্ত্রকারী ও রাজভক্ত বঙ্গলোকদিগকে নিরস্ত্র সিপাহী ও অন্যকে লাঠিয়াল রূপে রাখা নিষিদ্ধ করা হইল। নিরস্ত্র বাহিনীকে সসস্ত্রে কলিকাতা ও বারাকপুর মধ্যে হাঁটাইয়া লইয়া যাইবার সময় পথিমধ্যে অস্ত্র সরবরাহ করা হইবে বলিয়া ইংরাজ শুনিতে পাইয়াছিল ; আরব ষ্টীমবোটে করিয়া কামান বন্দুক সহ দেশীয় রাজভক্ত শিখ, গুর্খা, মাদ্রাজী এবং মেরিন-শ্রেণীর গোরা-পল্টন-বাহিনী বাঙ্গালা, আসামের নদীগুলি এবং উড়িষ্যার সমুদ্র তীরবর্ত্তী অঞ্চল অনবরত পাহারা দিতে লাগিল। বাঙ্গালার এই অবস্থা আর অযোধ্যা প্রভৃতির অবস্থা তুলনা করিলে দেখা যায়—উত্তর প্রদেশের সিপাহীরা নিরস্ত্র হয় নাই, ষ্টীমবোটে ইংরাজ পক্ষীয় সৈন্যদল ঘাঁটিতে উপস্থিত হইতে পারিতেছে না, হাতের কাছে ম্যাগাজিন বা অস্ত্রাগারে যথেষ্ট অস্ত্র তাহারা পাইয়া গেল বলিয়া সেইসব অঞ্চলে বিপ্লবের বিস্ফোরণ হইয়া গেল। কিন্তু বাঙ্গালী ঐগুলির একটি সুবিধাও না দেখিয়া অগত্যা ষ্টীমবোটের নাগালের বাহিরে সিংভূম ও পাচেট এবং শিলচরের পার্ব্বত্য ও জঙ্গল অঞ্চলে বিপ্লব ঘোষণা করিয়া দিল ; আর কলিকাতার বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রে সহানুভূতিকারীরা রাজভক্ত জমিদারদের সহিত মিশিয়া প্রকাশ্যে কোম্পানিরাজের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিল।

তারপর ১৮৬০ সনে ঐ বিপ্লবী মনোভাব মধ্য-বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে নীল না-বুনিবার জন্য অহিংস সত্যাগ্রহ ঘোষণা করিল। ইহার পরিচয় লেখকের নিজের গ্রামের নেপথ্য কাহিনীর দ্বারা পরিস্ফুট হয়। নদীয়ার গ্রামে গ্রামে তখন লাল, নীল প্রভৃতি ৭টি রংয়ের সুতা গেল। সেই বিপ্লব বার্ত্তা পাইয়া গ্রামের লোকেরা সন্ধ্যাকালে খোলামাঠে সভা করিল। সেখানে তামা, তুলসী গঙ্গাজল প্রভৃতি হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া তাহারা প্রতিজ্ঞা করিল যে, ঐ হাতে তাহারা আর নীল বুনিবে না। নীলকরদ্বারা গ্রাম আক্রান্ত হইলে লেখকের গ্রামে তাহাদের বাড়ীর তেতালার ছাদে একটী বড় জয়ঢাক সঙ্কেতজ্ঞাপনার্থে লুকায়িত রাখা হইয়াছিল। একদিন গুরুরে আতঙ্কিত হইয়া উহা বাজাইয়া দেওয়াতে ৪।৫ মাইল ব্যাসার্দ্ধের মধ্যস্থিত কৃষকরা ছুটিয়া আসিয়াছিল। মফঃস্বলে আয়োজন এইভাবেই হইয়াছিল।

সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব্বে দেশের স্বাধীনতা উদ্ধার বা রক্ষার চেষ্টা ( মেদিনীপুর ও ভূম অঞ্চলের যুদ্ধ বিগ্রহাদি ) এবং পরের অন্যান্য প্রচেষ্টা ইতিহাসে উল্লেখ আছে :—পরের প্রচেষ্টার আর একটা উদাহরণ আছে যথা :—চৈত্রের গাজনের সময় একটা ভারতব্যাপী বিস্ফোরণের আয়োজন শুনিতে পাইয়া ইংরাজ সিভিলিয়ান হিউম ও ওয়েডারবার্ণ কয়েকজন শিক্ষিত ভারতবাসীকে রাজী করিয়া কংগ্রেস পত্তন করেন। ইংরাজ গুরুর সরাসরি

সাহায্য বিনা ছিরিঙ্গী বিদ্যা আয়ত্ত করিবার জন্য বাঙ্গালীর একলব্যের ন্যায় সাধনা ও নিষ্ঠার দ্বারাও বুঝিতে পারা যায়, তাহার মনের অন্তস্থলে বিপ্লব আয়োজনের তাগিদ ছিল; যথা:—রাধানাথ শিকদার কর্তৃক এভারেষ্ট আবিষ্কার, "জনৈক বাঙ্গালী ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক মূলতঃ ভারতে টেলিগ্রাফ লাইন পত্তন করা, ( Telegraph centenary Report ) এবং জনৈক বাঙ্গালী কর্মকার কর্তৃক দমদম অস্ত্রনির্মাণ কারখানা হইতে ব্যাটালোগ চুরি করিয়া লইয়া গিয়া নেপালে প্রথম মেসিনগান কারখানা স্থাপনা করা প্রভৃতি। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময় (১৭৭২-১৭৮৫) নন্দকুমার এবং তিব্বতের প্রধান রাজশক্তিধারক তাসি লামার সভায় বাঙ্গালী পূর্ণানন্দ গিরি গোঁসাইয়ের কার্য্য-কলাপ ইত্যাদিও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তদ্ব্যতীত একশত বৎসর পূর্ব্ব হইতে বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষায় গুপ্তভাবে রাজনৈতিক পুস্তকাদি প্রকাশ দ্বারাও ইহা হইতে সিদ্ধান্ত হয় যে, স্বাধীনতার উদ্ধারের প্রচেষ্টা বাঙ্গালার বরাবর ছিল। বারদীর ব্রহ্মচারীর গুরুটাই বেণীদত্তের কুটীর হইতে অন্তর্ধান রহস্যময় রহিয়া গিয়াছে। "হরিদাসের গুপ্তকথা" নামক উপন্যাস কলিকাতায় সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে গোরাসৈন্যদের সহিত skirmish-এর কিছু কিছু বিবরণের ছায়া পাওয়া যায়।

---

# ভক্তশ্রেষ্ঠ বিদুর

## শ্রীশান্তিময় ঘোষ

বিনয়ের তুমি মধুর মূরতি—দীনতায় ধরাবেশ,
তোমার দুয়ারে বাঁধা পড়েছিল প্রেম-ডোরে পরমেশ।
অনটন তব জীবনের সাথী,
অনশনে কত কাটাইয়া রাতি
সহাসে সকালে পেয়েছ প্রভাতী—মনে নাহি কোন ক্লেশ।
অভাব ছিল সে স্বভাবের মত—দেহে নাহি দুখ-লেশ।
সারা দিন শেষে মুঠি দুই খুদ্—তাই হাসিমুখে বেশ
রহিয়া এনেছ যতনে রেঁধেছ—প্রসাদ পেয়েছ শেষ
হরিতে হরষে করি নিবেদন
ভকতি-আবেশে অবশ চেতন,
পূজনে নেমেছে নীচে নারায়ণ—ভুবনমোহন বেশ,
তোমার ঝুরেছে যুগলনয়ন—আনন্দে অনিমেষ।
পতিপাশে সতী সে-ও দেবারতি-রসালে মাধবীলতা,
তুমি যদি পুথা-সে সেথায় সুধা-পবিত্রতোয়ে পতিব্রতা।
শ্রীকৃষ্ণে হেরি ভবন-সুমুখে
বসন ফেলিয়া ছুটে এ'ল সুখে
সবলে চাপিল সযতনে বুকে—ভুলে গেল সব কথা,
কদলী ভাঙিল—মুখে তুলে দিল—যেন জন্ম সরলতা।
শ্রীহরি সরমে খুলি পীতবাস—যেরি দিল বেড়ি কটি
জানহারা সতী বুঝিল না রতি—খাওয়াল কদলী কটি
অতি সমাদরে,—ফুরাল কদলী
তখন তাহার গোপীগুলি তুলি
খাওয়াতে লাগিল প্রসাদ সেকুলি—ব্যাকুল, বিভলমতি
এমনি আপনা-হারান সাধনা—এমনি শরণাগতি।
ভকতি-ভাবের প্রেম-মন্থর—তুমি যেন নীলাকাশ,
শকতি সেথায় বিজুরি-বিভায় নিতি-প্রীতি-পরকাশ।
তুমি সে সাধন—সুবর্ণ ভাতি,
রমণী সে পাশে পূর্ণিমা রাতি,
মন্দার মালা যেন দোঁহে গাঁথি পাঠায়েছ পীতবাস।
পরা ভকতির প্রণব মূরতি—সহ নতি-প্রতিশ্বাস।

# দার্শনিক রেনে দেকার্তের জীবন-কথা

মহামনীষী রেনে দেকার্তে (Rene Descarte) পাশ্চাত্যে দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসে নিজ প্রতিভার আজও একটি বিশিষ্ট গৌরবের স্থান অধিকার ক'রে আছেন। আধুনিক ইউরোপে দার্শনিক চিন্তাধারার তিনিই প্রথম পথিকৃৎ ( Pioneer ) একথা বললে মোটেই অত্যুক্তি করা হয় না। সেজন্যে পাশ্চাত্যের দার্শনিক মনীষীদের মধ্যে অনেকে তাঁকে 'Father of Philosophy' ( দর্শনশাস্ত্রের জনক ) ব'লে শ্রদ্ধা কোরে থাকেন। দেকার্তে শুধু দার্শনিক মতবাদ প্রবর্তন ও নিজের সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠাতেই নিজের প্রতিভার অসাধারণত্ব প্রমাণ করেন নি। ইউরোপের আধুনিক অঙ্কশাস্ত্রেরও তিনি জন্মদাতা। মাধ্যাকর্ষণ নিয়মের বিশ্ববিখ্যাত আবিষ্কারক বৈজ্ঞানিক মনীষী স্যার আইজাক নিউটনের (জন্ম ১৬৪৩—মৃত্যু ১৭২৭ খৃষ্টাব্দ) প্রথম জীবনে দেকার্তের রচিত Analytical Geometry-র প্রভাব বিশেষভাবে দেখতে পাওয়া যায়। এসব ছাড়াও আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের ( Physics ) কোন কোন মতবাদ গঠনেও তাঁর দান সামান্য নয়।

১৫৯৬ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চে টুরেইন-এর অন্তর্গত লাহোয়ে ( Lahoai ) নামক স্থানে রেনে দেকার্তে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ১৬০৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৬১২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দেকার্তে ফ্লাঁজ্-এ জেসুইটদের[১] (Jesuits) বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। তারপরে তিনি প্যারিসে অঙ্কশাস্ত্রের কাজে গবেষণায় কয়েক বছর কাটিয়েছিলেন। ১৬১৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৬২৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি স্বেচ্ছাসৈনিকরূপে ডচ্‌ সরকারের অধীনে কাজ করেছিলেন। এই সময়ে দেকার্তে বোহেমিয়ার রাজার বিরুদ্ধে প্রাগ-এর (Prague—চেকোস্লোভেকিয়ার অন্তর্গত সহর) যুদ্ধ-ক্ষেত্রে সৈন্যদলের মধ্যে ছিলেন। তারপরে কয়েক বছর ধ'রে তিনি ইউরোপের কোন কোন দেশে ভ্রমণ করেছিলেন। ১৬২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বিশেষ কোন কারণে লোয়েটো সহরে ফিরে আসেন। ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে দেকার্তে সৈন্যরূপে না রোম-এর অবরোধে যোগ দিয়েছিলেন। ১৬২৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি হল্যাণ্ডারল্যাণ্ডে নির্জনে বাস করতে লাগলেন। এই সময়টা দেকার্তের জীবনের বিশেষ মূল্যবান অধ্যায়। কারণ এই বিশ বছরের সময়ের সমস্তটাই তিনি নিজের দার্শনিক মতবাদের গঠন বিস্তৃতি সাধন ও সেই সম্বন্ধে কতকগুলি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করার কাজে গভীরভাবে নিযুক্ত ছিলেন। শেষ বয়সে ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে দেকার্তে সুইডেনের রাণী ক্রিশ্চিনার আহ্বানে ইকহল্ম ( Stockholm ) সহরে গিছলেন। সেখানে থাকবার সময়ে তিনি রাণী ক্রিশ্চিনাকে দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষাদান করতেন। রাণী তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে ইকহল্ম-এ তাঁকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার একটি প্রতিষ্ঠান গড়বার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু এখানকার জলবায়ু তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল ছিল না। কিছুকাল যাবেই দেকার্তের শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লো। ক্রমে শরীরে রোগ প্রবল হয়ে যাওয়ার ফলে ১৬৫০ খৃষ্টাব্দের ১১ই জানুয়ারী দেকার্তের প্রতিভাদীপ্ত ও গৌরবময় জীবনের শেষ হয়ে গেলো।

**দেকার্তের দার্শনিক চিন্তাপ্রণালীর বিশেষত্ব**—দার্শনিক তত্ত্বনির্ণয় এবং দার্শনিক বিষয়-বস্তুর গবেষণা করতে গেলে কিভাবে যুক্তি ও বিচারের পদ্ধতি গ্রহণ ও প্রয়োগ করতে হবে—তার সম্বন্ধে দেকার্তে নিজের উদ্ভাবিত বিশেষ একটি

১। জেসুইট—রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান সন্ন্যাসীদের একটি বিশেষ দল। এই দলের আসল নাম 'Society of Jesus' ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে ইগ্নেটিয়াস লয়লা নামে বিখ্যাত রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান সন্ন্যাসী এই দলটি প্রবর্তন করেছিলেন। ইগ্নেটিয়াস লয়লার জন্ম অনুমান ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে। তাঁর মৃত্যু ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে। প্রথম জীবনে তিনি সৈনিক ছিলেন—পরে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন।

পদ্ধতি রেখে গেছেন। সেই পদ্ধতিটির ক্রম হচ্ছে এই রকম :—

(১) কোন বিষয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে সন্দেহহীন হয়ে জানলাভ করবার আগে তাকে সত্য ব'লে গ্রহণ করা উচিত নয়।

(২) প্রত্যেক কঠিন সমস্যাকে যথাসময়ে তাদের প্রাকৃতিক বিভাগ অনুযায়ী বিভক্ত কোরে তার সম্বন্ধে চিন্তা করা উচিত।

(৩) দার্শনিক বিষয়-বস্তুর সম্বন্ধে চিন্তাধারাকে সরল থেকে ক্রমে ক্রমে জটিলতার দিকে নিয়ে যেতে হবে। যেখানে বিষয়-বস্তুটির আলোচনার স্বাভাবিক কোনও নিয়ম বা শৃঙ্খলা নেই, সেখানেও তার একটা নির্দিষ্টরূপ ও শৃঙ্খলা আছে ব'লে আগে থেকে ধ'রে নিতে হবে।

(৪) বিষয়-বস্তুর আলোচনা ও গণনায় একটি পূর্ণতার আশ্রয় গ্রহণ কোরতে হবে—যাতে এর মধ্যে কোনও ব্যাপারে কোন কিছু ত্রুটি না থাকে।

প্রাচীন গ্রীসে দার্শনিক মনীষী য়্যারিষ্টটল ( Aristotle—জন্ম ৩৮৪ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ, মৃত্যু ৩২২ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ ) ন্যায়শাস্ত্রের একটি নিয়ম উদ্ভাবন কোরে দার্শনিক তত্ত্ব-নির্ণয়ের একটি পদ্ধতি নির্ণয় কোরেছিলেন। নিজের এই উদ্ভাবিত পদ্ধতি প্রয়োগ কোরে দেকার্ত্তে দেখালেন—দার্শনিক তত্ত্বকে নির্ণয়ের ও ব্যাখ্যানের ব্যাপারে তাঁর পদ্ধতি য়্যারিষ্টটল-এর পদ্ধতির চেয়ে উন্নততর।

দেকার্ত্তে যেসব পুস্তক লিখে গেছেন তার মধ্যে এই বইগুলিই সবচেয়ে বিখ্যাত। (১) Discourse de la Methode (২) Meditationes de Prima Philosophia—১৬৪১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। (৩) Principia Philosophiae—১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। (৪) Passiones Animae।

দেকার্ত্তের সম্পূর্ণ রচনাবলী প্রথমে ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে এবং তারপরে ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে লাটিন ভাষায় ছাপা হয়েছিল। ঐসব রচনাবলীর ফরাসী অনুবাদ ১৮২৪ থেকে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে প্রথমে, তারপরে ১৮৯৭ থেকে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে আর একবার ছাপা হয়েছিল। এরপরে তাঁর দার্শনিক রচনাবলীর ১৯১১ খৃষ্টাব্দে মিস হালডেন এবং জি, টি, রস্ (G. T. Ross) দ্বারা ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। এর পরে অবশ্য তাঁর রচনাবলীর মূল ও অনুবাদের আরও কতকগুলি সংস্করণ ছাপা হয়ে বেরিয়েছে।

পাশ্চাত্য দেশে দার্শনিক মতবাদ প্রচারে দেকার্ত্তেই স্বাধীনচিন্তা ও যুক্তিবাদের প্রথম সূচনা করেছিলেন। এর প্রায় দুশো বছর আগে থেকে ইউরোপে রেনেসাঁ বা মানবীয় চিন্তাজগতে নবযুগের আরম্ভ। দেকার্ত্তের আগে জগতের কারণতত্ত্ব ও উৎপত্তির সম্বন্ধে স্বাধীন চিন্তা ও নির্দ্দিষ্ট প্রণালীবদ্ধ বিচারপদ্ধতি ছিল না। খৃষ্টানধর্ম্মের গোঁড়ামী ও যুক্তিহীন মতবাদের অবাধ প্রচারের ফলে ইউরোপে পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত মানুষের যুক্তিবাদের ও স্বাধীনচিন্তার নদীস্রোত (ধর্ম্মের নামে অন্ধবিশ্বাস ও যুক্তিহীন আচার-অনুষ্ঠানের মরুবালুরাশিতে) অবরুদ্ধ হয়ে গিছলো। সেজন্যে ঐসময়ে পণ্ডিতসমাজ ধর্ম্মগত ও দার্শনিক মতবাদগত কোনও রকম ব্যাপারে গ্রীক দার্শনিক য়্যারিষ্টটল এবং খৃষ্টান ধর্ম্মমণ্ডলীর প্রধান গুরু পোপ ও যাজক সম্প্রদায়ের দেওয়া অভিমত ও নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে কিম্বা কথা বলতে সাহসী হতেন না। তাঁদের এই রকম অন্ধবিশ্বাস বা সাহসহীনতার মূলে ছিল—হয় খৃষ্টান সম্প্রদায়ের গোঁড়া নেতাদের কাছ থেকে নির্য্যাতন ও অত্যাচার —কিম্বা 'নরকে যাবার ভয়ে' অভিভূত হওয়া। দেকার্ত্তের অভ্যুদয়ের ফলে ইউরোপের পণ্ডিতসমাজ থেকে এই রকম অন্ধবিশ্বাস ও ভয় চ'লে যেতে লাগলো। মানুষের মনকে এই রকম অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কার ও জড়তা থেকে যাঁরা মুক্তি দিয়েছেন—দেকার্ত্তে ছিলেন সেইসব মহাপ্রাণ মানবপ্রেমিক ও বরেণ্য পুরুষদের মধ্যে অন্যতম।

নিঃসন্দেহে কোনও বিষয়কে মেনে নেওয়া দেকার্ত্তের মতবাদ নয়। তাঁর মতবাদের বিশেষত্ব

এই যে, জ্ঞানের প্রত্যেক বিষয়কে যুক্তির কষ্টিপাথরে সকল রকমে যাচাই কোরে দেখতে হবে। যদি সেই বিষয়ে যুক্তির সারবত্তা থাকে তবেই তাকে গ্রহণ কোরতে হবে, নইলে নয়। তাই বিচারের সমস্ত বিষয়ের সারবত্তায় তিনি প্রথমেই সন্দেহ করেছেন। এই সন্দেহবাদ ডেকার্তের দর্শনের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কিন্তু তাই ব'লে ডেকার্তের মতবাদ নাস্তিকতা নয়। সেই মতবাদের মধ্যে Doubt আছে—কিন্তু তাতে disbelief বা atheism নেই।

যে-কোনও মনীষীর ব্যাখ্যাত দার্শনিক মতবাদ হোকনা কেন—সেই মত কখনও সর্ব্ববাদী-সম্মত হতে পারেনি এবং কখনও পারবে না। ডেকার্তের মতবাদকেও দার্শনিক বিষয়ে চিন্তাকারী সকলেই মেনে নেন নি। তাঁর মতবাদের বিরুদ্ধেও অনেক বিরোধী মতবাদ আছে।

শ্রীমৎ পুরাগ্র পরমপন্থীজী ডেকার্তের দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা কোরে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। সেই প্রবন্ধটি 'বিশ্ববাণীর' বর্ত্তমান সংখ্যায় আমরা এই সঙ্গে প্রকাশ করলুম।

—ইতি সম্পাদক, বিশ্ববাণী

---

# ডেকার্টের দার্শনিক মতবাদ

## শ্রীপুরাগ্র পরমপন্থী

একদা ডেকার্ট (Rene Descartes) দর্শন পরবর্ত্তী মধ্যযুগীয় ইউরোপে বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর দার্শনিক চিন্তার প্রভাব, তাঁর সিদ্ধান্তরাজি উদ্ভূত সমস্যা নিচয় পরবর্ত্তী কয়েক শতাব্দীর চিন্তা নেতাগণকে সবেই জিজ্ঞাসামুখর ও মুগ্ধ ক'রে রেখেছিল। এমনকি ডেকার্ট দর্শনের প্রতিক্রিয়া পরবর্ত্তীকালের বিজ্ঞান-রাজ্যেও আলোড়ন তোলে।

ফ্রান্সিস বেকনের ( Francis Bacon—জন্ম ১৫৬১, মৃত্যু ১৬২৬ খৃষ্টাব্দ ) জ্ঞান-দর্শনের ব্যবহারিক কার্য্যকারিতার উপরে ডেকার্ট বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর মতে দর্শন হ'লো পরিপূর্ণ জ্ঞানের অভিব্যক্তি, জীবন-সংগ্রামের পাথেয় এবং সমগ্র কলা-শিল্পের আবিষ্কার ও বিকাশের মূল উৎস। জ্ঞানের সমস্ত বিষয়ের মধ্যে তিনি গণিতকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। তাঁর মতে গণিত শাস্ত্রের মতন দর্শনশাস্ত্রেরও সত্যতা, সম্পূর্ণতা ও দৃঢ়তা পাওয়া উচিত।

ডেকার্ট প্রত্যেক দ্রব্যের যান্ত্রিক ব্যাখ্যার পক্ষপাতী—আবার অধ্যাত্ম সত্তা, ভগবান ও আত্মার স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। তাই তাঁর জীবনব্যাপী দার্শনিক সমস্যা ছিল যে, কি ক'রে বিশ্বের যান্ত্রিক প্রক্রিয়াবাদের সহিত ভগবৎ-তত্ত্ব ও আত্মার স্বাধীনতাবাদের ঐক্য সম্ভব হ'তে পারে।

ডেকার্টের মতে দর্শন একটী বিশাল বৃক্ষ। তার মূল অধ্যাত্মবিদ্যা, কাণ্ড পদার্থ-বিজ্ঞান ও শাখা-প্রশাখা অন্য অন্য বিদ্যা-নিচয়। ডেকার্টের মূল লক্ষ্য ছিল কতকগুলি নিশ্চিত, স্বতঃসিদ্ধ ( self-evident ) সত্যরাজির আবিষ্কার করা—যাহা সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন যুক্তিবাদী জনসাধারণের দ্বারা স্বীকৃত হবে। তিনি অন্যের সিদ্ধান্ত বা মতবাদ গ্রহণ করতে প্রস্তুত ন'ন—কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বাধীন চিন্তার দ্বারা সত্যে উপনীত হতে হবে, অন্যের মত-জানা বিজ্ঞান নয়—তা ইতিহাস মাত্র।

ডেকার্ট ঘোষণা করেন যে, আমরা গণিত-শাস্ত্রের পদ্ধতি অবলম্বন ক'রে সত্যে উপনীত হ'তে পারবো।

অর্থাৎ—আমাদের কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ প্রতিজ্ঞা ( proposition ) নিয়ে বিচার আরম্ভ করা উচিত ও ধীরে ধীরে এইভাবে গভীর ও গূঢ় সত্যে প্রবেশ করতে হবে ইহাদের সাহায্যে।

আমাদের সমস্ত চিন্তা ভাবনা, চিরাচরিত প্রথাসমূহ, অভিজ্ঞতা, স্মৃতি, কল্পনা, ধারণা ও প্রত্যয় ভ্রান্তিজনক হ'তে পারে। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি মাত্রেই একটি বিষয়ে নিশ্চিত—সে জানে, "আমি সন্দেহ করি বা চিন্তা করি"। ইহা সম্পূর্ণ অযুক্তিকর সন্দেহ বা চিন্তা করা যে, যে-ব্যক্তি চিন্তা বা সন্দেহ করছে তার অস্তিত্বনেই চিন্তা বা সন্দেহ করার সময়ে। অর্থাৎ, সন্দেহ বা সংশয় সংশয়িতার ইঙ্গিত দেয়—যেমন চিন্তা চিন্তাকারীর অস্তিত্বকে প্রকাশ করে। সুতরাং সংশয় চিন্তাপ্রসূত, চিন্তা আবার চিন্তাকারী থেকে আসে। অতএব যেহেতু আমি চিন্তা করি বা সংশয় করি সেহেতু আমি বর্তমান ( *cogito, ergo sum*—I think, I doubt, so I exist ) ইহাই ডেকার্টের কৃত দার্শনিক মতে সারা জগতে বিখ্যাত সিদ্ধান্ত। এই উপলব্ধি সম্বন্ধে তিনি বলেন, "It is the first and most certain knowledge that occurs to one who philosophises in an orderly manner."

ডেকার্টের মতে এই সিদ্ধান্ত—আমাদের প্রকৃত সত্যের কি লক্ষণ হওয়া উচিত তাও জানিয়ে দেয়। "আমি বর্তমান" এই সত্যটী একটী অত্যন্ত নিশ্চিত উপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত—অতএব যাহা একান্ত নিশ্চিত সংশয়হীন উপলব্ধি বা সুস্পষ্ট অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত, তা-ই স্বতঃসিদ্ধ সত্য।

মানুষের জ্ঞান বা প্রত্যয় বা ধারণা দুই উপায়ে প্রাপ্তি হয়—(১) সংবেদন বা অভিজ্ঞতা হতে ও (২) সহজাত বৃত্তি হ'তে। অর্থাৎ, মানবজ্ঞান হয় অভিজ্ঞতা-জাত, না হয় সহজাত আশ্রয়ী বৃত্তিজাত। সমস্ত জ্ঞানই ইন্দ্রিয়জ নয়, এবং ইন্দ্রিয়-বহির্ভূত জ্ঞানকে ডেকার্ট বলেছেন innate ideas—সহজাত প্রত্যয়। এইরূপ একটি সহজাত প্রত্যয় বা জ্ঞান ঈশ্বর-সম্বন্ধীয়। আমার প্রত্যেক অস্তিত্বের একটি কারণ বর্তমান—ইহাই সার্বিক নিয়ম ও সিদ্ধান্ত—আমার কার্যের ন্যায় কারণ অস্তিত্বশীল। সুতরাং ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় প্রত্যয় বা ধারণারূপ কার্যের নিশ্চয়ই কারণ বর্তমান আছে। কারণ আমার ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণার—কারণ বা জনক আমি কখনই হ'তে পারি না—যেহেতু আমি সীমাবদ্ধ, অসম্পূর্ণ সত্তা, আর ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা অনন্ত ও সম্পূর্ণ। অতএব এই ঈশ্বর সম্বন্ধে অসীম—সম্পূর্ণ ও বিরাট ধারণা নিশ্চয়ই ভগবান আমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অর্থাৎ আমার সহজাত ভগবৎস্বরূপের জ্ঞান ইঙ্গিত দেয়—ভগবৎস্বরূপের অস্তিত্বের —আমার এই জ্ঞানের ভিত্তি ভগবৎস্বরূপ বা ভগবৎসত্তা। ডেকার্টের মতে অনন্ত অসীমের ধারণা অনন্ত অসীম সত্তার অস্তিত্বের প্রতিপাদনকারী। ( the knowledge of such a being necessarily implies as the ground of this concept, a being greater than the knower. )"

আমিই আমার জনক স্রষ্টা বা রচয়িতা হ'তে পারি না। আমার পিতামাতাও প্রকৃত অর্থে আমার স্রষ্টা নন। কারণ আমি বা আমার পিতামাতা অসম্পূর্ণ, ভ্রমপ্রবণশীল, দুঃখে কষ্টে তাপক্লিষ্ট। যদি আমি আমার রচয়িতা হ'তাম বা পিতামাতা আমার রচয়িতা হোতেন—তাহলে নিশ্চয়ই আমি সম্পূর্ণ, অমর, দিব্য হ'য়ে বিরাজ করতাম। সুতরাং আমার স্রষ্টা ভগবান হওয়াই সম্ভব। অর্থাৎ আমার কারণ ভগবান।

কিন্তু ভগবানের অন্য কারণ থাকতে পারে না। ভগবৎ সম্পূর্ণতার অন্যকারণ সম্পূর্ণ অচিন্তনীয়। কারণ পূর্ণ হ'তে প্রয়োজন এক কারণ ও একক সত্তা। সুতরাং ঈশ্বর বা ব্রহ্ম স্বয়ং কারণ (self-caused )। যদি তিনি অন্যকারণ থেকে উদ্ভূত হন, তাহলে কারণের কারণ-রূপ প্রবাহের বিরাম সম্ভব নয় কোনদিন। কার্য-কারণ শৃঙ্খল তাহলে চিরকাল চলবে। কিন্তু তাহা সম্ভব নয়—অতএব ভগবানই স্বয়ং কারণ।

পূর্বেই বলেছি ডেকার্টের মতে ঈশ্বর সম্বন্ধীয়

জ্ঞান সহজাত মানুষের। ডেকার্ট ঘোষণা করেন—ভগবান সমস্ত বিশ্বচরাচরের কারণ ও স্রষ্টা। তিনি জীবকেও নিজের স্বরূপে সৃষ্টি করেছেন। ( He created man in His own image ) আমি ভগবৎ সম্বন্ধে চিন্তা ও বিচার করলেই স্পষ্ট বুঝতে পারি যে, ভগবান সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ, অনন্ত, সত্য ও শিবের মূলাধার। তিনি বিশ্বপ্রপঞ্চের স্রষ্টা, তিনি মানুষের মতন শরীরধারী নন—মানুষের মতন ইন্দ্রিয়দ্বারা তাঁকে দর্শন করতে হয় না। তাঁর ইচ্ছা ও বুদ্ধি বর্তমান—তবে তাহা মানবের ইচ্ছা বা বুদ্ধির মতন নয়। ভগবান পাপ বা অশিবের জনক ( হেতু ) নহেন।

কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে—যদি সত্যই ভগবান আমাদের সৃষ্টি কোরেই থাকেন—তবে আমরা ভুল করি কেন? আমরা ভ্রান্তিতে পড়ি কেন? ডেকার্টের মতে সত্য ও মিথ্যার বিভিন্নতা দর্শন করতে যে বিবেক ভগবান আমাদের দিয়েছেন—তাহা সম্পূর্ণ বা অনন্ত নয়। আমাদের ভুল হয় তখন, যখন আমরা আমাদের ইচ্ছাশক্তিকে সংযত করতে পারি না—কোন বস্তুর সম্বন্ধে ধারণা করতে যখন সেই বস্তু সম্বন্ধে কোন দৃঢ় বা নিশ্চিত প্রত্যয় হয় নি। অর্থাৎ কোন বস্তুর নিশ্চিত প্রত্যয় বা উপলব্ধি বিচারের পদ্ধতিতে হবার পূর্বে হঠাৎ সেই বস্তু সম্বন্ধে এষণা-প্রণোদিত ধারণা করাই আমাদের ভুলের প্রধান কারণ।

দর্শন জগতের আর একটি সমস্যা বহিঃপ্রকৃতির অস্তিত্বের জিজ্ঞাসা। ডেকার্ট বিশ্বপ্রপঞ্চের স্বাধীন অস্তিত্বের সত্যতা স্বীকার করেছেন। বিশ্বের পদার্থনিচয় বিষয়ীনিষ্ঠ বা মনকল্পনা উদ্ভূত নয়। তাহারা স্বাধীন ও তাহাদের অস্তিত্ব আমাদের অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল নয়। এক কথায় ডেকার্ট বিজ্ঞানবাদের সমর্থক নন। এই পদার্থ সকলকে ডেকার্ট নাম দিয়েছেন—'দ্রব্য' বা 'Substance'। যে কোন অন্য-নিরপেক্ষ পদার্থই দ্রব্য। আমার প্রকৃত পক্ষে অদ্বৈত-নির্বিশেষ সত্তাই ভগবান। সুতরাং সাঙ্খ্যিক দৃষ্টিতে বলা যায় যে, এক চরম ( Absolute ) সত্তা বা দ্রব্য হলেন ভগবান এবং অন্য দুই আপেক্ষিক সত্তা বা দ্রব্য হলো মন ও দেহ। ( এই 'দেহ' বলতে অন্য সব পদার্থকেও বুঝতে হবে )। মন ও দেহ উভয়েই উভয় হতে স্বাধীন—কিন্তু উভয়েই ভগবানে নির্ভরশীল। উভয়ের গুণাবলী পৃথক। প্রত্যেক দ্রব্যের (Substance) লক্ষণ হ'ল তার গুণাবলী—( attributes )। যে কোন দ্রব্য আবার নিজেকে বিভিন্ন ভাবে বা প্রকারে ( modes ) প্রকাশ করতে সক্ষম। দ্রব্য তার গুণ পরিবর্তন করতে পারে না—কিন্তু প্রকাশের প্রকার ভেদ ( modes ) পরিবর্তন করতে পারে। যেমন যে কোন দ্রব্যের অপরিবর্তনীয় গুণ হ'ল বিস্তার ( extension ) কিন্তু বিভিন্ন দ্রব্যের বিভিন্ন প্রকারের ( modes ) অভিব্যক্তি সম্ভব।

দ্রব্যমাত্রই বিস্তার, বিস্তারই দ্রব্য। দ্রব্যের, তাই, দৈশিক-গুরুত্ব ( spatial magnitude ) আছে। দেশ ও দ্রব্য—(space and substance) সর্বত্র বিদ্যমান—তাই ডেকার্টের মতে শূন্য দেশ ( empty space ) সম্ভব নয়। দেশের অসংখ্য ও অনুরূপ বিভাগ সম্ভব—তাই পরমাণু ব'লে কোন দ্রব্য জগতে থাকতে পারে না। ডেকার্ট জড় জগৎকে যান্ত্রিক নিয়মের অন্তর্গত বলেছেন। জড়জগতের পরিবর্তন—কার্য্য-কারণ, বিভিন্নতা সবই গতির দ্বারা হয়। আকর্ষণ বিকর্ষণ গতিসম্ভূত—গতি আবার ঈশ্বরের সৃষ্টি।

ডেকার্ট দেহ ও মনের সমস্যায় দ্বৈতবাদ মেনে নিয়েছেন ব্যবহারিক জগতে। মন ও দেহ এরা দুই পরস্পর বিরোধী সত্তা। দেহের লক্ষণ বিস্তার, মনের লক্ষণ চিন্তাশক্তি। দেহ জড় এবং মন সক্রিয় ও স্বাধীন। মনের বিস্তার নেই, দেহের চিন্তা-শক্তি নেই। 'আমি' ও 'আমার' জ্ঞান মনজাত—সুতরাং আমি দেহ হ'তে ভিন্ন এবং আমার দেহ-অতিরিক্ত অস্তিত্ব সম্ভব। আমি আমার কল্পনা বা প্রত্যয় শক্তি ব্যতিরিক্ত নিজেকে উপলব্ধি করতে পারি। কিন্তু কল্পনা বা প্রত্যয়ের অস্তিত্ব আমাকে

ব্যতীত সম্ভব নয়। অতএব কল্পনা, প্রত্যয়, ধারণা ইত্যাদি আমার প্রকৃত স্বরূপ হতে ভিন্ন। অর্থাৎ—'অহং' যাহা মনের উপর প্রতিষ্ঠিত—তাহা দেহ, ভাবনা, কল্পনা, আবেগ প্রত্যয় ইত্যাদি হ'তে সম্পূর্ণ পৃথক্। মন ও দেহ উভয়েই দুই বিপরীত-ধর্মী অস্তিত্ব।

যদি মন ও দেহ সত্তাই বিপরীতধর্মী হয়, তাহলে মন দেহে বা দেহ মনে কোনরূপ প্রতিক্রিয়া বিস্তার করতে পারে না—ইহাই ডেকার্টের বিচারের যুক্তি-সঙ্গত সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত। ডেকার্ট কিন্তু এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে রাজী নন। তাঁর মতে দেহ ও মন পরস্পরের বিপরীত ধর্মী হলেও উভয়ের মধ্যে একটি নিকট সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে। যেমন তৃষ্ণা, ক্ষুধা, আবেগ, ভাবপ্রবণতা, স্নেহ, সুখদুঃখ, শব্দ, গন্ধ আলো প্রভৃতির উপলব্ধি ও অভিব্যক্তি দেহ ও মনের নিকট সম্বন্ধে আভাষ দেয়। এক কথায় বলা যায়—দেহ ও মন নিয়ে এক পরার্থিক ঐক্য গঠিত ( mind and body compose a substantial unity )। সুতরাং মানুষ কেবল শুদ্ধ আত্মার সত্তা নয়—তার দৈহিক সত্তার প্রয়োজন ও অস্তিত্ব বর্ত্তমান। ডেকার্ট কিন্তু দেহ ও মনের ঐক্য বা সম্বন্ধের স্বরূপ কি তাহা পরিষ্কার ক'রে ব্যাখ্যা করেন নি। ডেকার্টের এই নীরবতার কারণ হচ্ছে যে, তিনি দৈহিক জগৎকে সম্পূর্ণ যান্ত্রিক নিয়মে ও দৃষ্টিভঙ্গীতে বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন এবং আত্মিক সত্তাকেও সম্পূর্ণ অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন স্বাধীন সত্তারূপে। এই দুই ভাবধারার দ্বন্দ্বে তাঁর চিন্তা অস্পষ্ট হ'য়ে গেছে।

ডেকার্টের মতে—আত্মা ও মন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আত্মিক সত্তা-নিচয়ের সমষ্টি নয়। আত্মা এক সার্বিক অখণ্ড সত্তা—যাহা বিভিন্ন প্রকারে ও রূপে নিজেকে অভিব্যক্তি করেছে। আত্মার দুই বিকাশ বা রূপ সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়—যার নাম দিয়েছেন ডেকার্ট আত্মার action and passion। আত্মার স্বাধীনতা আছে। সে ভগবৎ-প্রেমে ও ভগবৎ চিন্তায় বা শুদ্ধ আত্মিক ভাবনায় সমাহিত থাকতে পারে—অথবা অসীম কল্পলোকে দেহ-সম্বন্ধ-বিযুক্ত অবস্থায় বিচরণ করতে সক্ষম। কিন্তু আত্মার শক্তি প্রকৃত-রূপে কার্য্যকারী হয় ও জাগ্রত হয়—যখন সে পরম সত্তাকে অবগত হয়। মানব-আত্মার একমাত্র লক্ষ্য ও আদর্শ হচ্ছে দেহের কামনা বাসনা, ইন্দ্রিয়নিচয়ের এবং বহিঃপ্রকৃতির প্রভাব হ'তে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে সকলের উপর নিজের প্রভুত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

---

ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করাই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম কখনই মতবাদ বা আচার-অনুষ্ঠান নয়। মন্দিরে গীর্জ্জায় অথবা সাধারণ কোনও ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের উপাসনায় সমবেত যোগ দেওয়াও ধর্ম্ম নয়। মন্দির গীর্জ্জা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করানোও কখনও ধর্ম্ম নয়। সম্প্রদায়ে বা সঙ্ঘে ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। ধর্ম্ম একান্তভাবেই প্রাণের বস্তু। সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্ম্ম কখনই এক বস্তু নয়।

ঈশ্বরের সহিত নিজের স্বরূপগত সম্বন্ধকে আবিষ্কার করাই ধর্ম্ম। বক্তৃতা শাস্ত্রবিচার আমাদিগকে ধর্ম্মলাভে প্রত্যক্ষভাবে সক্ষম করে না। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই ব্রহ্মস্বরূপতা অব্যক্তভাবে আছে। যথাযথ সাধনার দ্বারা আমাদের ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে হইবে। ঈশ্বরত্ব ব্রহ্মত্ব লাভই ধর্ম্ম।

—স্বামী বিবেকানন্দ

# বৈজ্ঞানিক ফার্মি

শ্রীবীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

মৃত্যুর ঠিক এক বছর পরে স্মরণ করতে বসেছি বিজ্ঞানী এনরিকো ফার্মিকে। নামটি আপনাদের অচেনা নয়। ভবিষ্যৎ পৃথিবী রচনায় যে অদ্ভুত পরমাণু-শক্তি সভ্যতার ক্রমবিকাশকে সর্বাপেক্ষা সহায়তা করবে তারই আবির্ভাবের পরিবেশ রচনার জন্য ইতালীয় বিজ্ঞানী এনরিকো ফার্মির নাম সমগ্র বিশ্বজগৎ কৃতজ্ঞ ও সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করে। গত বছর ২৮শে নভেম্বর ( ১৯৫৪ ) এই খ্যাতনামা বিজ্ঞানী পরলোকগমন করেছেন।

ফার্মির নামের সঙ্গে অঙ্গেভাবে জড়িয়ে আছে 'চেন রিএ্যাকসান' ( Chain Reaction ) আবিষ্কারের কথা। ১৯৪২ সালের ২রা ডিসেম্বর এক মনোজ্ঞ ঘরোয়া পরিবেশে কিভাবে এই 'চেন রিএ্যাকসান' জন্মগ্রহণ করে তার গল্প অনেকেই জানেন। পরমাণু-শক্তির সংরক্ষিত ব্যবহার-বিধির জন্য সুপরিকল্পিত 'চেন রিএ্যাকসানের' প্রয়োজন খুবই বেশী, তাই ফার্মিকে এই মহাশক্তি বিষয়ক অন্যতম প্রধান আবিষ্কারের কৃতিত্ব দেওয়া হয়। পরমাণুর উপর এই "চেন রিএ্যাকসান" থেকে শক্তির উদ্ভব, তা থেকে সৃষ্টি হবে প্রচণ্ড উত্তাপ, সেই উত্তাপ তরল সোডিয়ামের মারফৎ বাইরে এনে জলকে বাষ্প করার কাজে ব্যবহার করা হবে। সেই বাষ্প-শক্তি যথারীতি রূপান্তরিত করা হবে বিদ্যুৎ-শক্তিতে। রূপান্তরিত এই পরমাণু-শক্তিই ভবিষ্যতে পৃথিবীতে স্বর্গ রচনার স্বপ্নকে করবে প্রাণবন্ত।.....

এইবার ফার্মির জীবন এবং গবেষণা বিষয়ক দু'একটি কথা আলোচনা করা যাক। ১৯০১ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর তিনি রোমে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৭ বছর বয়সে একটি বৃত্তি লাভ ক'রে পিসা (Pisa) বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতে যান এবং ১৯২২ সালে ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক উপাধি লাভ করেন। এরপর তিনি গটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিখ্যাত গণিত-বিজ্ঞানী ম্যাক্স বোর্ণ-এর কাছে গবেষণা করতে। ১৯২৪ সালে তিনি ফ্লোরেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। মাত্র ২৫ বছর বয়সেই ফার্মির জীবনে আসে এক বিরাট আবিষ্কারের গৌরব। জানা ছিল একই কোয়ান্টাম সংস্থানে দুটি ইলেকট্রন অবস্থান করতে পারে না, ফার্মি এই মতবাদকে গ্যাসের অণুর গতির বিষয়েও সম্প্রসারিত করলেন। এর মাধ্যমেই রূপ গ্রহণ করলো তাঁর স্ট্যাটিস্টিক্যাল মতবাদ যা বর্তমানকালে 'ফার্মি ডেরাক স্ট্যাটিস্টিক্স্' নামে বিখ্যাত। ১৯২৬ সালে মাত্র ২৫ বছর বয়সে ফার্মি রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের থিওরেটিক্যাল ফিজিক্স-এর অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন।

রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯২৬ সালের পর ফার্মির জীবনের আর একটি গৌরবময় অধ্যায় সুরু হয়। এই সময় তিনি পরীক্ষামূলক গবেষণা আরম্ভ করেন। পরমাণু-কেন্দ্র বিষয়ক বিজ্ঞান তখন বিস্তার লাভ করছে, ফার্মিও এ বিষয়ে আকৃষ্ট হলেন। ১৯৩৩ সালে রোলিয়েট ও জুরী দম্পতি পরমাণু-কেন্দ্রকে আলফা-কণার দ্বারা আঘাত ক'রে বহু নতুন তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন। ফার্মি এই কাজ সুরু করলেন নতুন-ভাবে। তাঁর অস্ত্র হলো নিউট্রন—আলফা-কণা নয়। আলফা-কণা একটি চার্জ বহন করে কিন্তু নিউট্রন নিরপেক্ষ হওয়ার ফলে এর কার্যক্ষমতা দেখা গেল অনেক বেশী। অত্যন্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন ব'লে নিউট্রনের কিছু অসুবিধা ছিল, ফার্মি তাই এর গতিপথে মন্থর প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে 'মন্থরগামী নিউট্রন' দ্বারা পরমাণু-কেন্দ্রকে আঘাত করার ব্যবস্থা করলেন। এই মন্থরগামী নিউট্রনের দ্বারা ফার্মি আবিষ্কার করলেন বহু নতুন তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ। বিজ্ঞানী অটো হান এবং

ষ্ট্রাসমান ১৯৩৮ সালে ইউরেনিয়াম পরমাণু বিদারণের জন্য এই 'মন্থরগামী নিউট্রন' ব্যবহার করেছিলেন। নতুন তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরিচয়-বিধান এবং পরমাণু-কেন্দ্র বিদারণে 'মন্থরগামী নিউট্রন' ব্যবহারের জন্য ১৯৩৮ সালে ফার্মি বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান পদার্থ-বিজ্ঞান নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

ইতালীতে মুসোলিনীর নেতৃত্বে ফ্যাসিষ্ট শাসন সহ্য করতে না পেরে ১৯৩৯ সালে ফার্মি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞার অধ্যাপকের পদ গ্রহণ ক'রে আমেরিকা চ'লে গেলেন। এখানেই সুরু হলো তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠতম দানের প্রারম্ভিক গবেষণা। ১৯৪২ সালে যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাঁকে শিকাগোতে সরিয়ে নিলেন এবং সেখানেই ধাতু-বিষয়ক গবেষণাগারের ছদ্মনামে গুপ্তভাবে তাঁর নেতৃত্বে সুরু হলো আণবিক পাইল নির্মাণের প্রচেষ্টা। ঐ নবনির্মিত পাইল-এই ১৯৪২ সালের ২রা ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করলো 'চেন রিএ্যাকসান', উদ্ভোলিত হলো মানব-সভ্যতার জয়যাত্রার এক বিজয়-কেতন। এই সাধনার ফলই ফার্মিকে চিরকাল অমর ক'রে রাখবে।

যুগান্তর—সোমবার ১১ই অগ্রহায়ণ ১৩৫২ ( ২৮শে নভেম্বর ১৯৪৫ ) দৈনিক সংখ্যা হইতে পুনর্মুদ্রিত।

---

# প্রাচীন তাম্রলিপ্তির সংস্কৃতি

প্রাচীন তাম্রলিপ্তির সংস্কৃতি পরিচয় আনা দূরের কথা, তাম্রলিপ্তি নামটাই অনেকে শুনেন নাই। তাম্রলিপ্তি বলিতে ঠিক কোন্ স্থানটিকে বুঝাইবে, সে বিষয়ে অনেকেরই ধারণা নাই। আজকালকার মানচিত্রে 'তাম্রলিপ্তি' বলিয়া কোন স্থানের নাম নাই। অনেকেই শুনিয়া বোধ হয় বিস্মিত হইবেন যে, 'তাম্রলিপ্তি' স্থানটি পশ্চিমবঙ্গে। মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার সদর সহর তমলুক ও তৎসন্নিহিত বিস্তৃত অঞ্চলের নাম ছিল তাম্রলিপ্তি এবং বিস্তৃততর অঞ্চলের নাম ছিল তাম্রলিপ্তি রাজ্য। বর্তমান তমলুক বা প্রাচীন তাম্রলিপ্তি মেদিনীপুর জেলার পূর্ব-সীমা রূপনারায়ণ নদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। কলিকাতা হইতে তমলুকের দূরত্ব বেশী নহে। ট্রেণে ও মোটরবাসে মিলিয়া হাওড়া ষ্টেশন হইতে তমলুক যাইতে তিন ঘণ্টা সময় লাগে। হাওড়া হইতে ট্রেণযোগে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের পাঁশকুড়া ষ্টেশনে নেমে তমলুকগামী মোটরবাস ধরিতে হয়। প্রাচীনযুগে তাম্রলিপ্তি প্রাচ্যের অন্যতম প্রধান বন্দর ছিল। এখান হইতে বিজয়সিংহ সিংহল যাত্রা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী বণিকগণ এখান হইতে জাহাজে চড়িয়া চীন, মালয়, সুবর্ণদ্বীপ, যাভা প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। ইহা ভারতের ৫২ পীঠস্থানের অন্যতম।

প্রাচীন হিন্দু সাহিত্যে তাম্রলিপ্তির অনেক উল্লেখ রহিয়াছে। প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যেও তাম্রলিপ্তির প্রাচীন গরিমার কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, (খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে চীনদেশীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু ফা-হিয়ান এবং মিশরবাসী মনীষী টলেমি প্রভৃতি) বিদেশী পর্যটকদের ভূ-ভ্রমণ কাহিনীতেও তাম্রলিপ্তির নাম বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে। রাজধানী হিসাবে, বাণিজ্য-কেন্দ্র হিসাবে, শিল্প ও বিদ্যানুশীলনের পীঠস্থান হিসাবে তাম্রলিপ্তির প্রাচীন গৌরব কিরূপ ছিল তাহা ঐসব বিবরণীতে সুস্পষ্টভাবে অঙ্কন করা হইয়াছে।

প্রাচীন তাম্রলিপ্তির সংস্কৃতি সম্পর্কে আগ্রহী

ও অনুসন্ধানীদের গবেষণা-কার্যের সুবিধার্থে গত মার্চ মাসে ( ১৯৫৪ ) পূর্ব সার্কেলের পুরাতত্ত্ব বিভাগ হইতে বর্তমান তমলুক সহরের নিকটবর্তী কয়েকটি স্থানে খনন-কার্য চালানো হইয়াছিল। খননের আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল। তাহা হইতেছে পূর্ব-ভারত সম্পর্কে অধিকতর গবেষণার সূত্রপাত করা। এই ঐতিহাসিক খননের ফলে প্রাচীন তাম্রলিপ্তি সংস্কৃতির বহু লুপ্ত সম্পদ উদ্ধার সম্ভব হইয়াছে।

**খনন-কার্যের ফল—**

দুই মাস খনন-কার্য চালনার ফলে তমলুকে নিওলিথিক যুগের প্রস্তরনির্মিত নানাপ্রকার দ্রব্য মৌর্য ও শুঙ্গ যুগের[১] পোড়ামাটির নানাবিধ জিনিষ ঢালাই-করা তামার মুদ্রা বিচিত্র খোলামকুচি, মূল্যবান প্রস্তরের বিভিন্ন রকমের গুটিকা, নানাপ্রকার বহুমূল্য প্রস্তর, দেশী-বিদেশী নানাপ্রকার মৃৎপাত্র, খেলনা, জীবজন্তুর মূর্তি প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে।

গৌরবময় তাম্রলিপ্তির সংস্কৃতি বিভিন্ন যুগে কিরূপ ছিল তাহার কিছুটা পরিচয় এই সকল দ্রব্য হইতে জানা যাইবে।

একটি-মাত্র গহ্বর হইতে প্রাচীনতম যুগের কিছু পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ঐ যুগের অবসান ঘটিয়াছে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে। ইহাতে বুঝা যায় যে, সে যুগে আধপোড়া মাটির ও প্রস্তরের দ্রব্য ব্যবহৃত হইত।

তাম্রলিপ্তি সংস্কৃতির দ্বিতীয় যুগ হইতেছে মৌর্য ও শুঙ্গ যুগ—উহা খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে এই যুগে সুন্দর সুন্দর ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পোড়ামাটির দ্রব্য ও মূর্তি ব্যবহৃত হইত। মৌর্য যুগে ( অনুমান ৩২১ হইতে ২০২ খৃষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত ) যে উৎকৃষ্ট কালো-পালিশ-করা দ্রব্য ব্যবহৃত হইত তাহার সহিত ঐগুলির সাদৃশ্য আছে। শুঙ্গ যুগের শিল্পীদের বুদ্ধিমত্তার চমৎকার নিদর্শন হইতেছে ঐ সব পোড়ামাটির দ্রব্য। এ পর্যন্ত ভারতে যে-সব উৎকৃষ্ট পোড়ামাটির দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে সেগুলির তুলনায় ঐ সকল দ্রব্যের কয়েকটি কোনক্রমে হীন নহে, বরং সমতুল্য। দুইটি পরিখার মধ্যে যে কয়েকটি তামার মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে সেগুলি এই দ্বিতীয় যুগের বলিয়া অনুমান হয়।

তাম্রলিপ্তি সংস্কৃতির তৃতীয় যুগ হইতেছে প্রথম ও দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দে। এই যুগে তাম্রলিপ্তি বন্দরের মধ্য দিয়া সুদূর সাগরীয় দেশসমূহের সহিত ভারতের বাণিজ্য চলিত। এই যুগে রোম দেশীয় কতকগুলি বন্দুক, খেলার সামগ্রী হিসাবে ব্যবহৃত হইত। তমলুকে খননের সময় এই বন্দুক প্রচুর সংখ্যক পাওয়া গিয়াছে। রোম দেশীয় একটি শিলালিপিও এখানে খনন-কার্যের ফলে পাওয়া গিয়াছে।

**খৃষ্ট যুগ—**

বর্তমান তমলুক সহরের দক্ষিণাঞ্চলের দুইটি পরিখা হইতে জানা যায় যে, সেখানে খৃষ্ট যুগে লোকে বসবাস আরম্ভ করে এবং অনুমান হয়—এইযুগে তাম্রলিপ্তির দক্ষিণাঞ্চলে নূতন উপকণ্ঠ গড়িয়া উঠিয়াছিল। একটি পরিখার পাশে ঘাটযুক্ত পুষ্করিণী এবং আর একটি পরিখায় একটি কূপ ও গর্তের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এইযুগে মূল্যবান প্রস্তরের জপমালা ব্যবহৃত হইত।

তাম্রলিপ্তি সংস্কৃতির চতুর্থ যুগের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। খৃষ্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীর যে সব পোড়ামাটির দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে সেগুলিতে গুপ্ত প্রভাব রহিয়াছে। একটি চমৎকার পোড়ামাটির মূর্তির শুধু নিম্নাংশ পাওয়া গিয়াছে। ইহার গঠন-সৌকর্য মনোরম। গুপ্তযুগের পরবর্তী এখানকার ইতিহাস সন্ধান করা অসুবিধাজনক।

তাম্রলিপ্তির প্রথম যুগের গুরুত্ব নষ্ট হইয়াছে।

১। মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল অনুমান ৩২১ হইতে ২৯৭ খৃষ্টপূর্বাব্দ। ইহার পৌত্র সম্রাট অশোকের রাজত্বকাল ২৭৩-২৩২ খৃষ্টপূর্বাব্দ। শুঙ্গ বংশের প্রতিষ্ঠাতা পুষ্যমিত্র মৌর্যবংশের রাজা বৃহদ্রথকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। ৫০ খৃষ্টাব্দে কুষাণ রাজবংশের সূচনা করিয়াছিলেন। ইতি, সম্পাদক বিশ্ববাণী।

কতকগুলি পুষ্করিণী খননের ফলে সে যুগের নিদর্শনগুলি আর পাওয়া যাইতেছে না। স্থানীয় লোকেরা পুষ্করিণী খননকালে পাল ও সেন যুগের ভাস্কর্যের যে সব নিদর্শন বিক্ষিপ্তভাবে পাইতেছেন তাহা হইতে সেই অজ্ঞাত যুগের কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়।

শেষ যুগের ( অর্থাৎ অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর ) ধ্বংসাবশেষ হইতে ঐ যুগের নানা তথ্য জানা যায়। এই যুগে স্থানীয় রাজা ও লবণ-কারখানার মালিকগণ নিজেদের জন্য অনেকগুলি অট্টালিকা নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

আনন্দবাজার পত্রিকা—১৩ই কার্ত্তিক ১৩৬২

---

# মহাপুরুষ শ্রীমৎ শিবানন্দ মহারাজ

## ( শততম জন্মদিনের উৎসবে স্মৃতিপূজা। )

এই বৎসরে ( রবিবার ২৩শে পৌষ ১৩৬২—৮ই জানুয়ারী ১৯৫৬—কৃষ্ণা-একাদশী তিথি ) পূজনীয় মহাপুরুষ শ্রীমৎ শিবানন্দ মহারাজের শততম আবির্ভাব তিথি সমাগত হইয়াছে। এই পুণ্যদিনের পবিত্র উৎসবক্ষণে আমরা পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের উদ্দেশে বারবার ভক্তিভরে প্রণাম-নিবেদন এবং তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার শুভাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি।

ধর্ম্মের আদর্শকে সুকঠোর তপস্যার ফলে যাঁহারা নিজেদের মহান জীবনে জীবন্তরূপে প্রকাশ করেন—তাঁহারাই যথার্থ ধর্ম্মগুরু ও জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ। সংযম পবিত্রতা ঈশ্বরপ্রেম মানবপ্রীতি জীবসেবা প্রভৃতি গুণ তাঁহাদের শুদ্ধ ও সিদ্ধজীবনের অন্যতম বিশেষত্ব। এই সমস্ত মুক্তাত্মা পুরুষের নিকটে আসিয়া ধর্ম্মান্বেষী ভক্তিমান ও শান্তিকামী নরনারীরা ঈশ্বরলাভের ও মুক্তিপথের সঠিক সন্ধান পাইয়া কৃতার্থ হয়। জগদ্গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অন্যতম লীলা-সহচর ও সাক্ষাৎ সিদ্ধ পূজনীয় স্বামী শিবানন্দ এই প্রকার একজন শুদ্ধাত্মা ও সাধনসিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতি ব্রহ্মবিদ ও সত্যদ্রষ্টা মহামানবেরা তাঁহার গুরুভ্রাতা। এই সমস্ত মহামানবদের সহিত একত্রে দক্ষিণেশ্বরের পুণ্য তপোবনে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদপ্রান্তে স্বামী শিবানন্দ প্রথম জীবনে ( তখন তারকনাথ ) ধর্ম্মের মহতী শিক্ষা ও উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। বিবেকানন্দ ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি ব্রহ্মবিদ্ গুরুভ্রাতাদের সহিত মহাপুরুষ মহারাজ যৌবনের প্রারম্ভ হইতে বহু বৎসর কঠোর তপস্যার দ্বারা ধর্ম্মসাধনায় সাফল্য লাভ করিয়া আপনার সন্ন্যাসাশ্রমের নামকে সার্থক করিয়াছিলেন।

পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ প্রায় আশীবৎসর পার্থিব শরীরে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার সুদীর্ঘ-কালব্যাপী সাধন সিদ্ধ জীবনের সমস্ত ঘটনার বিবরণ দেওয়া এখানে সম্ভবপর নয়। অতএব আমরা তাঁহার সিদ্ধ জীবনের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলিরূপে অতি সংক্ষেপে কয়েকটি ঘটনা এখানে বিবৃত করিতেছি।

পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের পূর্ব্বাশ্রমের নাম—তারকনাথ ঘোষাল। তিনি পশ্চিমবঙ্গে ২৪ পরগণা জেলার বারাসত মহকুমায় একটি ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম রামকানাই ঘোষাল এবং মাতার নাম

বামাসুন্দরী দেবী। রামকানাই ঘোষাল মহাশয় মোক্তারীর কাজ করিতেন। তাঁহার অবস্থা বেশ স্বচ্ছল ছিল। আইনের ব্যবসা করিলেও ঘোষাল মহাশয় সাধারণ গৃহস্থ লোকেদের মত ভোগসুখে লিপ্ত ও বিষয়াসক্ত ছিলেন না। তিনি জগজ্জননী কালীর প্রতি অতিশয় ভক্তিমান ছিলেন। ঘোষাল মহাশয় প্রত্যেক দিন সকালে ও রাত্রিতে অনেকক্ষণ ধরিয়া ইষ্টনামজপ ও ইষ্টদেবীর ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন। ঘোষাল মহাশয়ের সহধর্মিণী বামাসুন্দরীও বিশেষ ধর্মপরায়ণা ও ভক্তিমতী নারী ছিলেন। তিনি একটি সৎপুত্রের কামনায় শ্রীশ্রীতারকেশ্বরের নিকট অনেক দিন প্রার্থনা ও তাঁহার পূজার্চনাদি করিয়াছিলেন। এই আন্তরিক ভক্তিপূর্ণ পূজার্চনার ফলে ১২৬১ সালের অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা-একাদশী তিথিতে ( ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে) বামাসুন্দরীর একটি সৌম্যকান্তি পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। শ্রীশ্রীতারকেশ্বরের কৃপায় এই পুত্রের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া ভক্তিমতী জননী পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন—তারকনাথ।

অন্তরের পুণ্য সংস্কারের প্রেরণায় তারকনাথ বাল্যকাল হইতে ধর্মলাভের জন্য ব্যগ্র ও উৎসুক হইয়াছিলেন। যৌবন বয়সে কোনও শাস্ত্র-পুস্তকে তিনি পড়িয়াছিলেন—ধর্মসাধনা ঠিকভাবে করিতে হইলে একজন সমাধিবান সিদ্ধযোগীর শিক্ষকরূপে তাঁহার উপদেশমত চলিয়া ধর্মজীবন গঠন করা একান্তভাবেই প্রয়োজন। এইজন্য তারক একজন যথার্থ সমাধিবান যোগীরূপী ব্রহ্মজ্ঞ সদ্‌গুরুর আশ্রয়ের জন্য কয়েক বৎসর ধরিয়া অবিরত চেষ্টা করিতেছিলেন। অবশেষে একদিন ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ( সিমুলিয়া কলিকাতা ) বাড়ীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সমাধিমগ্ন অবস্থায় দেখিতে পাইয়া তাঁহার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আধ্যাত্মিক মহিমা-সমুজ্জ্বল শান্ত সৌম্য ও আনন্দময় মূর্তি দেখিয়া তারকনাথ মুগ্ধ ও বিস্মিত চিত্তে তাঁহার প্রতি একান্তভাবে আকৃষ্ট ও অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন।

এই ঘটনার কয়েকমাস পরে তারকনাথ একদিন দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া (১৮৮২ সালে) শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব প্রথম দেখিয়াই তারকনাথের প্রতি স্নেহপরায়ণ হইয়াছিলেন। ধর্ম-সম্বন্ধে কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরে ঠাকুর তারকনাথকে আবার তাঁহার কাছে আসিতে বলিয়াছিলেন। রামকানাই ঘোষাল মহাশয় এই ঘটনার কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই বালী রামমণির জমিদারীর ব্যাপারে মামলা-মোকদ্দমার তদারক করিতেন। সেজন্য মাঝে-মাঝে তাঁহাকে তখন দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীতে যাইতে হইত। এই সূত্রে ঘোষাল মহাশয়ের সহিত পরমহংসদেবের প্রীতি ও বন্ধুত্বের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। তারকনাথ রামকানাই বাবুর পুত্র জানিতে পারিয়া পরমহংসদেবের স্নেহ তারকনাথের সহিত আরও গভীর হইয়া পড়িল। ঠাকুরের স্নেহ ও করুণা ছিল যেমন অযাচিত ও অহেতুক, তেমনি অবিশ্রান্ত ও সুগভীর। তিনি ছিলেন স্নেহ-প্রেম-করুণার মূর্তি। একদিকে অতল গভীর আধ্যাত্মিকতা আবার অপরদিকে এমন অগাধ গভীর স্নেহময়তার সমাবেশ একাধারে ঠাকুরের মধ্যে দেখিয়া তারকনাথ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন, পরমহংসদেব শুধু একজন উচ্চশ্রেণীর সিদ্ধ মহাযোগী এবং আদর্শগুরু নহেন—তিনি মানবরূপ-ধারী সাক্ষাৎ জগজ্জননী।

ঘটনাচক্রে তারককে বিবাহ করিতে হইয়াছিল। বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ায় জন্য ধর্মসাধনের ক্ষতি ও বাধা হইবে—এই দুশ্চিন্তায় তারক অত্যন্ত উদ্বিগ্ন থাকিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই সময়ে (১৮৮৩) একদিন তারকনাথকে অভয় ও আশীর্বাদ করায় তারকের মন হইতে সেই উদ্বেগ ও আশঙ্কা দূর হইয়া গেল। ক্রমেই সংসার-বৈরাগ্যের ভাব তারকের মধ্যে প্রবল হইতে লাগিল। তিনি গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার ধর্মপ্রাণা পত্নী ইহাতে বাধা দিলেন না। পিতাও তাঁহাকে এই সঙ্কল্পে সিদ্ধ হইবার জন্য প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। কয়েক মাস পূর্ব্বেই তিনি অফিসের

চাকরী ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। যুগাবতাররূপী পরমারাধ্য গুরুদেবের আশীর্ব্বাদের ফলে তারক এখন হইতে নিশ্চিন্ত হইয়া আপনার মনে অবিশ্রান্তভাবে সাধনা করিয়া যাইতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে জীবনযাপন করিতেন। কখন সিমুলিয়ায় রামচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে একটি ঘরে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে জপধ্যানে দিনে ও রাত্রে কয়েকঘণ্টা তাঁহার কাটিয়া যাইত। আবার কখনও বা রামচন্দ্র দত্তের কাঁকুড়গাছির বাগানে (এখনকার নাম যোগোদ্যান) অথবা কালীঘাটে কিম্বা বিভন-স্কোয়ারে সারারাত্রি ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তিনি কাটাইতেন। সারাদিনের মধ্যে তারক তখন মাত্র একবার আহার করিতেন। সে সময়ে পরণে জামা জুতা থাকিত না। একখানি কাপড় ও চাদর মাত্র পরিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তারকের এই বৈরাগ্য ও সাধননিষ্ঠা দেখিয়া অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেন ও উৎসাহ দিতেন। এইসব সাধনভজন ছাড়াও তারক মাঝেমাঝে দক্ষিণেশ্বরে গুরুভ্রাতাদের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে থাকিয়া তাঁহার উপদেশ শুনিতেন। সময়ে সময়ে তিনি গুরুর সেবা ও পরিচর্য্যা করিতেন।

নরেন্দ্রনাথ (বিবেকানন্দ) রাখালচন্দ্র ( ব্রহ্মানন্দ ) বাবুরাম ( প্রেমানন্দ ) কালীপ্রসাদ ( অভেদানন্দ ) প্রভৃতি গুরুভ্রাতাদের সহিত তারকনাথের একান্ত প্রেম প্রীতি ও স্নেহের সম্বন্ধ ছিল। বয়সে তারক ঐসব গুরুভ্রাতাদের প্রায় সকলের অপেক্ষা বড় ছিলেন। এজন্য নরেন্দ্র রাখাল বাবুরাম প্রভৃতি গুরুভ্রাতারা তারককে 'তারকদাদা' বলিয়া ডাকিতেন। ঐ সময়ে একজন উচ্চশ্রেণীর সাধক প্রকৃতির যুবক প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে যাওয়া-আসা করিতেন। তারকের সহিত ইঁহার ঐ সময়ে বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ এই সাধক প্রকৃতির যুবকটির সহিত তারক ও অন্যান্য শিষ্যদের বেশী মেলামেশা করিতে বিশেষভাবে বারণ করিয়া দিয়াছিলেন। কারণ, যোগদৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিয়াছিলেন —ঐ যুবক ভিন্ন ঘরের সাধক এবং শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মগোষ্ঠির মধ্যে অন্তর্গত নহেন। সেই হইতে তারক ঐ ব্যক্তির সহিত আর তেমন গভীর-ভাবে মেলামেশা করিতেন না।

দক্ষিণেশ্বর হইতে ১৮৮৫ সালে মে মাসে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব চিকিৎসা করাইবার জন্য কলিকাতায় চলিয়া আসেন। কলিকাতায় আসিয়া ঠাকুর প্রথমে কয়েকমাস শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটে একটি বাড়ীতে ভক্তদের সহিত থাকিতেন। পরে কাশীপুরে গোপালচন্দ্র ঘোষের প্রশস্ত ও মুক্তবায়ু পূর্ণ বাগানবাড়ীতে তাঁহাকে শিষ্যবৃন্দ ও ভক্তগণ লইয়া গিয়াছিলেন। এই কাশীপুর বাগানে রামকৃষ্ণদেব ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ১৬ই আগষ্ট রবিবার তারিখে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া নিত্য-চিন্ময়-বিগ্রহ ধারণ করিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে এখানে রাখাল কালীপ্রসাদ বাবুরাম লাটু শরৎ শশী যোগেন প্রভৃতি যুবক শিষ্যেরা পালাক্রমে ঠাকুরের সেবাশুশ্রূষা করিতেন। ঠাকুরের সেবা-পরিচর্য্যার উপলক্ষে এখন তাঁহার শিষ্যেরা কাশীপুর বাগানে উপস্থা শাস্ত্রবিচার ধর্ম্মপ্রসঙ্গ প্রভৃতিতেও মগ্ন ছিলেন। এইখান হইতেই রামকৃষ্ণদেবের ভাবী সন্ন্যাসী-সঙ্ঘের উৎপত্তির সূচনা হইয়াছিল। এই কাশীপুর উদ্যানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীমা সারদাদেবী এবং নরেন্দ্র রাখাল কালীপ্রসাদ যোগীন শরৎ প্রভৃতি তাঁহাদের সর্ব্বত্যাগী সন্তানদের আগমনে এবং তপস্যার ও অনুভূতিময় সমবেত উপস্থিতিতে ক্রমেই একটি পবিত্র তপোবনে পরিণত হইল। এখানেই নরেন্দ্রনাথ প্রথম নির্ব্বিকল্প সমাধিতে অদ্বৈতভাবের চরম অনুভূতি লাভ করিয়াছিলেন। এইখানেই শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য যুবক শিষ্যের ধর্ম্মসাধনায় বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে করিতে সিদ্ধিলাভের দিকে যাইতেছিলেন। যুবক-তপস্বী তারকেরও এইসময়ে ধর্ম্মসাধনার বিশেষ উন্নতির অনেক লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছিল। 'শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে দিব্যভাবে' উক্ত আছে "ধর্ম্মলাভের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুলতার ফলে ( এই সময়ে একদিন ) তারকের হৃদয়গ্রন্থি উন্মোচিত হইয়া গিয়াছিল।

কাশীপুরের বাগানে ঠাকুর রামকৃষ্ণের অবস্থান-কালে তারকনাথ ও কালীপ্রসাদকে সঙ্গে লইয়া নরেন্দ্র-নাথ একবার গয়াধামে গিয়াছিলেন। সেখানে বুদ্ধ-গয়ায় এই তিনজন গুরুভ্রাতা কয়েকদিন পাশাপাশি বসিয়া বুদ্ধমন্দিরের কাছেই নির্জনে ধ্যান করিতেন। এখানে একদিন সন্ধ্যাবেলায় নরেন্দ্রনাথ দেখিয়া-ছিলেন, বুদ্ধদেবের মূর্তি হইতে একটি জ্যোতির প্রবাহ বাহির হইয়া তারকনাথের পাশ দিয়া চলিয়া গেল। যাহা হউক, যথাসময়ে তাঁহারা কাশীপুরে ঠাকুরের কাছে ফিরিয়া আসিলেন। ঠাকুর তখন নরেন্দ্র কালী তারক রাখাল শরৎ যোগীন প্রভৃতি শিষ্যদের বলিয়াছিলেন, "চার খুঁট ঘুরে আয়—কোথাও কিছু পাবি না—যা কিছু সব এখানে।" ১২৯২ সালের পৌষ সংক্রান্তির সময়ে সন্ন্যাসাশ্রমের অধিকারী মনোনীত করিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁহার এগারো জন শিষ্যকে স্বহস্তে গৈরিক বস্ত্র দান করিয়াছিলেন। এই এগারোজনের নাম—নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাম, যোগেন, নিরঞ্জন, কালীপ্রসাদ, শরৎ, শশী, লাটু তারক ও বুড়োগোপাল। এই এগারো জন ছাড়াও ঠাকুর রামকৃষ্ণের আরও কয়েকজন সন্ন্যাসী শিষ্য ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ হরি মহারাজের ( স্বামী তুরীয়ানন্দের ) নাম সর্বথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ঠাকুরের পার্থিব দেহত্যাগের পরে নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে তাঁহার সন্ন্যাসী-শিষ্যেরা বরাহনগরের একটি পুরাতন ও জীর্ণ বাড়ীতে একত্রে থাকিয়া শাসন-তপস্যা করিতেন। এইখানেই নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ঠাকুরের যুবকশিষ্যেরা যথাবিহিত অনুষ্ঠানের দ্বারা সন্ন্যাসব্রত লইয়াছিলেন। সন্ন্যাসাশ্রমে তারকনাথের নাম হইয়াছিল—স্বামী শিবানন্দ। তারকনাথ স্বভাবতঃই শিবভাবে একান্ত ধ্যাননিষ্ঠ ও সদানন্দ মহাত্মা ছিলেন বলিয়া স্বামিজী তাঁহাকে সন্ন্যাসাশ্রমে এই নাম দিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে কোনও এক বিশেষ ঘটনার উপলক্ষে স্বামিজী আনন্দিত হইয়া তারকনাথকে 'মহাপুরুষ' নামে প্রশস্তির সহিত অভিহিত করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে স্বামী শিবানন্দজীকে "মহাপুরুষ মহারাজ" নামে উল্লেখ করা হয়।

মহাপুরুষ মহারাজ বরাহনগর মঠ হইতে বাহির হইয়া কাশীধাম বৃন্দাবন এলাহাবাদ (প্রয়াগ) উত্তরভারতের এবং আরও অন্য কয়েকটি তীর্থস্থানে তপস্যা ও পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ১৮৮৮ র শেষ হইতে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ এই কয়েক বৎসর আলমোড়া প্রভৃতি হিমালয়ের কোন কোন স্থানে তিনি কঠোর তপস্যায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই সময়ে কঠোর তপস্যায় তিনি অধিকাংশ সময়েই একাকী থাকিতেন। এই সময়ে স্বামী শিবানন্দের কতদিন কতরাত্রি অরণ্যের তরুতলে ও পর্বতগুহায় একাকী কাটিয়া গিয়াছে। কখনও স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বামী অখণ্ডানন্দ অথবা অন্য কোনও গুরুভ্রাতার সহিত ঘটনাক্রমে তখন তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়া যাইত। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে স্বামী শিবানন্দ তপস্যা ও তীর্থভ্রমণের উদ্দেশে দক্ষিণ ভারতে ছিলেন। এই সময়ে আমেরিকা যুক্তরাজ্যে চিকাগো ধর্মমহাসভায় হিন্দু-ধর্মের স্বামী বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক দিগ্বিজয়ের সুসংবাদ ভারতবর্ষে আসিয়া পড়িল। মাদ্রাজ প্রদেশের নানাস্থানে অগণ্য লোক তখন স্বামিজীর প্রশংসা ও অভ্যর্থনে উৎসাহে মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের শেষ দিকে স্বামিজীর অনুরোধে স্বামী শিবানন্দকে হিন্দুধর্ম ও বেদান্ত প্রচারের জন্য সিংহলে (কলম্বো) যাইতে হইয়াছিল। কলম্বো ও অনুরাধাপুরে কয়েকমাস তিনি সাফল্যের সহিত প্রচার-কার্য করিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে কয়েকমাস তাঁহার প্রচার-কার্যে স্বামিজী অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। অতঃপর বেদান্ত প্রচারের উদ্দেশ্যে একটি আশ্রম স্থাপনের জন্য স্বামিজীর নির্দেশে মহাপুরুষজী কাশীধামে গমন করেন। এখানে রামপুরায় একটি ছোটঘর ভাড়া লইয়া তিনি প্রথমে আশ্রমের পত্তন করেন। যেদিন ঐ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাদিবস ঠিক সেইদিনই ( সোমবার ৪ঠা জুলাই ১৯০২ ) বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দ দেহত্যাগ

করিয়াছিলেন। সজ্ঞানেতার মহাপ্রয়াণে মহাপুরুষজী অত্যন্ত ব্যথিত হইলেও ধীরভাবে তাঁহার নির্দেশমত কাশীধামে বেদান্ত প্রচার ও সাধনার আশ্রম গঠনের কার্য্য তিনি করিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসর পরে তাঁহাকে বিশেষ কাজে বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। সেই ক্ষুদ্র আশ্রমই এখন কাশীধামে সুপরিচিত "শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে" পরিণত হইয়াছে।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দের দেহত্যাগের পরে পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের অনুরোধে মহাপুরুষজীকে বেলুড় মঠের অধ্যক্ষতা করিবার জন্য সেখানে থাকিতে হইল। এই সময় হইতে প্রায়ই প্রতিদিনই বহুভক্ত নরনারী তাঁহার কাছে আসিয়া ধর্ম্মের কথা ও ঠাকুরের প্রসঙ্গ শুনিয়া শান্তি ও আনন্দ পাইতেন। ১৯২২ সালে ১০ই এপ্রিল সোমবার রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সর্ব্বপ্রথম নির্ব্বাচিত প্রেসিডেন্ট পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ ( রাজা মহারাজ ) মহাসমাধি লাভ করেন। শ্রীমৎ রাজা মহারাজের মহাপ্রয়াণের পরে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের দ্বারা মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচনী সভা হইয়াছিল। সেই নির্ব্বাচনী সভায় মহাপুরুষজী রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট ও প্রধানাচার্য্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এই সময় হইতে তাঁহার জীবনে গুরুভাবের সম্পূর্ণ বিকাশ দেখা দিতে আরম্ভ করিল। ১৯২২ এপ্রিল হইতে দেহান্ত কাল ( ১৯৩৪ ফেব্রুয়ারী ) পর্য্যন্ত মহাপুরুষ মহারাজ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সঙ্ঘগুরুর পবিত্র আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তখন শত শত ব্যক্তি বেলুড়মঠে প্রত্যহ তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য আসিতেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সভাপতিত্বের অধ্যক্ষপদে থাকিলেও মহাপুরুষজী ইহার পদমর্য্যাদা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ও নিরাসক্ত ছিলেন। এসম্বন্ধে তিনি আজীবন সঙ্ঘের সর্ব্বপ্রথম অধ্যক্ষ ও স্বধামপ্রত্যাগত ব্রহ্মবিদ্বরেণ্য সেই নিত্যসিদ্ধপুরুষের একান্ত অনুগামী ও প্রতিনিধি বলিয়া নিজেকে মনে করিতেন। বহু শত ব্যক্তি তাঁহার কাছে ঐসময়ে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করিয়াছেন। মহাপুরুষ মহারাজ স্বভাবতঃই অত্যন্ত শিশু-বৎসল ছিলেন। শিশুবৃন্দের ( গৃহস্থ বা সন্ন্যাসী, ধনী বা দরিদ্র, পুরুষ অথবা নারী ) প্রতি তাঁহার সহানুভূতি স্নেহরাশি ও শুভেচ্ছা অবিশ্রান্তভাবে প্রবাহিত হইত। শিশু ও ভক্তেরা মহাপুরুষ মহারাজের স্নেহকরুণাময় তপস্যাদীপ্ত প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া সংসারের দুঃখ তাপ জ্বালা ভুলিয়া যাইত। তাঁহার আশীর্ব্বাণীবাণী ও অভয় শত শত তাপিত ব্যথিত নরনারীর প্রাণে শান্তি ও সান্ত্বনার সুধা বর্ষণ করিত। সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ শিশুবৃন্দ ছাড়াও সমাগত অনেক ব্যক্তির ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রশ্ন ও সমস্যা তিনি অতিশয় স্নেহ যত্নের সহিত মীমাংসা করিয়া দিতেন। তাঁহার মুখ হইতে ধর্ম্মসম্বন্ধে বাণী শুনিয়া অনেক ব্যক্তির সংশয় ও দুর্ভাবনা দূর হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা সাধনার পথে অগ্রসর হইবার শক্তি ও নির্দ্দেশ পাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন।

বহু শত ব্যক্তি সৌভাগ্যবশতঃ মহাপুরুষ মহারাজের নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ এই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের মনে 'গুরু' বলিয়া কখনও কোনই অভিমান ছিল না। তিনি দেখিয়াছিলেন—সকল গুরুর যিনি অন্তর্য্যামী চিরন্তন গুরু—সেই জ্ঞানস্বরূপই তাঁহার দেহমন অবলম্বনে সমাগত নরনারীকে মন্ত্রদীক্ষা ও উপদেশ দিতেছেন। এ সম্বন্ধে তিনি বারবার বলিয়াছেন—"বাবা! আমি তো গুরু নয়, দীক্ষা তো আমি দিই না। দীক্ষা দেন স্বয়ং ঠাকুর। তিনিই গুরু। আমরা উপলক্ষ্য মাত্র।" কাশীধামে অদ্বৈতাশ্রমে শেষবারে অবস্থানকালেও কয়েকজন ব্যক্তিকে দীক্ষা দানের শেষে মহাপুরুষ মহারাজ বলিয়াছিলেন, "বাবা! এখানে আর গুরু কে? এখানে গুরু স্বয়ং বাবা বিশ্বনাথ। তিনিই এর ( নিজের শরীর দেখাইয়া ) মধ্যে থেকে তোমাদের দীক্ষা দিয়েছেন।" তারপর বারবার বিশ্বনাথের উদ্দেশে জোড়হাতে মহাপুরুষ মহারাজ ভক্তিভরে প্রণাম করিতে লাগিলেন। বিশ্বেশ্বর

বিশ্বনাথের প্রতি ভক্তির আবেশে তাঁহার শান্ত গম্ভীর মুখে একটি পরম পবিত্র দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল।

১৯২৮ সাল হইতে মহাপুরুষ মহারাজের শরীর বার্ধক্যজনিত প্রায়ই অসুস্থ থাকিত। তাহা সত্ত্বেও তিনি বেলুড় মঠে সমাগত ব্যক্তিদের কাহাকেও ফিরাইয়া দিতেন না। তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর ও সাধন সম্বন্ধে তিনি নানাভাবে উপায় বলিয়া দিতেন। দেহের অসুস্থতা সত্ত্বেও অসংখ্য দর্শনার্থীদের সহিত তিনি প্রত্যহ সহাস্য আলাপ করিতেন। কিন্তু এই সময় হইতে তিনি স্বধামে প্রত্যাগমনের জন্য প্রায়ই উন্মুখ হইয়া থাকিতেন। স্বামিজী, রাজা-মহারাজ, হরিমহারাজ, শরৎ-মহারাজ প্রভৃতি প্রিয় গুরু-ভ্রাতারা একে একে ইতিপূর্বেই নিত্যধামে প্রত্যাগত হইয়াছেন। তাঁহাদের সহিত কবে আবার তাঁহার পুনর্মিলন হইবে—কবে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার তাঁহাকে দিব্যধামে আপনার চিরসান্নিধ্যে ডাকিয়া লইবেন—সেই পরম শুভ চরম মুহূর্তের জন্য মহাপুরুষ মহারাজ নীরবে প্রতীক্ষা করিতেন। অবশেষে সেই বিশেষ চিহ্নিত ক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হইল। ১৯৩৪ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণকালে বেলুড় মঠে পুণ্যতীর্থে পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ নশ্বর দেহত্যাগ করিয়া জগদ্-গুরুর দিব্যচিন্ময়ধামে প্রত্যাগত হইলেন। এই পৃথিবীতে শত শত অনুরক্ত ভক্ত ও শিষ্যদের অন্তরে জাগ্রত হইয়া রহিল তাঁহার সেই তপস্যালিপ্ত জীবনের সুপবিত্র স্মৃতিরাশি। ওঁ শিবমস্তু।

---

# শ্রীশ্রীমায়ের স্মরণে

## শ্রীশোভা ছাই

১২৬০ সালে ৮ই পৌষ বৃহস্পতিবার এক রমণীয় সন্ধ্যায় যখন ঘরে ঘরে পল্লীবধূরা সন্ধ্যার আরাধনায় ব্যাপৃত, শঙ্খনিনাদে যখন চারিদিক প্রতিধ্বনিত, ঠিক সেই শুভক্ষণে শ্রীশ্রীসারদামণি জগৎজননী-জগদ্ধাত্রী জয়রামবাটীতে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের পর্ণকুটিরে জন্মগ্রহণ করলেন।

মাত্র পাঁচ বৎসর পর্যন্ত মা খেলা-ধূলায় কাটিয়েছেন। ছয় বৎসর বয়সেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত তাঁর বিবাহ হয়। ক্ষুদ্রবালিকা মা-সারদা, কিন্তু অসাধারণ বুদ্ধি তাঁর।

বাসরে প্রদীপের স্তিমিত আলোকে বালিকা বধূকে সতীর দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ ক'রে কণ্ঠাজড়িত স্বরে বললেন ঠাকুর, "রাত হয়েছে, শুয়ে পড়"। তারপর একটু ইতস্তত ক'রে ঠাকুর আবার বললেন "দ্যাখো গো নারকেল তেলের গন্ধ আমার সয় না, আমি মেঝেতে শুচ্ছি"।

কচি মেয়ে মা-সারদা তখনি বললেন তৎক্ষণাৎ "তুমি শোও এখানে," তারপরে তক্তাপোষের বিছানা দেখিয়ে দিয়ে শ্রীমা নেমে এলেন মাটীতে। ঘরের কোণে একটা ছেঁড়া চ্যাটাই ছিল সেইটী পেতে শ্রীমা শুয়ে পড়লেন।

এই বাসর-রাত থেকে সুরু হলো শ্রীমায়ের ব্রহ্মচর্য্য। শুধু ব্রহ্মচর্য্য নয়, সুরু হলো তাঁর কঠোর জীবন, কত ভাবনা, কত চিন্তা, কত ব্যাকুলতার মধ্য দিয়ে তাঁকে চলতে হয়েছে। কত বেদনা তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে আজীবন। সাংসারিক জীবন বিরোধ, তর্ক, কলহ, ও উৎপাতের ভিতর দিয়ে তাঁকে দিনের পর দিন কাটাতে হয়েছে। বহু ঝড়, ঝঞ্ঝা তাঁর উপর দিয়ে চ'লে গেছে, কিন্তু কিছুতেই তিনি অধৈর্য্য হন নি। ধীর স্থির অবিচলিত চিত্তে জীবনের সমস্ত ঝড়-ঝাপটা সহ্য ক'রে সংসারে সবাইকে শ্রীমা দেখিয়ে গেছেন, "যেই সয় সেই রয়।"

পিতৃগৃহে শ্রীমা সারাদিন কর্মব্যস্ত থাকতেন, উদয়াস্ত পরিশ্রম, ছোট ছোট ভাই বোনদের এবং গৃহপালিত পশুর সেবা, গৃহকর্মে মাকে সাহায্য, মাঠে দুপুরের খাবার নিয়ে যাওয়া, এমনকি গরুর জন্যে ঘাস-খড় কাটা সবই অম্লান বদনে করেছেন শ্রীমা। মা বাপ গুরুজনের আদেশ তাঁর শিরোধার্য। অকুণ্ঠ চিত্তে ভক্তি শ্রদ্ধা তিনি করতেন তাঁদের। বাধ্যতা ছিল তাঁর বিশেষ গুণ।

শ্বশুর-বাড়ীতে বধূরূপে শ্রীমায়ের সেই একই মূর্তি। শাশুড়ীর সেবা আত্মীয়-স্বজনকে আপনার ক'রে নেওয়া, সকলের সঙ্গে মিলে-মিশে থাকা, ছোটদের আবদার-রাখা—এক কথায় নিজেকে সকলের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছেন তিনি।

আবার সহধর্মিণীরূপে দেখি শ্রীমাকে সার্থক সহধর্মিণী।

"ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু
মম চিত্তমনুচিত্তং তে অস্তু।
মম বাচমেকমনা জুষস্ব
বৃহস্পতিস্ত্বা নিযুনক্তু মহ্যম্।"

অর্থাৎ—'আমার ব্রতে তোমার হৃদয় সমাহিত হউক, তোমার চিত্ত আমার চিত্তের অনুকূল হউক, তুমি একান্ত মনে আমার আজ্ঞানুবর্তী হও, দেবগুরু বৃহস্পতি তোমাকে আমার সহিত যুক্ত করুন।'

বিবাহের এই মন্ত্র শ্রীশ্রীমায়ের জীবনে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। "আমার ব্রতে তোমার হৃদয় সমাহিত হউক।" নানা রকম শুভবে ঠাকুরের অমঙ্গল-চিন্তায় শঙ্কিতা হয়ে শ্রীশ্রীমা যখন ব্যাকুল হৃদয়ে দক্ষিণেশ্বরে ছুটে এলেন, ঠাকুর তাঁকে দেখেই জিজ্ঞেস করলেন "কি গো! আমায় কি সংসারপথে টেনে নিতে এসেচো?"

আমাদের জগজ্জননী মা বললেন, "না, তোমায় সংসার-পথে টানতে আসিনি। তোমার ধর্মপথের সহায় হতে এসেছি।" সত্যই এই উক্তি আদর্শ সহধর্মিণীর যথার্থ উক্তর—এবং এই উক্তর শুধু শ্রীমার মুখের কথা নয়। এর প্রতিটি অক্ষর পালন করেছেন শ্রীমা আজীবন। দিনের পর দিন মাসের পর মাস নহবতের ঐ এক-কালি ছোট্ট ঘরে আবদ্ধ থেকেছেন উদয়াস্ত। ঐটুকু ছোট জায়গায় রান্না, খাওয়া, শোওয়া, বসা সব। শুধু কি সেসব নিজের প্রয়োজনে? ওরই মধ্যে ঠাকুরের প্রিয় সন্তানদের, প্রিয় ভক্তদের রান্না করে দিয়েছেন, পান সেজে দিয়েছেন ডিবে ভ'রে। প্রত্যেকটি কাজ করেছেন পরম সন্তোষের সঙ্গে। সেবা করেছেন তাঁর স্বামীরূপী পরমদেবতার একাগ্রচিত্তে। নিজেকে উজাড় ক'রে ঢেলে দিয়েছেন স্বামীর পদতলে—তপস্বিনী সতী। ভারতের মূলমন্ত্রের মূর্তি-ভা বাণী শ্রীমা—যথার্থ সহধর্মিণী। মাসের পর মাস তিনি কাটিয়েছেন স্বামীর সঙ্গে। কিন্তু সেই বিবাহিত জীবনে এই দেব-দম্পতীর একত্র বসবাসের মধ্যে ছিল অপার্থিব সৌন্দর্য পবিত্রতা ও মহিমা। সংসারের কুশ্রীতা মলিনতা তুচ্ছতা ও ভাবলা সেখানে ঘোটেই ছিল না। স্বামীর ধর্মপথের সহায় তিনি। অতএব স্বামীর মনে কোনরূপ বিকার আসতে দেন নি। পবিত্রতা-স্বরূপিণী উনার মতন শুচিশুভ্র কল্যাণময় মূর্তিতে শ্রীমা তাঁর স্বামীর ধর্মসাধনার হোমাগ্নিকে চিরপ্রজ্বলিত রেখে গেছেন।

শুধু একদিক থেকে নয়, সর্ব দিকেই তিনি ঠাকুরের ত্যাগ বৈরাগ্য বাঁচিয়ে চলতেন। ঠাকুরের সংসার শিবের সংসার। কোন দিনই সেখানে স্বচ্ছলতা ছিলনা। কোন রকমে সেই সংসার চ'লে যেত। ধনী মাড়োয়ারী দশ হাজার টাকা নিয়ে যখন ঠাকুরের সেবায় দিতে এলেন, ঠাকুর নিলেন না। তখন মাড়োয়ারী মা'কে ঐ টাকা গ্রহণের জন্যে মিনতি করতে লাগলেন। মা দৃঢ় চিত্তে ঐ টাকা নিতে অস্বীকার করলেন। ঠাকুর যেখানে অনিচ্ছুক, সেখানে তিনি কি সেই দান গ্রহণ করতে পারেন?

জন্ম থেকে মহাসমাধি পর্যন্ত নানা রকম বিপর্যয়ের চিত্তর দিয়ে শ্রীমাকে চলতে হয়েছে। জগতের সকল প্রকার উৎপাত, সকল রকম দুঃখ তিনি শান্ত সমাহিত চিত্তে পরম সহিষ্ণুতার সহিত সহ্য ক'রে গেছেন। রোগ, শোক, দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা,

পারেনি। সব সময়ে সকল অবস্থাতেই তাঁর ঠোঁটের কোণে চির মধুর সেই স্নিগ্ধ হাসিটী লেগেই থাকতো।

আমাদের শ্রীমা ছিলেন সত্যসত্যই সর্বতোভাবে পরমকল্যাণ-স্বরূপিণী। তিনি স্নেহ মমতা করুণা ক্ষমা ও ক্ষেমের জীবন্ত মূর্তি। সত্যই তিনি কন্যারূপে অতুলনীয়া, ভগ্নীরূপে অদ্বিতীয়া, বন্ধুরূপে অসামান্যা, আর মাতৃরূপে চির অনন্যা। নারী-চরিত্রের সকল দিক ও সমস্ত গুণ শ্রীমায়ের জীবনে এক অপার্থিব সৌন্দর্যে শাশ্বত পতদলের শুভ্র সুষমায় সম্পূর্ণরূপে ফুটে উঠেছিল।

জয়রামবাটীতে ভক্ত-সন্তানদের সেবার জন্য শ্রীমা কিনা করেছেন? ঘাটে ঘাটে ঘুরে খাদ্য-সংগ্রহ রান্না, পরিবেশন, আসন বিছানো, এমনকি সন্তানদের উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করতেও দ্বিধাবোধ করেন নি। তাঁদের শোয়া-বসা-ঘুমানোর সব ব্যবস্থা শ্রীমা নিজে থেকে কোরে তবে নিশ্চিন্ত হতেন। একবার কোন একজন ভক্ত কতকগুলি কালো কুচকুচে কুচুপাক —পুকুর থেকে তুলে নিয়ে এলেন রান্নার জন্যে। কচু শাকগুলি এত কুটকুটে যে, তাঁর পিঠ ফুলে গেল। মা নিজে তাঁর পিঠে ভালভাবে তেল মালিশ ক'রে বললেন "একটু তেলটা শুকুক, তারপরে বাবা চান কোরো।" শুধু তাই নয়। সেই কচু-শাকগুলি তিনবার তেঁতুল জলে সিদ্ধ ক'রে জল ফেলে রান্নাও ক'রে দিলেন। কি জয়রামবাটীতে, কি উদ্বোধনে সন্তানদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তিনি প্রখর দৃষ্টি রাখতেন। তাঁদের অসুখ-বিসুখে নিজহাতে তিনি শুশ্রূষা করতেন। সংসারে যাদের কেউ কখনো দেখতে পাবে না, সেইসব দীনহীন পাপীতাপী শত-শত নরনারীকে তিনি সস্নেহে বুকে টেনে নিয়েছেন।

পাপী-তাপী সকল লোককেই শ্রীমা অপার কৃপায় শ্রীচরণে স্থান দিয়েছেন। কখনও কোন ভেদ বিচার করেননি। তাঁর নিজের শ্রীমুখের বাণী "আমি সৎ-এরও মা আর অসৎ-এরও মা। সতের মা সবাই হতে পারে। অসতের মা কজন হয়?" তাঁর শ্রীমুখের ঐ সান্ত্বনা এবং আশ্বাসের বাণীতে আমাদের চিত্ত পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। মায়ের কাছে আমাদের এই প্রার্থনা—"মা! তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ এবং তোমার মহাবাণী স্মরণ ক'রে, তোমার স্নেহশীর্ষের অবিশ্রান্ত ধারায় আমাদের জীবন যেন শান্তি ও মুক্তিলাভ করে।" তোমার দিকে সর্বদা দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে যেন এই সংসার-মরুতে আমরা চলতে পারি।

---

# পদাবলীর-পাঠক

**শ্রীঅনিলকুমার হালদার**

বৈষ্ণব-পদাবলী ভক্তি-সাধনার-রাজপথে প্রেমের রথযাত্রা-সমারোহ। সেই রাজপথের দুইপার্শ্বে ভক্ত বিচিত্র নরনারীর ভিড় এবং সেই পথের উপর প্রেমের রথচক্র, রথে যুগল প্রেম-মূর্তি—রাধা ও কৃষ্ণ। ভক্তের ভাব-রজ্জুর আকর্ষণে তাহা আপনিই চলিয়াছে। রথ অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিল। সহসা এক উন্মত্ত প্রেমিক সেই চলন্ত রথ হইতে মূর্তি দুইটি চুরি করিয়া লইয়া কোথায় লুকাইল, কেহ দেখিল না—শুধু পথের উপরে 'হা কৃষ্ণ' বলিয়া আকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল। চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিল। সেই নয়নবিগলিত অশ্রুধারায় নদীয়া ডুবিল, জগৎ প্লাবিত হইল, ভক্তহৃদয়ে বান্ ডাকিল।

বৈষ্ণব-পদকর্তা সেই আত্মহারা প্রেমিকের একবিন্দু অশ্রু ও তাঁহার নিজের একবিন্দু অশ্রু সযত্নে পদ-মঞ্জুষায় সঞ্চয় করিয়া রাখিলেন। এ' গ্রন্থ হইতে

ও' প্রান্ত পর্যন্ত সেই ক্রন্দন ধ্বনিত হইতেছে। তাহারই মীড়-মূর্ছনায় পর্দে পর্দে দুঃখের রাগরক্ত অনুভূতি উদ্বেল ও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। সেই বিচিত্র স্রোতধারার মৃদু কলতান তাদের ঐশীর সুরের মত শোনা যাইতেছে। তাহাতে নির্বেদের অনুলেপ ও আকুতির একাগ্রতা। বৈষ্ণব-পদকর্তা তাহারই বাঁকে দাঁড়াইয়া যেন এক স্বপ্নলব্ধ বৃত্তান্ত রচনা করিয়াছেন। তাই পদাবলী-রচনা-কর্মটিতে তাঁহার স্বকৃত-প্রয়াস বেশী নাই, সজ্ঞান প্রয়াস করিতেই হয় নাই। স্বপ্ন-প্রভাবে তিনি একদূর আবিষ্ট ও অভিভূত যেন আড়ষ্টের মতো সবকিছুই করিয়া চলিয়াছেন, অথচ কোন কিছুতেই নাই। এই 'নাই' অথচ 'আছি' অর্থাৎ অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের সমন্বয়ের ইতিহাসই ইহার জন্মের বৃত্তান্ত। ইহাতে মিষ্টিসিজ্‌মের কথা আসিয়া পড়ে বটে, কিন্তু তাহাও প্রাসঙ্গিক।

কিন্তু এখনও আমরা মূল কথা বলি নাই। সৃষ্টির উপভোক্তার কথা বলিতে গিয়া সৃষ্টি-দুষ্টির দুই একটা পাতা আমরা উল্টাইতেছিলাম মাত্র। আধুনিক সাহিত্যিক-রুচির পরিমার্জিত ক্ষুরধারে বৈষ্ণব-পদের বিচার-সভায় যে তুমুল হট্টগোল উঠিয়াছে এবং যে সমস্ত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে মূলতঃ এই প্রশ্নটাই উঠে যে, উহারা কি প্রত্যেকেই বৈষ্ণব-পদাবলীর যথার্থ পাঠক? আরও একটি কারণে এই প্রশ্নটি দৃঢ় হইয়া উঠে,—অনেক ছিদ্রান্বেষীর মতে বৈষ্ণব-পদাবলী নাকি অশ্লীল! তাঁহারা যে রুচেতের যন্ত্রবিশ্ব নহেন, তাহাতে সন্দেহ নাই!

বৈষ্ণবকাব্যে বর্ণিত রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলায় যে মর্মকথার উদ্‌ঘাত, ভগবৎপ্রেমমূর্তি শ্রীচৈতন্যের রাগানুগা প্রেমধর্মে আমরা তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেখিতে পাই। তাঁহার দিব্যজীবনের দিব্যস্পর্শে সহস্র রশ্মি নানাভাবে বিকীর্ণ করিয়াছে পদকর্তার মনে। তাই সে-মন যখন সাহিত্যরচনা করিয়াছে তখন তাহার মানসনেত্রে সেই 'রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত' মূর্তিই বিরাজিত ছিল। সেই সাহিত্য উপভোক্তাকেও অনিবার্যভাবে ঐ রসের রসিক হইতে হয়, নহিলে স্রষ্টা-মানসের ভাব-সঞ্চারিত হয় না। এই ব্যাপকতাতেই যে পাঠকের ধৈর্য আছে তাহার কাছে উহার আবেদন ব্যর্থ হইতে বাধ্য, কাব্যক্ষেত্রে উহারই নাম 'সহানুভূতি,' আলঙ্কারিক সেইজন্য উহাকেই বলিয়াছেন—'সহৃদয় হৃদয়-সংবাদী'।

শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন —সেই বিরহের আকুল ক্রন্দনে আকাশ বাতাস ভরিয়া গিয়াছে। অনশনক্লিষ্টা রাধা প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছেন। তাই সখিকে তিনি বলিতেছেন 'সখি, আমার মৃতদেহ দাহ করিয়ো না, অথবা জলেও ভাসাইয়া দিও না, তবে তাহা কোথায় রাখিবে? তমালের ডালে, তমালের লতা দিয়া তাহা বাঁধিয়ো।" কারণ শ্রীকৃষ্ণ ও তমাল অভেদাত্মক—ঐ' সেই প্রিয়-বিরহে প্রিয়ের স্মৃতির আকুল অনুধ্যান। এই আর্তির গভীরতা বুঝিতে হইলে আমাদিগকেও সমগ্র অন্তর দিয়া রাধার সহিত একাত্ম হইতে হয়। কিন্তু এত যে বুক-ফাটা দুঃখ, তাহাও প্রিয়-মুখ দেখিয়া এক মুহূর্তে উবিয়া গেল। রাধা তাঁহার নিজের দুঃখ তিনি গণনার মধ্যে আনেন না, শুধু—'তোমার কুশলে কুশল মানি।' মথুরা প্রত্যাগত সেই শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দীর্ঘ বিরহানুভবা শ্রীরাধিকা বলিতেছেন—

'বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে।
এতেক সহিল অবলা ব'লে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হ'লে।'

—কিন্তু ঐ যে বলিয়াছি, 'এ'সব দুঃখ কিছু না গণি'। ইহা কি সেই পর্বতনন্দিনীর তপস্যায় চন্দ্রশেখরের "তবাস্মি দাসঃ" শুনিয়া "অহার্য সা নিয়মজং ক্লমমুৎসসর্জ'—অর্থাৎ তপস্যাজনিত কষ্ট বিস্মৃত হওয়া? পার্বতী মহাদেবকে পাইয়াছেন— ভোগের মহিমার মধ্য দিয়া নহে, ত্যাগের ধূসরতার মাধ্যমে; কিন্তু তিনি পাইয়াছেন, আর শ্রীরাধার সর্বাঙ্গে বিচ্ছেদের বিষণ্ণ করুণতা,—'অল্প বয়সে

পরিতি করিয়া ঘরকে বাহির, বাহিরকে ঘর, পরকে আপন, আপনকে পর, রাতিকে দিবস এবং দিবসকে রাতি' করিয়াছেন। তথাপি—"বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পিরীতি।"—এই মেদুর সুরের অনুরণন—পদাবলীর সর্ব্বত্র!

পদাবলী সম্ভোগ আত্মিক ও একক জগতের অপেক্ষা রাখে। নিভৃত রূপ-মণ্ডল অকৃত সুখ সম্ভোগ—ইহাই পদাবলীর নিজস্ব; অতিগত সংস্কারের ফলে কীর্ত্তন সমাজের মধ্য দিয়া আমরা পদাবলী পরিক্রমা করিয়া থাকি বটে, কিন্তু উহা অন্য এক ধরণের উপভোগ—আত্মগত উপভোগ উহা নহে। ঐ পাঁচজনের আসরে খোল-করতাল-মন্দিরার ঐকতানের মধ্য দিয়া এবং কীর্ত্তনিয়ার ভাব-গদ্‌গদ রসভাষের সাহায্যে যে উপলব্ধি, অবশ্য তাহারও প্রয়োজন আছে। কারণ উহা অন্য একটি উদ্দেশ্য সাধন করে এবং তাহা করিলেও বিশুদ্ধ সাহিত্যিক উপভোগ উহাকে বলিতে পারি না। উহাকে 'যোগানন্দ' বলা যায়, কিন্তু সাহিত্যে যাহাকে 'রসানন্দ' বলে তাহা কি উহাতে আছে? অবশ্য ঐ 'যোগানন্দ' যে রসানন্দের অনুকূল তাহা অনস্বীকার্য্য।

সাহিত্যের আসর উপরোক্ত আসর হইতে একটু পৃথক; বৈষ্ণব পদাবলী গেয় হইয়া আসি; তাই বলিয়া গীতবাদ্য সহযোগ না হইলে যে উহা অ-ভোগ্য হইবে এমন কোন কথা নাই। প্রাচীন সাহিত্যের প্রায় সবগুলিই রাগ-রাগিণীর সাহায্যে গাওয়া হইত,—তথাপি গানেরও একটা পৃথক মূল্য আছে বলিয়াই তাহাকে সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বৈষ্ণব-পদকর্ত্তা কল্পনার তুরীয়লোকে উহা সৃষ্টি করিলেও, যে সাহিত্যিক লিপিকুশলতা ও আশ্চর্য্য বর্ণ-সংযম উহাতে দেখা যায়, যাহাতে ভাব একটি মুক্তার খণ্ডের মধ্যে নিটোল ও সংহত হইয়া উঠে এবং পদকর্ত্তার কবিতাও সেই রসের পোষকতা করে—এ' যেন একপ্রকার প্রাক্তন-প্রতিভার মতোই। রসোদ্গারের আতিশয্যে এই ভাব-স্রোত দু'কূল ভিজাইয়া জনপদে প্রবেশ করে নাই—তটের বন্ধন স্বীকার করিয়া সেই ভাবস্রোত তরঙ্গায়িত হইতে থাকে। বৈষ্ণব-ভক্তি এই দ্বৈত এবং অদ্বৈতের বন্ধন স্বীকার করিয়াছে বলিয়া বৈষ্ণব কবিতায় পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, মান-অভিমান, অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহমিলন—ইত্যাদি স্তর পরম্পরা। এই স্তরের বিদর্ভার নাই, দুই স্তরের পারম্পরিক সম্পর্ক রহিয়াছে, ইহাই লক্ষণীয়। সুতরাং এই সাধনায় একটা শৃঙ্খলা বিদ্যমান।

সে যাহাই হউক, সাহিত্য-রসের কথাই আমরা বলিতেছিলাম। সাহিত্য-রসের প্রধান ও মূল কথা হইল উহা আত্মগত। মনের গহনে মানসিক উৎকণ্ঠার পরিতৃপ্তি অর্থাৎ 'মনের মধ্যে মন' ডুবাইয়া উহার সন্ধান করিতে হয়। তাই 'পাগল হইয়া বনে বনে কিবা আপন গন্ধে মম কস্তুরী-মৃগসম।'—ইহাই সেই 'রসাস্বাদে'র আসল কথা।—তন্ময়-চিত্ত হইয়া রস-আস্বাদন এবং মনের কৌতূহল চরিতার্থ করা—তাহাও ঐ নিভৃতে ও নীরবে এবং সেই অবস্থায় যে উল্লাস অনুভূত হয় তাহাই সাহিত্য-রস। সাহিত্য-পাঠকের আনন্দ ঐখানেই। কারণ, 'The pleasure of literature is a secret pleasure and the needs it satisfies are personal needs."

রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহের পদাবলী' এবং মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' বোধ-করি কীর্ত্তনীয়া কর্ত্তৃক কোথায়ও গীত হয় নাই। তথাপি উহারা পাঠকের নিকট সেই অন্তরলোকের অমৃত'-নির্য্যাস বিলাইয়া দিতে কার্পণ্য করে নাই। তাহার কারণ যদি অপ্রবুদ্ধ চেতনা হইয়া থাকে তবে সাহিত্য-উপভোগের ক্ষেত্রে ঐ অপ্রবুদ্ধ চেতনারও যথেষ্ট গুরুত্ব আছে।

এইরূপে অন্তরের মধ্যে বোধ-শক্তি সংহরণ করিয়া যে সম্ভোগ তাহাই পাঠকর্ম্মের প্রাথমিক স্তর। এই সময়ে লেখকের সহিত পাঠক একাত্মতা অনুভব করে। ইহা অত্যন্ত মূল্যবান, আমাদের পূর্ব্ব-সংস্কার অনেক সময় ইহার পরিপন্থী হয়। তাই Virginea Wooly-র সাবধান বাণী—'Do

not dictate to your author; try to become him.'। বিশেষতঃ বৈষ্ণব-কবিতা পাঠের সময় ইহা সর্ব্বতোভাবে প্রযোজ্য। নহিলে যাহারা কাব্যেও প্রগতিবাদী তাহারা ইহাতে কাব্যত্বেরই সন্ধান পাইবে না!

কিন্তু ইদৃশঃ পাঠক অত্যন্ত বিরলদৃষ্ট, পদকর্ত্তাও তাহা জানিতেন। তত্ত্ব-বিচারক্ষম পণ্ডিত অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু অনুভূতিশীল পাঠক—'লাখে না মিলয়ে এক'! রস-চর্ব্বণ, বা পাণ্ডিত্য অপেক্ষা ঐ মূঢ় ভালবাসা এখানে অধিকতর কাম্য হইয়া উঠিল! শুধু তাহাই নহে,—

'রসিক রসিক বলয়ে সবাই
রসিক কেহ ত' নয়,
ভাবিয়া দেখিয়া পরিয়া বুঝিলে
কোটিকে গুটিক হয়।'

—'কোটিকে গুটিক হয়'—কী সাংঘাতিক কথা! আধুনিক রসাভিমানীর সমস্ত গর্ব্ব ধূলিসাৎ হইয়া গেল। 'আমরা Shelley, Keats, Browning, Wordsworth, Tennyson পড়, আর আমরা রসিক নহি? আমাদের মত দুর্দ্ধর্ষ রসগ্রাহীও কোটিকে গুটিক হইলে, স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে তত্তঃ কিম্?'

অতএব, 'প্রভু কহে এহ বাহ্য আগে কহ আর।' বৈষ্ণব-কবিতায় যে আবেগের প্রাবল্য, যে ঘর্ষণের ও যে মূর্চ্ছার অর্চ্চনা, যে উচ্ছ্বাসের আকুতির বাষ্পে রূপায়ণ পরিলক্ষিত হয়—যাহার সামগ্রিক মূল্য একটা স্বতোৎসারিত লিরিকমূর্চ্ছনার মধ্যে, যাহার ব্যঞ্জনা শব্দ-চয়নের নৈপুণ্যের মধ্যে বিধৃত হইয়া রহিয়াছে—সেই শব্দ ও শব্দাতীত মানসতীর্থের পরপারে বিরাজিত ভক্তির অলকাপুরী; বিরহীচক্রের মেঘদূত 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে' যাত্রা করিয়াছে,—'সানুমান আম্রকূট, বেত্রবতী কূলে দশার্ণ গ্রাম, মেঘশ্যামশৈলে যূথ নিষ্কাসনার প্রীতি সঞ্চার করিয়া অবন্তীপুরী ও উজ্জয়িনী অতিক্রম করিয়া মেঘ যখন মোক্ষধামে উপস্থিত হইল তখন সেখানে বর্ষার ঘনঘটা থামে নাই, বিরহিণী রাধা তখনও বিলাপ করিতেছে তত্ত্ব ভাবের ঘন তমিস্রায়,—'সখি হে হামারি দুখের নাহি ওর।' বাহিরে ভুবন ভরিয়া বর্ষা ঝাঁপিয়া আসিয়াছে, মেঘ গর্জ্জন শোনা যাইতেছে, শত শত বজ্রপাত হইতেছে, তাহারই আনন্দে ময়ূর নৃত্য করিতেছে, ভানুকী উন্মত্ত হইয়া ডাকিতেছে। এ' হেন সময়ে প্রিয় তাহার নিকটে নাই, তাই—

"কাটি যাওত ছাতিয়া!

বিরহী-চিত্তের এই ভুবনব্যাপিত বেদনা ও সন্তাপ সংবেদনশীল চিত্তে ধীরেধীরে প্রসৃত হয়, 'গীত-গোবিন্দের' ললিত কবি ইহা জানিতেন বলিয়া গ্রন্থারম্ভেই তিনি উচ্চারণ করিলেন,—

'যদি হরি-স্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাস-কলাসু কুতূহলম্,
মধুর কোমলকান্ত পদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্'।

—পদাবলীর পাঠ-কর্ত্তব্যে এতখানি সুস্পষ্টভাবে আর কোনও পদকর্ত্তা নির্দ্দেশ করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানিনা এবং ইহাতে আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হইতেছে, জয়দেব পাঠকের সরস-মন কামনা করিয়াছেন,—Baconও বলিয়াছেন, 'Studies serve for delight—সুতরাং একটিকে আর একটির প্রতিধ্বনি বলিয়া মনে হয় না কি?

## সঙ্ঘবার্ত্তা

**ধর্ম্মালোচনা**—কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে পণ্ডিত শ্রীমধুসূদন মুখোপাধ্যায় বৈষ্ণবাচার্য্য সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় প্রতিদিন সন্ধ্যা সাতটায় সোমবার হইতে শুক্রবার প্রতি সপ্তাহে পাঁচদিন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

**কথকতা**—কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে প্রতিদিন রবিবার সন্ধ্যায় আরতির পরে সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত কথকতা করিতেছেন।

**শ্রীশ্রীরামনাম-কীর্ত্তন**—প্রতি শনিবার বেলা তিনটার সময়ে সঙ্গীতবিশারদ শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্ত্তীর পরিচালনায় কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে শ্রীশ্রীরামনাম কীর্ত্তন ও ভজনগান হইয়া থাকে।

প্রতিষ্ঠাতা—স্বামী অভেদানন্দ

সপ্তদশ বর্ষ—দ্বাদশ সংখ্যা
বার্ষিক মূল্য—চারি টাকা

মাঘ, ১৩৬২
প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন—বড়বাজার ১৮০৭

সম্পাদক—স্বামী সত্যাত্মানন্দ ও স্বামী বেদাত্মানন্দ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের পক্ষে ব্রহ্মচারী বসন্তকুমার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৪১, বিবেকানন্দ রোড কলিকাতা-৬, ভারতী প্রিন্টিং ওয়ার্কসহইতে শ্রীবিনয়ভূষণ সিংহ কর্তৃক মুদ্রিত।

# বিশ্ববাণী—মাঘ, ১৩৬২

## সূচীপত্র


| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | হিন্দুদের দৃষ্টিতে যীশুখৃষ্ট ও খৃষ্টানাচার্চের ধর্ম | স্বামী অভেদানন্দ | ৫৬১ |
| ২। | ইতিহাসের এক অধ্যায় | শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র কর | ৫৭৫ |
| ৩। | ভারত তিব্বত বাণিজ্যিক সম্পর্কের ঐতিহাসিক গুরুত্ব | শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত | ৫৭৯ |

# হাওড়া মোটর কোম্পানী লিঃ

স্থাপিত—১৯১৮ )

মোটর গাড়ীর যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

নিখুঁত ভাবে ইঞ্জিন মেরামতি কার্য্য আমাদের বৈশিষ্ট্য

হেড অফিস—পি ৬, মিশন রো এক্সটেনসন, কলিকাতা—১

ফোন—২৩-১৮০৪ ( পাঁচ লাইন )

শাখা—বম্বে, দিল্লী, পাটনা, ধানবাদ, কটক ও গৌহাটি

বস্ত্র শিল্পে মোহিনীর অবদান অতুলনীয়

# মোহিনী মিলস্ লিমিটেড

— ১নং মিল — — ২নং মিল —

কুষ্টিয়া ( পাকিস্তান ) ✱ বেলঘোরিয়া ( ভারত )

এই মিলে প্রস্তুত ধুতি শাড়ী লংক্লথ প্রভৃতি ভারত ও পাকিস্তানে সমভাবে সমাদৃত

ম্যানেজিং এজেন্টস্ ঃ

চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোম্পানী

রেজিষ্টার্ড অফিস ঃ—২২নং ক্যানিং ষ্ট, কলিকাতা

ডাক্তার হরসুখাদয় মল্লিক, এম. ও, এম. ডি, বি. এল, আবিষ্কৃত

পেটেণ্ট

# ইক্-মিক্ কুকার

ইহাতে এক ঘণ্টায় উপরে বিভিন্ন আমিষ ও নিরামিষ খাদ্য অতি সহজে এবং সুন্দররূপে রন্ধন করা যায়। যে কোন জ্বালানী দ্রব্যের দ্বারা বিনা তত্ত্বাবধানে অতি অল্প খরচে রান্না চলে। মূল্য-তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

ম্যানেজার—ইক্-মিক্-কুকার, ২১১।১এ, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

## সূচীপত্র


| | | | |
|---|---|---|---|
| ৪। | শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদ্বৈত-বেদান্ত সাধনা | যতীন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় | ৫৮১ |
| ৫। | ব্রহ্মবিদ্ শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ মহারাজ | | ৫৮৮ |
| ৬। | চর্য্যাপদ-এর শিল্প-সুষমা | শ্রীঅনিলকুমার হালদার | ৫৯৩ |
| ৭। | প্রতীক্ষা ( কবিতা ) | শ্রীবিশ্বপতি রায় | ৫৯৬ |
| ৮। | ভালবাসা | শ্রীবালকরাম ভট্টাচার্য্য | ৫৯৭ |
| ৯। | শ্রীবিষ্ণুপুরাণে·· মৈত্রেয় ঋষির প্রশ্ন | শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায় | ৫৯৯ |
| ১০। | অন্ধ্রদেশে প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপ আবিষ্কার | | ৬০২ |
| ১১। | মহাত্মা সেন্ট পিটারের পবিত্র দেহাবশেষ আবিষ্কার | | ৬০৩ |
| ১২। | অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসুর জন্মদিন | | ৬০৩ |
| ১৩। | শ্রীললিতা-রহস্য | শ্রীরামমোহন চক্রবর্ত্তী | ৬০৪ |
| ১৪। | বিবিধ-সঙ্কলন | | ৬০৬ |
| ১৫। | এক্স-রশ্মি প্রক্রিয়া সম্পর্কে ডাঃ রামনের নূতন আবিষ্কার | | ৬০৭ |
| ১৬। | চন্দ্রের জন্ম-কাহিনী | | ৬০৮ |
| ১৭। | অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর একটি গবেষণা-পত্র | শুভ্রেন্দু কর | ৬০৮ |
| ১৮। | বিবেকানন্দের প্রতি (কবিতা) | শ্রীশৈলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য | ৬১০ |
| ১৯। | গ্রন্থ-সমালোচনা | | ৬১১ |
| ২০। | সঙ্ঘবার্ত্তা | | ৬১২ |
| ২১। | মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত | | ৬১৪ |


## "বিশ্ববাণী"-র নিয়মাবলী

১। 'বিশ্ববাণী'-র বর্ষ আরম্ভ হয় প্রতি ফাল্গুন মাসে। বৎসরের যে কোন সময়ে আপনি গ্রাহক হইতে পারেন। তবে প্রথম সংখ্যা হইতেই লইতে হইবে।

২। 'বিশ্ববাণী'-র বার্ষিক মূল্য সডাক চারি টাকা, ষাণ্মাসিক দুই টাকা, প্রতি সংখ্যা আট আনা। মূল্য অগ্রিম পাঠাইতে হইবে।

৩। কোন গ্রাহকের ঠিকানা অল্পদিনের জন্য পরিবর্ত্তিত হইলে তিনি স্থানীয় ডাকঘরে নির্দ্দেশ দিবেন; বেশীদিনের জন্য হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে নতুবা পূর্ব্বোক্ত ঠিকানায় পত্রিকা প্রেরিত হইবে।

৪। 'বিশ্ববাণী'-র গ্রাহক মূল্য মনিঅর্ডার যোগে পাঠাইলে কূপনে নাম ও ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। কোনও মাসের সংখ্যা না পাইলে গ্রাহকগণ তাহার পরের মাসে সাত তারিখের মধ্যে আমাদিগকে তাহা জানাইবেন।

৫। 'বিশ্ববাণী'র জন্য প্রবন্ধাদি পাঠাইবার কালে রচয়িতার নাম ঠিকানা যেন তাহাতে বেশ স্পষ্টাক্ষরে সন্নিবেশিত থাকে। 'বিশ্ববাণী'তে প্রকাশযোগ্য প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হয়। প্রবন্ধাদি হারাইয়া যাইলে বা কোন প্রকারে নষ্ট হইলে আমরা দায়ী থাকি না।
প্রবন্ধ স্বল্পায়তনে, মূলতঃ **চার পাতার মধ্যে**, রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। দীর্ঘাকার প্রবন্ধ ছাপা অসম্ভব

৬। প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাক-টিকিট পাঠানো চাই। ছয়মাস পরে অমনোনীত প্রবন্ধাদি নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। কোনও লেখা প্রকাশিত করা সম্পূর্ণরূপে সম্পাদকদের অভিমত সাপেক্ষ। ইহার জন্য সম্পাদকেরা কোনও কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নহেন।

৭। কাহারও কোন বিষয় জানিতে হইলে ( গ্রাহক হইলে, গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া ) সকল। **রিপ্লাই কার্ডে** অথবা ডাক-টিকিট সমেত এবং পূর্ণ ঠিকানার সহিত দিতে হইবে। অন্যথায় উত্তর দেওয়া হয় না।

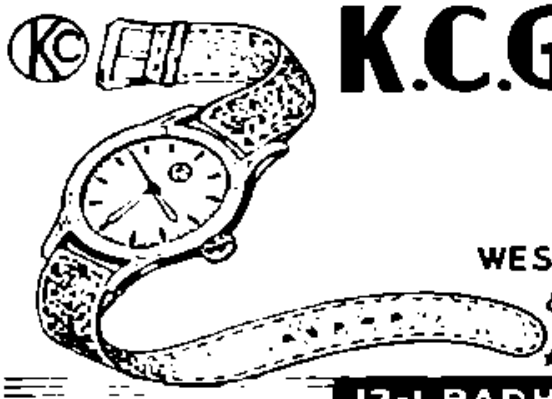

# K.C.GANGULY
## & CO.

*Dealers in:-*

WEST END • FAVRE-LEUBA
& ANGLO SWISS

★ REPAIRING OUR SPECIALITY

12-1 RADHA BAZAR ST. CAL-1



স্বামী ওঁকারেশ্বরানন্দ প্রণীত

## ১। প্রেমানন্দ জীবন-চরিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইস চ্যান্সেলর ভারতবরেণ্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের এই জীবন-চরিতখানি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আধ্যাত্মিক শাখার গ্রন্থরাজির মধ্যে বিশেষ সম্মানীয় স্থান অধিকার করিবে।··· হৃদয়স্পর্শকারী সুন্দর ও প্রাঞ্জলভাবে বর্ণিত।" প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠায় ৪খানি সুন্দর ছবি সহ, সুলভ সংস্করণ মূল্য ৩,০ বাঁধাই ৪৲ টাকা।

## ২। প্রেমানন্দ ১ম ভাগ ২য় সংস্করণ ও ২য় ভাগ

সাধক ও ভক্তদিগকে প্রদত্ত অমূল্য উপদেশ সংগ্রহ।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ভূতপূর্ব ভাইস প্রেসিডেণ্ট পূজ্যপাদাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী অচলানন্দজী মহারাজ লিখিয়াছেন—"পড়িয়া প্রাণে বড় আনন্দানুভব করিলাম"।

উদ্বোধন—"উপদেশ অংশ পড়িয়া সংগ্রাহককে কৃতজ্ঞতা না জানাইয়া থাকা যায় না।" সকল পত্রিকায়—উচ্চ প্রশংসিত। সুন্দর আর্ট পেপারে চারিখানি ছবি ইহাতে আছে। মূল্য যথাক্রমে ২।০ ও ২৸০

প্রাপ্তিস্থান :— **শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ**,—১৯বি, রাজা রাধাকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

পোঃ অঃ কৃষ্ণা, দেওঘর, এস, পি., বিহার এই ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট লইলে ডাক মাশুল লাগিবে না।



# ডি. রতন এণ্ড কোং

## ফটোগ্রাফার্স

ফটো

২২-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিঃ ৬

ফোন: ৩৪- ৩৭১১

বিশ্ববাণী

সপ্তদশ বর্ষ | মাঘ—১৩৬২ | দ্বাদশ সংখ্যা

# হিন্দুদের দৃষ্টিতে যীশুখৃষ্ট ও খৃষ্টানচার্চ্চের ধর্ম্ম

( পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর )

স্বামী অভেদানন্দ

শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য চৈতন্যদেব শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রভৃতি মহামানবেরা অবতার-পুরুষ বলিয়া হিন্দুদের দ্বারা অভিহিত হন। বাইবেলে বর্ণিত যীশুর জীবন-কাহিনীর সহিত শ্রীকৃষ্ণ অথবা বুদ্ধদেবের জীবনচরিত তুলনামূলক দৃষ্টিতে পড়িয়া হিন্দুরা সত্যই আশ্চর্য্যান্বিত হন। কেননা, তাঁহারা দেখিতে পান—খৃষ্টের আবির্ভাবকালে আকাশে সেই সকলপরিচিত ও সর্বজনদর্শিত অদ্ভুত নক্ষত্র, ক্রুশবিদ্ধ এবং কবরে-পতিত যীশুর পুনরুত্থান এবং যীশুর স্বর্গে গমন প্রভৃতি কাহিনীর মতন শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেবের জীবন-কাহিনীর আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে। শ্রীকৃষ্ণের জীবনকাল যীশুর জন্মগ্রহণের চতুর্দ্দশ শত বৎসর পূর্ব্বে। ৫৫৭ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে কয়েকজন ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিদ্ মনীষী প্রাচ্য জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাসকে পক্ষপাতশূন্য দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। নিরপেক্ষ বিচার ও অনুসন্ধানের ফলে তাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছিলেন—ম্যাথু মার্ক ও লুকের গস্পেলে বর্ণিত যীশুর জীবন-কাহিনী যীশুর দেহত্যাগের অনেক পরবর্ত্তী কালের লেখা। ঐসব গস্পেলে যীশুর জীবন-কাহিনীর অনেক তথ্য ভারতবর্ষের মহামানব শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধের জীবনচরিত হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে[১]। খৃষ্টান মিশনারীরা ভারতবর্ষে প্রথম আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধের জীবনচরিতের অনেক ঘটনার সহিত যীশুর জীবনের কোন কোন ঘটনার মিল দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হন। তাহার ফলে তাঁহাদের মনে এ সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন উঠিতে থাকে। সেইসব প্রশ্নের মীমাংসার কোনও উপায় দেখিতে না পাইয়া তাঁহারা নিজেদের মধ্যেই একটা মনগড়া সিদ্ধান্তের বশে স্থির করেন যে, খৃষ্টের আবির্ভাবের

১। সেণ্ট লুকের গস্পেলে যীশুর জন্মগ্রহণের পরে একজন প্রাচীন ভবিষ্যদ্বক্তা সাধুমহাত্মা এবং একজন বর্ষীয়সী সাধ্বী তপস্বিনীর সর্বজাতি সর্বজাতি যীশুকে দর্শন করিতে আগমন ও তাহাদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের সহিত বুদ্ধদেবের জন্মগ্রহণ কালে মহর্ষি অসিতী একজন তপস্বিনীর আগমনের আশ্চর্য্য কাহিনীগত মিল আছে।

ঘটনা পূর্ব্ব হইতেই জানিতে পারিয়া নাকি শয়তান ভারতবর্ষের খৃষ্টের জীবনকাহিনীর পূর্ব্বতন আকারের এইসব কাহিনী ও ধর্ম্মমত প্রচার করিয়া গিয়াছিল।

বিভিন্ন ধর্ম্মে ব্যবহৃত ও পূজিত অনেক রকম প্রতীকের ( Symbol ) উৎপত্তি ও ব্যবহারের সম্বন্ধে অনেকগুলি ইতিহাস-গ্রন্থ বিখ্যাত পণ্ডিতেরা লিখিয়া গিয়াছেন।[২] এই সমস্ত গ্রন্থ পড়িয়া পাঠকেরা জানিতে পারেন—যে প্রতীকটিকে ক্রশ ( Cross ) বলিয়া খৃষ্টানরা ভক্তি করে, যীশুর জন্মগ্রহণের বহু শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে তাহা 'স্বস্তিক' নামে ভারতবর্ষে হিন্দুদের ও বৌদ্ধদের দ্বারা পরিচিত ধর্ম্মচিহ্নরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। যীশুর জীবন-কালের অনেক বৎসর পরে খৃষ্টান সম্প্রদায়ে ইহা ধর্ম্ম-প্রতীক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এই প্রতীকের পূর্ব্বতন ইতিহাস জানেন না বলিয়া গোঁড়া খৃষ্টানেরা অজ্ঞতাবশতঃ ইহাকে নিজেদের একচেটিয়া সম্পত্তি বলিয়া মনে করেন। ধর্ম্মের কোনও বিষয় কখনও কোনও ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের একচেটিয়া অধিকারে আসিতে পারে—হিন্দুরা ইহা কিছুতেই বিশ্বাস করেন না। সেইজন্য হিন্দুরা খৃষ্টানদের এই অজ্ঞতাপূর্ণ ও অসঙ্গত দাবীকে প্রত্যাখ্যান করেন।

গীর্জ্জার প্রচলিত খৃষ্টান ধর্ম্মমতের শাস্ত্রে ( Genesis, chapter III ) নাটকীয় ভাবে 'প্রথম মানব' আদামের এবং 'প্রথমা নারী' ইভের স্বর্গ হইতে পতনের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। আদাম ও ইভের এই 'পতনের' কাহিনীকে পৃথিবীর যাবতীয় পাপ ও অশুভের উৎপত্তির কারণ বলিয়া খৃষ্টান সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রচার ও ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু খৃষ্টানদের এই বিবরণের মধ্যে হিন্দুরা কোনই যুক্তি খুঁজিয়া পান না। সেজন্য তাঁহারা এই মতকে স্বীকার করেন না। "কোনও একজন মানুষ যীশুখৃষ্টের জন্মের চারহাজার বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল। আর সেই লোকটিই সমগ্র মানবজাতির আদিপুরুষ! আর এই লোকটির পাপের ফল সমস্ত মানবজাতির মধ্যে সংক্রামিত হইয়াছে—এবং সেইজন্যই সমস্ত নরনারী পাপীরূপেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে!" এই রকম উদ্ভট বর্ণনাকে হিন্দুরা কোনও আদিম অসভ্যজাতিদের আজগুবী গল্পকথা বলিয়াই মনে করেন। এইরূপ বর্ণনা শুধু অপরিণত মনের কল্পনার ফল মাত্র। বিশ্ব-জগতের ও মানবজাতির উৎপত্তির এই প্রকার বিবরণকে হিন্দুরা সম্পূর্ণরূপে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের বিরোধী ও যুক্তিহীন মত বলিয়া মনে করেন। বর্ত্তমান কালে বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক গবেষণার ফলে হিন্দুদের এই যুক্তনিষ্ঠ ধারণাকে সমর্থন করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা জানিতে পারা যায় যে, খৃষ্টের জন্মের সাত আট হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে হিন্দুরা বিবিধ জ্ঞানবিদ্যা ও চিন্তাশীলতায় কিরূপ উন্নত জাতি ছিলেন। মিশরের ঐতিহাসিক খনন-কার্য্যের ফলে এই কথা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং পৃথিবীতে পাপের উৎপত্তি সম্বন্ধে খৃষ্টানদের উদ্ভাবিত এই প্রকার আজগুবি মতবাদ হিন্দুদের পক্ষে গ্রহণ করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

২। খৃষ্টান ধর্ম্মসম্প্রদায়ে ব্যবহৃত ক্রশ এবং অন্যান্য প্রতীক ও উপাসনা পদ্ধতির সম্বন্ধে J. P Lundy : Monumental Christianity

E. D. Bunsen : Angel Messiah

Williamson : Great Law প্রভৃতি পুস্তক দেখুন।

J. M. Robertson : *Christianity and Mythology, World's Sixteen Crucified Saviours* এবং *Pagan Christ* গ্রন্থ যীশুখৃষ্টের জীবন-চরিত রচনার বহু উপাদান ও খৃষ্টান ধর্ম্মের উপাসনা পদ্ধতি বিশ্লেষণ সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ঘাটিত করিয়াছে।

আর্থার লিলি ( Arthur Lilli ) নামে অনেক পুরাতত্ত্ববিদ্ ও খৃষ্টান ধর্ম্মের আদিম ইতিহাস সম্বন্ধে অভিজ্ঞ মনীষীও লিখিয়াছেন : The only Christian Cross in the Catacombs is Buddhist *Swastika.*"

ইতি—অনুবাদক

"ঈশ্বরের দ্বারা আদম সৃষ্ট হইবার" অনেক শত বৎসর পূর্ব্বেই লক্ষ লক্ষ লোক এই পৃথিবীর নানা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে ও মরিয়া গিয়াছে। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন—'মানুষ মাত্রেই ঈশ্বরের সন্তান এবং দেবত্ব প্রত্যেক মানুষেরই প্রকৃতিগত চিরন্তন সম্পদ।

হিন্দুদের মতে 'পাপ' বলিতে স্বার্থপরতা অজ্ঞানতা প্রভৃতি দোষকেই বুঝাইয়া থাকে। কোনও পুরাণে বর্ণিত 'শয়তান' নামধারী কোনও অলৌকিক মূলক পাপের প্রবর্ত্তক নয়। অতি-প্রাকৃতিক কোনও শক্তির দ্বারা এই পৃথিবীতে পাপের উৎপত্তি হয় নাই। তাহা হইলে পাপের কারণ কী? হিন্দুরা বলেন, মানুষ আপনার দিব্যস্বরূপকে অজ্ঞানতার ফলে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে—ঈশ্বর প্রত্যেক মানবের আন্তর সত্তা—ইহার সম্বন্ধে সচেতন না থাকার জন্যই মানুষের পাপাচরণে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। আমরা আমাদের দিব্যস্বরূপকে যতক্ষণ না জানিতে পারিব, সে পর্য্যন্ত আমরা নিজেদের এই জন্মমৃত্যুশীল দেহ এবং পরিবর্ত্তনশীল মন বলিয়া নিজেদের বিশ্বাস করিতে থাকিব। যতক্ষণ আমাদের এই দেহাত্মবোধ থাকিবে ততক্ষণই আমরা স্বার্থপরতার দ্বারা অভিভূত থাকিব। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে আমরা নিজেদের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিতে পাইব এবং যখনই আমরা আমাদের দিব্য-স্বরূপকে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব—তখনই আমাদের মধ্য হইতে পাপ মোহ স্বার্থপরতা একেবারে দূর হইয়া যাইবে। তখন হইতে আমরা সম্পূর্ণরূপে পাপমুক্ত ও নির্ম্মল হইয়া যাইব। মানুষের অন্তরে আত্মজ্ঞানের অনাদি অনির্ব্বাণ অগ্নিরাশি ঢাকা পড়িয়া আছে। এই অগ্নিরাশি আবরণ ভেদ করিয়া তাহার অসংখ্য প্রচণ্ড শিখার দ্বারা পাপমোহের জঞ্জালকে চিরতরে ভস্মীভূত করিয়া দেয়। আত্মজ্ঞানের শাশ্বত অগ্নির আলোকে আমাদিগকে জানিতে সমর্থ করে যে, আমরা সমস্ত পাপ ও অপবিত্রতা হইতে মুক্ত হইয়াছি।

পাপের উৎপত্তি এবং পাপকে উচ্ছেদ করিবার এই যুক্তিসঙ্গত মতবাদ ও সাধন-পদ্ধতি সম্বন্ধে হিন্দুরা সম্পূর্ণরূপে অবগত। সেজন্য মুক্তিলাভের ব্যাপারে বাহির হইতে বিশেষ কোনও অলৌকিক শক্তির করুণা ও সাহায্য তাঁহারা প্রত্যাশা করেন না। খৃষ্টান ধর্মসম্প্রদায়ে প্রচলিত অনন্ত নরক-যন্ত্রণার মতবাদে হিন্দুদের আদৌ বিশ্বাস নাই। পাপীদের শাস্তি-ভোগের জন্য নরক বলিয়া বিশেষ কোনও স্থানের অস্তিত্বে তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। সেজন্য মুক্তিলাভের উদ্দেশে ঈশ্বরের কাছে সুপারিশ করাইয়া দিবার জন্য কোনও প্রফেটকে 'মধ্যবর্ত্তীপুরুষ' ( Mediator ) বলিয়া স্বীকার এবং তাঁহার সাহায্যের আবশ্যকতা হিন্দুরা বোধ করেন না। যে সমস্ত লোক নরকে অনন্ত কাল শাস্তিভোগের কথা বিশ্বাস করে—মুক্তিলাভের জন্য তাহারা অবশ্য একজন মহাপুরুষকে 'পরিত্রাতা' বলিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইতে পারে ( যেমন যীশুখৃষ্টকে গোঁড়া খৃষ্টানরা মুক্তিদাতা ও পরিত্রাতা বলিয়া মানিয়া থাকে )। সুবিখ্যাত খৃষ্টান মিশনারী জন হেনরী ব্যারোজ* কয়েক বৎসর আগে ( ১৮৯৯ ) ভারতবর্ষে গিয়া সেখানকার কোনও একটা প্রসিদ্ধ সহরে ধর্ম্মের নামে অনন্ত নরক ভোগ এবং মুক্তিলাভের জন্য ব্যক্তিবিশেষকে পরিত্রাতা বলিয়া গ্রহণের সম্বন্ধে প্রচার করিয়াছিলেন। ব্যারোজ সাহেবের বক্তৃতা শেষ হইয়া যাইবার পরে একজন শ্রোতা দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন —"মহাশয়, আমি প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, আপনি একটি সভ্যজাতির অন্তর্গত ব্যক্তি এবং আমাদের সভ্যতা শিক্ষা দিবার জন্য এখানে আসিয়াছেন। আপনার বক্তৃতা শুনিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত

*। জন হেনরি ব্যারোজ আমেরিকা যুক্তরাজ্যে খৃষ্টান মিশনারীদের একজন বিখ্যাত নেতা ছিলেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকা যুক্তরাজ্যের চিকাগো মহানগরীতে সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের ধর্ম্ম মহাসম্মেলন সভায় তিনি সভাপতি হইয়াছিলেন।

পর্যন্ত জানিতে পারি নাই যে, যে সব ব্যাপারকে আপনারা জ্ঞান বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন, তাহা আমাদের দৃষ্টিতে কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়।" ভারত-ভ্রমণের শেষে ব্যারোজ সাহেব যথাসময়ে নিজের দেশ আমেরিকা যুক্তরাজ্যে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি খৃষ্টানদের একটি জনসভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে শ্রোতাদের জানাইয়াছিলেন—'ভারতবর্ষে শত শত উচ্চশিক্ষিত ব্রাহ্মণ খৃষ্টান হইবার জন্য উৎসুক হইয়া আছে।' সেজন্য ব্যারোজ সাহেব তাঁহার শ্রোতাদের অনুরোধ করিয়া জানাইলেন—যেন হাজার হাজার টাকা চাঁদা তুলিয়া আরও অনেক পাদ্রীকে ভারতবর্ষে খৃষ্টান ধর্ম প্রচার করিতে পাঠানো দরকার। ভারতবাসী একজন সুবিখ্যাত বক্তা ব্যারোজ সাহেবের এই বক্তৃতা শুনিয়া বিদ্রূপের সহিত তাহাকে বলিয়াছিলেন, "হে আমার খৃষ্টান বন্ধুগণ ইহার বদলে আপনারা ভারতবর্ষে একটা ছাপার ইঞ্জিন পাঠাইয়া দিতেছেন না কেন? তাহা হইলে তো আপনারা অনেক অল্প খরচায় নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারেন!"

খৃষ্টান চার্চের দ্বারা আর একটা ভোর-ভবরদস্তির মত প্রচার করা হয়—সেই মতবাদটি Vicariaos Atonement—অর্থাৎ, সমস্ত মানুষের পাপ দূর করিবার জন্য যীশুখৃষ্ট ক্রুশে বিদ্ধ ও নিহত হইয়া নিজের পুণ্যশোণিতধারা প্রবাহিত করিয়াছিলেন। এই মতবাদটি শুনিয়া হিন্দুদের স্নেহকোমল অন্তর ও প্রেমপূর্ণ মন কী এক বিভীষিকায় শিহরিয়া উঠে। এই ব্যাপারটিকে হিন্দুরা কখনও ঈশ্বরের করুণার কার্য বলিয়া মনে করেন না। বরং তাঁহারা মনে করেন, ঈশ্বর তাঁহার নিষ্পাপ ও নিরীহ পুত্রকে এই কার্য করিতে আদেশ দিয়া নিষ্ঠুরতা ও অবিচারের পরিচয় দিয়াছেন।

তাহার পরে খৃষ্টান চার্চের আর একটি যুক্তিহীন মত। এই মতটি হইতেছে Resurrection—অর্থাৎ কবর হইতে পুনরুত্থিত হইয়া যীশুখৃষ্টের স্বর্গারোহণের কাহিনী। খৃষ্টানদের অধিকাংশ দলই বিশ্বাস করে যে, যীশুখৃষ্টই সমস্ত মৃতব্যক্তিদের ফলস্বরূপ, সমস্ত মানুষের মধ্যে একমাত্র তিনিই কবর হইতে জীবন্ত হইয়া পুনরায় উত্থিত হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্য দেশের কোনও বৈজ্ঞানিকই বিশ্বাস করেন না যে, মানুষ মরিয়া যাবার পর তাহার দেহ কবর হইতে আবার জীবন্ত হইয়া বাহির হইয়া আসিবে। এই বৈজ্ঞানিক নিয়ম জানার জন্য হিন্দুরা যীশুখৃষ্টের কবর হইতে পুনরুত্থানের গল্পকাহিনীকে সত্য ঘটনা হিন্দুরা বলিয়া বিশ্বাস করেন না। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন যে, আত্মার মৃত্যু হয় না এবং আত্মা অবিনাশী। 'মৃত্যু' শব্দের অর্থে হিন্দুরা জীবের দেহান্তর-প্রাপ্তির অবস্থা বলিয়াই জানেন। আত্মার অবিনাশিত্বের তত্ত্বের উপরেই হিন্দুদের ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত। কিন্তু খৃষ্টান মিশনারীদের অনেকেই মনে করেন যে, হিন্দুরা আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করেন না। অপর পক্ষে আত্মার এই অমরত্বের মতবাদ ভারতবর্ষে হিন্দুদের মধ্যে এমন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং এত অধিক সংখ্যক লোকেদের দ্বারা সমর্থিত হয় যে, ভারতবর্ষে হিন্দুদের নিকট কোনও ব্যক্তিবিশেষের কবর হইতে পুনরুত্থানের গল্প বলিয়া আত্মার অমরত্বের বিষয় বুঝাইবার কোনই প্রয়োজন হয় না।

খৃষ্টানদের এই মতবাদের অপেক্ষা আত্মার অমরত্বের স্বপক্ষে হিন্দুদের যুক্তি আরও প্রবলতর। হিন্দুরা বলেন, 'আত্মার অমরত্বের বিষয় বুঝিতে হইলে দুইটি তথ্য জানা একান্ত প্রয়োজন। প্রথমটি হইল পূর্বজন্মবাদ ( Pre-existence ) এবং দ্বিতীয়টি জন্মান্তরবাদ ( Reincarnation ) বা দেহের মৃত্যু হইলেও আত্মার অস্তিত্বের অব্যাহত অবস্থা এবং আত্মার আবার নূতন দেহ গ্রহণ। যে কোনও পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে তাহার নাশ অবশ্যম্ভাবী। যাহা উৎপন্ন হয়, তাহার বিনাশ বা মৃত্যু

হইবেই। ইহাই বিশ্বপ্রকৃতির চির নিয়ম। যদি শূন্য বা অনস্তিত্ব হইতে ভগবান মানুষদের আত্মা-গুলিকে সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহারা কখনও অমর হইয়া থাকিতে পারে না, তাহাদের মৃত্যু হওয়া অনিবার্য্য। 'এই সমস্ত আত্মা কোনও এক সময়ে উৎপন্ন হইয়াছিল, অথচ তাহারা চিরকাল অমর হইয়া থাকিবে'—এইরূপ উক্তির মধ্যে কোনও যুক্তি থাকিতে পারে না। যদি আপনারা আত্মার অমরত্ববাদকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিতে চান, তাহা হইলে আপনারা পূর্ব্বজন্মবাদের মতকে স্বীকার করুন। খৃষ্টান চার্চ্চ আত্মার পূর্ব্বজন্মবাদকে মানে না—অথচ এদিকে মৃত্যুর পরে অনন্তকাল আত্মার অমরত্বের মতকে প্রচার করিয়া থাকে! হিন্দুরা খৃষ্টানদের মুখের উপরেই জবাব দেন, এই রকম মত একেবারেই অসম্ভব। বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মনীতি যে এই রকম মতবাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে বিদ্যমান তাহা আমরা সকলেই জানি। হিন্দুদের প্রধান প্রধান যে কোন শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিলেই আপনারা দেখিতে পাইবেন—প্রত্যেক হিন্দুশাস্ত্রেই মানব ও অন্যান্য জীবের আত্মাকে জন্মহীন মৃত্যুহীন অপরিণামী সত্তা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কঠোপনিষদ্ এবং ভগবদ্গীতায় আত্মার জন্মমৃত্যুহীনতা ও অমরত্ব সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, আমেরিকার দার্শনিক-কবি এমার্সন-এর ( Ralph Waldo Emerson, জন্ম ১৮০৩ খৃষ্টাব্দ, মৃত্যু ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ ) *Brahm* ( ব্রহ্ম ) নামক কবিতায় সেইভাবগুলি আমেরিকায় প্রচারিত হইয়াছে। সেই কবিতার একটি অংশে এমার্সন লিখিয়াছেন :—

"If the slayer thinks he slays,
Or if the slain thinks he is slain :
They know not well the subtle ways
I come and pass and turn again."

অর্থাৎ—"যদি কেহ মনে করে যে, 'আমি কাহাকেও হত্যা করিয়াছি,' কিম্বা কেহ যদি মনে করে যে, 'আমি অমুক ব্যক্তির দ্বারা নিহত হইতেছি'—তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তাহারা আত্মার গতির এই সূক্ষ্মতত্ত্ব জানে না। আত্মারূপে আমি বারবার আসি যাই ও দেহকে পরিবর্ত্তন করি।" খৃষ্টান চার্চ্চের মতবাদ প্রচার করে যে, আত্মার উৎপত্তি আছে কিন্তু উহার বিনাশ নাই। হিন্দুরা এরূপ যুক্তিবিরোধী মতকে গ্রহণ করিতে পারেন না।

তাহার পরে খৃষ্টান চার্চ্চের পরবর্ত্তী মত হইতেছে—মানব মাত্রেরই ভাবীজীবন পূর্ব্ব হইতে নির্দ্দিষ্ট হয় ( Pre-destination ) এবং মানবের মুক্তিলাভ ঈশ্বরের বিশেষ কোনও এক প্রকারের করুণা ( Special Grace ) ভিন্ন হইবার উপায় নাই। এইরূপ উৎকট মতবাদের দ্বারা ঈশ্বরকে অবিচারকারী ও পক্ষপাতদুষ্ট বলিয়া প্রমাণ করা হয়। এই রকম উদ্ভট মতের পরিবর্ত্তে হিন্দুদের অবলম্বিত পুনর্জ্জন্মবাদের মত প্রকৃতপক্ষে যুক্তিসঙ্গত ও বৈজ্ঞানিক নিয়মের সমর্থক। হিন্দুদের এই পুনর্জ্জন্মবাদের মত অতি সন্তোষজনকরূপে জন্ম ও মৃত্যুর সমস্যার সমাধান করে। এই মতবাদের ব্যাখ্যানে হিন্দুরা কখনও ঈশ্বরের উপরে পক্ষপাত ও অবিচারের দোষকে আরোপ করেন না।

খৃষ্টান চার্চ্চের সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমত শিক্ষা দেয়, ঈশ্বর পাপীদের শাস্তি দেন এবং পুণ্যবান ব্যক্তিদের পুণ্যের পুরস্কার দিয়া থাকেন। কিন্তু হিন্দুদের ধর্ম্মশাস্ত্রে কর্ম্মফলের মতবাদ শিক্ষা দেয়—অর্থাৎ প্রত্যেক কর্ম্মের ফল তাহার কারণের অনুযায়ী নিয়মের অনুসারে মানুষ প্রাপ্ত হয়। হিন্দুদের

শাস্ত্রমতে, "ঈশ্বর কাহারও পাপের শাস্তি অথবা পুণ্যের পুরস্কার দেন না। কিন্তু নিজের সৎকর্ম অথবা কুকর্মের ফল আমরা নিজেরাই ভোগ করিয়া থাকি। সুখভোগ অথবা দুঃখভোগ আমাদের পূর্ব্বকৃত কৃতকর্মের অনুসারে ঘটিয়া থাকে।" খৃষ্টান চার্চ্চের আর একটি মতকে হিন্দুরা স্বীকার করিতে কেন চাহেন না—তাহার কারণ, ইহা বলে মানুষের ধর্ম্মসাধনার চরম গতি দেহত্যাগের পর স্বর্গে গমন এবং সেখানে অনন্তকাল ধরিয়া সুখ ও আরাম উপভোগ করা। কিন্তু হিন্দুদের মতে ধর্ম্মসাধনার সর্ব্বোচ্চ গতি স্বর্গে যাইয়া সুখভোগ করা নয়। হিন্দুদের মতে জীবাত্মার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক অবস্থা সমাধি অথবা দিব্যজ্ঞানলাভ—যাহার ফলে সর্ব্ববিধ দুঃখ অশান্তি অজ্ঞানতা ও স্বার্থমলিনতার বন্ধন হইতে চিরমুক্তিলাভ এবং আনন্দস্বরূপে চিরপ্রতিষ্ঠা। এই জন্মেই এই শরীরেই মানুষ ভববন্ধন হইতে নিশ্চিতই মুক্তিলাভ করে, এই জীবনেই মানুষ সাধনার ফলে আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। দেহত্যাগের পরে মানুষ পরলোকে মানবাত্মার সেই অবস্থাই থাকিয়া যায়।

যদিও হিন্দুরা খৃষ্টান চার্চ্চে ধর্ম্মের নামে প্রচারিত ও প্রচলিত গোঁজামিল ও যুক্তিহীন মত ও নিয়মকে স্বীকার করেন না, তথাপি হিন্দুদের মধ্যে অসংখ্য ব্যক্তিই যীশুখৃষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র এবং অন্যতম অবতার-পুরুষ বলিয়া ভক্তি করিতে দ্বিধা করেন না। খৃষ্টানদের অবতারবাদ অপেক্ষা হিন্দুদের অবতারবাদ বহুগুণে যুক্তির দিক দিয়া শ্রেষ্ঠ। যাঁহারা ভগবদ্গীতা নামে হিন্দুদের বিখ্যাত শাস্ত্রকে অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন—পৃথিবীতে অবতাররূপে ঈশ্বরের আবির্ভাবের বিষয়টি সম্বন্ধে হিন্দুদের ধারণা কিরূপ? যীশুখৃষ্টের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব ছিল কি না—সে সম্বন্ধে হিন্দুরা তেমন কোন প্রাধান্য দেন না। 'খৃষ্ট' বলিতে হিন্দুরা অতি উচ্চশ্রেণীর আধ্যাত্মিক অবস্থালাভকারী যে কোনও মহাপুরুষকেই নির্দ্দেশ করেন। হিন্দুদের মধ্যে 'খৃষ্টত্ব' বলিতে সেই পরম আধ্যাত্মিক অবস্থাকেই বুঝায়—যখন আর মানবের মধ্যে কোনও দ্বৈতবোধ ও ভেদভাব থাকেনা, যখন সমস্ত বিকার দ্বন্দ্ব ও ভ্রান্তি চিরশেষ হইয়া যায়—যখন প্রবল বন্যার বেগে ঐশ্বরিক সত্তা মানবের মধ্যে প্রকাশিত ও প্রবাহিত হয়, যখন লৌকিক জ্ঞানের সমস্ত গণ্ডী ও সীমা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়া পরম অসীম অদ্বৈতজ্ঞানের পূর্ণ প্রকাশ দেখা দেয়—যখন মানুষ সাক্ষাৎ ও অপরোক্ষ অনুভূতির দ্বারা জানিতে পারে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা স্বরূপতঃ এক ও অবিচ্ছিন্ন অনাদি অনন্ত সত্তা। এই অবস্থায় যে কোনও ব্যক্তি উপনীত হন, হিন্দুদের মতে তিনি খৃষ্টত্ব লাভ করিয়াছেন। আধ্যাত্মিক এই চরম অবস্থাপ্রাপ্ত সেই ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধ অথবা যীশু যে কোন নামে পরিচিত হউক না কেন তিনিই 'খৃষ্ট' নামে অভিহিত হন। ব্যক্তিগত কোনও বিশেষ নামে হিন্দুদের দৃষ্টিতে কোনও পার্থক্যের সৃষ্টি করিতে পারে না। এই অপরূপ ও পরম আধ্যাত্মিক অবস্থাসম্পন্ন প্রত্যেক মহামানবই ঈশ্বরের অবতার। তাঁহারা সকলেই মহান ও ঐশ্বরিক ভাবসম্পন্ন।

সর্ব্বোচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়াছে—এইরূপ কোনও একজন ব্যক্তিকে আপনারা আমাকে দেখাইয়া দিন—আমি তখনই তাঁহাকে পৃথিবীতে মূর্ত্তিমান ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিব। খৃষ্টানরা অবশ্য মনে করিতে পারেন যে, যীশুই ঈশ্বরের অবতারগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বৌদ্ধরাও বুদ্ধদেবকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবতারপুরুষ বলিয়া মনে করিতে পারেন, অথবা শ্রীরামচন্দ্র কিম্বা শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরা মনে করিতে পারেন, শ্রীরামচন্দ্র অথবা শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবতারপুরুষ। কিন্তু আমরা যখন এই সমস্ত দিব্যভাবসম্পন্ন মহামানবদের জীবনলীলাকে অনুধ্যান করি, তখন দেখিতে পাই ইঁহারা প্রত্যেকেই অপর অবতার-পুরুষদের মতনই মহান। ইঁহাদের মধ্যে একজন হয়তো অনন্তভাবময় ঈশ্বরের কোনও একটি বিশেষ

ভাবকে নিজের মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন—অন্য একজন অবতারপুরুষ হয়তো ঈশ্বরের আর কোনও একটি ভাবকে বিশেষরূপে নিজের জীবনে রূপ দিয়াছেন। ভাগবেধবাসী যীশুর জীবন ছিল সর্ব্বত্যাগময়। আধ্যাত্মিক যোগে যীশু ঈশ্বরের সহিত একাত্মতা লাভ করিয়াছিলেন। এই অবস্থা তাঁহার খৃষ্টত্ব লাভের ও উপলব্ধির প্রমাণ। কিন্তু সাধারণ লোকেরা যীশুখৃষ্টের জীবনের মহান উদ্দেশ্যকে ভুলিয়া যায় বলিয়া—সত্যই যীশুর ঐতিহাসিক অস্তিত্ব ছিল কিনা সেই ব্যাপার লইয়া তাহারা বাদানুবাদ ও মারামারি করে। অজ্ঞ জনসাধারণ ধর্ম্মের নামে কেবল বিবাদ ও গণ্ডগোল করিয়া থাকে। এই সমস্ত অজ্ঞ ব্যক্তিদের এক সম্প্রদায় নিজেদের সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তককে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবতার বা 'প্রফেট' বলিয়া স্বীকার করাইবার জন্য অন্য সম্প্রদায়ের লোকেদের উপরে নানা উপদ্রব ও জোরজবরদস্তি করে। এক সম্প্রদায়ের লোকে অন্য সম্প্রদায়ের লোকেদের নিজের ধর্ম্মে দীক্ষিত করাইবার জন্য নানা রকম কৌশল ও চেষ্টা করে। কিন্তু ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপকে জ্ঞাত জ্ঞানীপুরুষেরা সাম্প্রদায়িকতাবাদী এই সমস্ত জনমণ্ডলীর কার্য্যকলাপকে করুণার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। এই সমস্ত ধর্ম্মান্ধ ও সাম্প্রদায়িক গোঁড়া ব্যক্তিরা কুসংস্কার জাতিশ্রেষ্ঠতা ধর্ম্মান্ধতা প্রভৃতির বশবর্ত্তী হইয়া যাহাতে ধর্ম্মের নামে অপর ধর্ম্মাবলম্বীদের নামে অত্যাচার লাঞ্ছনা নির্য্যাতন প্রভৃতি ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য না করে—সেজন্য ঐ সমস্ত ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরা নানাভাবে চেষ্টা করেন।

যীশুখৃষ্টের যাহা প্রকৃত ধর্ম্ম—সে ধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম; তাহা ত্যাগ-সাধন ও আত্মসংযমের ধর্ম্ম। যীশুর ধর্ম্ম জীবাত্মা ও পরমাত্মার আধ্যাত্মিক যোগ বা সমাধির ধর্ম্ম। ত্যাগ সংযম পবিত্রতা যোগসমাধি যেহেতু হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শের পরিচায়ক, সেইজন্য ঐ সমস্ত গুণের অধিকারী যীশুখৃষ্টকে ও তাঁহার নিজের ধর্ম্মাদর্শকে হিন্দুরা সমগ্র অন্তরে গ্রহণ করেন। কারণ যীশুর প্রকৃত ধর্ম্ম ও সত্যকার হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ মূলতঃ এক ও অভিন্ন। কিন্তু হিন্দুরা যখন দেখেন, খৃষ্টানচার্চ্চের প্রচলিত ধর্ম্ম ত্যাগ বৈরাগ্য সংযম পবিত্রতার প্রচারক নয়, যখন হিন্দুরা দেখেন খৃষ্টান চার্চ্চের উদ্দেশ্য মানবপ্রেম নয়, আত্মসংযম প্রচারও ইহার উদ্দেশ্য নয়—যখন খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী শ্বেতাঙ্গ জাতিদের রাজ্যশাসকেরা ( চীন প্রভৃতি ) অন্যদেশে মদ ও আফিমের ব্যবসা চালাইয়া পাপের প্রশ্রয় দেয়, যখন এইসব বণিকের ও রাজ্যশাসকের জাতি তথাকথিত খৃষ্টানরা অর্থের লোভে অন্যদেশে নানারকম মাদক দ্রব্য আমদানী করিয়া সেই দেশের নিরীহ ও সংযত লোকেদের বেশাখোর ও দুর্নীতিগ্রস্ত করিয়া ফেলে—তখন হিন্দুরা এই তথাকথিত ধর্ম্মকে অবজ্ঞার সহিত প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ এইসব অন্যায় ও ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্যকে যে জাতি ও ধর্ম্ম প্রশ্রয় দেয়, তাহাদের প্রতি হিন্দুদের কখনও শ্রদ্ধা থাকিতে পারে না। হিন্দুরা যীশুখৃষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং হিন্দুরা জানেন—যীশুখৃষ্ট কখনও এই সমস্ত ধর্ম্মবিগর্হিত ও নিন্দিত কার্য্য করেন নাই অথবা তাহাদের প্রশ্রয় দেন নাই।

প্রকৃত ধর্ম্মের প্রধান কর্ত্তব্য—মানুষের মনকে উদার করিয়া দেওয়া, তাহার আধ্যাত্মিক চক্ষু উন্মীলন করা, ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার একত্ব উপলব্ধি করানো এবং ধর্ম্মের নামে মত-বিরোধ বিদ্বেষ ও ঘৃণা দূর করা। যে পর্য্যন্ত না আমরা যথার্থরূপে ধর্ম্মপ্রাণতা লাভ করিতে পারিব সে পর্য্যন্ত ধর্ম্মের নামে আমরা শুধু বিবাদ ও যুদ্ধ করিতেই থাকিব। কিন্তু যখন আমরা প্রত্যেকে নিজের মধ্যে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব, যখন আমরা জানিতে পারিব জাতিধর্ম্ম বর্ণ নির্ব্বিশেষে সমস্ত নরনারীই বিশ্বশিতা ঈশ্বরের সন্তান—যখন আমরা সম্প্রদায়গত সমস্ত মতবাদ নিয়ম ও বিধানবিধিকে অন্ধভাবে মানিবার হীন অবস্থাকে অতিক্রম করিতে পারিব—শুধু তখনই আমরা যীশুখৃষ্ট অথবা অন্য কোনও অবতারপুরুষের যথার্থ অনুগামী ভক্ত বলিয়া পরিচয়

দিবার অধিকার লাভ করিব। তখনই আমরা যীশুখৃষ্টের মতন বলিতে পারিব, "আমি ও আমার পরমপিতা স্বরূপতঃ এক" ( অহং ব্রহ্মাস্মি, সোঽহমস্মি )। খৃষ্ট নামধারী যে ব্যক্তিকে লইয়া ধর্ম্মের নামে বিবাদ বিসম্বাদ, হিন্দুরা সেই ব্যাপারকে আমল দেন না। তাঁহারা চান খৃষ্টের আদর্শকে—যে আদর্শ শিক্ষা দেয়—প্রত্যেক মানুষের মধ্যে খৃষ্টের অবাক্ত ও প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে—যাহা বিশ্বাস করে, প্রত্যেক মানুষই এক একজন অব্যক্ত খৃষ্ট। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন—ঈশ্বরের এই বাণী মানুষমাত্রেরই অন্তরে সর্ব্বদা ধ্বনিত হইতেছে, কিন্তু অজ্ঞানতা ও স্বার্থপরতার কোলাহলে ঈশ্বরের সেই বাণীকে আমরা শুনিতে পাই না। হিন্দুদের শ্রেষ্ঠ অবতারপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "ধর্ম্মের গৌণ ও অসার ব্যাপারের অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া হে মানব তুমি একমাত্র আমারই আশ্রয় গ্রহণ কর, আমার শরণাগত হও। তুমি শঙ্কিত অথবা শোকার্ত্ত হইও না। আমি নিশ্চয়ই তোমাকে সমস্ত পাপ দুঃখ ও অশান্তির দুর্ভোগ হইতে চিরমুক্ত করিয়া দিব।" —(গীতা, ১৮।৬৬)।

যীশুখৃষ্ট বলিয়াছেন, "জীবনভারে ক্লান্ত ও কাতর হে মানবগণ। তোমরা সকলে আমার কাছে এসো। আমি তোমাদের চির বিশ্রাম দান করিব।" এই সমস্ত মানবদের অন্তরবাণী আসুন আমরা সমগ্র চিত্তে শ্রবণ করি। এই সমস্ত বাণীর আভ্যন্তরিক ভাব একই, ইহাদের মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায়, তাহা শুধু ভাষার পার্থক্য। আসুন, আমরা তাঁহাদের সেই সব বাণীকে অনুসরণ করি। তাহা হইলেই আমরা যীশুখৃষ্টের জীবনে প্রকাশিত আসল খৃষ্টধর্ম্মকে উপলব্ধি করিতে পারিব। যে ধর্ম্মাদর্শকে যীশু নিজের জীবনে প্রকাশ করিয়াছেন, আসুন আমাদের জীবনেও যেন তাহাকে জীবন্ত রূপ দিতে পারি। তাহা হইলে আমরাও প্রত্যেকে এক একজন মূর্ত্তিমান যীশু হইতে পারিব। হিন্দুরা শুধু মতবাদের দিক দিয়া যীশুকে গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হইতে পারেন না। বরং যে আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া যীশু যে মহান জীবন-যাপন করিয়াছেন, সেই আদর্শমত জীবনযাপন করিতে অনেক হিন্দু প্রাণপণে চেষ্টা করেন। সেই জীবন—ত্যাগ পবিত্রতা সংযম এবং বিশ্বপ্রেম ও মানবপ্রেমে সমুজ্জ্বল জীবন। এই ভাবে হিন্দুরা সেই শাশ্বত ও সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের নির্দ্দেশকে পালন করিতে সচেষ্ট হন—যে মহান ও সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম যুগে যুগে শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধদেব যীশু শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি ধর্ম্মমূর্ত্তি অবতারপুরুষেরা স্বীয় জীবনের দৃষ্টান্তে জনসমাজকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।*

সমাপ্ত

* পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের দ্বারা নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটি ভবনে প্রদত্ত *Why a Hindu accepts Christ and rejects Churchianity* নামক ইংরাজী বক্তৃতা স্বামী বেদানন্দ কর্ত্তৃক বঙ্গানুবাদ।

# ইতিহাসের এক অধ্যায়

(তিব্বত-ভারত মৈত্রী প্রচারক শ্রীমৎ পূর্ণগিরি গোস্বামী)

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র কর, বি-এস-সি

যোশীমঠ বা জ্যোতির্মঠের দশনামী 'গিরি' সম্প্রদায়ভুক্ত শৈব সন্ন্যাসীগণ বিশেষ সম্মানার্হ। পূর্ণগিরি বা পুরণগির গোঁসাই এই শাখার জনৈক সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসী পুরুষ ছিলেন। বড়লাট ওয়ারেণ হেষ্টিংসের তিনি সমসাময়িক। তাঁহার বিস্তৃত জীবন-কথা জানা যায় না। তবে যতটুকু সংগৃহীত হইয়াছে তাহাতে তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। একাধারে তিনি সন্ন্যাসী, ব্যবসায়ী, পরিব্রাজক, মঠাধীশ ও কূট রাজনীতিজ্ঞ। এই অসামান্য কর্মযোগীর মান ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ থাকিবার উপযুক্ত। সন্ন্যাসী হইয়াও বৃটিশ সরকারের গুরুদায়িত্বপূর্ণকাজে তিনি লিপ্ত হইতেন। সেই হেতু তিনি স্বয়ং গবর্ণর জেনারেলের বিশেষ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। যখন তাঁহাদের উভয়ের পরিচয় ঘটে, তখন পূর্ণগিরির বয়স মাত্র পঞ্চবিংশতি বর্ষ। হেষ্টিংসের মত রাজপুরুষের নিকট এরূপ মর্যাদা-প্রাপ্তির মূলে ছিল তাঁহার গুণাবলী—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুদূর তিব্বত দেশের লোকেরাও তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরাগ প্রকাশ করিতেন। ইহার নিদর্শন স্বরূপ রহিয়াছে তিব্বতী ভাষায় তাঁহাকে প্রদত্ত এক ছাড়-পত্র। তীর্থযাত্রায় তিনি তিব্বত মানস খণ্ডে গমনের প্রাক্কালে তিব্বত সরকার উহা তাঁহাকে সানন্দে দিয়াছিলেন[১]।

১। (ক) Narrative of the Mission of G. Bogle by C. R. Markham, 1897, (খ) Account of an Embassy to court of Teshhoo Lama in Tibet by capt S. Turner, 1800, (গ) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. Lix, Pt. Z, No. I., (ঘ) Indian Pandits in the Land of Snow by S. C. Das, Rai Bahadur, C. I. E. 1893; (ঙ) বাংলার ভ্রমণ (দুইখণ্ড) পূর্ববঙ্গের জেলাসমূহের প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৪০।

যাহাতে এই ভ্রমণকালে পূর্ণগিরি কোন অসুবিধা ভোগ না করেন এই ছাড়পত্রে তাহার সমস্ত দিকে নজর রাখার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এক দেশ হইতে অন্য দেশে কোন রাজপুরুষের গমনাগমনে অনুরূপ সুবন্দোবস্তই করাই আইনসঙ্গত প্রথা। ইহাতে এদেশীয় এই সন্ন্যাসীর প্রতি বিদেশীয়দের যথেষ্ট শ্রদ্ধা লক্ষিত হয়। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে দলাইলামা, টাশী-লামা ও মন্ত্রির সিলমোহরাঙ্কিত এই ছাড়পত্র আসে টাশীলুম্পো হইতে। ঐ দেশের ভাষায় ছাড়পত্রকে বলে—'লমযিগ'। ইহার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ হইতে বিষয়টি পরিস্ফুট হইবে :—

আচার্য পূর্ণগিরি তিনজন অনুচরসহ মানস-সরোবরে (স্থানীয় নাম মংগু) পুণ্য স্নান ও পরিক্রমার্থে যাইতেছেন। তাঁহাদের সকলের জন্য প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য যথা—ইন্ধন, মৃৎপাত্র, তৈজসাদি, অশ্ব, পাচক, পরিচারকাদির ব্যবস্থা করিবেন এই লামাগণ যথা নার্খেন, গঙীরাছন, নো-সন, কুন-ছোগ-লিন, স্যার ছে, নমরীণ ও নীরেনস্থ মঠে। ঘোটক চারিটি, আর সাতটি বলিষ্ঠ ভারবাহী পশুর প্রয়োজন। এতদূরে কোন পশুই একটানা যাইতে পারে না, অতএব পথিমধ্যে ঐসব পশুবদলের ব্যবস্থা থাকিবে। বিশ্বাসী লোক পর্যাপ্ত সংখ্যায় পশু লইয়া পূর্ব হইতেই উপস্থিত থাকিবে। রক্ষ পথপ্রদর্শকের ব্যবস্থা করা হউক। তিনি বরাবর এই দলের দেখা শুনা করিবেন। যাতায়াতে উভয় যাত্রায় সমান ব্যবস্থা থাকিবে। ইহা অতি জরুরী সরকারী আদেশ নামা বলিয়া গণিত হউক"—ইত্যাদি।

পূর্ণ গিরি কয়েক কেন তিব্বতে যাতায়াত করেন। ভারত ও তিব্বত এই দুই দেশের পণ্য বিনিময় তাঁহার আনুষঙ্গিক অবলম্বন ছিল।

মনে হয়, এই অভিজ্ঞতা থাকায় ওয়ারেণ হেষ্টিংস পূর্ণগিরিকে তিব্বতীয় ব্যাপারে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। একবার ঐ দেশস্থ লামা বড়লাটকে এসম্বন্ধে এক পত্র লিখেন; সেই সঙ্গে কয়েকটি সুন্দর উপঢৌকনও আসিল যথা:—কস্তুরিম মৃগনাভি, পশমীবস্ত্র, চীনা রেশমী বস্ত্র, স্বর্ণ ও রৌপ্যময় দ্রব্য, সোণালী চর্ম প্রভৃতি; যে আধারে এইসব জিনিষ প্রেরিত হইয়াছিল তাহাও ঐদেশের শিল্প-দক্ষতার পরিচায়ক। এইসব দ্রব্য দেখিয়া হেষ্টিংসের মনে ঐ দেশের সহিত বাণিজ্যসম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছা হইল। তদনুসারে তিনি নিজ আত্মীয় জর্জ বোগলকে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সঙ্গে দিলেন তাঁহার পূর্ব-পরিচিত ও বিশ্বস্ত পূর্ণ গিরিকে। ১৩ই অক্টোবরে তাঁহাদের যাত্রা সুরু হয়। রাজকার্যে তাঁহার এই প্রথম প্রবাস-ভ্রমণ। গন্তব্যস্থানে ৮ই নভেম্বর উপস্থিত হইয়া পাঁচমাসে তথায় ন্যস্ত কর্তব্য কার্য সমাধান করিয়া পূর্ণগিরি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। এই সহকর্মীর দক্ষতায় বোগলের কার্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল। তাঁহাদের প্রত্যাগমনের সংবাদ পাইয়া হেষ্টিংস হুগলী ও মুর্শিদাবাদের শুল্ক বিভাগকে আদেশ করিলেন যে বোগল ও গিরি সঙ্গে যাহা আনিবেন তাহা যেন বিনাশুল্কে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।[১]

দ্বিতীয় বারের যাত্রা ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে, এবারও সঙ্গে ছিলেন বোগল। এইবারের উল্লেখযোগ্য ঘটনা তাঁহাদের সেখান হইতে চীনের রাজধানী দর্শন ও চীন সম্রাটের সকাশে উপস্থিত হওয়া। তাঁহারা যখন তিব্বতদেশে যান সেইসময়ে তথাকার লামা শিকিংয়ে যাইতেছিলেন। তিনিই ঐ ভারতীয় দলকে সঙ্গে লইয়া যান এবং সম্রাটের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। সামান্য একজন সন্ন্যাসীর পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নয়।

১। Letter of 9. 5. 6775 from Warren Hastings to G. Bogle at Tassisudon—Vide p. 186—Narrative of the Mission of G. Bogle to Tibet etc. by C. R. Markham. 1879

কাপ্তেন টার্ণারের সঙ্গে পূরণগিরি ৯ জানুয়ারী, ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে তৃতীয়বার তিব্বতাভিমুখে রওনা হইলেন। তখনকার দিনে যানবাহনের দুরবস্থার কথা স্মরণ করিলে এই সুদূর পার্বত্য অভিযানের অবস্থা অনুধাবন করা যায়। এত কষ্ট করিয়া নয় মাস পরে (২২-৯-১৭৮৩) তাঁহারা লামার সম্মুখে উপস্থিত হইতে সক্ষম হ'ন। এবারে পূর্ণগিরির প্রবাসের অবস্থান-কাল মাত্র তিন মাস। এত অল্পদিনেই তিনি সরকারের অভিপ্রায় মত সমস্ত ব্যাপার নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন। দেশভ্রমণে তাঁহার অভিজ্ঞতা ও কর্মকুশলতা বৃদ্ধি পাইল। শেষে তাঁকে অধিকতর দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত করিতে হেষ্টিংস মনস্থ করিলেন।

হেষ্টিংস পূর্ণগিরিকে তিব্বতে প্রথম কূটনৈতিক ভারতপ্রতিনিধিরূপে প্রেরণের প্রস্তাব করিলেন। ইহা কম বিস্ময়ের কথা নয়। হেষ্টিংসের কার্যকালের পরে ম্যাক্ফার্সন সাহেব ভারতের পরবর্তী বড়লাট হইয়া তাঁহার পূর্ববর্তীর অভিপ্রায় মত পূর্ণগিরিকে এই কাজে পাঠাইলেন। মাত্র পাঁচমাস অবস্থানের পর তিনি স্বদেশে পুনরাগমন করিয়াছিলেন। টার্ণার-সাহেব লাটের কাছে এই যাত্রার রিপোর্ট পেশ করেন। সমগ্র রিপোর্টটি টার্ণার লিখিত পুস্তকে পাওয়া যায়। তিব্বতে তাঁহার অবস্থানের সমস্ত বন্দোবস্ত করা হয়। যথা সময়ে লামাকে দর্শন করিয়া পূর্ণগিরি তাঁহাকে সরকারী পত্র ও উপহার দ্রব্যাদি অর্পণ করেন। লামার সম্মুখে অবিলম্বে উপঢৌকন পেটিকা উন্মোচিত হইলে লামা এক একটি করিয়া জিনিষগুলি স্বহস্তে লইলেন ও বিশেষ আনন্দপ্রকাশ করিলেন। পত্রটি কিন্তু তিনি স্বহস্তে খুলিয়া লইলেন। বিশেষ সমাদরে লামা তাঁহার পথ ক্লেশের কথা ও কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। এইরূপে ভারতীয় প্রতিনিধি পূর্ণগিরি প্রায় এক ঘণ্টাকাল লামার নিকট অবস্থান করেন। বিদায় কালে তিনি লামার নিকট আশীর্বাদ গ্রহণে উদ্যত হইল, সস্নেহে তিব্বতাধীশ তাঁহার মাথার উপর হাত রাখিয়া আন্তরিক আশীর্বাদ

করিয়াছিলেন। শেষে বলিয়া দিলেন সময় পাইলেই তিনি যেন একবার আসেন।

যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, সে সময়ে বঙ্গ ও তিব্বতের মধ্যে বেশ ব্যবসায়ও বাণিজ্য চলিত[১]। পূর্ণগিরি তিব্বতে গিয়া অনেক ভারতীয় ব্যবসায়ীকে সেখানে দেখিয়াছিলেন। ফেরার সময়ে তিব্বতী রাজপুরুষেরা পূর্ণগিরির হস্তে ইংরাজ সরকারের জন্য একাধিক পত্র পাঠাইয়া দেন। অভিজ্ঞ রাজপুরুষের কর্তব্য নিষ্পন্ন করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। লাট বস্তুরের গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রে ছত্রে ছত্রে তাঁহার নাম দেখা যাইত। বড়লাটের নিকট পেশ করা রিপোর্টে টার্ণার সমগ্র কাজের কথা বিস্তারিত করেন। এই রিপোর্টের তারিখ ৬ ফেব্রুয়ারী, ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দ। এই বিরল নথিটির কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—"Pooranger having recived from Hastings, a short time previous to his departure from Bengal, despatches for Teshoo Lama.....immediately set about preparing for the distant journey.....Immediately upon entering the monastery, he went to the Durbar to announce his arrival of the purpose of his commission..... Pooranger went down to the Lama's tents. He delivered letters of presents with which he had been charged..... Poorangeer says that the young Lama regarded him with a very kind of significant look and spoke to him in Tibet language and asked him if he had a fatiguing Journey.

With respect to the lately established commercial intrecourse Poorangeer informs me, that though he was so early he found himself not the first man who had arrived Teshoo Loomboo from Bengal. Many merchants had already brought their Commodities to market and others followed before he left his place..... Poorangeer during his residence..... had freequent interviews.....Poorangeer having received these despatches, in the beginning of October, after a residence of five months.....took leave of the Lama of the Regent and set out, upon his return, by the same route he came, to Bengal....."

যোগ্য ব্যক্তি বলিয়া প্রথম হইতেই লামা পূর্ণগিরিকে গোপনীয় সরকারী পত্রাদি ইংরাজ সরকারে হস্তান্তরের জন্য দিতেন। বোধ হয় ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংসকে লেখা এক পত্রে এই ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়। ২৯ মার্চ হেষ্টিংস গিরির কাছ হইতে তাহা পাইয়াছিলেন। শুধু পত্রের দ্বারাই নয়, মুখেও বলিবার জন্য লামা পূর্ণগিরিকে অনেক কথার ভার দেন। এই পত্র টার্ণার লিখিত পুস্তকে দেখা যায়[২]।

১। ..."and an old Gossain, who afraid that in passing through Nepal he might be stripped of all the wealth he had been gathering during forty years' trading pilgimages from the banks of the Indus to the plain of Siberia, had obtained leave to pass in company through the Bhutan mountain,....." p 178

"Besides the Gosain when the Lama formerly sent to Calcutta, I am accompanied by another a marchant who for many years traded between Bengal and Tibet." p. 182—Narratives of the Mission of Georgse Bogle to Tibet etc. by C. R. Markham, 1879.

২। .....the bearer of it, who is a Gosain well represent to you all particulars, and it is hoped that you will comply therewith....."—Introduction p IX—Account of an Embassy of the Court of the Teshoo Lama in Tibet by Capt. Samuel Turner. 1800

পূর্ণগিরি সঙ্গে না থাকিলে অর্থ যোগেলকে কোনমতেই কুটীর বাজা অনুমতিপত্র দিতেন না। এই উদ্ধতচেতা সাধুপুরুষের মধ্যস্থতায় তিনি শেষে অনুমতি পাইয়াছিলেন। হেষ্টিংস যোগ্য ব্যক্তিকেই তাঁহার সঙ্গী করিয়া দিয়াছিলেন।

পূর্ণগিরির জীবনে এক স্মরণীয় দিন যেদিন তিনি লামার অভিষেক দর্শনের সুযোগ পাইয়াছিলেন। দেশ বিদেশের অনেক গণ্যমান্য জনের সমক্ষে এই উৎসব সম্পন্ন হয়। প্রাচীন গ্রন্থে তাহার বিবরণ রহিয়াছে।*

শেষজীবনে গিরি মহারাজ কলিকাতার অপর পারে ঘুসুড়ীতে এক মঠের মোহন্ত হ'ন। এই মঠের প্রতিষ্ঠা স্বয়ং হেষ্টিংসের হাতে। অদ্যাপি এই ঐতিহাসিক কর্মস্থান বিদ্যমান আছে; তবে উহার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। হাওড়ার অদূরে বালি-উত্তরপাড়ার নিকটে ভোটবাগান নামে পল্লী আছে। এইখানেই এই মঠ—নাম ভোটবাগান মঠ। ভোট বা তিব্বত দেশীয়দের মঠ বলিয়া ইহার এরূপ নামকরণ। স্বয়ং বড়লাট ও তিব্বতী লামা ইহার সংগঠনের মূলে ছিলেন; ইহা এক স্মরণীয় ব্যাপার। তিব্বতীদের অনুমোদনে তাঁহাদের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র পূরণ গিরিই এই মঠের সর্বপ্রথম মোহন্ত নিযুক্ত হ'ন। যখন এই সাধুপুরুষ তিব্বতে গমনাগমন করিতেন, লামা সেই অবসরে হেষ্টিংসকে পত্রে অনুরোধ জানাইলেন, যেন গঙ্গাতীরে তাঁহাদের এক ধর্মমন্দির স্থাপনের অনুমতি ও ব্যবস্থা করা হয়। তিনি এইজন্য টাকা ও বিস্তর কাপড় পাঠাইলেন। তদনুসারে হেষ্টিংস পূর্বোক্ত অঞ্চলে প্রায় ১৫০ বিঘা জমি সংগ্রহ করেন। এই জমিতে ১লা আষাঢ় ১১৮৫ সালে (১২-ই জুন ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে) ভোটবাগান মঠের উদ্বোধন হইয়াছিল। অদ্যাবধি তিব্বতী ও ভারতীয় দেবদেবী সেই মঠে পূজিত হইয়া থাকেন।

সৌরীন্দ্র বসাক মহাশয়ের দৃষ্টি পড়ে এই পুরাকীর্তির প্রতি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে। তিনি তিব্বত ব্যাপারে অভিজ্ঞ রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাসের সহায়তা লইয়া মঠের নানা তথ্য সাধারণের গোচর করিলেন। তাহার ফল এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত করিলেন। বসাক মহাশয় মঠে কতকগুলি পুরাতন দলিল পত্রাদি পাইয়াছিলেন :—

(১) তিব্বতী ভাষায় পূর্ণগিরিকে একছাড় পত্র—তারিখ ১১৭৮ খৃষ্টাব্দ

(২) ফার্সী ভাষায় জমি বিষয়ক চারিটি দলিল —উহাদের দুইখানিতে তারিখ আছে ১২ই জুন ১১৭৮ ও বাকী দুটিতে তারিখ আছে ১১ই ফেব্রুয়ারী ১১৮৩ খৃষ্টাব্দ। হেষ্টিংসের স্বাক্ষর যুক্ত দুইখানি দলিল ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ।

প্রায় দ্বাদশ বর্ষকাল পূর্ণগিরি এই মঠে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রায় ৫০ বৎসর বয়সে দস্যুর হাতে নিধন প্রাপ্ত হইলেন। যুক্ত তরবারি হস্তে তিনি একেলা আত্মরক্ষার্থে

প্রায় দ্বাদশ বর্ষকাল পূর্ণগিরি এই মঠে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রায় ৫০ বৎসর বয়সে দস্যুর হাতে তিনি নিধন প্রাপ্ত হইলেন। যুক্ত তরবারি হস্তে তিনি একেলা আত্মরক্ষার্থে চেষ্টা করিয়াও নিধন প্রাপ্ত হইলেন। গৌরবময় কর্মময় জীবনের এই পরিণতিতে সকলেই মর্মাহত হইয়াছিল। তাঁহার প্রতি বড়লাট হেষ্টিংস এত সদয় ছিলেন যে, প্রয়োজন হইলে কোন কোন সময়ে গিয়া ভোট-বাগানে গিরির নিকট উপস্থিত হইতেন। কথিত আছে যে, আততায়ী ধৃত হয় ও ঐ স্থানে তাহার

* "……This was Puraugir Gosain, the faithful companion of Bogle, Turner and of the Tesho Lama in his Journey to Peking.…… Puraugir witnessed……the solemn installation (of the Teshu Lama) in the presence of the Dalai Lama, the Chinese political Agent……and the heads of all the monasteries in Tibet"—Narratives of the Mission of George Bogle to Tibet of the Journey of Thomas Manning to Lhasa by C. R. Markham. London, 1897.

চরম দণ্ড ভোগ হয়। মঠ প্রাঙ্গণের প্রান্তভাগে পূর্ণগিরির সমাধিমন্দির তৈয়ারী করেন ২৩ বৈশাখ ১২০২ সালে তদীয় শিষ্য দলজিৎ গিরি। সেই মন্দির মধ্যে শিবলিঙ্গ বিরাজমান। ধাতব ফলকে সেই মঠে বঙ্গাক্ষরে আনুসঙ্গিক লিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে।

শান্তরক্ষিত, কমলশীল, পদ্মসম্ভব, দীপঙ্কর প্রভৃতি বঙ্গের সুসন্তানগণ তিব্বতে যে অমর কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বহুকাল পরে পূর্ণগিরি সেই পার্বত্য রাজ্যে বঙ্গের বাণী ঘোষণা করিয়াছেন অষ্টাদশ শতকে। গীতার কথায়—

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥
—(গীতা, ১৮।৪৬)

এই রকম কর্মবীরই যুগে-যুগে বিভিন্ন দেশে ভাব ও সংস্কৃতির মিলনসেতু নির্মাণ করেন। তাঁহারা সর্বতোভাবে স্মরণীয় ও পূজনীয়। জীবিত-কালে বিনা আড়ম্বরে এই সংসারত্যাগী মহাত্মা কত কাজ করিয়া গিয়াছেন, ইতিহাস তাহার কিছু কিছু সাক্ষ্য বহন করিতেছে। জীবনাবসানে গঙ্গাতীরে নিভৃত প্রান্তরে, লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রকৃতির কোলে তিনি চিরশয়ান। আমাদের দেশবাসীর কর্তব্য তাঁহার সমাধিক্ষেত্রে সমবেত হইয়া শ্রদ্ধা-নিবেদন করা।

---

# ভারত-তিব্বত বাণিজ্যিক সম্পর্কের ঐতিহাসিক-গুরুত্ব

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত, এম-এ

ইতিহাসসাক্ষ্য দিচ্ছে, বহু শতাব্দী ধ'রে তিব্বত সিংকিয়াং, মঙ্গোলিয়া, এবং চীনের সঙ্গে ভারত বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় রেখে এসেছে। তিব্বতী ব্যবসায়ীরা যুগ যুগ ধ'রে এইসব দেশে ব্যবসা চালিয়েছেন। এঁদের স্থাপিত বাণিজ্যকেন্দ্র ঐতিহাসিকদের কাছে কৌতূহলের বিষয় হয়ে রয়েছে। ইতিহাসের পাতায় যে ভারত-তিব্বত বাণিজ্যিক সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায় সেটা তিব্বত কর্তৃক সিংকিয়াং, মঙ্গোলিয়া এবং চীনের সঙ্গে স্থাপিত বাণিজ্যিক সম্পর্কের চাইতে যে রকম নিবিড়তর, সেরকম অধিকতর আন্তরিক।

তিব্বতে অনেকগুলো ছোটবড় বাণিজ্য-কেন্দ্র আছে। তবে সিগাৎসে এবং লাসার বাণিজ্য-কেন্দ্র দুটো সবচাইতে বেশী উল্লেখযোগ্য। কিভাবে পাঞ্জাব এবং লাদাক থেকে ব্যবসায়ীরা এইদুটো বাণিজ্যকেন্দ্রে ব্যবসা করতে যেতেন, সে সম্বন্ধে ইতিহাসে বিভিন্ন ধরণের রোমাঞ্চকর কাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে। সে এবং রুদক থেকে এদের যাত্রা সুরু হতো, মানসসরোবর এবং মরুময় গিরিপথের ভিতর দিয়ে। এঁদের এই বাণিজ্য-যাত্রা তিব্বত এবং ভারতের মধ্যে বহু শতাব্দী ধরে মিলনের পথ প্রশস্ত ক'রে দিয়েছে।

আমরা দেখেছি, ভারতের কয়েকটা নির্দিষ্ট এলাকাকে কেন্দ্র ক'রে নিয়মিতভাবে ভারতীয় এবং তিব্বতী পণ্যের আদানপ্রদান হয়েছে। সেই নির্দিষ্ট এলাকাগুলো হচ্ছে—উত্তরপ্রদেশ, আসাম এবং বাংলাদেশ। কালিম্পংকে ভারত-তিব্বত বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র বললে বোধ করি অত্যুক্তি হবেনা। লাদাক সিগাৎসে এবং পূর্ব তিব্বতের অন্যান্য এলাকা থেকে ব্যবসায়ীরা কালিম্পং-এ বাণিজ্য করতে আসতেন। সিগাৎসে, ইয়াতুং এবং ফারিজোং-এর ভিতর দিয়ে এঁদের বাণিজ্য যাত্রা সুরু হতো। সাধারণতঃ বছরে চার মাস অর্থাৎ নভেম্বর মাস থেকে ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত বাংলার কালিম্পং

বাণিজ্যক্ষেত্রে এঁদের দেখা যেত। বিভিন্ন গিরিপথ এবং উপত্যকা অতিক্রম ক'রে ভারতীয় এবং তিব্বতী ব্যবসায়ীরা দুটো দেশের মধ্যে বন্ধুত্বের চিঠি স্থাপন ক'রে গেছেন। এদের বাণিজ্যযাত্রার কাহিনী পড়তে গেলে চোখের সামনে ভেসে উঠে দেবাজিরি, উদলগিরি, চুম্বি উপত্যকা এবং সিপকি গিরিপথের ছবি। আর কিভাবে এঁদের বাণিজ্যযাত্রা দুটো প্রাচীন দেশের মধ্যে মিলনের সেতু রচনা করে গেছে সেটা অন্তর দিয়ে অনুভব করি। আমরা আশা করি, স্বাধীন ভারত তিব্বতের সঙ্গে বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে চেষ্টা করবেন।

পশম হলো তিব্বতের প্রধানতম বাণিজ্যিক সম্পদ। এই সম্পদই তিব্বতী ব্যবসায়ীরা বিভিন্নদেশে রপ্তানী ক'রে থাকেন। অবশ্য পশম ছাড়াও তিব্বতের আরো কিছু বাণিজ্যিক সম্পদ আছে। এইসব সম্পদও বাইরে রপ্তানী করা হয়। তবে তিব্বতী পশমের মত এগুলো তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।

মানচিত্র আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, ভারত এবং পূর্ব-তুর্কীস্থানের মধ্যে লাডাকের কপাল বাণিজ্যের দিক থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার ক'রে রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে যে কয়েকটি কেন্দ্র এই দুটো দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সংযোগ স্থাপন করেছে সেগুলোর মধ্যে কপাল হলো অন্যতম। চ্যাংচেনমো উপত্যকাটি লাডাকের অন্তর্গত। প্রধানতঃ দুটো কারণে চ্যাংচেনমো উপত্যকার গুরুত্ব বেড়ে গেছে। প্রথমতঃ এই উপত্যকার সঙ্গে যাযরা—উপত্যকা এসে মিশেছে। দ্বিতীয়তঃ এই উপত্যকা থেকে তিব্বত যাবার পথ চলে গেছে। শুধু তাই নয়। এই পথে বিদেশে তিব্বতী পণ্য রপ্তানী করা হয়েছে এবং বাইরের ব্যবসায়ীরা তিব্বতে বাণিজ্য করতে গিয়েছেন। এছাড়া লাডাকের চ্যাংচেনমো উপত্যকা—থেকে ইয়ারখন্দে যাবার পথ চ'লে গেছে। তাই চ্যাংচেনমা উপত্যকার পথে ব্যবসায়ীদের ইয়ারখন্দে তিব্বতী পণ্যের ব্যবসা চালাতে দেখা গিয়েছে। ইতিহাসে লিপিবদ্ধ কাহিনী থেকে জানা যায়, চীন থেকে যে-সব পণ্য পাঠান হতো সেসব পণ্য সংগ্রহ করবার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হচ্ছে—দারচিয়েন্ডো। এই কেন্দ্রটি খামের সীমান্তে অবস্থিত। খাম হচ্ছে—চীনের পূর্ব প্রান্তের প্রদেশ। পণ্যসংগ্রহ কেন্দ্র দারচিয়েন্ডো থেকে দুটো পথ লাসার চলে গেছে। প্রথম পথটির নাম হচ্ছে জুয়াংলাম। দ্বিতীয় পথটির নাম হল চ্যাংলাম। এটা কোকনর এবং চাইদাম থেকে বেরিয়ে এসেছে এবং চ্যাংট্যাং-এর ভিতর দিয়ে লাসার দিকে এগিয়ে গেছে। এই পথটির গুরুত্বের প্রধান কারণ হ'লো এই—এটা চীন, মোঙ্গল, এবং তুরস্কের ব্যবসায়ীদের মধ্যে পণ্য আদানপ্রদান সহজ ক'রে দিয়েছে. মোট কথা হলো এই যে, বহু শতাব্দী ধ'রে তিব্বত পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় রেখে এসেছেন এবং এই সম্পর্কের ভিতর দিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সঙ্গে তিব্বতের বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছে। আমরা আশা করি, এই বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে তিব্বত যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

---

উদ্যম ও পরিশ্রমে ভাগ্যলক্ষ্মী যাঁদের প্রতি প্রসন্না, তাঁরাই দেশের নেতা ও নিয়ন্তা ব'লে গণ্য হন। আর তোদের দেশে জাতের বড়াই কোথে কোয়ে—তোদের অন্ন পর্য্যন্ত ছুটছে না। একটা ছুঁচ গড়বার ক্ষমতা নেই—তবুও তোরা ইউরোপীয়ানদের বিদ্রূপ করিস।

—স্বামী বিবেকানন্দ

# শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদ্বৈত-বেদান্ত সাধনা

শ্রীযতীন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

১৮৬৪ সালের এপ্রিল মাস। দক্ষিণেশ্বর কালী-বাড়ীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই সময়ের কয়েক মাস পূর্ব্বে মধুরভাবের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। এই মধুরভাবের সাধনায় সিদ্ধিলাভের সঙ্গে সঙ্গে দ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈতমূলক সমস্ত প্রকার সাকার মতের সাধনা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনে শেষ হইয়া গিয়াছে। তাহার পর হইতে তাঁহার অন্তরে ঈশ্বরের নিরাকার সগুণ ও নির্গুণ ভাবের সাধনার জন্য প্রেরণা জাগিয়া উঠিতেছিল।

পূর্ব্বোক্ত ১৮৬৪ সালের এপ্রিল মাস (অথবা ১২৬০ সালের চৈত্রের) শেষদিকে একদিন বিকাল বেলায় যুবকবয়সী (তখন ২৮ বৎসর বয়স) রামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর গঙ্গার ঘাটের চাঁদনীর মধ্যে এক কোণে আপনার মনে বসিয়া-ছিলেন। এমন সময়ে গঙ্গার স্রোত-লহরীর মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলিয়া প্রবল ঝড় উঠিল। ঝড়ের বেগ ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল। ঝড়ের প্রচণ্ড গতিতে গঙ্গার তীরে সমস্ত গাছপালা অস্থিরভাবে দুলিতে ও কাঁপিতে লাগিল। বাতাসের গভীর গর্জ্জনে তখন চারিদিক মুখরিত ও সচকিত। ঘোর ধূলিজালে চারিদিক সমাচ্ছন্ন। সামনের লোকজনদেরও ঠিক স্পষ্টভাবে তখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু প্রকৃতির এই প্রচণ্ড চঞ্চলতায় রামকৃষ্ণদেবের কোনই ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি অন্তরের অন্তস্তলে কী এক অবর্ণনীয় ভাবে নিমগ্ন হইয়া বাহ্যজগতের সমস্ত ব্যাপার বিস্মৃত হইয়া শান্ত সমাহিত চিত্তে বসিয়া আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সেই শান্ত সৌম্য মুখে ফুটিয়া উঠিতেছে কী এক অপরূপ সৌন্দর্য্যময় আশ্চর্য্য দীপ্তি।

এই ঝড়ের প্রবলতার মধ্যে হঠাৎ একটি নৌকা আসিয়া দক্ষিণেশ্বরের চাঁদনীর ঘাটে লাগিল। নৌকা হইতে কিছুক্ষণ পরে তীরে নামিলেন অমিততেজা একজন সন্ন্যাসী। বয়সে প্রবীণ হইলেও তাঁহার শরীর তখনও সবল ও সুদৃঢ়। সন্ন্যাসীর দেহ সমুন্নত, সুবিশাল বক্ষ। শান্তগম্ভীর তেজসমুজ্জ্বল তাঁহার মুখ, দুই আয়ত চক্ষু আকর্ণবিস্তৃত। সেই মুখ ও চক্ষুর মধ্যে তপস্যাসিদ্ধি ও দিব্যজ্ঞানের শুভ্র জ্যোতি। তাঁহার গাম্ভীর্য্যময় পবিত্রতাময় উপস্থিতি চাঁদনীতে সমস্ত ব্যক্তিকে তখনি সচকিত ও শ্রদ্ধায় বিস্মিত করিয়া তুলিল। ভয় বিস্ময় ও শ্রদ্ধামিশ্রিত দৃষ্টিতে সকলেই এই মহাগম্ভ প্রবীণ-বয়স্ক সিদ্ধ-সন্ন্যাসীকে দূর হইতে দেখিতে লাগিল।

এই প্রবীণ বয়স্ক সিদ্ধসন্ন্যাসী জাতিতে পাঞ্জাবী। পূর্ব্ব পাঞ্জাবে লুধিয়ানা জেলায় কোনও একটি স্থানে আচার্য্য শঙ্কর প্রবর্ত্তিত দশনামী সন্ন্যাসী 'পুরী' সম্প্রদায়ের কোনও মঠে তিনি থাকিতেন। তিনি দশনামী নির্ব্বাণ আখড়ার সদস্য। অদ্বৈত বেদান্ত মতের সাধনায় ইনি একজন সিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ। ইহার নাম শ্রীমৎ তোতাপুরী স্বামী। পূর্ব্ব পাঞ্জাবের লুধিয়ানার মঠ হইতে ইনি পুরীধামে যাইবার ইচ্ছায় একাকী তীর্থ-পরিক্রমণে বাহির হইয়াছেন। নৌকা করিয়া গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্ত্তী কোনও স্থান হইতে তিনি সেদিন কলিকাতায় যাইতেছিলেন। হঠাৎ প্রবল ঝড় উঠিয়া নৌকা অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না। সেজন্য গঙ্গার পূর্ব্বতীরে নিকটেই দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দির ও পঞ্চবটী তপোবন দেখিয়া তিনি সেখানে নৌকা হইতে নামিয়াছেন। নৌকা হইতে নামিবার কিছুক্ষণ পরেই ঝড় ধীরে ধীরে থামিয়া গেল। সিদ্ধমহাত্মা তোতাপুরীজী অতঃপর কি করিবেন তাহাই ভাবিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের পরিবেশে গাম্ভীর্য্য ও শান্তিময়তা দেখিয়

তোতাপুরীজী সেই রাত্রিটি কালীমন্দিরের কোনও স্থানে যাপন করিতে মনস্থ করিলেন।

এই সঙ্কল্প লইয়া তোতাপুরীজী চাঁদনী হইতে কালীবাড়ীর প্রাঙ্গণের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে যাইতেছিলেন। সহসা সম্মুখে যুবকবয়সী শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিয়া তিনি বিস্ময় ও আনন্দে অভিভূত হইয়া অচল প্রস্তরমূর্ত্তির মতন সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বিস্ময়পূর্ণ চিত্তে তোতাপুরীজী সম্মুখে আত্মসমাহিত শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিতেছিলেন আর ভাবিতেছিলেন, "তন্ত্র ও পুরাণের স্থান বাঙলাদেশে অদ্বৈত-বেদান্ত মতের সাধনায় এমন অসাধারণ অধিকারী কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল?"

অনেকক্ষণ শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিতে দেখিতে শ্রীরামকৃষ্ণের পরিচয় জানিতে ও তাঁহার সহিত আলাপ করিতে শ্রীমৎ তোতাপুরীজির একান্ত ইচ্ছা হইল। সেইজন্য তোতাপুরীজী ধীরেধীরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণও এই অসাধারণ তেজস্বী ও উন্নত-দেহ সিদ্ধসন্ন্যাসীকে দেখিয়া তাঁহার অধ্যাত্মিক মহত্ত্ব তখনি বুঝিতে পারিলেন। সেজন্য শ্রদ্ধা ও আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ তোতাপুরীজিকে দেখিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে কোনও ভূমিকা না করিয়া শ্রীমৎ তোতাপুরীজী শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে একজন অতি অসাধারণ উচ্চ আধার বলিয়া দেখিতে পাইতেছি? তুমি কি আমার নিকট হইতে অদ্বৈত বেদান্তমতে দীক্ষিত হইয়া সাধনা করিবে?"

শ্রীমৎ তোতাপুরীর সেই প্রশ্নে বিশ্বজননীর প্রতি একান্ত নির্ভরশীল শিশুসুলভ শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন, "কি কোরবো, কি কোরবো না,—ওসব আমি কিছুই জানিনা। আমার মা ওসব জানেন। মা যদি তোমার কথা-মতন সাধন কোরতে আমায় আদেশ দেন, তাহলে আমি তোমার কথা-মতন কাজ কোরতে পারি।" তখন শ্রীমৎ তোতাপুরীজী শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বলিলেন, "তবে যাও, তোমার মাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করো গে। যেন বেশী দেরী না হয়। কারণ আমি কোনও জায়গায় তিন দিনের বেশী থাকি না।" তোতাপুরীজী অবশ্য এখানে "মা" শব্দের অর্থে 'গর্ভধারিণী জননী'-ই মনে করিয়া ঐ কথা শ্রীরামকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যখন দেখিলেন—শ্রীরামকৃষ্ণ উঠিয়া সোজাসুজি মা-ভবতারিণীর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, তখন তিনি অবাক হইয়া গেলেন। কারণ একমাত্র নির্গুণ ব্রহ্মবাদী তোতাপুরীর মনে হইল, "নির্গুণ অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বের সাধনায় এমন অসাধারণ উচ্চ অধিকারী সাধক হইয়াও শ্রীরামকৃষ্ণ কেমন করিয়া ধর্ম্মসাধনার নিম্ন স্তরের অধিকারীদের মতন মন্দিরের দেবমূর্ত্তির পূজায় এখনও বিশ্বাসী ও অনুরক্ত হইয়া থাকিতে পারেন? ইহা হয়তো তাঁহার পূর্ব্বজন্ম জীবনের কোনও রূপ দুর্ব্বল সংস্কার। সেজন্য দ্বৈতভাবজনিত সেই পূর্ব্বজন্ম অজ্ঞানতা এখনও এই অসাধারণ যুবকের মধ্যে থাকিয়া গিয়াছে। যাহা হউক, ঠিকভাবে অদ্বৈত মতের শিক্ষা ও উপদেশ পাইলে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে দ্বৈতভাবজনিত এই অজ্ঞতা ও কুসংস্কার আর থাকিবে না।" এই সমস্ত চিন্তা করিতে করিতে তোতাপুরীজির মুখে বিদ্রূপমিশ্রিত করুণার হাসি দেখা দিল।

এদিকে রামকৃষ্ণদেব মন্দিরের মধ্যে যাইয়া জগজ্জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোতাপুরীর নির্দ্দেশমতে তিনি অদ্বৈত-বেদান্ত মতের সাধনা করিবেন কি না। জগজ্জননী তাহাতে তাঁহাকে উত্তর দিলেন, "তোর শিক্ষার জন্যেই আমি বড় তুলে ঐ সন্ন্যাসীকে এখানে নিয়ে এসেছি। তুই যা, ঐ সন্ন্যাসীর কথা-মতন সাধন কর্।" জগজ্জননীর অনুমতি পাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সহর্ষে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীমৎ তোতাপুরীকে তাহা জানাইলেন। পুরীজী তাহাতে প্রসন্ন হইলেন। কিন্তু আর একটি ব্যাপারে শ্রীরামকৃষ্ণ ইতস্তত: করিতেছিলেন। সেটি হইতেছে —অদ্বৈতমতে সাধনার পূর্ব্বে সাধককে সংসারগত ও পরিবারগত সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া বিধিবিহিত-ভাবে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিতে হয়।" সন্ন্যাসব্রত

গ্রহণ করিলে পিতামাতা ভ্রাতা ভগ্নী স্ত্রী প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনের সহিত আর কোনও সংস্রব সন্ন্যাসী ব্যক্তির থাকে না। ইতিপূর্ব্বে শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহময় জ্যেষ্ঠভ্রাতার ( রামকুমার ও চট্টোপাধ্যায়ের ) মৃত্যু হইয়াছে। এমন উপযুক্ত জ্যেষ্ঠপুত্রের শোকে শ্রীরামকৃষ্ণের জননী চন্দ্রমণি তখন অত্যন্ত কাতরা ও বিষাদগ্রস্তা। সুতরাং এই অবস্থায় যদি 'সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিলে জননী মনে কোনও আঘাত প্রাপ্ত হন সেজন্য শ্রীরামকৃষ্ণ ইতস্ততঃ করিতেছেন।

নিজের এই অসুবিধা সেজন্য তোতাপুরীকে জানাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "যদি তুমি গোপনে আমাকে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষা দাও, তাহলে আমি তোমার নির্দ্দেশমত অদ্বৈত-বেদান্ত মতে সাধনা কোরতে পারি।" সেই কথায় তোতাপুরীজী দ্বিরুক্তি না করিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণকে বলিলেন, "বেশ, বেশ—তাই হবে। গোপনেই তোমাকে আমি সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত করবো।" তারপরে, তোতাপুরী একটি শুভদিন স্থির করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে জানাইলেন —সেইদিন যথারাত্রে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে যথারীতি বিরজা হোমাদি অনুষ্ঠানের পরে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত করিবেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাহা শুনিয়া সেই দিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

নির্দ্দিষ্ট সেই রাত্রে দক্ষিণেশ্বর পঞ্চবটিতে নিশুত্ত প্রহরে শ্রীমৎ তোতাপুরী ও শ্রীরামকৃষ্ণ উভয়ে উপস্থিত হইলেন। দুইজনে সামনা-সামনি হইয়া আসনে বসিলেন। প্রথমে সন্ন্যাসব্রত অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক মন্ত্রাদি একে একে তোতাপুরী উচ্চারণ করিতে লাগিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সেইসব মন্ত্রের অনুসরণে আবৃত্তি করিয়া যাইতে লাগিলেন। তাহার পর বিরজা অনুষ্ঠানের হোমাগ্নি প্রজ্বলিত হইল। তোতাপুরীজির নির্দ্দেশ-মত মন্ত্র বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাতে যথাবিধানে এক একটি আহুতি দিতে লাগিলেন। অবশেষে হোম সমাপ্ত হইল। চারিদিক রাত্রির অন্ধকারে স্থির শান্ত ও স্তব্ধ। শুধু ভাগীরথীর স্রোতধারার উমুখর কল্লোল-রব এবং তরুশ্রেণীর আন্দোলিত পত্রপুঞ্জের মর্ম্মর-ধ্বনি মাত্র ধ্বনি মাত্র তখন শোনা যাইতেছে। গুরু ও শিষ্য উভয়ে ধীর শান্ত সমাহিত ও অন্তর্মুখী অবস্থায় নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট। উভয়েই ধ্যানের গভীর আবেশে তন্ময় ও আত্মহারা। ক্রমে ক্রমে রাত্রির অন্ধকার দূর হইল। পূর্ব্ব-দিগঙ্গন উদ্ভাসিত করিয়া স্বর্ণরশ্মিময় অমল আলোক-প্লাবনে সূর্য্যদেব উদিত হইলেন। পঞ্চবটীর শ্যামশোভাময় তরুশ্রেণীর শাখায় শাখায় বিহঙ্গের সমবেত কাকলি-কূজনে প্রভাতের আগমন-বার্ত্তা প্রচারিত হইল। প্রভাতের শুভ্র আলোকের-ধারা ও স্নিগ্ধ সমীর-প্রবাহ অবাধে দিকে দিকে ধাবিত হইয়া জানাইয়া দিল—বহুকাল পরে ধর্ম্মসংস্থাপনের উদ্দেশ্যে মানবমূর্ত্তিধারী বিচিত্রপুরুষ আবার সর্ব্বত্যাগ-ব্রতে নিজেকে উৎসর্গ করিতেছেন।

সন্ন্যাস-দীক্ষা অনুষ্ঠানের পরদিন হইতে তাঁহার সাধন-পদ্ধতি শিক্ষাদান আরম্ভ হইল। নির্গুণ অদ্বৈততত্ত্বের সাধনার আদর্শ ও ক্রিয়া-পদ্ধতি সম্বন্ধে শ্রীমৎ তোতাপুরীজী শ্রীরামকৃষ্ণকে শাস্ত্রের যথাযথ উপদেশ দান করিবার পরে বলিলেন :—

"নিত্য সত্য অপরিণামী ব্রহ্মই একমাত্র সত্তা। ব্রহ্মেরই অপর নাম আত্মা। 'আত্মা' অর্থে ব্যক্তিগত সত্তাকেই বুঝায়। ব্রহ্মই এক অদ্বিতীয় অপরিণামী সত্তা। ব্রহ্মের অতিরিক্ত আর দ্বিতীয় সত্তা নাই। ব্রহ্মই একমাত্র চরম ও পরমতত্ত্ব। ব্রহ্ম সমস্ত নাম রূপ, সমস্ত বিকার ও সর্ব্ববিধ দ্বন্দ্বের অতীত। দেশ কাল নিমিত্তের মধ্য দিয়াই সেই অদ্বৈত ব্রহ্ম জীবের অবিদ্যাবশতঃ এই প্রপঞ্চময় জগৎরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। আত্মসাক্ষাৎকারের ফলে অদ্বৈত-জ্ঞানের উদয়েই ব্রহ্মে এই জগদ্‌ভ্রান্তি দূর হইয়া যায়।

"পঞ্চকোষ (অন্নময়, মনোময় প্রাণময় বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় ), তিন অবস্থা ( জাগ্রৎ, স্বপ্ন সুষুপ্তি ), তিনগুণ ( সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ ), ষড়বিকার ( অস্তি জায়তে বর্দ্ধতে অপক্ষীয়তে বিপরিণমতে এবং নশ্যতি ) এবং সর্ব্ববিধ নাম ও রূপের অতীত অথচ চৈতন্যস্বরূপ নির্ব্বিশেষ অখণ্ড সত্তাই আত্মা।

আত্মার অতিরিক্ত একটি অণুপরমাণু বলিয়া আর কোনও স্বতন্ত্র সত্তা নাই।

"বহু জীব, বহু প্রাণী অথবা বহু পদার্থ—এইরূপ বোধ অজ্ঞানের অবস্থা। অবিদ্যা অর্থাৎ আত্মজ্ঞান-হীনতার অবস্থায় তত্ত্ব একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্মসত্তাকে 'বহু' বলিয়া মনে হয়।

"জীবমাত্রেই স্বরূপতঃ ব্রহ্ম। যাহা জীবের এই ব্রহ্মস্বরূপতার বোধকে আবৃত করিয়া রাখে—তাহাই অবিদ্যা। অবিদ্যার এই ঘোর আবরণ দূর হইলেই স্বপ্রকাশ স্বয়ং জ্যোতিস্বরূপ আত্মা স্বতঃই প্রকাশিত হন।

"যে অবস্থায় একে অন্যকে জানে—যে অবস্থায়—জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা—এই তিন-এর ভেদ থাকে, তাহা অজ্ঞান। যে অবস্থায় বিষয় ও বিষয়ী এই দুই পৃথক সত্তার অনুভব ও বোধ থাকে—তাহা অজ্ঞানের অবস্থা।

"যে অবস্থায় জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা—থাকে না—যে অবস্থায় সাধক সাক্ষাৎ ও অপরোক্ষ ভাবে নিজেকে অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ সর্বব্যাপী অখণ্ড সত্তাস্বরূপী আত্মা বলিয়া জানেন—তাহাই যথার্থ জ্ঞান। যে অবস্থায় জ্ঞানের আর অন্য বিষয় থাকে না—সাধক নিজেই জ্ঞানস্বরূপ হইয়া যান—সেই অবস্থাই চরম অদ্বৈত অনুভূতির অবস্থা।

"নিজেকে অনাদি অনন্ত অব্যয় তত্ত্ব এবং সর্বব্যাপী আত্মা বলিয়া উপলব্ধি করাই অদ্বৈত-বেদান্তের সাধনার লক্ষ্য। সমাধিতে এই অবস্থার উপলব্ধি হয়। জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপতার সমত্ব ও অভেদত্ব উপলব্ধিই সমাধি। 'নেতি নেতি'—(অর্থাৎ, ব্রহ্মটা নয়, ব্রহ্ম উহা নয়) এইরূপ বিচারের দ্বারা মনকে যাবতীয় নাম ও রূপের মোহ এবং সঙ্কল্পাত্মক বিকল্পাত্মক যাবতীয় বৃত্তি হইতে মুক্ত করা অদ্বৈতমতের অন্যতম সাধন।"

"আমি দেহ নই, মন নই—আমি বুদ্ধি ইন্দ্রিয় প্রভৃতি কিছুই নহি। আমার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই—আমি জন্মহীন মৃত্যুহীন অদ্বয় শাশ্বত অব্যয় সত্তা। আমার উৎপত্তি বৃদ্ধি পরিণাম ক্ষয় ও নাশ কিছুই নাই। আমি অবিকারী অপরিণামী নিত্য শাশ্বত অব্যয় আত্মা। আমি সর্বগুণের অতীত, অদ্বয় ও সর্ববন্ধহীন।' এই প্রকার প্রত্যয় স্থায়ী হইলেই অদ্বৈতজ্ঞান সম্ভব হয়।"

শ্রীরামকৃষ্ণকে ব্রহ্মজ্ঞ তোতাপুরীজি এই প্রকারে অদ্বৈত-বেদান্ত সাধনের উপদেশ দিয়া বলিলেন, "শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন—এই ত্রিবিধ উপায় অবলম্বনে এখন নিজের ব্রহ্মস্বরূপতাকে উপলব্ধি কর।" শ্রীরামকৃষ্ণ সেই উপদেশ অনুযায়ী সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মরূপে নিজের স্বরূপ-ভাবনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার অদ্বৈত-ভাবনায় কেবলই একটি বাধা আসিতে লাগিল। শ্রীরামকৃষ্ণ যতবারই নিজের চিত্তকে সমস্ত দ্বৈতভাবের সীমা অতিক্রম করিয়া অদ্বৈতভাবে স্থাপন করিতে যাইবেন—অমনি সেখানে জগজ্জননীর আনন্দঘন কল্যাণময়ী চির সৌন্দর্যসমুজ্জ্বলা অপরূপ মূর্তি আসিয়া দেখা দিতে লাগিল।

বারবার এইভাবে অদ্বৈতভূমিতে মনকে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আসন হইতে উত্থিত হইলেন। তাহার পরে শ্রীমৎ তোতাপুরীর নিকটে সাধনার প্রতিবন্ধকতার কথা তিনি জানাইলেন। তোতাপুরী তাহা শুনিয়া ঈষৎ ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কেন? কিসের জন্য অদ্বৈতভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যাইবে না?" অতঃপর আবার অদ্বৈত-সাধনার আর একটি বিশেষ প্রক্রিয়া তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বলিয়া দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এইবার আসনে বসিয়া মনকে অদ্বৈতভাবের স্তরে লইয়া যাইতে লাগিলেন। এইবারে যেমনি জগজ্জননীর আনন্দরূপিণী মূর্তি তাঁহার ধ্যাননেত্রের সম্মুখে আসিয়া পূর্বের ন্যায় দেখা দিল—অমনি জ্ঞানকে অসিরূপে কল্পনা করিয়া তিনি সেই মূর্তিকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিলেন। তখন তাঁহার মন আর নগুণ উপাসনার কিম্বা দ্বৈতভাবের অনুভূতির স্তরে আবদ্ধ থাকিতে পারিল না। দ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত ত্রিগুণ-উপাসকগণ অনুভূতির সমস্ত ভেদের রাজ্য অতিক্রম করিয়া—

শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতভাবের স্তরে উঠিয়া—নির্বিকল্প সমাধিতে ব্রহ্মস্বরূপতায় সমাকভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইহা সেই অবস্থা—যাহার সম্বন্ধে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য নির্বাণ-ষটকে লিখিয়াছেন,—

"অহং নিরাকারো নির্বিকল্প রূপো,
বিভুত্বাচ্চ সর্বত্র সর্বেন্দ্রিয়াণাম্।
ন চাসঙ্গতং মুক্তিরূপের চিদানন্দরূপো
শিবোঽহং শিবোঽহম্।"

শ্রীরামকৃষ্ণকে ধ্যানের আবেশে নিশ্চল নিষ্পন্দ-দেহ দেখিতে পাইয়া তোতাপুরী বুঝিতে পারিলেন —এইবার শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন-প্রয়াস সফল হইবে। সাধনার সময়ে বাহিরের কোনও লোক আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যানাবেশ ভাঙিয়া দিতে পারে—এই আশঙ্কায় তোতাপুরী কুটিরের দরজা বাহির হইতে বন্ধ করিয়া দিলেন। কুটিরের বাহিরে তোতাপুরী নিজে পাহারা দিতে দিতে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন—তখন শ্রীরামকৃষ্ণ আসন হইতে উঠিয়া তাঁহাকে দরজা খুলিয়া দিতে বলিবেন।

দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটির তপোবনে সাধন-কুটিরের সম্মুখে শ্রীমৎ তোতাপুরীজী স্থিরভাবে বসিয়া আছেন। উৎসুক চিত্তে তিনি অপেক্ষা করিতেছেন—কখন শ্রীরামকৃষ্ণ আসন হইতে উঠিয়া তাঁহাকে দরজা খুলিয়া দিতে বলিবেন? অপেক্ষা করিতে করিতে একদিন, দুইদিন—তাহার পরে তিনদিন পূর্ণাহ্নও চলিয়া গেল। চতুর্থ দিনের সকাল বেলা পর্যন্তও এইরূপ চলিল। তোতাপুরীর মনে তখন কৌতূহল হইল—ব্যাপার কি, তিনদিন চলিয়া গেলেও শ্রীরামকৃষ্ণ আসন হইতে উঠিতেছেন না কেন? অবশেষে তোতাপুরী নিজেই উঠিয়া সাধন-কুটিরের দরজা খুলিলেন।

তোতাপুরী কুটিরের দরজা খুলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে চারদিন আগে যেমন অবস্থায় সমাসীন দেখিয়াছিলেন, তিনি ঠিক সেই একভাবেই দেহবোধবিস্মৃত মুগভীর যোগমগ্ন অবস্থায় আসীন হইয়া আছেন! কৌতূহল পরবশ হইয়া তোতাপুরী তখন শ্রীরামকৃষ্ণের সেই অবস্থায় দেহ লক্ষণ ও মনের অবস্থা দেখিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ শ্রীরামকৃষ্ণের সেই অবস্থা পরীক্ষা করিবার পরে বিস্ময়ে তোতাপুরী অভিভূত হইয়া পড়িলেন। স্তব্ধ হইয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "যাহা দেখিতেছি! তাহা কি সত্য? যে নির্বিকল্প সমাধির অবর্ণনীয় অবস্থা লাভ করিতে আমাকে চল্লিশ বৎসর ধরিয়া একভাবে কঠোর সাধনায় মগ্ন হইতে হইয়াছিল, তাহা কি এই যুবক মাত্র একদিনেই আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে?" তোতাপুরী আবার অনেকক্ষণ ধরিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের সেই অবস্থা পরীক্ষা করিলেন। তাহার পর বিস্ময়ে ও আনন্দে চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "অহো কা দৈবী মায়া! লাভ ইসকো নির্বিকল্প সমাধি হো গিয়া।" (অহো কী দৈবী মায়া! সত্যসত্যই এই যুবকের নির্বিকল্প সমাধি লাভ হইয়াছে)।

যে অবস্থা লাভ করিতে তোতাপুরীজীর মতন এমন একজন উচ্চশ্রেণীর সুযোগ্য সাধককে দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর ধরিয়া অবিশ্রান্ত কঠোর সাধন করিতে হইল—শ্রীরামকৃষ্ণ তাহা একদিনে কেমন করিয়া লাভ করিলেন? ইহার কারণ আর কিছুই নয়। ইহা শুধু আধারগত শক্তির তারতম্য। আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারের ব্যাপারে সিদ্ধ-মহাপুরুষের এবং অবতার-পুরুষের মধ্যে আধারগত ও পরিমাণগত বিপুল পার্থক্য সর্বদা বর্তমান। নদীও জলরাশির আধার, সমুদ্রও জলরাশির আধার বটে। তথাপি তাহাদের আয়তন ও গভীরতার মধ্যে যে বিরাট বিপুল পার্থক্য—কেহই তাহা অস্বীকার করিতে পারে না। তোতাপুরীজী একজন উচ্চশ্রেণীর ব্রহ্মবিদ ও সিদ্ধমহাপুরুষ হইলেও —অবতারপুরুষ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আধারগত ব্যাপারে তাঁহার খর্বতা থাকিবেই।

তোতাপুরীজী প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণকে একজন উচ্চশ্রেণীর সাধক বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন। সেজন্য এত অল্প সময়ের মধ্যে বেদান্তের সর্বোচ্চ অনুভূতির অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণকে উন্নীত হইতে দেখিয়া তিনি তাহা প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারেন

নাই। কিন্তু তাহার পরে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত কয়েকমাস একত্রে বাস ও বেদান্তের প্রসঙ্গে তিনি দেখিলেন—বিনা চেষ্টাতেই শ্রীরামকৃষ্ণ মুহুর্মুহু নির্বিকল্প সমাধিমগ্ন হইয়া যান! বহুদিন এই ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের চরিত্র আচার আচরণ ও আধ্যাত্মিক মহত্ত্ব অনুধাবনের ফলে শ্রীমৎ তোতাপুরীজী মর্মে মর্মে বুঝিতে পারিলেন—"শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু একজন উচ্চশ্রেণীর ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ নহেন—তিনি সত্যসত্যই সেই শ্রেণীর অলোকসামান্য বিচিত্র পুরুষ, যাঁহাদের শরীর মন অবলম্বনে ভগবান যুগে যুগে ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করেন। যুগে যুগে ধর্মসাধনার নব নব সাধন-পদ্ধতি প্রবর্তনের দ্বারা অসংখ্য ব্যক্তিকে মুক্তি ও শান্তি লাভের সঠিক সন্ধান যাঁহারা দান করেন—শ্রীরামকৃষ্ণ সেই ধর্মসংস্থাপক ও ধর্মমূর্তি লোকোত্তর পুরুষদের মধ্যে অন্যতম।

শ্রীমৎ তোতাপুরীজী পাঞ্জাবের যে মঠের অন্তর্গত সন্ন্যাসী—সেই মঠের সন্ন্যাসীরা তিনদিনের বেশী কোনও স্থানে অপেক্ষা করেন না। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের মতন এমন অলোকসামান্য ধর্মপুরুষের সাক্ষাৎ পাইয়া এবং সঙ্গ একান্ত দুর্লভ বলিয়া তিনি দক্ষিণেশ্বরে প্রায় এগারো মাস কাটাইয়া ছিলেন। অবশ্য ইহার পশ্চাতে জগজ্জননীর এক রহস্যময়ী ইচ্ছা ছিল। শ্রীমৎ তোতাপুরী ইতিপূর্বে একমাত্র নির্গুণ ব্রহ্মেই বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি এজন্য ব্রহ্মের লীলাভাব মানিতেন না। সগুণ ব্রহ্মের লীলাবাদ বা শক্তিবাদ তিনি পূর্বে স্বীকার করিতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের অবলম্বনে জগজ্জননী ঘটনার পর ঘটনায় শ্রীমৎ তোতাপুরীর অন্তরে লীলাবাদের সত্যতা ও যুক্তিযুক্ততা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করিলেন। শুদ্ধ পবিত্রাত্মা ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ তোতাপুরী অনেকবার প্রত্যক্ষ অনুভূতির আলোকে দেখিয়া অবশেষে স্বীকার করিলেন—"ব্রহ্ম ও শক্তি সত্যই অভেদ। ব্রহ্ম নিত্য, শক্তি লীলা। ব্রহ্ম ও শক্তি অভিন্ন—যেমন অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তি। যখন নির্গুণ, তখন ব্রহ্ম। যখন শক্তি, তখন সগুণ। এই বিশ্বচরাচরের সমস্ত প্রাণী ও সকল পদার্থই শিবশক্তিময়। লীলাবাদ অদ্বৈতভাবের বিরোধী নয়। কারণ যাঁহারই নিত্যভাব—তাঁহারই লীলাভাব। ব্রহ্ম ও শক্তির এই অভেদ স্বরূপসত্তার মূর্তিই অর্দ্ধনারীশ্বর হরপার্বতী।"

দক্ষিণেশ্বরে তোতাপুরী যখন প্রথমে আসিয়া ছিলেন—তখন তিনি ছিলেন বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গী এবং নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদী সিদ্ধ সন্ন্যাসী। ঈশ্বরে ভক্তির সাধনাকে তিনি তখন নিম্নস্তরের সাধনা বলিয়াই মনে করিতেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মাদর্শ অথবা সাধনপদ্ধতি কখনও একঘেয়ে অথবা একদেশদর্শী ছিল না। তাহা ছিল সাকার নিরাকার, সগুণ নির্গুণ, দ্বৈত অদ্বৈত, জ্ঞান ভক্তি সকল প্রকার ধর্মমতের সাধনা ও অনুভূতির সমন্বয়। সেইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যের ফলে তোতাপুরীর ধর্ম সম্বন্ধে পূর্বতন মত সংশোধিত হইতে লাগিল। তিনি অবশেষে শক্তির উপাসনার এবং ভক্তিমতের সাধনার প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা স্বীকার করিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন।

পাখীর স্বচ্ছন্দভাবে আকাশে উড়িয়া যাইতে হইলে তাহার দুইটি ডানা ও একটি পুচ্ছ থাকা একান্তভাবে প্রয়োজন। ধর্মের আদর্শকে সকল দিক দিয়া দেখিতে জানিতে ও বুঝিতে হইলে তেমনি জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম এই তিন ভাবের সাধনা ও অনুভূতির সমন্বয়পূর্ণ জীবন প্রত্যেক সাধককেই লাভ করিতে হইবে। নিরপেক্ষভাবে যথার্থ যুক্তির সহিত বিচার করিয়া দেখিলে প্রত্যেক সত্যান্বেষী সাধক ভগবদ্গীতার এই মহতী শিক্ষার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ইহাই প্রকৃত ধর্মের সর্বাঙ্গীন রূপ।

শুধু জ্ঞান, অথবা শুধু ভক্তি, অথবা শুধু নিষ্কাম কর্মের সাধনায় মানুষ ধর্মের সর্বাঙ্গীন রূপকে সমগ্রভাবে ও প্রকৃতরূপে উপলব্ধি করিতে পারে না। ভক্তিবিহীন নিষ্কাম জ্ঞানের সাধনায় সাধকের অনুভূতি যেমন একঘেয়ে শুষ্ক ও সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়—জ্ঞানবিহীন ভক্তির সাধনাতেও মানুষ তেমনি ভাবপ্রবণ বহির্মুখী ও অন্ধ-আবেগের বশে

দেহে মনে ও বুদ্ধিতে ভারসাম্যহীন (unbalanced) হইয়া যায়। যে ভক্তিতে মানুষ যথার্থভাবে ও প্রকৃতরূপে ঈশ্বরকে উপলব্ধি ও উপভোগ করে সেই ভক্তি আদৌ জ্ঞান-সম্পর্কহীনা ভক্তি নয়—তাহা জ্ঞান-সংসিক্তা ও জ্ঞানোত্তীর্ণা শুদ্ধাভক্তি। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাই বারবার বলিয়াছেন, "শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধাভক্তি এক।"

প্রকৃত জ্ঞান ও প্রকৃত ভক্তি কখনও পরস্পর বিরোধী নয়—বরং একে অন্যের সহায়ক ও পরিপূরক। 'ঈশ্বরই একমাত্র সত্য' এই উপলব্ধি—এবং ঈশ্বরের সহিত নিজের সম্বন্ধের জ্ঞান সম্পূর্ণ না হইলে মানুষের হৃদয়ে কখনই ঈশ্বরভক্তি ও ঈশ্বরপ্রেম আসিতেই পারে না। আবার অপর দিকে পরমতত্ত্বের প্রতি সর্বতোভাবে অনুরক্ত না হইলে কিছুতেই চিত্তশুদ্ধি হৃদয়শুদ্ধি ও বুদ্ধিশুদ্ধি হয় না। আর হৃদয় চিত্ত ও বুদ্ধি শুদ্ধ না হইলে, কখনই মলিন হৃদয়ে পরমতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হয় না। ধর্মসাধনায় যাঁহারা গভীরভাবে নিমগ্ন হন নাই, তাঁহারাই শুধু মনে করেন—জ্ঞান ও ভক্তি দুই পৃথক ও বিরোধী বস্তু এবং একের সহিত অন্যের কোনও সম্বন্ধ নাই। ভগবদ্গীতায় ইহা সুস্পষ্টভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বুঝাইয়া দিয়াছেন। হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনকারী আচার্য শঙ্করও তেমনি শুধু অদ্বৈতজ্ঞানের ভাস্বরমূর্তিই ছিলেন না। তিনি ছিলেন শুদ্ধাভক্তির ও ভগবৎপ্রেমের সুবিপুল আধার। সমস্ত দেবদেবীর সম্বন্ধে ভক্তিরসবিগলিত গভীর ভাবপূর্ণ এবং প্রসাদগুণের ভাষায় আচার্য শঙ্করের ন্যায় এমন আশ্চর্য সাফল্যের সহিত এত অধিক সংখ্যক স্তোত্র আর কোন ধর্মগুরু মহাত্মারা রচনা করিয়া যান নাই। আধুনিক যুগে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া হিন্দুধর্মের সেই সর্বভাবময় আদর্শকে নিজের অনুভূতির বিপুলতা ও বৈচিত্র্যে পুনরায় উজ্জীবিত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সকল প্রকার ধর্মভাবের সামঞ্জস্য ও সমন্বয়—এবং ধর্মের আদর্শকে সর্বাঙ্গীন পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে অনুভব ও উপলব্ধি করার জন্যই আর্যঋষিবৃন্দ-নিষেবিত এবং অবতারপুরুষদের দ্বারা যুগে যুগে পরিমার্জিত হিন্দুধর্ম এক অতুলনীয় মহিমা ও অপরূপ গৌরবে চির উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে।

শ্রীমৎ তোতাপুরী দক্ষিণেশ্বর হইতে যথাসময়ে চলিয়া গেলেন। তাহার পর তাঁহার আর কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তিনি কবে ও কোথায় এবং কত বৎসর বয়সে মহাসমাধি লাভ করিয়াছিলেন—সে সংবাদ জানিতে পারা যায় না। শ্রীমৎ তোতাপুরীজী দক্ষিণেশ্বর হইতে চলিয়া যাইবার পরে—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছা হইয়াছিল—এখন হইতে তিনি দীর্ঘকাল একভাবে অদ্বৈত-অনুভূতির ঘনীভূত অবস্থায় অবস্থান করিবেন। এই সঙ্কল্প আয়ত্ত হইবার পরে—রামকৃষ্ণদেব পঞ্চবটীর নির্জন তপোবনে সাধন-কুটিরে একদিন নির্বিকল্প সমাধিতে গভীরভাবে নিমগ্ন হইয়া পড়িলেন। ছয়মাসেরও অধিককাল ধরিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ একভাবে অবিশ্রান্ত ধারায় অদ্বৈতভাবের সেই চরম অনুভূতির অবস্থায় নিমগ্ন ছিলেন।

অদ্বৈতভাবের এই ঘনীভূত অবস্থায় এতকাল ধরিয়া একভাবে অবস্থান করা—উচ্চশ্রেণীর সিদ্ধপুরুষদের কথা দূরে থাকুক—লোকশিক্ষা দিবার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ আধিকারিক পুরুষদের পক্ষেও ইহা সম্ভব হয় না। অদ্বৈত বেদান্তের এইরূপ উচ্চ অবস্থায় এরূপভাবে এত দীর্ঘদিন ধরিয়া রামকৃষ্ণদেবের অবস্থানের চিত্র মনোমধ্যে জাগ্রত হইলে—সঙ্গেই তাঁহার উদ্দেশে ভক্তিভরে ধর্মান্বেষী মানবমাত্রেরই শির অবনত হইয়া পড়ে। ইহার দ্বারাই বুঝিতে পারা যায়—এই যুগে ধর্মকে সমগ্রভাবে জাগ্রত করিয়া, সকল ভাবের ও সকল সম্প্রদায়ের প্রকৃত ধর্মান্বেষী অসংখ্য সাধককে ঈশ্বরলাভের সন্ধান দিবার জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল।

এই দীর্ঘ ছয়মাস কাল শ্রীরামকৃষ্ণ একেবারেই দেহবোধ বিস্মৃত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছিলেন। বাহ্যজগতের কোনও চেতনা তো দূরের কথা—দেহের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও তাঁহার কোন জ্ঞান ছিল না।

বিশ্ববিধাতার কোনও সুমহান উদ্দেশ্য শ্রীরামকৃষ্ণকে দিয়া সাধিত হইবে বলিয়াই, বিশ্বনিয়ন্তা অপূর্ব্ব কৌশলে সেসময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের শরীরকে ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। যে সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটীতে এতদূর দীর্ঘকাল সমাধিমগ্ন ছিলেন—সে সময়ে উত্তর-পশ্চিম দেশ হইতে একজন অপরিচিত সন্ন্যাসী আসিয়া দক্ষিণেশ্বরে থাকিতেন। ঐ সন্ন্যাসী বুদ্ধি ও কৌশল করিয়া সমাধিমগ্ন শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে দু'বেলা একটু একটু করিয়া দুধ ঢালিয়া ঢালিয়া তাঁহাকে খাওয়াইয়া দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইবার কিছুকাল পরে সেই সাধু দক্ষিণেশ্বর হইতে অন্যস্থানে চলিয়া গিয়াছিলেন।*

* পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ রচিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ —সাধকভাব" হইতে এই প্রবন্ধ রচনার বিশেষভাবে সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।—ইতি, লেখক।

---

# ব্রহ্মবিদ্ শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ মহারাজ

## ( জীবনকথা ও উপদেশমালা )

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মানসপুত্র পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নাম হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত প্রত্যেক সম্প্রদায়ের অনেক ব্যক্তির নিকট একান্ত শ্রদ্ধার সহিত সুপরিচিত। পূর্ব্বজীবনে স্বামী ব্রহ্মানন্দের নাম ছিল—রাখাল চন্দ্র ঘোষ। চব্বিশপরগণা জেলার বসিরহাট পরগণার সিকরা কুলীন গ্রামে একটি সম্ভ্রান্ত ও ধনী কায়স্থ বংশে স্বামী ব্রহ্মানন্দ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১২৬৩ সালের ৮ই মাঘ মঙ্গলবার শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের জন্ম-তারিখ। স্বামী ব্রহ্মানন্দের পিতা আনন্দমোহন ঘোষ প্রকাণ্ড জমিদারী ও কয়েকটি পাইকারী ব্যবসায়ের দ্বারা অগাধ অর্থ ও বিষয়সম্পত্তির মালিক হইয়াছিলেন। আনন্দমোহনের দুই বিবাহ। তাঁহার প্রথমা পত্নীর নাম কৈলাসকামিনী। দ্বিতীয়া পত্নীর নাম হেমাঙ্গিনী। আনন্দমোহনের প্রথমা পত্নী কৈলাসকামিনী অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা ও ভক্তিমতী ছিলেন। রাখাল মহারাজ তাঁহারই একমাত্র পুত্র। পাঁচ বৎসর বয়সে রাখাল মাতৃহীন হইয়াছিলেন। তখন আনন্দমোহন হেমাঙ্গিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। হেমাঙ্গিনী অতিশয় স্নেহশীলা ও মধুর চরিত্রা নারী ছিলেন। হেমাঙ্গিনীর অবিশ্রান্ত স্নেহযত্নেই রাখালের শৈশব বাল্য এবং যৌবনকাল অতিবাহিত হইয়াছিল।

ধর্ম্মের জন্য আকুলতা ও ঈশ্বরলাভের ব্যাকুলতা জন্ম হইতেই ছিল বলিয়া সম্ভ্রান্ত ধনী জমিদারের পুত্র হওয়া সত্ত্বেও রাখাল কখনও সাংসারিক ভোগবিলাসে মন দিতে পারেন নাই। বাল্যকাল হইতেই তিনি নির্জ্জনে ধ্যানমগ্ন হইয়া থাকিতে ভালবাসিতেন। রাখালের ধর্ম্মের দিকে এই প্রকার তীব্র আকর্ষণ দেখিয়া আনন্দমোহন তাঁহাকে আঠারো বৎসর বয়সেই বিবাহ দিয়াছিলেন। রাখালের সাধ্বী ও ভক্তিমতী স্ত্রীর নাম বিশ্বেশ্বরী। বিবাহ দিলেও পিতা রাখালকে সংসারে বাঁধিয়া রাখিতে পারিলেন না। প্রায় উনিশ বৎসর বয়সে ( ১৮৮১ ) দক্ষিণেশ্বরের তপোবনে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত রাখালের প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল। প্রথম দর্শনেই রাখাল শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট ও অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিয়াই রাখালের মনে হইয়াছিল—"ইনিই তো আমার আপনা হইতেও আপনার। এমন স্নেহ ভালবাসা পিতামাতার কাছেও তো পাওয়া যায়

না। ইহার স্নেহ ভালবাসা যেমন নিঃস্বার্থ ও অযাচিত তেমনি অহেতুক ও অবিশ্রান্ত।"

বয়সে প্রায় যুবক হইলেও রাখাল স্বভাবে শিশু-প্রকৃতির অবস্থায় ছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে আসিলে রাখাল একেবারে ক্ষুদ্র শিশুর মতন একান্তভাবে তাঁহার প্রতি নির্ভরশীল ও আত্মহারা হইয়া পড়িতেন। আবার মানসপুত্র রাখালকে দেখিলে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরে শতধারে পুত্রবাৎসল্যের ও স্নেহের সুধানির্ঝর উছলিয়া উঠিত। জগজ্জননী শ্রীরামকৃষ্ণকে বলিয়া দিয়াছিলেন—রাখাল তাঁহার সর্বত্যাগী মানসপুত্র। শ্রীরামকৃষ্ণ জানিতেন ও প্রায়ই বলিতেন, "নরেন্দ্র (পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ) রাখাল—এরা সব নিত্যসিদ্ধ, আজন্ম ব্রহ্মজ্ঞানী। সাধ্যসাধনা কোরে লোকের একটু আধটু ভক্তি হয়। এরা আজন্ম ঈশ্বরের ভক্ত—যেন পাতাল-ফোঁড়া শিব—বাসানো শিব নয়।" দক্ষিণেশ্বরে রাখাল শ্রীরামকৃষ্ণের পদপ্রান্তে স্বামী বিবেকানন্দ ছাড়াও স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রভৃতি সর্বত্যাগী যুবক গুরুভ্রাতাদের সহিত একত্রে ধর্মশিক্ষা ও ধর্মসাধনা করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের সুবিপুল আধ্যাত্মিক প্রভাবে ও তাঁহার অনাবিল স্নেহের আকর্ষণে রাখাল আর সংসারে আবদ্ধ থাকিতে পারিলেন না। স্নেহময় পিতার বিপুল ঐশ্বর্য, সতীসাধ্বী স্ত্রীর নির্মল পতি-ভক্তি, নবজাত সুকুমার শিশুপুত্র প্রভৃতি সমস্তই পিছনে পড়িয়া রহিল। ঐশ্বর্যশালী ও সম্ভ্রান্ত ধনী জমিদারের বহু আদরের পুত্র রাখাল যৌবনেই ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের অন্যতম বিশিষ্ট লীলাসহচররূপে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া গেলেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ (১৬ই শ্রাবণ রবিবার) ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগ হইয়াছিল। তাঁহার পরে ঠাকুরের সর্ব-প্রধান ও প্রিয়তম শিষ্য নরেন্দ্রনাথের (শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের) নেতৃত্বে ঠাকুরের যুবক শিষ্যগণ সন্ন্যাসী হইয়া কঠোর তপস্যায় সকলে নিমগ্ন হইলেন। রাখালও এখন হইতে যথাবিধানে সন্ন্যাসী হইয়া 'স্বামী ব্রহ্মানন্দ' নামে পরিচিত হইলেন। সেই সময় হইতে নিজের সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতা-দের সহিত বরাহনগরের মঠে তিনি একাগ্রচিত্তে ও বিমিশ্রভাবে কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন।

ইহার পরে অন্যান্য সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাদের মতন স্বামী ব্রহ্মানন্দও প্রায় ছয় সাত বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষের বহু তীর্থস্থানে পর্যটন এবং তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। এই সময়ে তিনি পুরী কাশী বৃন্দাবন প্রয়াগ হরিদ্বার ওঙ্কার গৌরীকুণ্ড প্রভৃতি স্থানে সাময়িক পূর্ণকুটিরে বাস ও তপস্যা করিতেন। প্রথম প্রথম তিনি মাধুকরী ভিক্ষা করিতেন। শেষে তাহাও ছাড়িয়া দিয়া তিনি অপ্রতিগ্রহ ব্রত ও আকাশবৃত্তি অবলম্বন করিলেন। ঐ সময়ে বৃন্দাবনে কখন কখনও স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী সুবোধানন্দ প্রভৃতি কোন কোনও সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতারা সাধন-সঙ্গীরূপে তাঁহার সহিত থাকিতেন। অন্য সময়ে তিনি প্রধানতঃ একাই নিঃসঙ্গ নির্জন অবস্থায় থাকিতেন। সে সময়ে তাঁহার পরিধানে ছিল শুধু বহির্বাস ও একটি চাদর। শয্যা একখানি কম্বল। ব্যবহারের জন্য একটি কমণ্ডলু। জামা জুতা প্রভৃতি আদৌ ব্যবহার করিতেন না। বেশীর ভাগ সময়েই পায়ে হাঁটিয়াই তিনি পথ চলিতেন। অবশেষে দক্ষিণভারতে নর্মদার তীরে একটি নির্জন নিরালা স্থানে স্বামী ব্রহ্মানন্দ নির্জনে তপস্যা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার তপস্যার কঠোরতা ও একনিষ্ঠ সাধনার কথা অল্প স্বল্প যাহা শুনিতে পাওয়া যায়—তাহাতে ভক্তি-বিস্ময়ে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। ধ্যানের গভীরতায় দুই তিন দিন ধরিয়া তাঁহার একেবারে অবিশ্রান্তভাবে তখন কাটিয়া যাইত। অবশেষে একবার তিনি একাসনে আটদিন ধরিয়া নির্বিকল্প সমাধিতে একভাবে মগ্ন হইয়া ছিলেন। এইরূপে সন্ন্যাস-জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শের অনুভূতিতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ আত্মসাক্ষাৎকার করিলেন। তাহার ফলে তিনি অসীম আনন্দসত্তায় সম্যক প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এখন হইতে তাঁহার 'ব্রহ্মানন্দ' নাম অক্ষরে অক্ষরে সফল হইল।

১৮৯৭ সালে যে মাসে পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সূচনা করেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে স্বামিজী বেলুড়ে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের প্রধান কেন্দ্র-ভবন স্থাপন করেন এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ট্রাস্টীডীডে তাঁহার সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাদের উপরে অর্পণ করিয়াছিলেন। স্বামিজীর একান্ত ইচ্ছায় এবং অন্য সমস্ত গুরুভ্রাতাদের সম্মতিক্রমে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে মঠ ও মিশনের প্রথম প্রেসিডেন্ট ও প্রধানাচার্যরূপে নির্বাচিত করা হইল। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ মহাসমাধি লাভ করেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনকে গঠনের ব্যাপারে স্বামিজী একটি পরিকল্পনা ও নির্দিষ্ট কার্যপদ্ধতি দিয়া গিয়াছিলেন। ১৯০১ হইতে ১৯২২ সাল পর্যন্ত স্বামী সারদানন্দ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ স্বামী অভেদানন্দ প্রমুখ তাঁহার বিশিষ্ট গুরুভ্রাতাদের সাহায্যে স্বামী ব্রহ্মানন্দ সেই পরিকল্পনাকে কর্মে পরিণত করেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিস্তৃতি ও প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে স্বামী ব্রহ্মানন্দের ব্যক্তিত্ব দূরদর্শিতা ধীশক্তি ও সংগঠন-পদ্ধতির ফল আশ্চর্যভাবে সাফল্য আনিয়া দিয়াছে।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের সমস্ত মূর্তি একটি অপার্থিব সৌন্দর্য ও জ্যোতিতে সুন্দর ও উজ্জ্বল ছিল। তাঁহার পরম প্রশান্ত ও সদানন্দময় মুখশ্রী মানুষের প্রাণে শান্তি বর্ষণ করিত। সত্যই স্বামী ব্রহ্মানন্দ ছিলেন শান্তি আনন্দ ও কল্যাণের মানবীয় রূপ। বেলুড় মঠ, ভুবনেশ্বর মঠ, মাদ্রাজ মঠ, কাশী-অদ্বৈত আশ্রম অথবা যে কোনও স্থানে তিনি থাকিতেন—তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া সেই স্থানে সকলের প্রাণে শান্তি ও আনন্দের একটি বন্যা বহিয়া যাইত। তাঁহার পবিত্রতাকারী অপরূপ উপস্থিতিতে অনেক শুদ্ধচিত্ত ধর্মানুরাগী নরনারী অকস্মাৎ ধ্যানতন্ময়তায় আবিষ্ট হইয়া যাইতেন। সংসারসন্তপ্ত শোকার্ত বেদনা ক্লান্ত বহু নরনারী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বসিলে তাহাদের সমস্ত জ্বালা জুড়াইয়া যাইত।

পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রায় কুড়ি বৎসরের অধিককাল রামকৃষ্ণ মঠের প্রধান ধর্মাচার্যের আসনে সগৌরবে বিরাজ করিয়াছিলেন। আধ্যাত্মিক শক্তির ও দিব্যজ্ঞানের তিনি জীবন্ত মূর্তি ছিলেন। পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দকে স্বামিজী বলিতেন "You are a mountain of spirituality—তোমার মধ্যে পাহাড়-প্রমাণ আধ্যাত্মিকতা আছে।" জ্ঞান ভক্তি ও কর্মযোগের সাধনা স্বামী ব্রহ্মানন্দের সুবিপুল অনুভূতিতে অপরূপভাবে সমন্বয় লাভ করিয়াছিল। ভারতবর্ষের বহু সিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ স্বামী ব্রহ্মানন্দকে ধর্মশক্তির আধার ও ব্রহ্মবিদপ্রবর বলিয়া আপনাদের শ্রদ্ধা জানাইয়াছেন। এরূপ একজন নিত্যমুক্ত ও আদর্শ ব্রহ্মবিৎ মহাপুরুষ হওয়া সত্ত্বেও স্বামী ব্রহ্মানন্দের শিষ্যসংখ্যা অতিশয় অল্প। শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা তাঁহার নিকট অত্যন্ত অপ্রিয় ছিল। যেখানে সেখানে, যখন তখন, যাহাকে তাহাকে ধর্মের সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া তাঁহার রীতি ছিল না। তবে যথার্থ ধর্মান্বেষী ব্যক্তিদের আকুলতা ও আগ্রহ দেখিলে তিনি একান্ত স্নেহ বশে তাঁহাদিগকে কখন কখনও উপদেশ দিতেন। এই সমস্ত উপদেশ তাঁহার সাক্ষাৎ অনুভূতি হইতে প্রসূত হইত। অতি সহজ ও সরল ভাষায় তাঁহার উপদেশ। কিন্তু ব্রহ্মবিদ সত্যদ্রষ্টা পুরুষের প্রত্যক্ষ অনুভূতির নিদর্শন বলিয়া সেইসব উপদেশ যেমন শক্তিময়, তেমনি সংশয়নাশক, অভয়প্রদ, তেমনি প্রাণস্পর্শী। পূজনীয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের উপদেশাবলী তাঁহার সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আগত কোন কোন ব্যক্তি কিছু পরিমাণে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কয়েক বৎসর হইল তাহার অনেক উপদেশ সঙ্কলিত হইয়া "ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ" নামে একটি অতি শিক্ষাপ্রদ পুস্তকও বাহির হইয়াছে।

ধূলিময়ী এই পৃথিবীতে সত্যদ্রষ্টা লোকোত্তর মহামানবেরা বেশীদিন অবস্থান করেন না। মানবদেহ ধরিয়া বিশ্ববিধাতার নির্দেশ সাধন করিতে তাঁহারা এখানে আসেন। সেই নির্দেশ-পালন শেষ হইলেই তাঁহারা আবার 'আপনাদের জ্যোতির্ময় দিব্যধামে ফিরিয়া যান।' পূজ্যপাদ

স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রায় ষাট বৎসর কাল এই পৃথিবীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। আধ্যাত্মিক মহিমা মানব-কল্যাণ এবং মানবীয় মহত্ত্বের একটি অনন্ত দৃষ্টান্ত স্বীয় জীবনে তিনি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল ( ২৭ চৈত্র ১৩২৮ ) সোমবার শুক্লা ত্রয়োদশীর পুণ্য তিথিতে ব্রহ্মবিদ্-প্রবর পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ দিব্যধামে প্রত্যাগত হইয়াছেন। তাঁহার তপঃসিদ্ধ বিচিত্র জীবন বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রের মহতী বাণীরই জীবন্ত রূপ। তাঁহার উপদেশাবলী ধর্ম্মান্বেষী সাধক এবং সংসারসন্তপ্ত নরনারীদের অভয় ও সান্ত্বনার অফুরন্ত উৎস।

এই বৎসরে ( আগামী ৩০ মাঘ ১৩৬২—১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬ ) মাঘী শুক্লাদ্বিতীয়ায় পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দের অন্তর্দিবস পড়িয়াছে। সেই শুভ ও পবিত্র দিনের স্মরণে ব্রহ্মবিদ্ শ্রীরাজা মহারাজের ( স্বামী ব্রহ্মানন্দের ) উদ্দেশে বারবার ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া—তাঁহার কয়েকটি উপদেশ আমরা এখানে সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

**পূজ্যপাদ শ্রীব্রহ্মানন্দ মহারাজের উপদেশমালা :—**

ভগবানের নাম করা সকল সময়েই উচিত। যখনি কাজ থেকে কোন ফুরসৎ ( অবকাশ ) পাবে, তখনই ভগবানকে স্মরণ করবে। পুজোর ঘরে রোজ সকালে ও রাত্তিরে জপ ধ্যান তো করতেই হবে। তা ছাড়াও অন্য সময়ে ভগবানকে স্মরণ করবে।

ভগবানের নামের শক্তি অশেষ। (ভগবানের) নামই একমাত্র সাধন। সরল প্রাণে ভক্তিভরে ইষ্ট-দেবতার নাম জপ কোরে যাও। লেগে-প'ড়ে থাকলে উপায় হবেই হবে।

ভগবানের নাম তো অনেক। তাঁর কোন্ নামটি জপ কোরলে তোমার শান্তি ও কল্যাণ হবে, তা যে সে বলতে পারে না। সিদ্ধগুরুই এসব ঠিক কোরে জান।

সিদ্ধগুরুর অন্তর্দৃষ্টি আছে। সেই দৃষ্টি অব্যর্থ সেই দৃষ্টিতে তিনি শিষ্যের বা'ব-তেতর সবই দেখতে পান। ভগবানের কোন্ নাম নিয়ে জপ কোরলে তোমার কল্যাণ হবে—তা তিনিই ব'লে দেবেন।

ঈশ্বরকে একেবারে সাক্ষাৎভাবে দেখেছেন—এমন মহাপুরুষই গুরু। সিদ্ধপুরুষই ঠিক ঠিক ভাবে সাধনার পথ দেখিয়ে দিতে পারেন। আনাড়ী লোককে গুরু কোরলে মহামুস্কিল হয়। ঈশ্বরকে যে দেখেনি, সে রকম লোক তোমাকে কেমন কোরে ভগবান লাভের পথ দেখাবে?

'সাধন করা'—মানে—ঈশ্বরের চিন্তায় মনকে ডুবিয়ে রাখা। কিসে সমস্ত মন ভগবানের চিন্তায় একেবারে ডুবে যায়—সব-সময়ে সেই চেষ্টাই করবেন। প্রার্থনা কোরে, কিম্বা জপ কোরে, কিম্বা তাঁর গুণ চিন্তা কোরে—যেমন কোরে পারেন মনকে ইষ্টচিন্তায় লাগিয়ে রাখুন।

সাধনের সব কথা শাস্ত্রে লেখা নেই। শাস্ত্রে শুধু সাধনের outline ( আভাস ) দেওয়া আছে। Details ( সমস্ত খুঁটিনাটি ) জানতে হ'লে কোনও সিদ্ধ মহাপুরুষের কাছে দীক্ষা নিয়ে তাঁর শিক্ষা ও উপদেশ নিতে হয়।

শুধু দীক্ষা নিলেই হবে না। লেগে প'ড়ে থেকে এক-মন হয়ে সাধন কোরে যেতে হবে। যতবড়ো মহাপুরুষের কাছেই দীক্ষা নাও—নিজেকে খাটতে হবে। গুরু শুধু ( সাধনার ) পথ দেখিয়ে দেন। কিন্তু তোমাকে নিজের চেষ্টাতে সেই ঠিকানায় যেতে হবে।

Progress ( সাধনায় উন্নতি ) কম কোরে একদিনেই হয় না। এখন তেমন উন্নতি হচ্ছে না ব'লে নিরাশ হবেন না! নিষ্ঠা নিয়ে একভাবে লেগে প'ড়ে থাকুন। আন্তরিক হয়ে ভগবানকে ডাকলে সে ডাক বৃথা যায় না।

রোজ খুব ভোরবেলায় উঠবেন—সূর্য্য ওঠবার অন্ততঃ দেড়ঘণ্টা আগে। সকাল বেলা চারদিকে খুব শান্ত ও পবিত্র atmosphere ( আবহাওয়া ) থাকে। এই সময়ে নির্জ্জনে বসে ভগবানকে ডাকবেন।

প্রথমে তো ওরকম গোলমাল হবেই। তার জন্যে হতাশ হতে নেই। মন যতই ইষ্টচিন্তা থেকে ছোটকে যাক্—আবার তাকে টেনে নিয়ে আসবে। আবার তাকে ইষ্টচিন্তায় লাগিয়ে দাও।

এই মন স্থির করা কি সোজা কথা রে বাবা! বড় বড় সাধকদেরই কত জন্ম কেটে যায়—সামান্য মানুষের আর কি কথা। একদিনেই তো হয় না। মাসের পর মাস অভ্যাস কোরে যেতে হয়। আন্তরিক টান থাকলে মন স্থির হবেই হবে। কেন ভয় পাস? কাতর হয়ে ডাক্। উপায় হবেই।

রোজ ধ্যান-ভজন করা উচিত। কোনদিনই বাদ দেওয়া উচিত নয়। একটা বাঁধা সময় ঠিক কোরে নেবেন। দু'বেলা নিয়ম মতন রোজ জপ ধ্যান কোরে যান। ঠিকভাবে এই রকম রোজ অভ্যাস কোরে গেলে—একবছর বাদে নিশ্চয়ই তার একটা ফল পাবেন।

আসনে বসে প্রথমেই ধ্যান কোরবি না। প্রথমে ইষ্টদেবতার কাছে ভক্তি মুক্তির জন্যে প্রার্থনা কোরবি। এতে প্রায় পনেরো মিনিট গেলে তারপরে ইষ্টদেবতার স্তব-স্তুতি কোরবি। তারপরে মন্ত্রজপ কোরবি। মন্ত্র জপ কোরতে কোরতে ইষ্টদেবতার রূপ চিন্তা কোরে যাবি। এই রকম কিছুদিন করতে করতে দেখবি ইষ্টদেবতায় মন স্থির করতে তত অসুবিধে থাকবে না।

ধ্যান করার মানে সেই অবস্থা—যখন মন অন্য সমস্ত চিন্তা ছেড়ে শুধু অনবরত ইষ্টচিন্তায় ডুবে যায়, ইষ্টের ভাবে তন্ময় হয়ে পড়ে। ঠিক ঠিক ধ্যান হচ্ছে—ইষ্টদেবতাকে দর্শন করা।

মন স্থির হয় না—তার কারণ—দিবারাত্রি অন্য সমস্ত বাজে বিষয়ে চিন্তা করা। বাজে গল্প করা ভারী খারাপ। ওতে মনকে বহির্মুখী কোরে দেয়। যারা এদিকে উন্নতি কোরতে চায় তাদের বাক্-সংযম অভ্যাস করা খুবই দরকার। বাক্-সংযম না হলে মন-সংযম হয় না। মন সংযম না হ'লে মনকে ইষ্টচিন্তায় স্থির করা যায় না।

সরল ও শুদ্ধ মনেই ঠিকভাবে ধ্যান হয়। যতক্ষণ না মন সরল ও পবিত্র হয়—ততক্ষণ সাধন ভজন সবই বৃথা।

যতদিন পর্য্যন্ত বিষয়বাসনা থাকে, মনে ততদিন মলিনতা থাকবেই। মন অশুদ্ধ থাকলে সে চঞ্চল থাকবেই—নানাদিকে ছুটে বেড়াবে। সৎচিন্তা ও সৎকামনা অভ্যাস কোরে গেলে মন ক্রমশঃ স্থির হয়।

গুরুর কাছে থেকে সাধন-ভজন কোরে যেতে হয়। সাধন কোরতে কোরতে তোমার কোথায় আটকাচ্ছে সিদ্ধগুরু তা জানতে পারেন। নিজের দোষদৃষ্টির বলে সেইসব difficulties (অসুবিধা ও বাধা) জেনে নিয়ে—ওসব সরিয়ে দেবার উপায় তিনি শিখিয়ে দেন।

সৎপ্রসঙ্গ যত বেশী কোরবে মন ততই পবিত্র হবে। সৎপ্রসঙ্গের ফলে মন ঈশ্বরমুখী হয়। যখনই দু'চার জন একসঙ্গে থাকবে তখনই ভগবানের প্রসঙ্গ কোরে যাবে।

ধ্যানের সময়ে আসনে স্থির হয়ে বসবে। যে রকম ভাবে বসলে তুমি অনেকক্ষণ ধ্যান জপ কোরতে পারে—সেই রকম আসনেই বসবে। পিঠ সোজা থাকবে। হৃদয়ের মধ্যে ইষ্টদেবতার জ্যোতির্ময় রূপ চিন্তা কোরতে হয়।

ধ্যানে বসবার আগে রোজ মনে মনে গুরুকে স্মরণ ও প্রণাম কোরতে হয়। সিদ্ধগুরুর ভেতর দিয়েই ঈশ্বর শিক্ষা দেন, কৃপা করেন। সিদ্ধগুরুর আশ্রয় পাওয়া অনেক জন্মের পুণ্যে হয়। গুরুকে ভক্তিভরে প্রণাম কোরে—তাঁর আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা কোরবে। তারপরে ধ্যানে বসবে।

আন্তরিক হয়ে মনপ্রাণ ঢেলে সাধন কোরে যাও। তিন বছর খুব জোরসে খাটো। তারপর তাঁর কৃপা নিশ্চয়ই জানতে পারবে।

# 'চর্য্যাপদ'-এর শিল্প-সুষমা

শ্রীঅনিলকুমার হালদার

ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়া চর্য্যাপদের সিদ্ধান্তের বাংলাসাহিত্যের আদি উন্মেষ ও জন্মবৃত্তান্তের বিধিদত্ত স্বাক্ষর এবং সুস্পষ্ট পদচিহ্ন-সঙ্কেত, আর শিল্পতত্ত্বের দিক দিয়া নিগূঢ় রসরুচি, কবিমানস, লেখনশৈলী তথা বাঙ্ময়-আত্মের ইহার অক্ষরে অক্ষরে নিহিত। দশম-দ্বাদশ শতকের ইতিহাস-মকে গৌড়বাংলার আধ্যাত্মিক চেতনা, তদ্রোক্ত সাধন ভজন,—কায়া-সাধন বৌদ্ধ-ধর্মতত্ত্ব, সমাজ-পটচিত্র, চণ্ডালিনী সম্ভোগ—ইহাদেরই একটি সম্মিলিত উল্লাস চর্য্যাপদের কায়া-কঙ্কাল নির্মাণ করিলেও উহার দেহজ লাবণ্য এবং রূপ অর্থাৎ শিল্পসৌন্দর্য্যও অপূর্ব্ব; চর্য্যাসঙ্কারের এ যেন ঐ একছলে সাহিত্যরস পরিবেশন।

যদিও চর্য্যাপদের ভাষা আপাত দুরূহ ও অপরিচিত তথাপি উহার পদবন্ধরচনা ও ছন্দস্পন্দ নিতান্তই রহস্যধর্মী নয়। অধুনা উহার বাংলা অনুবাদও পাওয়া যাইতেছে, সংস্কৃত টীকাগুলিও প্রাঞ্জল এবং রূপকাশ্রয়ী-ভাবে একটি উন্নত ও উচ্চাঙ্গের কর্মী-মনের স্বীকৃতি। কালিদাসের 'উর্ব্বশী' কামনায় অধীর হইয়া রাজা পুরূরবার নিকট যে ভাষায় পত্র লিখিয়াছিল তাহা আমাদের অনেকের নিকট দুর্ব্বোধ্য এবং রহস্যাচ্ছন্ন। চর্য্যাপদগুলিও সেইরূপ বলিয়া শাস্ত্রী মহাশয় ইহাকে সন্ধ্যা ভাষা বলিয়াছেন, 'সন্ধ্যাভাষার মানে আলো আঁধারি ভাষা' কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায় খানিক বুঝা যায় না'। কিন্তু সন্ধ্যাভাষা কোন নামই নয়। তাহাকে অস্পষ্ট বুঝি বলিয়া কি তাহা সন্ধ্যাভাষা? তবে যে ব্যক্তি সংস্কৃত অস্পষ্ট বোঝে তাহার নিকট সংস্কৃতও ত সন্ধ্যাভাষা; যে অল্প ইংরাজি জানে তাহার নিকট ইংরাজিও তাহা হইলে সন্ধ্যাভাষা। অবশ্য 'সন্ধ্যা' নামটি টীকাতেও আছে; কালিদাস রায় আবার ইহাকে একপ্রকার 'সন্ধিভাষা' বলিয়াছেন, ঐ নামটি যেমন কবিত্বময় তেমনি মণীন্দ্রমোহনের—সম্পূর্ব্বক ধৈ (ধ্যান করা) + অ + আপ্ (স্ত্রী) = সন্ধ্যা; সন্ধ্যাভাষা অর্থে বিশিষ্ট প্রয়োগ লক্ষ্য করিয়া যে ভাষার (প্রজ্ঞার) অর্থ স্থির করিতে হয়'—এই ব্যাখ্যাটিও পাণ্ডিত্য-পূর্ণ। চর্য্যাপদের ভাষাই প্রাচীন বাংলাভাষার অমসৃণ রূপ, উহা অপভ্রংশও নয়, স্থানে স্থানে সে পরিচয় অত্যন্ত সুস্পষ্ট; ডাঃ সুনীতিকুমারই আমাদের এই মতের নির্দেশক।

প্রায় সমস্ত চর্য্যাপদই 'পজ্ঝটিকা ছন্দে' রচিত, শিষ্যকে উপদেশ দিতে যাইয়া সরহাচার্য্যও এই ছন্দের সাহায্য লইয়াছেন—'ষোড়শ পজ্ঝটিকাভি-রশেষঃ, শিষ্যাণাং কথিতোহভ্যুদেশঃ'; সুতরাং ঐ ছন্দ চর্য্যাপদের আধ্যাত্মিক বিবৃতির অনুকূলই হইয়াছে।

এখন, 'ধর্মতত্ত্ব, ভাষা ও ছন্দ'—এই তিন শিলাখণ্ডে চর্য্যাকারের শিল্পচিন্তা প্রতিহত; সাঙ্কেতিকতার মধ্য দিয়া আমরা তৎকালীন বাঙালী মানসের সমুন্নতির পরিচয় পাইতেছি। বাঙালী কবি, (চর্য্যাকারগণ যে বাঙালী—তাহা নিঃসন্দেহ) এতখানি গভীর ভাব ও রসলিপ্সু লেখনশৈলীর অধিকারী ছিলেন, যাহাতে তাঁহারা অতি কঠিন কথাও অতি সহজ ও অতি স্বাভাবিক ভাবে বলিতে পারিতেন, প্রকাশের জন্য প্রয়াস পাইতে হয় নাই, তাহা স্বতঃসিদ্ধ ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত। পরে দেখিব চর্য্যাপদকারের চিত্তপ্রকর্ষ ও রস-বিন্যাসশীলতার অদ্ভুত চমৎকারিত্বের আবেশ আছে। উচ্চাঙ্গের কাব্যের একটি সাধারণ লক্ষণ তাহা ব্যঞ্জনাধর্ম্মী, একাধিক ভাবদ্যোতক। শব্দ ও অর্থের যুগ্ম-

চেতনায় তাহা রসময়। একটী তত্ত্ব তাহাকে ধারণ করিবেই, সে তত্ত্ব বাস্তবও হইতে পারে আনন্দও হইতে পারে। যে-স্রষ্টা মনে ঐরূপ বাসনা না থাকে তাহার সৃষ্টি সাময়িক আহ্লাদ ও শব্দের কারিকুরিতে পর্য্যবসিত, ঐ ভাব অল্পতেই ফুরাইয়া যায়, পুরাতনও হইয়া পড়ে, কিন্তু শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সকল সময়েই 'তিলে তিলে নূতন হোয়'। চর্য্যাপদ-গুলি নিছক কাব্যমোদীর নিকট রসতুল্য এবং যে যোগপ্রক্রিয়ার কথা বলা হইয়াছে ঐ পথের পথিকের নিকট তাহা সর্ব্বথা আচরণীয়। সেই হিসাবে পদগুলির ক্ষেত্রসীমা অনেকখানি বাড়াইয়া তোলা যায়। চর্য্যাপদকারগণ যে কবি তাহার প্রমাণ তাঁহারা গুহ্যকথাকে সূত্রাকারে না বলিয়া রূপরেখায় ধরিয়া ও ভরিয়া দিয়াছেন। প্রিয়দর্শী অশোকও বুদ্ধের অনুশাসন শিলাগাত্রে উৎকীর্ণ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি কবি নহেন—উভয়ের পার্থক্যটী সহজেই অনুমেয়।

কুক্কুরীপাদের সুনিপুণ লেখনী কেমন একখানি পারিবারিক চিত্র অঙ্কন করিয়াছে—"বৃক্ষের তেঁতুল কুমীরে খাইতেছে, বিয়াতী গৃহাঙ্গনের দিকে গেল, অর্দ্ধেক রাত্রিতে কানের কুণ্ডল চুরি গেল, শ্বশুর ঘুমাইলেও বধূ আসিয়া ছিল, তথাপি কর্ণাভরণ চোরে যখন লইল তখন কাহার নিকট সে চাহিবে? বৌ দিনের বেলায় ভয় করে, এবং রাত্রিবেলায় কামকেলি করে" ইত্যাদি।

কাহ্নপাদের অঙ্কিত অশুচি চিত্র—"নগরের বাহিরে ডোম্বির কুঁড়ে, যে কেবল ব্রহ্মনাড়িকা ছুঁইয়া ছুঁইয়া যায়, চৌষট্টিদল একটি পদ্মে ডোম্বি নাচিয়া বেড়ায়, ডোম্বি কাহার নৌকায় যায়? সে চাঙাড়ি বিক্রয় করে—উলঙ্গ এবং নির্ঘৃণ্য কাহ্ন তাহারই সঙ্গ করিবে।" কুক্কপাদের ঐ ডোম্বি আবার যারপর নাই জিজ্ঞাসী—"ডোম্বি ত' আপনি নাই জিজ্ঞাসী।"

কুক্কুরপাদের প্রকৃত বর্ণনা অদ্ভুত—"ঘন অন্ধকার রাত্রি। মূষিক চরিয়া চরিয়া অমৃত খাইতেছে, মূষিককে মারিতে হইবে; বর্ণহীন মূষিক গর্ত্ত খনন করিতেছে এবং গগনে উঠিয়া আমন ধানক্ষেতে বিচরণ করিতেছে।

শবরপাদ বলিতেছেন—"শবরী বালিকা উঁচু উঁচু পর্ব্বতে বাস করে, সে ময়ূর-পুচ্ছ পরে, গ্রীবাতে গুঞ্জার মালা দেয়, তাই দেখিয়া শবর কামনায় অধীর হইল। শবরী বলিতেছে ওগো পাগল শবর অত গোল করিও না, বনের পাছপালা মুকুলিত হইল এবং আকাশ অন্ধকার হওয়াতে শবরযুবক ত্রৈধাতুক বাট পাতিয়া নৈরাত্মিকে কণ্ঠে লইয়া মহাসুখে প্রেমকেলি করিয়া রাত্ত পোহাইল।"

সর্ব্বাপেক্ষা চেন্টণপাদের বর্ণনা মোহাকর—টালের উপরে তাঁহার ঘর, তাই প্রতিবেশী নাই; হাঁড়িতেও ভাত নাই, তবু গৃহে নিত্য অতিথি আসিতেছে, ব্যাঙের সংসার বাড়িয়া যাইতেছে, যে দুগ্ধ দোহন করা হইল তাহা পুনরায় বাঁটে প্রবেশ করিতেছে। আবার বলদ-গরু বিয়াইল, গাই-গরু হইল বন্ধ্যা। ইত্যাদি।

আবার সরহপাদ—বজ্রদেশোদ্ভবা ভার্য্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু পরক্ষণে তাঁহার বিজ্ঞান ভঙ্গ হইল; সুতরাং ভবমোহ অতিশয় অদ্ভুত, তাহারা আপনপর দেখিয়া থাকে; এ জগৎ অলীক। নিজেও সহজশূন্য, চিত্ত অন্যের বশ, অমৃত থাকা সত্ত্বেও বিষ খাইতেছেন—দুষ্ট বলদ কি হইবে? শূন্য গোয়াল তাহার অপেক্ষা অনেক ভাল। ভুসুকপাদ অন্য স্থানে উপমা দিতেছেন; "এ' জগৎ কি রকম? না, মরুভূমিতে মরীচিকা, যেমন গন্ধর্ব্বনগরী, যেমন দর্পণে প্রতিবিম্ব, যেমন বায়ুর আবর্ত্তে ঘূর্ণীভূত হইয়া জল প্রস্তরবৎ দৃষ্ট হয়, যেমন বন্ধ্যাপুত্র কেলি করে, বহুবিধ খেলা খেলে, যেমন বালুকার তেল, শশকের শৃঙ্গ, এবং আকাশের পুষ্প।

তাই ভুসুকীপাদ বলেন—

'জোইনি তই বিহু খনহিঁ জীবমি।
তো মুহচুম্বী কমলরস পীবমি।'

অর্থাৎ—হে যোগিনী। তোমা বিনা আমি একমুহূর্ত্তও বাঁচিব না এবং তোমার মুখচুম্বন করিয়া আমি পদ্মমধু পান করিব।

—[ সাহিত্য-পরিষদের নূতন সংস্করণ দ্রষ্টব্য ]

উপরে গোটা পদের ব্যাখ্যা করা হয় নাই, শুধু প্রাকৃত-স্পর্শ যেখানে ফুটিয়াছে তাহাই নিজের মতো তুলিয়া দিয়াছি। ওখানে যে বাংলার জনপদ চিত্রের ঠাস বুনন, যে মাটীর মানুষের নাড়ীর রক্তচলাচল স্রোত দৃষ্ট হয় তাহা কিসের প্রভাব? চৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীচৈতন্যও ভগবৎপ্রেম বুঝাইতে গিয়া পরপুরুষে আসক্ত নারীর উপমা দিয়াছেন—তাঁহার চোখের সামনেই তো শ্রীকৃষ্ণ-রাধার রাসলীলা ভাসিতেছিল; তিনি পরম পবিত্র যতিজীবন যাপন করিয়াও ঐ উপমা দিয়াছেন, ইহা হইত আশ্চর্য, কিন্তু কামিনীকাঞ্চন-মোহবিজয়ী শ্রীরামকৃষ্ণ কি ধরণের উপমা দিতেন?

অন্তরে আধ্যাত্মিকতা আছে, নিঃসন্দেহ, তথাপি বাহ্যতঃ যে কমনীয় কায়াকান্তি তাহাই ইহাকে কাব্যগুণোপেত করিয়াছে; প্রকৃত উপমা সাধারণ রূপক, প্রচলিত ঘটনার মধ্যদিয়া যে চৌর বৃন্দাবন রচিত হইয়াছে সেখানে শবর ও শবরীর বয়ঃসন্ধিকাল। বৈষ্ণবপদাবলীতে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের ঠিক অনুরূপ সম্ভোগ-লিপ্সা:—এখানকার ডোম্বিনী, কাহ্নি, ডোম্বি, চণ্ডালী, সহজসুন্দরী বা শবরী; এই নারীসাধনায় যে ধরণের উল্লাস, তথাকার—প্রেমবৈচিত্ত্যের মধ্যে একটা আতি চারুত্ব লাভ করিয়াছে। কালব্যবধানে সেখানে রুচির ক্রমোন্নয়ন হইয়াছে—ধর্মসাধনায় দেখা দিয়াছে নূতন একটি দৃষ্টিকোণ: তাই চর্যাপদে দেহধর্ম, বৈষ্ণবপদে প্রেমধর্ম; একটিতে দেহই প্রধান, দৈহিক পরিশুদ্ধি ও দেহমুক্তি, একপ্রকার হঠযোগ। অন্যটিতে বিরহলোকের বেদনা অন্তর্লোককে স্পর্শ করে। আবার দুই কবিই অন্ত্যজচরিত্র অবলম্বন করিয়াছে—শবর ও শবরী বা চণ্ডালিনী; রাধা ও কৃষ্ণ দুইজনেই গোয়ালার বংশে জন্ম লইয়াছেন এবং বাঙালী কবি রজকিনীর প্রেমে পড়িয়াছেন। যদিও—"রজকিনী প্রেম, নিকষিত হেম, বড়ু চণ্ডীদাসে গায়।"

চর্যাপদ রূপক এবং সাঙ্কেতিক—ইহা স্পষ্টতঃ কোথাও কোথাও পদকার নিজেই তাহার ইঙ্গিত দিয়াছেন; তান্ত্রিক সাধনাকে এতখানি ভাবান্বিত ও রসান্বিত করিয়া পূর্বাবতরণের রূপদক্ষতা-সাপেক্ষ; পূর্বে সেইজন্য কবিমনের কথা বলিয়াছি, আধিদৈহিক চেতনার এইরূপ রসবিন্যাস অপূর্ব নহে কি? সাঙ্কেতিক-সাহিত্য আধুনিক সাহিত্য-বিভাগের সর্বাপেক্ষা উচ্চে, আবার রূপক সাহিত্যে অতীন্দ্রিয় পরিবেশ এবং রহস্যঘেরা পরিবেশ আমাদিগকে উন্মনা করিয়া তোলে। কৃষ্ণপাদ যখন তাঁহার যোগিনীলাভ হইল, সেই শান্তিপ্রদ অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া বলিতেছেন—ভবনির্বাণে পটহ ও মাদল বাজিতেছে, তিনি ডোম্বিকে বিবাহ করিতে চলিলেন তখন জয় জয় রব ও দুন্দুভি উচ্ছলিত হইয়া উঠিল; তিনি ডোম্বিকে বিবাহ করিলেন, জয় আহার করিলেন, ধর্ম যৌতুক পাইলেন—তারপর সুরতপ্রসঙ্গে দিনরাত্রি চলিয়া গেল।

ব্যাপারটি কি রকম? চতুর পাঠক বলিবেন, চিনির মোড়কে নিমের বটি!!

পঞ্চাশটি চর্যাপদ সবই সমশ্রেণীর বা একস্তরের নয়, মোটামুটি দুই শ্রেণীর, কতকগুলি স্পষ্টতঃ প্রেমের কবিতা, বাকীগুলি তত্ত্বাকীর্ণ। প্রেমের মধ্যেও তত্ত্ব আছে বৈকি।

মণীন্দ্রমোহন চর্যাপদের মধ্যে একবার গীতি-কবিতার প্রাচীনতম রূপ আর একবার চৌদ্দপদী কবিতার রচনার নিদর্শন পাইয়াছেন। ঐ দুইটি কথা ইহার শিল্পকে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা দিবে। শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, ইহা গীত (গান করা) হইত; পদে রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে; এবং ইহা এমন এক বিশেষ মাত্রার রচিত যেগুলি পড়িতে গেলেই মনে বেশ একটু দোলা লাগে।

চর্যাপদের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, এইখানে গদ্যসাহিত্যের অঙ্কুর বা ভ্রূণ দেখা দিয়াছে। এইখানেই সর্বপ্রথম মাটির মানুষের দুঃখ-বেদনার একমুঠি রক্তরাগ নিতান্ত নিরাভরণ পদ্যের কাব্য-মর্যাদা এবং কাব্যমূল্যে উত্তীর্ণ; ইহার অনেক

পরবর্তী কালে প্রায় তিন শ' বছর পরে চতুর্দশ পঞ্চদশ শতকে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীতে তাহার পুনঃ প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়—তাই চর্য্যাপদকারগণ বাস্তবধর্মের কবি; ঊর্দ্ধচারী আকাশ-কল্পনা অপেক্ষা মৃত্তিকাতলবিহারী সচেতন জীবনদর্শন তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে প্রবলভাবে। হাঁড়ীর ভাত, ব্যাধের সংসার, বহুড়ির কানের কুণ্ডল এবং নৌকার খেয়াপারাপার —এই সমস্তই হইয়াছে তাঁহাদের কাব্যলক্ষ্মীর অলঙ্কার;—তাই—

(ক) রূপা থোই নাহিক ঠামী—রূপা থুইবার ঠাঁই নাই;

(খ) তান্তি বিকণঅ, ডোম্বি, অবরাধা চাংগেড়া—ডোম্বি তাঁত ও আবরণকারী চাঙাড়ী বিক্রয় করিতেছে।

(গ) তুলা ধুনি ধুনি আঁসু রে আঁসু—তুলা ধুনিয়া ধুনিয়া আঁশ আঁশ করা হইল।

(ঘ) কমুচিনা পাকেলা রে শবরা শবরি মাতেলা—কমুচিফল পাকিয়া উঠিল, শবর ও শবরী তাই মাতাল হইয়াছে।

(ঙ) বলদ বিআএলা গবিআ বাঁঝে—বলদ বাছুর প্রসব করিল, গাভী বন্ধ্যা হইল।

(চ) চীঅন বাকলঅ বাকণী বাহঅ—চিকণ বল্কল দ্বারা বাকণী মদ্য বাঁধা হইল।

আবার "গমনতরাবি", "ছিনালী" ইত্যাদি কথাগুলি জীবনরসের নীলদর্পণের কথা মনে করাইয়া দেয়। চর্য্যাপদেও নারীর জীবনের দারিদ্র্য দেখা দিয়াছে। তারপর জগৎ মিথ্যা, স্বপ্নবৎ প্রতীত, অর্থাৎ দুঃখ হইতে বৈরাগ্য উপস্থিত হইল; অতএব (কাহ্ন গাবড়ি খাটি মন কেড়ুআল) কায়াকে নৌকা এবং খুঁটিতে বদ্ধ মনকে বৈঠা বল। ঐ একধরণের মরমীয়া সাধক-কবির কায়া-চেতনা; বাক্‌পথাতীত নৈরাত্মিকা চণ্ডালিনীর সঙ্গসুখে ষট্‌চক্রসাধন পথে দেহাতীতের অরূপ রূপ দর্শন; ফলতঃ তত্ত্ব ও শিল্পের অদ্বয় মিলনে চর্য্যাপদের বাক্‌চঙীও যেন চারু বাকে বাঙ্ময়, সেইসূত্রে ইহার শিল্পসুষমার সমৃদ্ধি এবং তাহাতেই সমগ্র বাংলা সাহিত্যের কৌলীন্য-গর্ব্ব।

---

# প্রতীক্ষা

**শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র রায়**

কবে তুমি আসবে আমার
জীবন সফল কোরে?
নিবিড় মিলন-পরশ সুধায়
দেবে হৃদয় ভ'রে?
সেই সুলগন আসবে কবে,
ভরবে ভুবন মহোৎসবে,
সেই আশাতে জেগে থাকি
চেয়ে পথের পরে।

প্রতি প্রাতে অরুণ আলোয়
নীল আকাশের মাঝে,
তোমার বাণী কোন্ অজানা
গানের সুরে বাজে?
সেই সুরে মোর হৃদয় হতে,
প্রেম বহে যায় উছল স্রোতে,
আঁখির আগে জীবনস্বামি
তোমায় দেখার তরে।

# ভালবাসা

শ্রীবালকরাম ভট্টাচার্য্য

বিশ্বপ্রকৃতি জীবনকে সৃষ্টি ক'রেছেন যেন একটা নির্লিপ্ত উদাসীনতার মধ্য থেকে। ওঁর এই উদাসীনতা আরও বেশী পরিমাণে পরিস্ফুট জীবেতর উদ্ভিজ্জাদির মধ্যে। সেখানে বিশ্বপ্রকৃতি কোন আশা না রেখে সৃষ্টি ক'রেছেন। এখানে ওঁর সৃষ্টিটা যেন ওঁর লোকসানকে স্বীকার কোরেই।

মানুষকে সৃষ্টির মুহূর্ত্তে, প্রকৃতি যেন একটু ঔৎসুক্যের সহিত মানুষের মধ্যে ওতপ্রোত ক'রে দিয়েছেন। মানুষের বেলায় প্রকৃতি আর নির্লিপ্ত উদাসীন থাকিতে পারেন নি। মানুষের বেলায় প্রকৃতি কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা রেখে সৃষ্টি ক'রেছেন। মানুষের মধ্যে সৃষ্টির এই মর্ম্মরসটি প্রকাশ পায় পরিমিত ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত অপরিমিত ও অপ্রয়োজনীয়তার নানা বিচিত্র আয়োজনে।

সৃষ্টির পিছনকার মর্ম্মরসটি যে ঔৎসুক্যের সহিত বিশ্বপ্রকৃতি মানব-মনে প্রথিত ক'রেছেন, সেই মর্ম্মরসের ভূমিকা-স্বরূপে একটা নিগূঢ় ঔদার্য্য ও প্রসন্নতাই যেন প্রকৃতির সেই ঔৎসুক্যকে নির্দ্দেশ করছে। সাধারণ মনুষ্যেতর জীবের সঙ্গে মানুষের এইখানেই পার্থক্য। এই ঔদার্য্য ও প্রসন্নতাই মানুষের মানসিক স্বৈর্য্যকে রক্ষা করে।

সাধারণ মনুষ্যেতর জীব-প্রকৃতির মধ্যে যে ব্যস্ততা লক্ষ্য করা যায়, তার সবটাই চলে নিছক জৈব প্রয়োজনে। জৈব প্রয়োজনের তাড়নাটা বাঁচার কারণ-স্বরূপে সমস্ত বেচবোধের মধ্যে ওতপ্রোত ব'লে মনুষ্যেতর জীবের এই ব্যস্ততা তার স্বেচ্ছাকৃত নয়, সেটা বাধ্য হ'য়েই। জৈব প্রয়োজনের এই ব্যস্ততার একটা সুরই বর্ত্তমান, সেটা শুধু মাটির সুর, জড়ের সুর। সেই সুরটা বরাবর একটানা বাজে। এই একটানা বেজে এর অভ্যাসটা ক্রমে ক্রমে যান্ত্রিক কলা-কৌশলের মত মনে হয়। এই যান্ত্রিক কলা-কৌশলই মনুষ্যেতর জীবের মধ্যে সহজ বুদ্ধিরূপে প্রতিফলিত হয়। এই সহজ বুদ্ধির কোন দায় নেই। এ শুধু নিজের স্বভাট বেতাল খুশীতে চলে। মানুষের যে দিকটায় এই রকম সহজ বুদ্ধির প্রভাব দেখি, সে দিকটা সম্বন্ধে মানুষের চিত্ত একেবারে অন্ধ না হ'লেও স্বার্থবুদ্ধিতে সে অত্যন্ত সজাগ। এই সজাগ স্বার্থ-বুদ্ধি কামনার বিষয়গত কেন্দ্রটিতে প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ থাকে। তার এই সীমাবদ্ধতা প্রকাশ চাওয়া ও পাওয়ার ঐকান্তিকতায়।

আদিম যুগ থেকে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত মানুষের সভ্যতায় এবং সমাজ-সংস্কার যে বিশিষ্ট বাহিরের সম্বন্ধ-বোধটা মানুষে মানুষে প্রতিষ্ঠিত, তাহা ঐ চাওয়া ও পাওয়ার উপর ভিত্তি করিয়া। এই স্বার্থবোধের উপর ভিত্তি করিয়া যে সম্বন্ধ-বোধ, তার নানা-মুখী গভীর চিন্ত-সংস্কার বিচিত্রভাবে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক মানসকে প্রবুদ্ধ করিয়াছে। গণিত, অর্থনীতি, রাজনীতি, দণ্ডনীতি প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্ররাজি, মানুষের (ঐ সম্বন্ধ-বোধের পরিপ্রেক্ষিতে) বুদ্ধিবৃত্তিক মানসের প্রকাশ। এই যে বুদ্ধিবৃত্তিক মানসের প্রকাশ, ইহা বিশ্ব-ব্যাপারে মানুষকে শুধু উপায়রূপে প্রদর্শন করে। এখানে মানুষে মানুষে স্বার্থকে স্বীকার ক'রে সব কিছু কাজ চলে। মানুষের এই কাজ চলার মধ্যেই তার যে নিয়ম-বোধটা অধিগত হ'তে থাকে তাহা প্রকারে গাণিতিক। এই নিয়ম-বোধের মধ্যে মানুষ নিজেকে জগতে শুধু উপায়রূপে ভাবিতে অভ্যস্ত হয়। এই প্রকার উপায়-বোধ, স্বার্থ সম্বন্ধে লাভ-লোকসানের ও দেনা-পাওনার কেন্দ্র বিন্দুতে তার মনোযোগের শ্রেষ্ঠ অংশটিকে স্থাপন ক'রে নানা বিচিত্র বস্তুগত চিন্তবোধে তার বৃত্তটিকে

সম্পূর্ণ করে। তার উপায় বোধ শুধু এই বৃত্তটির চতুঃপার্শ্বিক বেড়াজালের উপরেই নিজের সব কিছু প্রভুত্বকে অবাধে বিস্তার করিতে পারে। এই উপায়বোধ কিন্তু বৃত্তটির ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। মানুষ নিজেকে উপায়বোধ ব'লে ভাবতে, চিরকালই এই বস্তুগত চিন্ত-বোধের বৃত্তটির চারি পার্শ্বে পরিভ্রমণ করে। এই বৃত্তের ভিতরে সে প্রবেশ করিতে পারে না। সেই বৃত্তে প্রবেশ করতে গেলেই পারিপার্শ্বিক সমাজবোধের তার সাম্য নষ্ট হয়। এই বাধাটাই জগৎ সম্বন্ধে মানুষের মনে একটা একরোখা বা একঝোঁকা ভাব সৃষ্টি করছে। জগতের সঙ্গে এখানে মানুষের সম্পর্ক, নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধনের মূল-সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। শুধু বিষয়গত উদ্দেশ্য-সাধন নিয়ে যেখানে সব কিছু সম্বন্ধের সূচনায় সেখানে মানুষ চিরাচরিত কর্ম-কৌশলের অভ্যাসে নিজেকে বিশ্ব-ব্যাপারে শুধু উপায়রূপে ভাবিতে অভ্যস্ত হয়। এই অভ্যাস বদ্ধমূল হ'য়ে গেলে মানুষ বিশ্ব-ব্যাপারকে নিজের সঙ্গে-সম্বন্ধ-বোধে উপায়-বোধের সাধক হিসাবে, শুধু ভেদকে তার জীবনলক্ষ্যে স্থাপন করে। এই ভেদবোধ মানুষের মধ্যে থেকে চিত্তবৃত্তিকে একটা বাস্তব কাঠিন্য দান করে, যে কাঠিন্য লাভ-লোকসানের বিষয়বোধ থেকে তথ্যজগতের বিশ্লেষণী খনন-বৃত্তিতে আপনার প্রকাশের যুক্তিগত সমর্থন পায়। স্ব স্ব স্বার্থ সংরক্ষণে এই ভেদবোধ (জীবন-যাত্রা চালাবার ব্যাপারে) মানুষের আচরণগত সমর্থন লাভ করে। এই যুক্তিগত ও আচরণগত সমর্থনে উপায়বোধ ক্রমে সামাজিক মূল্য লাভ করে।

এই উপায়-বোধের মধ্যে যে সম্পর্ক-জালকে আমরা লক্ষ্য করি তা মানুষের হ'য়ে নয় বিষয়ের হ'য়ে। এই উপায়-বোধে মানুষটা সর্বদা আচ্ছন্ন থাকে। এই উপায় বোধে যে অর্থটা মানুষের কাছে ধরা পড়ে তার যা কিছু দাবী সব বুদ্ধির ব্যবহারে। মানুষ এখানে লোকসান পেতে প্রস্তুত নয়। জগৎকে সে এখানে সর্বদাই প্রতিদ্বন্দ্বীর দৃষ্টিতে দে'খে। তার কাছ থেকে যতটা প্রয়োজন ততটাই সে আদায় করিতে চায়। প্রয়োজনের পরে আর তার কোন প্রবণতা নেই—পাছে সে সেখানে ঠকে। জগৎ সম্বন্ধে এই যে তার বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী তারই অনুসারে সে সর্বদা নিজেকে প্রস্তুত ক'রে রেখেছে। মানুষের এই নিরবচ্ছিন্ন প্রস্তুতি তার মানস-সংস্কারকে জগৎ সম্বন্ধে একটা সবল রেখার মত সোজা ব্যবহার বোধে উদ্বুদ্ধ ক'রে রেখে দিয়েছে। এই ব্যবহার বোধে জগৎ সম্বন্ধে যে বিশিষ্ট প্রত্যয় ধারার জন্ম দিয়েছে তাহা জগৎ ও তার মাঝে অন্তরঙ্গতার বোধের একটা বেড়ার মত।

এই বেড়া কবে ভেঙেছে তাহা ইতিহাসের সাল তারিখ দিয়ে বোঝা যাবেনা। তবে তা যে ভেঙেছে এটা সত্য কথা। বেড়া ভাঙা মাত্রই তার সব ওলট পালট হ'য়ে গেছে।

শুধু প্রাণ-স্তরের জীব জন্তুর মধ্যে বুদ্ধিযুক্ত মানুষের আবির্ভাব প্রাণীজগতের ইতিহাসে যেমন একটা স্মরণীয় ঘটনা তেমনি এই বেড়া-ভাঙাটাও মানুষের মানস-ইতিহাসে একটা স্মরণীয় অধ্যায়। এখানকার রাজত্ব দেখি সব ব্যাপারই একেবারে উল্টো। এখানে মানুষ জগতের কাছে নিজেকে শুধু উপায় ব'লে ভাববার কোন সূত্র পায় নাই। এখানে এসে মানুষ বোঝে সে যতক্ষণ সে নিজেকে উপায় বলে ভেবেছিল ততক্ষণ যেন জগৎ সম্বন্ধে তার বুদ্ধি একেবারে পাথর চাপা ছিল।

এই যে মানুষের মধ্যে নূতন আলোড়ন এটা তার জীবনের নূতন অভিজ্ঞতা নয়, এটা তার মানসে নূতন সৃষ্টি আন্দোলন। পূর্বতন সৃষ্টিতে তার বুদ্ধি, জগত সম্বন্ধে উপায় বোধে ছুটে উঠেছিল এখানে যেন তার বুদ্ধি নিজেই উপেয় হ'য়ে প্রকাশ পেয়েছে। প্রয়োজন বোধের জন্য যাকে উপায় ব'লে ভেবেছিল সে এখানে উপেয় হ'য়ে গিয়েছে। শুধু মাত্র প্রাণ-স্তরের জীবজন্তুর মধ্যে মানুষের আবির্ভাবের মত, মানুষের মনস্তরে ঠিক একটা আশ্চর্য্য আবির্ভাব।

এই উপেয় বোধে মানুষ জগতের সঙ্গে হৃদয়ের যোগে যুক্ত হ'লো—শুধু বুদ্ধির যোগ সেখানে আর রইল না।

এই উপেয়-বোধ মানুষের ভাষায় একটা চিরন্তন সংজ্ঞা লাভ করলে, তা হ'চ্ছে 'ভালবাসা'। এই ভালবাসার মধ্যেই জগৎটা মানুষের মধ্যে একেবারে অন্তরঙ্গ ও নিবিড় হ'য়ে এল। এই ভালবাসার মধ্যেই মানুষ জগতের সঙ্গে নিজের সংযোগ-সূত্রটি অত্যন্ত সহজে খুঁজে পেলে। পারস্যের সুবিখ্যাত সুফী কবি জামীর কথায় এই সংযোগ-সূত্রের পরমতম রূপটি আমরা লক্ষ্য করি :—

"All that is not one must ever
Suffer, with wounds of Absence ;
And whoever in Love's City
Enters, finds but room for one
And but in oneness, union."

---

# "শ্রীবিষ্ণুপুরাণে মহর্ষি পরাশরের নিকট মৈত্রেয় ঋষির প্রশ্ন"

শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, বৈষ্ণবদর্শনাচার্য্য, সাংখ্যবেদান্ততীর্থ

"নির্গুণস্যাপ্রমেয়স্য শুদ্ধস্যাপ্যমলাত্মনঃ।
কথং সর্গাদিকর্তৃত্বং ব্রহ্মণোঽভ্যুপগম্যতে॥"

নির্গুণ অপ্রমেয় শুদ্ধ অমলস্বরূপ ব্রহ্মের সৃষ্ট্যাদি কর্তৃত্ব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ইহাই মৈত্রেয় ঋষি মহর্ষি পরাশরের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

মৈত্রেয় ঋষির এই প্রশ্নের অন্তর্নিহিত ভাব হইতেছে এই—"যিনি নির্গুণ, অর্থাৎ যাঁহাতে সত্ত্ব রজ তম গুণ নাই, অপ্রমেয় অর্থাৎ যিনি দেশ কাল পাত্রাদির দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, শুদ্ধ—অর্থাৎ শরীরাদিরহিত অমলাত্মা অর্থাৎ রাগদ্বেষাদিশূন্য, সত্তামাত্ররূপে যাহার পরিচয়, কেবল "অস্তি" ইতি রূপে যাহার উপলব্ধি, তাদৃশ ব্রহ্মে, সত্ত্ব-রজস্তমোময় বিশ্বকার্য্য কেমন করিয়া সৃষ্ট হইতে পারে?"

কর্ত্তা হইলেই কার্য্যের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে, কারণ হইলেও কার্য্যের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে। ব্রহ্মকে কর্ত্তা বা কারণ যাহাই বলা যাক্ না কেন—তাহাতে ব্রহ্মের শুদ্ধত্ব বা নির্গুণত্ব কেমন করিয়া বজায় থাকে—ইহাই, ঋষির প্রশ্নের তাৎপর্য্য। যাহারা প্রকৃতিকারণবাদী, তাহাদের মতে প্রকৃতি কর্ত্রী হইলেও পুরুষের সঙ্গে কোন না কোন প্রকারে কিছু না কিছু সম্বন্ধ রাখিয়া তবে প্রকৃতি কর্ত্রী হয়। পুরুষ প্রকৃতির সংযোগে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়, নতুবা সৃষ্টি হয় না।

বেদান্ত ব্রহ্মকারণবাদী। ব্রহ্ম কিন্তু "একমেবাদ্বিতীয়ম্"। কাজেই বেদান্তমতে যদি কার্য্যজগতের কোন সত্তা থাকে তাহা হইলে সেই সত্তা যে পরমসৎ পরব্রহ্ম হইতেই আসিয়াছে তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। তাহা ছাড়া "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন বা জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্ব্রহ্ম" এই শ্রুতিবাক্য এবং "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই ব্রহ্মসূত্র উভয়েই ব্রহ্মের জগৎকারণ বিষয়ে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছে। সুতরাং ব্রহ্ম কারণবাদ নিঃসন্দিগ্ধ। ব্রহ্মকারণবাদ যদি নিঃসন্দিগ্ধই হয়—তাহা হইলে এই একটা প্রশ্ন মনে উঠে—"ব্রহ্ম সৎ জগৎ অসৎ, ব্রহ্ম চিৎ জগৎ জড়, ব্রহ্ম আনন্দময় জগৎ দুঃখময়। সৎ ও অসতের, চিৎ ও জড়ের আনন্দ ও নিরানন্দের কার্য্য কার্য্য সম্বন্ধটি কেমন করিয়া ঘটিয়া উঠিতে পারে? এবং এতাদৃশ জগৎকার্য্যের কর্ত্তা বা কারণ হইয়া

তাদৃশ ব্রহ্ম কেমন করিয়া আপনাকে শুদ্ধ ও নির্গুণ-রূপে স্থির রাখিতে পারেন? তবে যদি জগৎ সত্য না হইয়া মিথ্যা হয়, এবং মিথ্যা হইয়াও শুক্তিকাতে রজতখণ্ডের ন্যায় অথবা রজ্জুতে সর্পের ন্যায়, অধিষ্ঠানরূপ ব্রহ্মসত্তাতে কেবল সত্যের ন্যায় ভাসিতে থাকে, তাহা হইলে নির্গুণব্রহ্মের পক্ষে জগৎকারণ সাজিয়াও নিজ স্বরূপকে শুদ্ধ রূপে বর্ত্তমান রাখা অসম্ভব হয় না। ব্রহ্ম নিজে শুদ্ধ ও নির্গুণ রহিলেন অথচ বন্ধ্যা স্ত্রিয়া যেমন "গোপালের মা" এই নামে পরিচিত হইতে পারে, ব্রহ্মও কি তদ্রূপ "জগৎকারণ" ব্রহ্মরূপে ঘোষিত হইতে পারেন? কিন্তু জগৎ যদি মিথ্যা না হইয়া সত্য হয়, তাহা হইলে কি হইবে?

জগৎ যে সত্য, ইহা যে মিথ্যা নহে তদ্বিষয়ে শাস্ত্রে ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। "ব্রহ্ম সত্যং তপঃ সত্যং সত্যং চৈব প্রজাপতিঃ। সত্যাদ্ ভূতানি জাতানি, সত্যং ভূতময়ং জগৎ" (স্মৃতি) "সত্যং হ্যেবেদং বিশ্বমস্থজত" (শ্রুতিঃ)। "সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণঃ, সত্যমত্র প্রতিষ্ঠিতম্" (মহাভারত)। "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং" (শ্রুতিঃ) "ঋষয়াদিত্যাঃ সত্যম্" (শ্রুতিঃ)। "সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে" (ভাগবত)। এই সকল শাস্ত্রবাক্যে জগতের মিথ্যাত্ব ধারণা নিষিদ্ধ হইয়াছে। জগৎ অনিত্য হইতে পারে কিন্তু মিথ্যা নহে, সত্য। আকাশ-কুসুম সত্য নহে মিথ্যা, ঘট পট মিথ্যা নহে সত্য, তবে অনিত্য। নিত্যসত্য ও অনিত্যসত্য ভেদে সত্য দ্বিবিধ। অনিত্য সত্যও সত্য। তাদৃশ সত্যের কারণ হইয়া ব্রহ্ম কেমন করিয়া নিজের শুদ্ধস্বভাব বজায় রাখেন, অথবা ব্রহ্ম শুদ্ধ এবং নির্গুণ হইয়া কেমন করিয়া অশুদ্ধ জগতের কারণ হন, ইহাই এখানে মুনিবরের প্রশ্ন। কুম্ভকার যখন ঘট প্রস্তুত করে তখন মনের মধ্যে ঘটের আকার ভাবিয়া লইয়া হস্তের দ্বারা মৃত্তিকা লইয়া তবে সে ঘট প্রস্তুত করে। পরব্রহ্মও কি তদ্রূপ মনের মধ্যে জগৎকে ভাবিয়া লইয়া বিশ্বপ্রকৃতির উপাদানকে গ্রহণ করিয়া এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন? তাহা ছাড়া এই জগতের উপাদান কারণও ব্রহ্মই। যেহেতু ব্রহ্ম ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই, তাহা হইলে তো আরও সর্ব্বনাশ?

মৈত্রেয় ঋষির এই প্রশ্নের উত্তর মহামুনি শ্রীপরাশর যাহা উত্তর দিয়াছেন—তাহা সকলেরই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। শ্রীপরাশর বলিয়াছেন—"শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ। ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ! পাবকস্য যথোষ্ণতা॥" অর্থাৎ বিশ্বজগতের সকল ভাববস্তুরই কিছু না কিছু সামর্থ্য আছে। উহাদের ঐ সমস্ত সামর্থ্য অচিন্ত্য জ্ঞানগোচর। যেমন অগ্নির দাহিকাশক্তি। দহনশক্তি যেমন অগ্নি স্বরূপেই অবস্থান করে—এবং অগ্নি ব্যতীত অন্য বস্তুকে দহন করে—অগ্নিকে দহন করিতে পারে না—এবং উহা অগ্নিও নহে ভিন্ন নহে—তদ্রূপ পরব্রহ্মে তাদৃশ অচিন্ত্য অনন্ত শক্তি বর্ত্তমান। ঐ সমস্ত শক্তি পরব্রহ্মের স্বাভাবিক। সেই সমস্ত অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবেই পরব্রহ্ম বিশ্বজগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিয়া থাকেন—এবং ঐ শক্তিপ্রভাবেই গুণময় ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্ম নিজেকে শুদ্ধ স্বরূপে বর্ত্তমান রাখিতে পারেন। জীবের সহিত ব্রহ্মের এইখানেই পার্থক্য।

পরব্রহ্মে যে অচিন্ত্য অনন্ত স্বাভাবিক শক্তি আছে তদ্বিষয়ে শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রে বহু প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়।

"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়া চ"। (উপনিষদ)। "আপ্তেষ্ববোঽতর্ক-সংস্থশক্তিঃ" (ভাগবত) "বিষ্ণুশক্তিঃ পরাপ্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা। অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে"—(বিষ্ণুপুরাণ)। "কারণনিষ্ঠ কার্য্যোৎপাদন-ধর্ম্ম-বিশেষ শক্তি। শক্তির আবির্ভাব ও তিরোভাব হয় কিন্তু নাশ হয় না। বস্ত্রের শুক্লতা বীজের অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তির কখনও অভাব হয় না। রঞ্জক-ব্যাপারে বস্ত্রমালিন্য দূরীভূত হইলে স্বাভাবিক শুক্লবর্ণ আবরণ অসম্ভব নহে।

যোগসিদ্ধ মহাপুরুষগণের সংকল্পশক্তিদ্বারা তৃষ্টবীজেও অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তির প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এইসব দেখিয়া ও শাস্ত্রবাক্য শুনিয়া বুঝিতে পারা যায় শক্তির বিনাশ নাই। উহা নিত্য ও অবিনাশী।

"অবিনাশী বাবেহয়মাত্মাযুক্তিস্তিবর্ণ্যা" এই বেদবাক্যে নিত্যশুদ্ধ আত্মস্বরূপের অবিনাশী শক্তির কথা শোনা যায়। "পরাস্য শক্তি বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়া চ" এই বেদবাক্যে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীকৃত হয়।

এইবার মৈত্রেয় ঋষির প্রশ্ন ও পরাশরের উত্তরের প্রতি আর একবার দৃষ্টিপাত করিয়া ভাবিয়া দেখা যাক্ প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্যে কি রহস্য লুক্কায়িত আছে।

মৈত্রেয় ঋষির প্রশ্নটি দেখিলেই আপাত-প্রতীয়মান অর্থে মনে হয়—ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষে নির্গুণ সত্তামাত্রস্বরূপ। তাহা না হইলে "কথং সর্গাদিকর্তৃত্বং" এইরূপ একটি আক্ষেপাত্মক প্রশ্ন সেখানে উঠিতে পারে না। আবার পরাশর ঋষির উত্তরটী শ্রবণ করিলে মনে হয় ব্রহ্ম সবিশেষ ও সশক্তিক। ব্রহ্ম নির্গুণ নির্ব্বিশেষ মহর্ষি পরাশর যেন সেকথা প্রমাণ করিতে চাহেন না। তাঁহার মতে পরব্রহ্ম স্বরূপতই সবিশেষ সশক্তিক অনন্তকল্যাণগুণময়। সশক্তিক পরব্রহ্মের পক্ষে বিশ্বজগৎ সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় করাও যেমন অসম্ভব নহে, তদ্রূপ সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের কারণ বা কর্ত্তা হইয়াও নিজের শুদ্ধ স্বরূপকে নির্দ্দোষ রাখাও অসম্ভব নহে।

ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রে সবিশেষ নির্ব্বিশেষ সগুণ। নির্গুণ এই উভয়বিধ ব্রহ্মবোধক বাক্য আছে। "সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ"। যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ"। ইত্যাদি শ্রুতিসকল সবিশেষ ব্রহ্মবোধক আর "অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘম্" "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"—এই সকল শ্রুতি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবোধক।

এইরকম বিবিধ বাক্য থাকিলেও ইহা নিশ্চয় যে, পরব্রহ্ম দুইটী নহে। এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম। এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম একই সময়ে রূপবান ও রূপ-বিবর্জ্জিত এইরূপ হইতে পারে না। সুতরাং নিশ্চয়ই এই সকল বাক্যের কোন তাৎপর্য্য আছে। সেই তাৎপর্য্যটীকেই অনুসন্ধান করিতে হইবে।

বস্তুতঃ সেই তাৎপর্য্যটীকে খুঁজিতে গিয়াই কেবলাদ্বৈতবাদীগণ বলেন, ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নির্ব্বিশেষ নির্গুণ। সগুণ সবিশেষ ভাবটী ঔপাধিক। উপাধি আবার অবিদ্যা কর্ত্তৃক কল্পিত। অবিদ্যা অনির্ব্বচনীয়া ভ্রমরূপা। সুতরাং চিন্মাত্র ব্রহ্মই সত্য। আর সব মিথ্যা। পরাশর কিন্তু এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন না। তাঁহার যাহা মনোভাব আমরা যথাস্থানে বুঝিতে চেষ্টা করিব। ইতি—

( ক্রমশঃ )

---

যদিও ভয় আছে যে, এই পাশ্চাত্য-বীর্যতরঙ্গে আমাদের বহুকালাঙ্কিত রত্নরাজি বা ভাসিয়া যায়; ভয় হয়, পাছে প্রবল আবর্ত্তে পড়িয়া ভারতভূমিও ঐহিক ভোগলাভের রণভূমিতে আত্মহারা হইয়া যায়; • • আসুক চারিদিক হইতে রশ্মিধারা, আসুক তীব্র পাশ্চাত্য কিরণ। যাহা দুর্ব্বল, দোষযুক্ত, তাহা মরণশীল—তাহা লইয়াই বা কি হইবে? যাহা বীর্য্যবান, বলপ্রদ, তাহা অবিনশ্বর—তাহার নাশ কে করে?

—স্বামী বিবেকানন্দ

# অন্ধ্রদেশে প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপ আবিষ্কার

রবিবার ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৫৫ ( ১৮ই ভাদ্র ) নিউ দিল্লী হইতে 'প্রেস ট্রাষ্ট অফ্ ইণ্ডিয়া'র ( P. T. I ) জনৈক সংবাদদাতা অন্ধ্রদেশে ( দক্ষিণভারতে ) সম্প্রতি একটি প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপ আবিষ্কারের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংবাদ দিয়াছেন। ঐ সংবাদ *Statesman* পত্রিকায় মঙ্গলবার ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্ত সংবাদটির বিবরণ এইরূপ :—

অন্ধ্রদেশে সম্প্রতি একটি প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। পুরাতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা অনুমান করিতেছেন, ইহার নির্মাণ-কাল অনুমান খৃষ্টীয় চতুর্থ শতক। এই স্তূপটি দক্ষিণ ভারতে অন্ধ্রদেশে শ্রীকাকুলাম জেলায় শালিহুন্দাম নামক স্থানে অবস্থিত।

ভারতবর্ষে বৌদ্ধযুগের ইতিহাস সম্বন্ধে এই স্তূপটির আবিষ্কার একটি নূতন তথ্যের আলোক-সম্পাত করিয়াছে। তাহার দ্বারা বৌদ্ধধর্মের উত্তর ( মহাযান ) এবং দক্ষিণ ( হীনযান ) এই দুই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ-সূত্র আবিষ্কার করা যাইতে পারিবে।

শালিহুন্দাম খৃষ্টীয় প্রথম কয়েক শতাব্দীর সময়ে বৌদ্ধধর্মের একটি সাধনা-কেন্দ্র ছিল। এখানে সে সময়ে একটি বৃহৎ বৌদ্ধসঙ্ঘারাম ( মঠ ) ছিল বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে। অনেক ঐতিহাসিকের মতে এখানে খৃষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের বিখ্যাত একটি সাধনা ও প্রচারের কেন্দ্র ছিল।

শালিহুন্দাম-এর এই বৌদ্ধমঠটির অস্তিত্বের শেষ-শতাব্দীর দিকে ইহা বজ্রযান বৌদ্ধধর্ম সাধনার পীঠস্থান ছিল বলিয়া অনেক ঐতিহাসিক পণ্ডিত অনুমান করিতেছেন। এই স্থানের বৌদ্ধ ধর্মের সাধকগণ বিখ্যাত বিক্রমশীলা এবং ওড্ডীয়ান্ মঠের ধর্মগুরুদের নিকট হইতে ধর্মসাধনায় প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন।

ইহা ছাড়া এখানে কতকগুলি মৃন্ময় পাত্র ও প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। সেইগুলি প্রাচীন রোম্যানদের দ্বারা ব্যবহৃত পাত্র ও মুদ্রা। রোম্যান সম্রাট সীজার ক্লডিয়াস টাইবেরিয়াস-এর ( Tiberius—জন্ম ১৯ই নভেম্বর ৪২ খৃষ্ট-পূর্বাব্দ, মৃত্যু ১৬ই মার্চ ৩৭ খৃষ্টাব্দ ) রাজত্বকালে এই সকল মৃন্ময় বাসনপত্র ও মুদ্রা ( coins ) ব্যবহৃত হইত। ইহার দ্বারা জানিতে পারা যায়—খৃষ্টীয় প্রথম শতকের সময়ে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী ইউরোপের কোন কোন দেশের সহিত বিশেষতঃ প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের সহিত, এখানকার তৎকালীন অধিবাসীদের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের সম্বন্ধ ছিল।

---

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা ভাব আছে; বাইরের মানুষটা সেই ভাবের বহিঃপ্রকাশ মাত্র,—ভাষা মাত্র। সেইরূপ, প্রত্যেক জাতের একটা জাতীয় ভাব আছে। এই ভাব জগতের কার্য্য করছে—সংসারের স্থিতির জন্য তার আবশ্যক। যে-দিন সে অত্যাবশ্যকটুকু চ'লে যাবে, সেদিন সে জাত বা ব্যক্তির নাশ হবে।

—স্বামী বিবেকানন্দ

# মহাত্মা সেণ্ট পিটারের পবিত্র দেহাবশেষ আবিস্কৃত

অমৃতবাজার পত্রিকার শনিবার ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ তারিখে রোমনগর ( ইটালী ) হইতে একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান মণ্ডলীর বর্ত্তমানে সর্ব্বপ্রধান নেতা পোপ দ্বাদশ পিয়াস ( Pope Pius XII ) শীঘ্রই পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় একটি বিশেষ চাঞ্চল্যকর সংবাদ জনসমাজে প্রকাশ করিবেন।

রোম নগরের বারো মাইল দক্ষিণে কাষ্টেল ক্যাণ্ডোলফো ( Castel Candolfo ) নামে একটি পল্লী অঞ্চল আছে। এই স্থানটিতে পোপের গ্রীষ্মকালে থাকিবার বাড়ী আছে। মহামানব যীশুখৃষ্টের সর্ব্বপ্রধান সন্ন্যাসী শিষ্য সেণ্ট পিটারের ( Apostle St. Peter ) পবিত্র দেহাবশেষ পাওয়া সম্বন্ধে এখানে তিনি প্রামাণ্য দলিলপত্রাদি প্রকাশের জন্য নিযুক্ত আছেন। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ২রা মার্চ্চ পোপ দ্বাদশ পিয়াসের আশী বৎসর জীবনকাল সম্পূর্ণ হইবে। ঐ সময়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা দিবার জন্য আয়োজন করিতেছেন।

এই সংবাদে এইরূপ আভাস দেওয়া আছে যে, প্রায় গত দুই বৎসরেরও অধিককাল গবেষণার ফলে নিঃসন্দেহভাবে পোপের নিজস্ব ব্যবহৃত কামরার মধ্যে একটি পেটিকায় রক্ষিত ( casket ) সেণ্ট পিটারের মানবদেহের পুণ্যাস্থি পাওয়া গিয়াছে। সেণ্ট পিটারই খৃষ্টান ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রথম প্রধান ধর্ম্মনেতা ও পোপ হইয়াছিলেন। রোমের অত্যাচারী ও দুর্বৃত্ত সম্রাট নীরোর ( জীবনকাল ৩৭-৬৮ খৃষ্টাব্দ ) রাজত্বকালে ( ৫৪-৬৮ খৃষ্টাব্দ ) সেণ্ট পিটার প্যালেষ্টাইন হইতে রোমে আসিয়া যীশুখৃষ্টের ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ভ্যাটিক্যান পাহাড় সেণ্ট পিটারের ধর্ম্মপ্রচারের প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল। রোমসম্রাটদের অত্যাচারে জর্জ্জরিত বহু ক্রীতদাস ও নির্য্যাতিত শতশত নরনারী সেণ্ট পিটারের পবিত্র প্রভাবে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে থাকে। সেজন্য নীরোর আদেশে তাঁহার অত্যাচারী অনুচরেরা মহাত্মা সেণ্ট পিটারকে ৬৪ খৃষ্টাব্দে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছিল। রোমে পিটারের ধর্ম্মপ্রচারের প্রধান স্থান ভ্যাটিক্যান পাহাড়ের উপরেই পরবর্ত্তী-কালে রোম্যান ক্যাথলিক খৃষ্টানদের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মনেতা পোপের বাসভবন এবং ক্যাথলিক সন্ন্যাসীদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গীর্জ্জা নির্ম্মিত হইয়াছে।

---

# অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসুর জন্মদিনে

সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মনীষী মাননীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় গত পয়লা জানুয়ারী ১৯৪৬ রবিবার ৬২ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়াছেন। অধ্যাপক বসু মহাশয় তাঁহার অসাধারণ বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ও আবিষ্কার-শক্তির দ্বারা পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক মনীষিগণের সমাজে আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতি ও সম্মান লাভ করিয়াছেন। তাঁহার বৈজ্ঞানিক মনীষা ও কর্ম্ম-সাধনা শুধু বাঙালী জাতিকেই নয়—সমগ্র ভারতবাসীদের গৌরবান্বিত করিয়াছে। বিশ্ববিধাতার নিকট আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে অধ্যাপক বসু মহাশয়ের সুদীর্ঘ আয়ু, সবল স্বাস্থ্য ও আরও নবনব অবদানের জন্য প্রার্থনা জানাইতেছি। এই সঙ্গে অধ্যাপক বসুকে আমাদের অন্তরের অনুরাগ শুভেচ্ছা ও সম্মানের সহিত অভিনন্দিত করিতেছি।

---

# শ্রীললিতা-রহস্য

শ্রীরামমোহন চক্রবর্ত্তী, এম. এ, পুরাণরত্ন, বিদ্যাবিনোদ

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য "ললিতা-ত্রিশতী-ভাষ্যে" 'ললিতা' নামের এইরূপ নিরুক্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

'ললিতং স্নিগ্ধং সুন্দরম্' ইতি বচনাৎ অত্যন্ত সৌন্দর্য্যবতী ইত্যর্থঃ, অনুপমসৌন্দর্য্যা বা। ওঁ ললিতায়ৈ নমঃ। (নাম-সংখ্যা ৬২)

অর্থাৎ, 'ললিত' শব্দের অর্থ সুন্দর। অতিশয় সৌন্দর্য্যবতী অথবা ইনি অতুলনীয় সৌন্দর্য্যবিশিষ্টা বলিয়া 'ললিতা' নামে অভিহিতা হন।

ললিত-সহস্রনামের "সৌভাগ্য-ভাস্কর" ব্যাখ্যায় শ্রীযুক্তাস্কর রায় 'ললিতা' নামের তাৎপর্য্য নিরূপণ প্রসঙ্গে বলেন,—

(১) পদ্মপুরাণে হি "লোকান্ অতীত্য ললতে ললিতা তেন চোচ্যতে।" (২) ললিতং শৃঙ্গার-ভাবজন্য: ক্রিয়াবিশেষঃ তদ্বতী ললিতা তেন শৃঙ্গাররসপ্রধানা ইয়ং মূর্ত্তিরিতি সূচিতম্।

অর্থাৎ—(১) পদ্মপুরাণমতে, দেবী লোকসমূহকে অতিক্রম করিয়া ক্রীড়া করেন এইজন্য তাঁহার নাম "ললিতা"। (২) শৃঙ্গার ভাবজাত ক্রিয়াবিশেষকে 'ললিত' বলে। দেবী ঐরূপ ক্রিয়াযুক্তা বলিয়া 'ললিতা' নামে তিনি অভিহিতা। সুতরাং দেবীর এই মূর্ত্তি শৃঙ্গার-রস-প্রধানা, ইহা সূচিত হইতেছে।

• 'শ্রীললিতা সহস্রনাম' স্তোত্রে ভগবতী ললিতা দেবীর এইরূপ ধ্যান বর্ণিত হইয়াছে,—

সিন্দূরারুণবিগ্রহাং ত্রিনয়নাং মাণিক্য মৌলিস্ফুর—
তারানায়কশেখরাং স্মিতমুখীমাপীনবক্ষোরুহাম্।
পাণিভ্যামলিপূর্ণ রত্ন চষকং রক্তোৎপলং বিভ্রতীং
সৌম্যাং রত্নঘটস্থরক্তচরণাং ধ্যায়েৎ পরামম্বিকাম্॥"

—(১।৫২)

অর্থাৎ — জগন্মাতা শ্রীললিতা দেবীর মূর্ত্তি সিন্দূরবৎ রক্তবর্ণা — দেবী ত্রিনয়না, তাঁহার মণিমাণিক্য রত্নাদি খচিত কিরীট-শীর্ষে চন্দ্র দীপ্তি পাইতেছে। দেবী মৃদুহাস্যমুখী এবং পীনোন্নত পয়োধরা। দেবী তাঁহার একহস্তে অমিপূর্ণ রত্নচষক (পানপাত্র) এবং অপর হস্তে রক্তপদ্ম ধারণ করিতেছেন, তিনি সৌম্যা এবং রত্নঘটের উপর রক্তচরণদ্বয় স্থাপন করিয়া বিরাজিতা।

ভগবতী ললিতা দেবীর প্রকারান্তর ধ্যান, যথা,

"উদ্যদ্ভানুসহস্রাভা চতুর্বাহুসমন্বিতা
রাগস্বরূপ-পাশাঢ্যা ক্রোধাকারাঙ্কুশোজ্জ্বলা॥
মনোরূপেক্ষু-কোদণ্ডা পঞ্চতন্মাত্রসায়কা।
নিজারুণ প্রভাপূরমজ্জদ্ ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলা॥"

—(শ্রীললিতা সহস্র নাম, ২।২—৩)

অর্থাৎ—ললিতা দেবী উদীয়মান সহস্র সহস্র সূর্য্যতুল্য উজ্জ্বল প্রভাবিশিষ্টা। তিনি চতুর্ভুজে রাগ (আসক্তি) রূপ পাশ, ক্রোধাকার অঙ্কুশ, মনোরূপ ইক্ষু-ধনু এবং পঞ্চতন্মাত্ররূপ পঞ্চবাণ ধারণ করেন। তিনি স্বকীয় অরুণ প্রভাসমূহে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলকে নিমজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন।

পরাশক্তি কি কারণে ললিতা বা ত্রিপুরসুন্দরী-রূপে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন তাহা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের উত্তর খণ্ডে এবং ত্রিপুরা-রহস্য মাহাত্ম্যখণ্ডে সুবিস্তর-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।•

• পূর্ব্বকালে ভণ্ডাসুর শিবের আরাধনা করিয়া অভয়-বর প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। দেবতাগণকে স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিয়া ভণ্ডাসুর তাঁহাদের হবির্ভাগ (যজ্ঞভাগ) নিজেই ভোগ করিতে লাগিল। ইন্দ্রাণী (শচী) অসুরভয়ে ভীতা

• ললিতোপাখ্যানম্ (ব্রহ্মাণ্ড পুরাণোত্তর খণ্ডান্তর্গতম্) বোধে নির্ণয়সাগর প্রেসে এবং ত্রিপুরা রহস্যম্ (মাহাত্ম্যখণ্ডম্) কাশী সংস্কৃত সিরিজে (নং ৮২) প্রকাশিত হইয়াছে।

হইয়া ভগবতী গৌরীর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ভণ্ডাসুর ক্রমে ক্রমে ত্রৈলোক্য জয় করিয়া অনুজ বিশুক্রকে পৃথিবীর এবং বিষঙ্গকে পাতালের আধিপত্য প্রদান করিল এবং স্বয়ং ইন্দ্রাসনে আরোহণ করত ইন্দ্রাদি দেবগণকে ভার-বহন-কার্য্যে নিয়োজিত করিল। ইন্দ্রাণী গৌরীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন জানিয়া অসুরপতি কৈলাসে গমনপূর্ব্বক গণেশের নিকট শচীকে প্রার্থনা করিল। গণেশ ক্রুদ্ধ হইয়া প্রমথ-সেনা লইয়া ভণ্ডাসুর ও দৈত্যসৈন্যকে আক্রমণ করিলেন।

ভণ্ডাসুর কর্ত্তৃক গণেশ আক্রান্ত হইয়াছেন—তাহা দেখিতে পাইয়া গৌরী অসুররাজকে পাশ বদ্ধ করত নিধনোদ্যতা হইলে ব্রহ্মা আসিয়া দেবীকে শঙ্করের বরদানের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। গৌরী অগত্যা ভণ্ডাসুরকে ছাড়িয়া দিলেন।

ভণ্ডাসুর স্বর্গে ফিরিয়া আসিলে দেবতাগণের নিগ্রহ ও লাঞ্ছনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সুরগুরু বৃহস্পতি তখন দেবতাগণকে তন্ত্রানুসারে পরাশক্তির উদ্দেশে মহাযাগ অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দিলেন। তদনুসারে প্রত্যেক দেবগণ স্বীয় অঙ্গের মাংস কর্ত্তন পূর্ব্বক জগন্মাতার উদ্দেশে হোমাগ্নিতে আহুতি দিতে লাগিলেন।

"হস্তেষু সর্ব্বমাংসেষু পাদেষু চ করেষু চ।
হোতুমিচ্ছৎসু দেবেষু ফলেবরনশেষতঃ॥
প্রাদুর্বভূব পরমং তেজঃ পুঞ্জমনুপমম্।
কোটিসূর্য্য প্রতীকাশং চন্দ্রকোটি সুশীতলম্॥"
—( ললিতোপাখ্যানম্, ৭।৭১-৭২ )

অর্থাৎ,—হস্ত ও পদের সমস্ত মাংস আহুতি প্রদত্ত হইলে পর দেবগণ যখন নিঃশেষে সমুদয় দেহই আহুতি প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি কোটিসূর্য্য প্রভাবিশিষ্ট ও চন্দ্রকোটি সুশীতল পরম অনুপম তেজঃপুঞ্জ প্রাদুর্ভূত হইল।

"তন্মধ্যে সমুদঞ্চচ্চাকারমদ্ভুতম্।
তন্মধ্যে মহাদেবীমুদ্যদার্কসমপ্রভাম্॥
জগদ্রক্ষণকারাং ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মিকাম্।
সৌন্দর্য্যদায়নীমাদ্যাম্ আনন্দরস-সাগরাম্॥
কৃপাকুসুমসঙ্কাশাং দাড়িমীকুসুমাম্বরাম্।
সর্ব্বাভরণসংযুক্তাং শৃঙ্গারৈক-রসালয়াম্॥
কৃপাতরঙ্গিতাপাঙ্গ-নয়নালোক-কৌমুদীম্।
পাশাঙ্কুশেক্ষুকোদণ্ড-পঞ্চবাণ-লসৎকরাম্॥
তাং বিলোক্য মহাদেবীং দেবাঃ সর্ব্বে সবান্ধবাঃ।
প্রণেমুর্মুদিতাত্মানো
জুহ্বোকুহ্বোহ বিলাম্বিকাম্॥"
—( ৭।৭২-৭৭ )

অর্থাৎ—ঐ তেজঃপুঞ্জের মধ্যদেশে চক্রাকার এক অদ্ভুতম তেজোমণ্ডল প্রকাশিত হইল; দেবগণ দেখিতে পাইলেন, ঐ চক্রাকার তেজোমণ্ডল মধ্যে উদয়কালীন সূর্য্যবৎ প্রভাবিশিষ্টা মহাদেবী ললিতা আবির্ভূতা হইলেন। তাঁহার ঐ মূর্ত্তি জগৎ উজ্জীবনকারিণী, তিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবরূপিণী, তাঁহাতে সমুদয় শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা, তিনি আনন্দরসের সাগররূপা। মহাদেবী ললিতা জবাকুসুমতুল্য শুভ্রাবিশিষ্টা, দাড়িমীপুষ্পবৎ রক্তবর্ণ বস্ত্রপরিহিতা, সর্ব্বাভরণে অলঙ্কৃতা এবং শৃঙ্গাররসের আশ্রয়স্বরূপিণী। তিনি কৃপা-তরঙ্গিত কটাক্ষপাত রূপ চন্দ্রিকাবর্ষণকারিণী; তাঁহার চতুর্ভুজে পাশ, অঙ্কুশ, ইক্ষু-কোদণ্ড এবং পঞ্চবাণ একত্রে শোভা পাইতেছে। ইন্দ্রাদি দেবগণ উদৃশী মহাদেবী ললিতাকে দর্শন করিয়া আনন্দিত চিত্তে পুনঃ পুনঃ সেই অখিলাত্মিকা জগন্মাতাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন।

ভগবতী ললিতার কৃপাদৃষ্টিপাতে দেবতাগণ তৎক্ষণাৎ নিষ্পাপ ও মহাবলশালী হইয়া উঠিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের দেহ বজ্রবৎ দৃঢ় হইল। তাঁহারা ভক্তিবিনম্রচিত্তে অখিলার্থদায়িনী ললিতা-দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন:—

"জয় ব্রহ্মময়ে দেবি ব্রহ্মানন্দরসাত্মিকে।
জয় নারায়ণি পরে নিশ্চিন্তাশেষবিগ্রহে॥
জয় শ্রীকণ্ঠ-হৃদিতেজয় শ্রীললিতাম্বিকে।
জয় শ্রীবিজয়ে দেবি বিজয়-শ্রীসমৃদ্ধিদে॥"

'ললিতাস্তবরাজ' নামে বিখ্যাত এই স্তবটি

ললিতোপাখ্যানম্, অষ্টম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য, ১০০ শ্লোক।

তবে পরিতুষ্টা হইয়া ভগবতী ললিতা ইন্দ্রপ্রমুখ সুরগণকে বর প্রদান করিলেন,—

"অহমেব বিনির্গত্য ভণ্ডঃ দৈত্যকুলেশ্বরম্।
অচিরাত্তব দাস্যামি ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
নির্ভয়া মুদিতাঃ সন্তু সর্বে দেবগণাস্তথা॥"

—( ৮।৩৪—৩৫ )

অর্থাৎ—"হে ইন্দ্র! আমি অচিরেই দৈত্যরাজ ভণ্ডাসুরকে পরাজিত করিয়া তোমাকে সচরাচর ত্রৈলোক্যের আধিপত্য প্রদান করিব। হে দেবগণ, তোমরা নির্ভয় ও আনন্দিত হও।"

অতঃপর মহাদেবী ললিতা শ্রীচক্রাত্মক রথে আরোহণ করিয়া ভণ্ডাসুরকে বধ করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। ভগবতী ললিতার শক্তি বারাহী, মন্ত্রিণী, দণ্ডিণী, বারাহী প্রভৃতি দৈত্য-সৈন্যসমূহকে বধ করিতে লাগিলেন। মহাদেবী ললিতার সহিত ভণ্ডাসুরের ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পরিশেষে 'মহাকামেশ্বর' নামক দিব্য অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া ভগবতী ললিতা ভণ্ডাসুরকে বধ করিলেন।

---

# বিবিধ সঙ্কলন

## মোটরগাড়ীর বিনা-টিউবের টায়ার

মস্কো টায়ার ফ্যাক্টরীতে এক নতুন ধরণের টায়ার তৈরী হচ্ছে। এই টায়ারের কোন টিউব নেই। এই বিনা-টিউবের টায়ার দেখতে সাধারণ টায়ারেরই মতন। এই টিউববিহীন টায়ারে টিউবের কাজ সম্পাদিত হয় টায়ারের অভ্যন্তরস্থ নরম রবারের স্তর দ্বারা।

এই নূতন ধরণের টায়ার নষ্ট হ'লে বা ফেটে গেলে সঙ্গে সঙ্গেই বাতাস বা'র হয়ে আসে না। টায়ারের ফাটল বন্ধ করার জন্যে চাকা খোলা বা অপসারিত করার কোন প্রয়োজন পড়ে না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পুরো মেরামতের কাজ শেষ হয়ে যায়। যত দ্রুতবেগেই মোটরগাড়ী ছুটে চলুক না কেন বিনা-টিউবের টায়ার থেকে কোনো বিপদ বা দুর্ঘটনা ঘটবে না। এটি অধিকতর নিরাপদ।

## শিশু পক্ষাঘাত রোগের টীকা

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের স্বাস্থ্য ও শিক্ষাদপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, যে সমস্ত শিশু এই বছর শিশু পক্ষাঘাত রোগের টীকা নিয়েছিল তাদের মধ্যে রোগাক্রমণের সংখ্যা শতকরা ২৫ থেকে ৫০ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। এ বছর মোট ৭০ লক্ষ শিশুকে ঐ টীকা দেওয়া হয়েছিল। এর ফলাফল সংক্রান্ত বিবরণী এই প্রথম প্রকাশিত হলো।

স্বাস্থ্য ও শিক্ষা দপ্তরের সেক্রেটারী জানিয়েছেন যে, ব্যাপকভাবে শিশুপক্ষাঘাতের টীকা দেওয়ার ফল খুবই উৎসাহজনক।

তিনি আরও বলেন যে, যাদের বয়স ৫ থেকে ৯ বছর, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে তাদের প্রত্যেককেই যাতে দুটি করে রোগ প্রতিষেধক ইনজেকশন দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এর জন্যে প্রয়োজন অনুযায়ী টীকা পাওয়া যাবে ব'লে মনে হয়।

এই টীকার আবিষ্কারক ডাঃ সল্ক ( Salk ) জানিয়েছেন যে, যাতে শিশু-পক্ষাঘাত টীকাকে পুরোপুরি কার্যকরী করা যায় তার জন্য তিনি নতুন পরীক্ষাকার্য চালাচ্ছেন।

—( মাঞ্চেস্টার )

---

# এক্স-রশ্মি প্রক্রিয়া সম্পর্কে ডাঃ রামনের নূতন আবিষ্কার

### ভারতীয় বিজ্ঞান একাডেমীর অধিবেশনে বর্ণনা

### পদার্থনিচয়ের আপেক্ষিক তাপমাত্রা সংক্রান্ত মতবাদের ত্রুটির উল্লেখ

হায়দ্রাবাদ, ২৭শে ডিসেম্বর—নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত ভারতীয় পদার্থবিদ্ ডাঃ সি, ভি, রামন আজ ভারতীয় বিজ্ঞান একাডেমীর অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে বলেন যে, স্ফটিকের উপর 'এক্স-রে' প্রক্রিয়া সংক্রান্ত পরীক্ষায় তিনি দেখিয়াছেন যে, স্ফটিকে তাপ প্রয়োগের ফলে উহার পদার্থকণার অনিয়মিত বিক্ষোভ ঘটে বলিয়া পদার্থনিচয়ের আপেক্ষিক তাপমাত্রা ( স্পেসিফিক হিট ) সংক্রান্ত "ডেবাই ও বর্ণের" মতবাদে যে অনুমান করা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ ভুল।

এক্স-রে প্রক্রিয়া সংক্রান্ত তাঁহার সাম্প্রতিক আবিষ্কার প্রসঙ্গে ডাঃ রামন বলেন যে, "লোয়ে ও তাঁহার সহকর্মীদের বিখ্যাত পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, স্ফটিকের মধ্যে এক্স রে প্রবিষ্ট হইলে তাহার 'অপবর্তন' ঘটে। সঙ্কীর্ণ এক্স-রশ্মিমালা স্ফটিকের মধ্য দিয়া যায় এবং স্ফটিকের পিছনে ফটোগ্রাফিক ফিল্মে তাহা ফেলা হয়। ফটোগ্রাফ ছবিতে রূপান্তরিত করিলে এক্স-রশ্মিমালার আদি পথের চতুর্দিকে সুনির্দিষ্ট ক্রমবর্ধমান দাগ লক্ষিত হয়। পরীক্ষাকালে স্ফটিকটি উচ্চ তাপাঙ্কে উত্তপ্ত করা হইলে দাগগুলি খুব ক্ষীণ দেখা যায়।

এই পরীক্ষার যে ফলাফল এখনও পর্যন্ত সাধারণভাবে স্বীকৃত হইয়াছে তাহার ব্যাখ্যা নিম্নরূপ দেওয়া যায় :—

স্ফটিকের বিভিন্ন সমতলের সমান্তরাল রেখা ধরিয়া ইলেকট্রনের যে-সব নির্দিষ্ট স্তর রহিয়াছে, আদি এক্স-রশ্মিমালা তাহার উপর প্রতিফলিত হয়। কিন্তু পারমাণবিক কেন্দ্রগুলি এই সময় এক প্রকার নিষ্ক্রিয়ই থাকে। তাপ-প্রয়োগজনিত ক্রিয়ার ফলে পারমাণবিক কেন্দ্রগুলি বিক্ষুব্ধ হয়। সেজন্য ইলেকট্রনের স্তরগুলির বিকৃতি ঘটে, ফলে তাহাদের প্রতিফলন ক্ষমতা ব্যাহত (ক্ষীণ) হয়।

উপরিউক্ত ব্যাখ্যায় স্ফটিকের গঠন সংক্রান্ত মৌলিক তথ্য কিছুমাত্রায় উপেক্ষিত হইয়াছে, কারণ পারমাণবিক কেন্দ্র ও তাহাদের চতুর্দিকস্থ ইলেকট্রনই স্ফটিকটির "কঠিন" গঠনের জন্য দায়ী। এক্স-রশ্মির তড়িৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্রের দ্বারা ইলেকট্রন প্রভাবিত হইলে পারমাণবিক কেন্দ্রগুলির অবস্থানও নিশ্চয় ব্যাহত হইবে।

দ্বিতীয়তঃ স্ফটিকের উপর তাপ প্রয়োগের ফলে উহার পদার্থকণার অনির্দিষ্ট বিক্ষোভ ঘটে বলিয়া পদার্থনিচয়ের আপেক্ষিক তাপমাত্রা সংক্রান্ত মতবাদে যে অনুমান করা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ ভুল। বস্তুতঃ প্রত্যেক স্ফটিকই "পারমাণবিক দোলকের" ( atomic pendulum ) সমষ্টিবিশেষ। এইসব দোলকের আন্দোলনের গতি প্রকৃতি একই প্রকার। সেজন্য প্রত্যেক স্ফটিক গতির প্রক্রিয়া ও তাপ প্রক্রিয়াকালে যথেষ্ট নিয়মবর্তিতা দেখায়।

স্ফটিকের উপর দিয়া যাইবার কালে এক্স-রশ্মিমালার দুই প্রকার প্রতিফলন হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। উহাদের প্রথমটি হইল 'লোয়ে টাইপ'—অর্থাৎ যাহাতে পারমাণবিক কেন্দ্রগুলি অবিকৃত থাকিয়া ইলেকট্রনগুলি শুধু বিক্ষুব্ধ হয়। দ্বিতীয়তঃ, আদি এক্স-রশ্মি প্রতিফলিত হয় ক্ষীণভাবে।

ডাঃ রামন তাঁহার ভাষণে দ্বিতীয় প্রকারের প্রতিফলনের পরীক্ষাগত প্রমাণ দেখান এবং ইহার বিশদ বিবরণ দেন।

—সি-টি-আই।

---

# চন্দ্রের জন্ম-কাহিনী

## প্রচলিত মতবাদ মিথ্যা প্রতিপন্ন

লস এঞ্জেলস্ ( ক্যালিফোর্নিয়া ), ৮ই জানুয়ারী, ১৯৪৬।—পৃথিবীর দেহ হইতে একটি বৃহৎ অংশ শূন্যলোকে নিক্ষিপ্ত হইয়া চন্দ্রের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া দীর্ঘকাল যাবৎ যে মতবাদ চলিয়া আসিয়াছে, সমুদ্রের তলদেশ সম্পর্কে নূতন গবেষণায় তাহা মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়াছে।

ডাঃ ফ্রাঙ্ক প্রেস সম্প্রতি আমেরিকান ফিজিক্যাল সোসাইটিতে বক্তৃতাকালে বলেন, ভূ-কম্পন তরঙ্গের দ্বারা সমুদ্রের তলদেশের মৃত্তিকাস্তর সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের যে নূতন পদ্ধতি গ্রহণ করা হইয়াছে উহা চন্দ্রের জন্ম সংক্রান্ত পুরাতন মতবাদ সমর্থন করে না। কেননা, দেখা গিয়াছে যে, পৃথিবীর সকল সমুদ্রেরই তলদেশে আগ্নেয়-প্রস্তর ও স্ফটিক-প্রস্তর সমান পুরু অবস্থায় রহিয়াছে। ডাঃ ফ্রাঙ্ক প্রেস আরও বলেন, অতলান্তিক মহাসাগরে 'আটলান্টিস' মহাদেশ নিমজ্জনের যে পুরা-কাহিনী প্রচলিত রহিয়াছে, তাহাও নিছক কল্পনা। এরূপ কোন মহাদেশের অস্তিত্ব কোনদিন ছিল না।

---

# অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর একটি গবেষণা-পত্র

## শুভেন্দু কর

এমন অনেক পদার্থ আছে যারা কিছুক্ষণ কোন উজ্জ্বল আলোর সান্নিধ্যে থাকার পর অনেকক্ষণ ধ'রে অন্ধকারে আলো বিকীরণ করতে পারে। এই ধরণের উত্তর-বিকীরণের সঙ্গে সাধারণভাবে অনেকেই পরিচিত আছেন ( যেমন রেডিয়াম দেওয়া ঘড়ি )। এইরূপ আলোক বিকীরণকে বলা হয় 'Phosphoresence' বা 'প্রতিপ্রভা'। আর এক ধরণের পদার্থ আছে, যাদের ওপর কোন উজ্জ্বল আলো পড়লে ঐ আলো যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই শুধু ঐ পদার্থরা নিজস্ব আলো বিকীরণ করতে পারে; এইরূপ বিকীরণকে বলা হয়—'Floresence' বা অনুপ্রভা—এবং এই উভয় প্রকার প্রক্রিয়ার নাম Luminescence বা প্রভন। এইসব প্রক্রিয়াতে ঐ বিশেষ পদার্থগুলি উজ্জ্বল আলো থেকে কিছুটা শক্তি সঞ্চয় ক'রে রাখে, পরে সেই শক্তির বিকীরণ হয়। আলো বলতে আমরা সাধারণতঃ দৃষ্টির চেতনাকে যে-সব আলোক-তরঙ্গগুলি উদ্বুদ্ধ করতে পারে তাদেরই বুঝি। তার বাইরেও এমন অনেক তরঙ্গ আছে, যাদের আমরা সাধারণভাবে অনুভব করতে পারি না।

যেমন লাল-উজানী আলো ( infra-red rays ), বেগুনী পারের আলো ( ultra-violetrays ) এবং রঞ্জনরশ্মি ) ( x-rays ) ইত্যাদি দৃষ্টির অনুভূতিতে ধরা দেয় না। এমন অনেক আলোক-তরঙ্গের শক্তি দৃশ্যমান আলোক-তরঙ্গের শক্তির চাইতে অনেক বেশী। সাধারণ ( দৃশ্যমান ) 'আলোক-রশ্মির পক্ষে দুরতিক্রম্য' অনেক, রঞ্জন-রশ্মি অবলীলাক্রমে অতিক্রম করতে পারে এ প্রায় সকলেই জানেন। রঞ্জনরশ্মি এবং আরো অনেক শক্তিশালী আলোক-তরঙ্গ বাস্তবীয় পদার্থের

অণুগুলিকে ভেঙে ফেলতে পারে। এ প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'ionisation' বা 'আয়নন'। আয়ননের শক্তিসম্পন্ন আলোক-তরঙ্গ বিশেষ কতকগুলি পদার্থের ওপর পতিত হ'লে তারা অনুপ্রভা বিকীরণ এবং প্রতিপ্রভা উদ্ভব বিকীরণের ক্ষমতা লাভ করে। আমার অনেক সময় দেখা যায় যে, এইরূপ আলোক তরঙ্গাবিষ্কৃত ( irradiated ) পদার্থগুলিকে উত্তপ্ত করলে তারা আহরিত শক্তি আলোক-তরঙ্গরূপে বিকীর্ণ করে। বিভিন্ন তাপে বিকীর্ণ আলোর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এই উত্তাপ বিমুক্ত বিকীরণকেই সাধারণতঃ 'thermo-luminescence' বা 'তাপ-প্রভন' বলা হয়। শক্তি আহরণের ক্ষমতা নিম্নতাপেই অধিক পরিলক্ষিত হয়, সেজন্য অত্যন্ত নিম্নতাপে ( যথা—১৮৪° সেন্টিগ্রেড ) জড় পদার্থকে আলোকা বিষ্কৃত করলে তাপ-প্রভনের প্রখরতা বর্ধিত হয়। বিভিন্ন উষ্ণতায় তাপ প্রভন বিকীরণের জন্য বিভিন্নতা লক্ষ্য করলে শক্তি-সঞ্চয়ের ( পদার্থের ) বিভিন্ন স্তরের গভীরতা অনুমান করা যায়। স্ফটিক অ্যালকালি হ্যালাইডস, ক্যালসাইট, কাচ এবং অন্যান্য আরও অনেক বস্তুতে তাপ-প্রভন দৃষ্ট হয়। এই বৈশিষ্ট্যকে বহু বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে বর্তমানে ব্যবহার করা হচ্ছে।

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর পরিচালনায় বিজ্ঞান কলেজের 'খয়রা বীক্ষণাগারে' ১৯৫০ সাল থেকে তাপপ্রভন বিকীরণের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণাকার্য চলেছে। সাধারণ তাপে এবং অত্যন্ত নিম্নতাপে অ্যালকালি হ্যালাইডস অনুপ্রভা বিকীরণের পরীক্ষা করছেন—শ্রীহর্ষনাথ বসু, শ্রীজগদীশ শর্মা এবং শ্রীঅমরেন চট্টোপাধ্যায়। তাপ-প্রভন প্রক্রিয়ার পরীক্ষা এইসব রাসায়নিক পদার্থের শক্তিসঞ্চয়ের রহস্য উদ্ঘাটনে সাহায্য করছে।

বিশেষভাবে নির্মিত এক শূন্য গোলকের বহির্দেশে চাঁদির পাতের ওপর পরীক্ষণীয় কঠিন পদার্থের গুঁড়ো মাখিয়ে দেওয়া হয়। এই গোলকের ভিতরে তরল অক্সিজেন পুরে দিয়ে তরল অক্সিজেনের উষ্ণতার (—১৮৩ সেঃ) পদার্থকে উত্তেজিত করা হয়। বিভিন্ন উচ্চতর উষ্ণতায় তাপ প্রভনের পরীক্ষার জন্য এই গোলকের ভিতর এক বৈদ্যুতিক তাপযন্ত্র বসানো হয়েছে। থার্মোকাপল-এর সাহায্যে গোলকের বহির্দেশের উত্তাপ মাপা হয় এবং ফটো-মাল্টিপ্লায়ার নলের সাহায্যে প্রভন-বিকীরণের প্রখরতা ( luminescence intensity ) পরীক্ষা করা হয়। তাপপ্রভন বিভিন্ন বর্ণালী বিশ্লেষণের জন্য বিভিন্ন প্রকার ফটো-মাল্টিপ্লায়ার নলের প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন উষ্ণতায় বিকীরণের আলোকচিত্র প্রক্ষেপ ( Photographic record ) করা হয়েছে। এইসব যন্ত্রের সাহায্যে বহু রাসায়নিক দ্রব্যের বিশেষ ক'রে নানারকম আলাকালি হ্যালাইড-এর উত্তেজিত অবস্থায় এবং সাধারণ অবস্থায় তাপ-প্রভন বিকীরণের ফলে পরীক্ষাকার্য করা হয়েছে এবং সেইসব গবেষণার ফল বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এইসব গবেষণার ফলে উত্তর-বিকীরণের কতকালের কতকগুলি তথ্য ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়েছে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গেছে, একই দ্রব্যের বিকীরণের বিভিন্ন প্রখরতা বিভিন্ন বর্ণালীর দ্বারা গঠিত। অধিক উত্তাপের বিকীরণে বেগনী-নীলের আলো এবং নীল আলোর তীব্রতা পরিলক্ষিত হয়েছে। সুতরাং এদের ব্যাপক বর্ণালী বিশ্লেষণ বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু বিভিন্ন প্রখরতার (Peaks) উদ্ভবরূপে বর্ণালী-বিশ্লেষণের অসুবিধা হচ্ছে এই যে, এইসব বিকীরণ অত্যন্ত স্বল্পস্থায়ী ( মাত্র কয়েক সেকেণ্ড )। এই উদ্দেশ্যে একটি দ্রুতগতি বর্ণালী-বিশ্লেষণ যন্ত্র ( Rapid Spectro-photometer ) নির্মাণের প্রয়োজন হয় এবং কিছু দিন হলো এইরূপ একটি যন্ত্রের নির্মাণকার্য এই গবেষণাগারে সুসম্পন্ন হয়েছে। এরূপ যন্ত্র ইতিপূর্বে কোথাও প্রস্তুত হয়নি, যদিও এ নিয়ে পৃথিবীর অনেক জায়গায় গবেষণা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই এই যন্ত্রের সাহায্যে

কতকগুলি পরীক্ষাকার্য চালানো হয়েছে এবং তার আশাপ্রদ ফল পাওয়া গেছে। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর পরিচালনায় শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত এই যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন বিশ্লেষণ সম্পন্ন করেছেন। এই বর্ণালী-বিশ্লেষণ যন্ত্রের সাথে অতি অল্প সময়ে আলোকচিত্র গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং বিকীরণের প্রখরতা মাপার জন্য বিশেষরূপে নির্মিত ফটো-মাল্টিপ্লায়ার নল ব্যবহার করা হচ্ছে। এখানে উল্লেখযোগ্য, যে-সব সাধারণ ফটো-মাল্টিপ্লায়ার নল এখানে কিনতে পাওয়া যায়, তার দ্বারা এ সব পরীক্ষা কার্য চালানো সম্ভব নয় ব'লে অধ্যাপক বসু ফ্রান্স থেকে বিশেষরূপে নির্মিত একটি নল আনিয়েছেন। নবনির্মিত এই যন্ত্রের সাহায্যে এক সেকেণ্ডেরও কম সময়ে বর্ণালীর আলোক-চিত্র গ্রহণ করা এবং তাপ-প্রভনের পরীক্ষার সময়ে বর্ণালীর প্রয়োজনীয় ব্যাপক বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়েছে।

কতকগুলি কঠিন এবং তরল পদার্থের বিভিন্ন উষ্ণতায় তাপ-প্রভন-বিকীরণ পরীক্ষা করা হয়েছে। এইসব গবেষণার সাহায্যে নিম্নতাপে উত্তেজিত পদার্থের অণুগুলির বিভিন্ন শক্তি-পর্য্যায় (Energy states) সম্বন্ধে নতুন জ্ঞানলাভ করা সম্ভব হয়।

শক্তিশালী আলো দ্বারা উত্তেজিত পদার্থ ছাড়াও কতকগুলি প্রাকৃতিক খনিজ পদার্থে সাধারণভাবে তাপ-প্রভন বিকীরণ দেখা যায়। এই-জন্য আমাদের দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে নানারকম খনিজ পদার্থ এবং ধূলিকণা সংগ্রহ ক'রে বিকীরণের পরীক্ষা কার্য্য চালানো হচ্ছে।

যদিও প্রাকৃতিক খনিজ পদার্থের তাপ-প্রভন বিকীরণের চূড়ান্তকার্যের নির্দ্দেশ এখনও সম্ভব হয়নি, তবু আশা করা যায় অধ্যাপক বসুর পরিচালনায় বিকীরণের বিভিন্ন পর্য্যায়ের ওপর গবেষণা ভবিষ্যতে বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে নতুনতর আলোক-সম্পাত করতে পারবে।

—( অধ্যাপক সত্যেন্দ্র নাথ বসু, জগদীশ শর্ম্মা এবং বীরেন্দ্রচন্দ্র দত্তের একটি গবেষণাপত্র অবলম্বনে। )

লোকসেবক—বৃহস্পতিবার ১৩ই পৌষ ১৩৬২ ( ২৯ ডিসেম্বর ১৯৫৫ ) তারিখের দৈনিক সংখ্যা হইতে পুনর্মুদ্রিত।

---

# বিবেকানন্দের প্রতি

## শৈলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

নির্জীব নিদ্রিত জড় এ জাতির মাঝে
এনেছিলে তুমি একদিন
দুর্জ্জয় প্রাণের গতি কর্ম্মের প্লাবন
দিয়েছিলে জীবন নবীন।
সেদিন তোমার স্পর্শে এই বঙ্গদেশে
এসেছিল নবজাগরণ,
নিরাশার অন্ধকার অমারাত্রি শেষে
প্রকাশিল প্রভাত কিরণ।
আজ সারা বঙ্গদেশ হয়েছে আবার
জড়তা ও নিদ্রা অভিভূত
ঘুচাতে সে জড়ত্ব ও অবসাদভার
হও তুমি আজ আবির্ভূত।
শক্তির প্রচণ্ড মূর্ত্তি হে বীরসন্ন্যাসী!
হে স্বামিজী, হে গুরু মহান্!
এসো তুমি নব আশা অভয় প্রকাশি
এ দুর্দ্দিন করো অবসান।
তোমার তপস্যা তেজে, আশীষে তোমার
বাঙালীর সমস্ত দুর্গতি—
দূর হোক্—দেখা দিক সৌভাগ্য আবার
সর্ব্বাঙ্গীন গৌরবের জ্যোতি।

# গ্রন্থ-সমালোচনা

পুস্তক-সমালোচনার জন্য প্রত্যেক পুস্তকের দুইখানি করিয়া কপি পাঠাইয়া দেওয়াই সাধারণ নিয়ম। অতএব গ্রন্থকার অথবা পুস্তক-প্রকাশক মহাশয়দিগের প্রতি আমাদের নিবেদন—'বিশ্ববাণী'তে কোনও পুস্তক সমালোচনা করাইতে হইলে তাঁহারা আমাদের নিকটে প্রত্যেক সমালোচ্য পুস্তকের দুইখানি করিয়া কপি পাঠাইবেন। —ইতি সম্পাদক, 'বিশ্ববাণী'।

**The Cardinal Doctrines of Hinduism**—by Srimat Puragra Parampanthi—Foreword by J. R. Basu, M. A. (Triple). Size D/C, 1/16 Pages 215. Price Rs. 3-12 only। প্রাপ্তিস্থান—গ্রন্থকারের নিকটে, বিরাজ আশ্রম। ডক্টর বসু রোড, ডিব্রুগড়, আসাম।

'বিশ্ববাণী'র পাঠকসমাজের নিকট শ্রীমৎ পুরাগ্র পরমপন্থী মহারাজের পরিচয় দান নিষ্প্রয়োজন। পাশ্চাত্যদেশীয় দার্শনিকদের জীবনকাহিনী ও দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ তাঁহার অনেকগুলি প্রবন্ধ বিশ্ববাণীতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইংরাজী ও বাঙলা ভাষায় ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ভাষায় সুযুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ রচনায় তিনি সুদক্ষ ব্যক্তি। ইতিপূর্বে আমরা শ্রীমৎ পুরাগ্রজী রচিত *Advaita Vedanta and Modern Physics* নামক মননশক্তিসম্পন্ন গ্রন্থটির সমালোচনা করিয়াছিলাম। সেই গ্রন্থটি আমেরিকা যুক্তরাজ্যে বহু সুশিক্ষিত পাঠক পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছেন। বর্তমান পুস্তক প্রণয়নে গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্য ও মননশীলতার যশ আরও বৃদ্ধি করিয়াছে। সংক্ষেপে এইরূপ বিষয়ের সুপাঠ্য ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করা বিশেষ দক্ষতার পরিচায়ক। হিন্দুধর্মের শাস্ত্রগত ও অনুষ্ঠানগত প্রত্যেকটি প্রধান বিষয় গ্রন্থকার যেরূপ নিপুণভাবে আলোচনা ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে বইখানি সত্যই সুশিক্ষিত ও জিজ্ঞাসু পাঠকদের মুগ্ধ করে। আমরা এই বইখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

**সংগীত-প্রবেশিনী**—শ্রীবিপ্রদাস নন্দী, এম এ। সাইজ ডবল ক্রাউন ষোল পেজী—মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৬। প্রাপ্তিস্থান—ডি-এম-লাইব্রেরী-৪২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য একটাকা।

সঙ্গীত-শাস্ত্রের প্রাথমিক শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে এইরূপ একটি সুলিখিত পুস্তকের অত্যন্ত অভাব ছিল। বাঙলাদেশে সঙ্গীত-চর্চাকারী ব্যক্তিদের সংখ্যা অসংখ্য। কিন্তু সঙ্গীতের তত্ত্বগত বিষয়ের অধ্যয়ন আলোচনা ও গবেষণা বাঙলাদেশে ব্যাপকভাবে এতদিন ছিল না বলিলেই হয়। সুখের বিষয়—এখন সঙ্গীত-শাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের দিকটি অধ্যয়ন আলোচনা ও গবেষণা করিবার আগ্রহ বাঙলাদেশে সঙ্গীত-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত কয়েক জন মনীষীর চেষ্টায় সঙ্গীত চর্চাকারী ব্যক্তিদের মধ্যে জাগ্রত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ কয়েকজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি প্রচুর তথ্যপূর্ণ কয়েকটি জ্ঞানপ্রদ পুস্তক রচনার দ্বারা বাঙলা সাহিত্যের একটি বিশেষ দিককে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। তবে তাঁহাদের সেই সমস্ত পুস্তক সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে আয়ত্তসাপেক্ষ নয়। প্রথম শিক্ষার্থী ব্যক্তিদের জন্যও সঙ্গীতশাস্ত্র সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ ও শিক্ষাপ্রদ পুস্তকের একান্ত প্রয়োজন অনেক দিন অনুভূত হইতেছিল। এই শ্রেণীর কয়েকটি পুস্তক কয়েক বৎসর পূর্বে রচিত হইলেও—সেই পুস্তকগুলি আশাজনক হয় নাই।

শ্রীবিপ্রদাস নন্দীর সুরচিত এই বইখানি সেই অভাব এতদিনে দূর করিয়াছে। অতি অল্প পরিসরে এবং বিষয়বস্তুকে সহজ ও সুবোধ্য করিয়া তিনি এই গ্রন্থটি রচনা করিয়াছেন। সঙ্গীত সম্বন্ধে প্রথম শিক্ষার্থীরা মনোযোগের সহিত এই গ্রন্থটি পড়িলে গানের সুর তাল মান লয় ও প্রচলিত পদ্ধতির সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন।

প্রশ্নোত্তর-প্রণালীতে অনেক স্থানে সঙ্গীতের বিষয় ব্যাখ্যান করার জন্য এই গ্রন্থটি শিক্ষার্থীদের বিশেষ উপকারী হইয়াছে। এই বইখানির প্রত্যেক সঙ্গীত বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকরূপে গৃহীত হওয়া উচিত।

**শাণ্ডিল্য-ভক্তিসূত্র**—(পকেট এডিসন সাইজ)। ব্যাখ্যাতা শ্রীমৎ ব্রহ্মচারী শিশির কুমার। প্রাপ্তিস্থান—গ্রন্থকারের নিকটে—তিন নম্বর অম্বিকা নিয়োগী লেন—বাগবাজার, কলিকাতা। মূল্য ছয় আনা মাত্র।

ব্রহ্মচারী শিশিরকুমারের নিপুণ সম্পাদনায় ও সুষ্ঠু ব্যাখ্যানে "শাণ্ডিল্য-ভক্তিসূত্র"-এর এই বইখানি পড়িয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। প্রত্যেক সূত্রের অনুবাদ এবং সেই সঙ্গে সহজবোধ্য ব্যাখ্যান দেওয়ায় এই সংস্করণটি ভক্তিশাস্ত্র সম্বন্ধে অনুরাগী পাঠকমাত্রেরই নিকট বক্তব্য বিষয় বুঝিতে বিশেষ সহায়ক হইবে। ইহা ছাড়াও ব্রহ্মচারীজীর লিখিত 'পুরোভাস'-এ ভক্তিশাস্ত্রের ব্যাখ্যাটি এই পুস্তকের উপযোগিতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি করিয়াছে।

---

# সঙ্ঘবার্ত্তা

**শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব**—গত বুধবার ১৯ পৌষ ১৩৬২ ( ৪ঠা জানুয়ারী ১৯৫৬ ) বুধবার তারিখে কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে পরমারাধ্যা শ্রীমা-সারদাদেবীর ১০৪তম জন্মতিথি পূজার উৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

এই উৎসবের উপলক্ষে কলিকাতা রামকৃষ্ণ বেদান্তমঠে প্রভাতে মঙ্গলারতি স্তবপাঠ প্রভাতী ভজন এবং পরে বিশেষ পূজা হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বেলা এগারটা হইতে একটা পর্য্যন্ত সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীমায়ের জীবনলীলা কথকতা করিয়াছিলেন। বেলা একটা হইতে তিনটা পর্য্যন্ত প্রায় এক হাজার ভক্ত-নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বেলা তিনটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত সঙ্গীতবিশারদ শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পরিচালনায় ডানকুনি ( হুগলী জেলা ) 'বিবেক সমিতির' সদস্যগণ শ্রীশ্রীরামনাম-কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটার সময়ে বেদান্ত মঠের লাইব্রেরী হলে ও প্রাঙ্গণে একটি জনসভা হইয়াছিল। প্রায় দুই হাজার শ্রোতা সভায় সমবেত হইয়াছিলেন। কলিকাতা লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজের সুবিদুষী অধ্যক্ষা মাননীয়া ডক্টর শ্রীযুক্তা চৌধুরী মহাশয়া সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক শ্রীসমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, প্রাচ্যবাণী মন্দিরের সম্পাদক মাননীয় ডাঃ শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, শ্রীমৎ স্বামী বেদানন্দ, অধ্যাপক শ্রীনির্ম্মলেন্দু দাসগুপ্ত প্রভৃতি সভায় বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী উদ্বোধন-সঙ্গীত করিবার পরে শ্রীমৎ স্বামী হুগানন্দজী শান্তিবাচন করেন। তাহার পরে অধ্যাপক শ্রীসমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় মহাশয় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে নানাবিধ ঘটনার দ্বারা শ্রীমায়ের মহিমাময় চরিত্র বর্ণনা করিয়াছিলেন। ডাঃ শ্রীযতীন্দ্র বিমল চৌধুরী মহাশয় তাঁহার বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন, বিবিধ মহৎগুণ ও আধ্যাত্মিক মহত্ত্বের সমাবেশে শ্রীশ্রীমা-সারদা দেবী ভারতবর্ষের নারীজাতির মূর্ত্তিমতী আদর্শ। মানবীরূপে পৃথিবীতে বিরাজ করিলেও শ্রীমা ছিলেন সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রীদেবী। বহু

উন্নত শ্রেণীর ভক্ত সাধক শ্রীমায়ের মধ্যে বিশ্বজননীর প্রকাশ দেখিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছেন।

সভানেত্রী মাননীয়া ডক্টর শ্রীমতী চৌধুরী মহাশয়া বৈদিক যুগের সময় হইতে ভারতের মধ্যযুগ পর্যন্ত বহু সিদ্ধাত্মশালিনী নারীঋষি ও মহীয়সী নারীদের জীবনকথা বেদ মহাভারত বিবিধ পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রের প্রমাণে দেখাইয়াছিলেন—সাংসারিক সমস্ত অসার বিষয়কে জয় করিয়া শাশ্বতী মুক্তি ও পরম কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই ভারতবর্ষের নারী জীবনের শ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ আদর্শ। বর্তমান যুগে শ্রীমা-সারদা দেবীর জীবনে ভারতের নারী জাতির এই মহত্তম আদর্শ পূর্ণরূপে বিকশিত হইয়াছিল।

অন্যত্র বিশেষ কার্যে উপস্থিত হইবার প্রয়োজনে অতঃপর ডাঃ শ্রীমতী চৌধুরী মহাশয়া শ্রীমৎ স্বামী বেদানন্দের উপরে সভার পরিচালনার ভার দিয়া বিদায় গ্রহণ করেন। অতঃপর অধ্যাপক শ্রীনির্মলেন্দু দাসগুপ্ত শ্রীমায়ের সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। অধ্যাপক দাসগুপ্ত মহাশয় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত শ্রীমা-সারদা দেবীর অলৌকিক সম্বন্ধের কথা বর্ণনা করেন। তাহার পর শ্রীমৎ স্বামী বেদানন্দ ঠাকুর ও শ্রীমায়ের ধর্মাদর্শের বিশেষত্ব এবং তাঁহাদের কয়েকটি প্রধান উপদেশকে ব্যাখ্যানের দ্বারা বক্তৃতা শেষ করিয়াছিলেন।

সভার পরে কলিকাতা "পটলডাঙ্গা রিক্রিয়েশন ক্লাব"-এর সভ্যগণ আবৃত্তি ও গানের দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জীবনের মধ্যলীলা বর্ণনা করেন। ঐ মধ্যলীলা পালা বর্ণনায় তাঁহাদের গানগুলির সুরের বৈচিত্র্য ও আলাপন মাধুর্য সমস্ত শ্রোতাদের মুগ্ধ করিয়াছিল। রাত্রি সাড়ে এগারোটার সময়ে এই উৎসব শেষ হইয়া গিয়াছিল।

**শ্রীমহাপুরুষ শিবানন্দজীর জন্মতিথি পূজা**—গত ২৪ পৌষ ১৩৬২ (৯ই জানুয়ারী ১৯৫৬) রবিবার কৃষ্ণা-একাদশী তিথিতে পূজনীয় শ্রীশিবানন্দ মহাপুরুষ মহারাজের সপ্ততম জন্মতিথি উপলক্ষে কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে বিশেষ পূজা হোম আরতি ও ভজন গান হইয়াছিল। মধ্যাহ্নে মঠে প্রায় শতাধিক ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ২৯ পৌষ ১৩৬২ শনিবার সন্ধ্যায় এক সভায় শ্রীমৎ স্বামী বেদানন্দ প্রায় দুইশত শ্রোতার সম্মুখে পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের পবিত্র জীবনকথা ও উপদেশ সম্বন্ধে বর্ণনা ও আলোচনা করিয়াছিলেন। ব্যাখ্যানের সময়ে মধ্যে মধ্যে কতকগুলি ভজন গান হইয়াছিল। পরের দিন ৩০ পৌষ রবিবার (শ্যামবাজার রামধনমিত্র লেনের) 'ভারতী সংসদ'-এর সভ্যগণ আবৃত্তি ও সংগীত সহযোগে 'সতীলীলা' (দক্ষযজ্ঞ ও উমার পরিণয়) কীর্তন করিয়াছিলেন।

**ধর্মালোচনা**—কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত-মঠে পণ্ডিত শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায় বৈষ্ণবাচার্য সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় প্রতিদিন সন্ধ্যা সাতটায় সোমবার হইতে শুক্রবার প্রতি সপ্তাহে ছয়দিন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

**কথকতা**—কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে প্রতিদিন রবিবার সন্ধ্যায় আরতির পরে সঙ্গীতাচার্য শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত' কথকতা করিতেছেন।

**শ্রীরামনাম-কীর্তন**—প্রতি শনিবার বেলা তিনটার সময়ে সঙ্গীতবিশারদ শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তীর পরিচালনায় কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে শ্রীশ্রীরামনাম কীর্তন ও বিবিধ ভজন-গান হইয়া থাকে।

## শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের আগামী জন্মোৎসব

আগামী ২০ মাঘ ১৩৬২ (৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬) শুক্রবার কৃষ্ণা-সপ্তমী তিথিতে ভারতগৌরব বীরসন্ন্যাসী শ্রীমৎস্বামী বিবেকানন্দের ৯৩-তম জন্মদিবস। স্বামিজীর এই জন্মদিবসের উপলক্ষে কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে এবং দার্জিলিঙ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমে সাতদিবসব্যাপী কার্যক্রম অনুসারে উৎসব হইবে।

# মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত

বাঙালী জাতির গৌরব ও মহাপ্রয়াণ জননায়ক স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের এই বৎসরে (১৯৪৬, জানুয়ারী) শততম জন্মদিন আসিয়াছে। এই পুণ্যদিনের উপলক্ষে স্বদেশী যুগে জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনের অন্যতম সুবিখ্যাত নেতা এই মহাত্মাকে একান্ত শ্রদ্ধার সহিত আমরা স্মরণ করিতেছি। বরিশাল জেলায় জন্মগ্রহণ করিলেও অশ্বিনীকুমারের দেশপ্রেম জাতীয়তা ও স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মশক্তি ও মহত্ত্ব সমস্ত বাঙলা দেশে সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। অশ্বিনীকুমারের জীবন বিচিত্র ও বহুমুখী। একাধারে তিনি রাজনৈতিক নেতা, শিক্ষাগুরু, স্বদেশপ্রেমিক, কর্মযোগী, জ্ঞানসাধক মনীষী ও ধর্মপ্রাণ ভক্তসাধক। আজ নানাভাবে বাঙালীর জাতীয় জীবনে নির্জীবতা অসাড়তা ও পঙ্কিলতা আসিয়া পড়িয়াছে। বাঙালী জাতির মধ্যে আবার পৌরুষ মহত্ত্ব দেশপ্রেম ও ধর্মানুরাগ জাগ্রত করিবার জন্য অশ্বিনীকুমারের জীবন ও বাণী অনুধ্যানের প্রয়োজন আজ অনিবার্য্য।

ছাত্রজীবনে অশ্বিনীকুমার প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রিন্সিপাল চার্লস টনির প্রিয় ছাত্র ছিলেন। 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত'-প্রণেতা শ্রদ্ধাস্পদ মাষ্টার মহাশয় (মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) প্রেসিডেন্সী কলেজে ছিলেন অশ্বিনীকুমারের প্রিয় বন্ধু ও সহপাঠী। মাষ্টার মহাশয়ই অশ্বিনীকুমারকে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে লইয়া আসিয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ স্নেহ ও আশীর্বাদের পাত্র ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিকথা অশ্বিনীকুমার নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে লিখিয়াছিলেন। সেই স্মৃতিকথা 'শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে'র প্রথম ভাগের শেষে পরিশিষ্ট অংশে মাষ্টার মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন।

দক্ষিণেশ্বরে ও কলিকাতায় (সিমলায় রামচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে) ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে আসিয়া অশ্বিনীকুমার স্বামী বিবেকানন্দের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। স্বামিজী ছাড়াও ঠাকুরের আরও অন্যান্য সন্ন্যাসী শিষ্যদের সহিত অশ্বিনী-কুমারের বিশেষ শ্রদ্ধা ও অনুরাগের নিবিড় সম্বন্ধ ছিল। স্বামিজী প্রথমবার আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিবার পরে (১৮৯৭ সালে) আলমোড়ায় আবার তাঁহার সহিত অশ্বিনীকুমারের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সেদিন দেশ সমাজ ও জাতির উন্নতি-সাধন সম্বন্ধে স্বামিজীর সহিত অশ্বিনীবাবুর অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। সেই আলাপের অনুবাদ স্বামিজীর ইংরাজী জীবনচরিতের (মায়াবতী) দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

কর্মজীবনে অশ্বিনীকুমারের দীক্ষাগুরু ছিলেন পরম ভক্তিভাজন শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামিজী। মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, বিপিনচন্দ্র পাল, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ডন সোসাইটি), কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি জননেতা ও মনস্বী ব্যক্তিরা অশ্বিনীকুমারের গুরুভ্রাতা ছিলেন। অশ্বিনীকুমারের ঋষিচরিত্র ব্যক্তিত্ব মহত্ত্ব ও নেতৃত্বের প্রভাবে বরিশাল হইতে বহু দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক নেতা, শিক্ষাব্রতী ও জনসেবাব্রতী বিখ্যাত ব্যক্তির সৃষ্টি হইয়াছে। জাতীয়তার চারণকবি স্বর্গীয় মুকুন্দ দাস অশ্বিনী-কুমারের অন্যতম সৃষ্টি। স্বর্গীয় শরৎকুমার রায় (বিশ্বভারতী), ঐতিহাসিক ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি মনীষীদের লিখিত অশ্বিনীকুমারের বৃহৎ ও ক্ষুদ্রাকারের কয়েকটি জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে কলিকাতায় বঙ্গগৌরব এই জননেতা মহাত্মা দেহত্যাগ করিয়াছেন। মানবত্ব-সাধনার বিচিত্র সম্পদ তিনি বাঙালী জাতিকে দিয়া গিয়াছেন। তাহার জন্যই তিনি স্বদেশপ্রাণ ও মহত্ত্বপ্রয়াসী প্রত্যেক বাঙালীর নিকটে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।